



চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়
জার্নাল অব আর্টস অ্যান্ড হিউম্যানিটিজ

**THE CHITTAGONG UNIVERSITY
JOURNAL OF ARTS AND HUMANITIES**

সংখ্যা ৩৫ ২০১৯ * Vol. XXXV 2019



চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়
জার্নাল অব আর্টস অ্যান্ড হিউম্যানিটিজ

**THE CHITTAGONG UNIVERSITY
JOURNAL OF ARTS
AND HUMANITIES**

কলা ও মানববিদ্যা অনুষদ
Faculty of Arts and Humanities

Vol. XXXV, 2019, Published in December 2023

সংখ্যা ৩৫, ২০১৯ ডিসেম্বর ২০২৩-এ প্রকাশিত

Published by
Registrar
University of Chittagong

Copyright:
University of Chittagong

Printed by:
.....

Price
Tk. 600.00
US \$ 20.00

ISSN 1993-5536

This journal is an official publication of the Faculty of Arts and Humanities, University of Chittagong. Opinions expressed in the essays are authors'; they do not reflect the views either of the editor or of the university.

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় জার্নাল অব আর্টস অ্যান্ড হিউম্যানিটিজ
সংখ্যা ৩৫, ২০১৯

নির্বাহী সম্পাদক

ড. মোহাম্মদ মাহবুবুল হক

সম্পাদনা পর্ষদ

প্রফেসর ড. তাসলিমা বেগম, বাংলা বিভাগ

প্রফেসর মাহ-এ-নূর কুদ্দুসী ইসলাম, ইংরেজি বিভাগ

প্রফেসর ড. মো. আনোয়ারুল ইসলাম, ইতিহাস বিভাগ

প্রফেসর ড. এফ. এম. এনায়েত হোসেন, দর্শন বিভাগ

প্রফেসর ড. হাসিনা আখতার, ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ

ড. মুহাম্মদ নূর হোসাইন, সহযোগী অধ্যাপক, আরবি বিভাগ

প্রফেসর ড. আ.ন.ম. আবদুল মাবুদ, ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ

জনাব মনজুরুল আলম, সহযোগী অধ্যাপক, আধুনিক ভাষা ইনস্টিটিউট

প্রফেসর ড. কুন্তল বড়ুয়া, নাট্যকলা বিভাগ

প্রফেসর জাহেদ আলী চৌধুরী, চারুকলা ইনস্টিটিউট

প্রফেসর ড. মো. আবুল হাসেম, ফারসি ভাষা ও সাহিত্য বিভাগ

প্রফেসর ড. জিনবোধি ভিক্ষু, পালি বিভাগ

ড. শিপক কৃষ্ণ দেবনাথ, সহযোগী অধ্যাপক, সংস্কৃত বিভাগ

প্রফেসর ড. উদিত দাশ, ইনস্টিটিউট অব এডুকেশন এন্ড রিসার্চ

প্রফেসর ড. মোহাম্মদ মাহবুবুল হক, সভাপতি, বাংলাদেশ স্টাডিজ বিভাগ

The Chittagong University Journal of Arts & Humanities
Volume XXXV, 2019

Executive Editor

Dr. Mohammad Mahbubul Hoque

Members

Professor Dr. Taslima Begum, Department of Bangla

Professor Mah-E-Nur Qudsi Islam, Department of English

Professor Dr. Md. Anowarul Islam, Department of History

Professor Dr. F.M. Anayet Hossain, Department of Philosophy

Professor Dr. Hasina Akther, Department of Islamic History & Culture

Dr. Muhammad Nur Hossain, Associate Professor, Department of Arabic

Professor Dr. A.N.M. Abdul Mabood, Department of Islamic Studies

Mr. Monjurul Alam, Associate Professor, Institute of Modern Language

Professor Dr. Kuntal Barua, Department of Dramatics

Professor Jahed Ali Chowdhury, Institute of Fine Arts

Professor Dr. Md. Abul Hasem, Department of Persian Language & Literature

Professor Dr. Jinabodhi Bhikkhu, Department of Pali

Dr. Sipak Krishna Deb Nath, Department of Sanskrit

Professor Dr. Udit Das, Institute of Education and Research

Professor Dr. Mohammad Mahbubul Hoque, Department of Bangladesh Studies

সম্পাদকীয়

কলা ও মানববিদ্যা অনুষদের জার্নাল হিসেবে বর্তমান সংখ্যাটি ৩৫তম। বাংলা, ইংরেজি ও আরবি ভাষায় রচিত মোট ২০টি প্রবন্ধ এখানে স্থান পেয়েছে। ইতিহাস, ভাষা ও সাহিত্য, নাট্যকলা ও চারুকলা এবং ধর্মতত্ত্ব ও দর্শনের নানাবিধ বিষয়ে প্রবন্ধগুলো রচিত হয়েছে।

জার্নাল প্রকাশের দীর্ঘ জট নিরসনের লক্ষ্যে ডিনের দায়িত্ব পালনকালে (২০২২-২০২৪) অনুষদ জার্নালের মোট ৬টি সংখ্যা প্রকাশের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। বক্ষ্যমাণ সংখ্যাটি ৯৯তম অনুষদ সভার সিদ্ধান্ত অনুসারে আমার সম্পাদনায় দ্বিতীয় অনলাইন ভার্সনসহ প্রকাশিত হলো।

১৯৮৬ সাল থেকে MLA style manual অনুযায়ী জার্নাল প্রকাশের সিদ্ধান্ত ছিল; কিন্তু তা করা যায়নি; ভিন্ন ভিন্ন প্রবন্ধে ভিন্ন ভিন্ন style অনুসরণ করা হয়েছে। অনুষদ অফিসে সংরক্ষিত MLA style manual অনুসরণ করে বর্তমান সংখ্যাটি প্রকাশ করা হয়েছে।

জার্নাল প্রকাশের ক্ষেত্রে সম্পাদনা পরিষদের সম্মানিত সদস্যগণের যথাযথ সহযোগিতা পেয়েছি; তাঁদের পরামর্শ অনুযায়ী প্রবন্ধ প্রকাশের প্রক্রিয়া অনুসরণ করা হয়েছে। আমি প্রবন্ধ মূল্যায়ন সংশ্লিষ্ট বিশেষজ্ঞদের ধন্যবাদ জানাই। জার্নাল প্রকাশের কাজ এগিয়ে নেওয়ার জন্য আরবি বিভাগের প্রফেসর ড. মুহাম্মদ শাযাআত উল্লাহ ফারুকী ও ইংরেজি বিভাগের জনাব গোলাম হোসেন হাবীব (জি এইচ হাবীব)-এর সহযোগিতা কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্বীকার করছি। অনুষদের ডেপুটি রেজিস্ট্রার জনাব মুহাম্মদ আইয়ুব ও উর্ধ্বতন সহকারী জনাব মোহাম্মদ আতাউল্লাহ বিশেষজ্ঞদের সঙ্গে যোগাযোগের যাবতীয় কাজ করেছেন; আমি তাঁদেরকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি। যথেষ্ট সতর্কতা সত্ত্বেও কিছু মুদ্রণ প্রমাদ রয়ে গেছে। এ জন্যে আমি সম্পাদনা পরিষদের পক্ষ থেকে দুঃখ প্রকাশ করছি।

জার্নালের অনলাইন সংস্করণ প্রকাশের কাজ করেছেন আইসিটি-র সিনিয়র কম্পিউটার প্রকৌশলী জনাব এস. এম. আহসানুল করিম শিমুল এবং অনুষদের সভাপতি ও পরিচালক সভার সিদ্ধান্ত অনুসারে বিশ্ববিদ্যালয় প্রেসের বাইরে জার্নাল মুদ্রণের দায়িত্ব পেয়েছেন চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় প্রেসের সিনিয়র ইন্সট্রাক্টর (ডেপুটি রেজিস্ট্রার) জনাব মোর্শেদুল আলম; তাঁদেরকে ধন্যবাদ জানাই। আশা করি, ভবিষ্যতে জার্নাল যথানিয়মে প্রকাশিত হবে।



২৬.১২.২০২৩

প্রফেসর ড. মোহাম্মদ মাহবুবুল হক

নির্বাহী সম্পাদক

জার্নাল অব আর্টস অ্যান্ড হিউম্যানিটিজ, ৩৫তম সংখ্যা, ২০১৯

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়।

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় জার্নাল অব আর্টস অ্যান্ড হিউম্যানিটিজ
The Chittagong University Journal of Arts and Humanities

সংখ্যা ৩৫, ২০১৯ (ডিসেম্বর ২০২৩-এ প্রকাশিত) Vol. XXXV, 2019 (Published in December 2023)

সূচিপত্র:	পৃষ্ঠা
চট্টগ্রামে জমিদার শ্রেণির উদ্ভব ও বিকাশ: ১৮৪৮ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত	১-১২
ড. নূরুল ইসলাম	
প্রিন্টমেকিং: ছাপাইশিল্প শিক্ষা কার্যক্রমে অ-বিষাক্ত ছাপাইশিল্পের সমসাময়িক	১৩-৩০
করণকৌশলের চর্চা ও আবশ্যিকতা	
মো. জসিম উদ্দিন	
কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে ব্যবসা-বাণিজ্যের বিধান	৩১-৪৬
ড. মুহাম্মদ নূরুল আমিন নূরী	
মানবজীবনে “আল-আমানাহ ও আল-খিয়ানাহ”-এর স্বরূপ এবং সমাজ জীবনে এর	৪৭-৫৬
প্রতিফলন: একটি পর্যালোচনা	
ড. মুহাম্মদ নেজাম উদ্দিন	
নির্বাসিতের আত্মকথা: ব্রিটিশ ভারত ও আন্দামান জেলের চিত্র (১৯০৮-১৯২১)	৫৭-৬৮
মোহাম্মদ মীর সাইফুদ্দীন খালেদ চৌধুরী	
ছাপাই মাধ্যমের ক্রমবিকাশের ধারায় সৃজনশীল ছাপচিত্র (১৯৪৮-২০০০):	৬৯-৭৮
পরিপ্রেক্ষিত বাংলাদেশ	
নিত্যানন্দ গাইন	
মহাভারতীয় প্রেমোপাখ্যানের নবরূপ “ভারত প্রেমকথা”	৭৯-৯০
ড. শিপক কৃষ্ণ দেব নাথ	

ইউরোপ ও দক্ষিণ এশিয়ার মধ্যে সভ্যতার মিথস্ক্রিয়া: ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট	৯১-১০২
ড. মুহাম্মদ শফিউল্লাহ কুতুবী	
তুলনামূলক শিক্ষা: একটি পর্যালোচনা	১০৩-১১৬
কাজল বরণ নাথ	
বাংলাদেশের নাটকে অ্যাবসার্ড চেতনার প্রভাব	১১৭-১৩০
ফাহিমদা সুলতানা তানজী	
ভারতীয় দর্শনে কর্মের ধারণা	১৩১-১৪০
রীতা রানী ধর	
আমির খসরু দেহলভি: কাব্য ও কবিমানস	১৪১-১৫২
আলতাফ হোসেন	
Islamic Education and Islamization of Education in Bangladesh: A Critical Study	১৫৩-১৭৬
Dr. Mohammad Nayamat Ullah	
English Acronymic Loans in Bangla	১৭৭-১৯২
Dr. Sarwar Morshed	
A Critical Analysis of Deriving Moral Statement from Factual Statement	১৯৩-২০২
Muhammed Amir Uddin	
The Nature of World According to Advaita Vedānta	২০৩-২১২
Rajpati Das	
The Enigma Called Translation: An Exposition	২১৩-২১৮
Golam Hossain Habib	

Femininity and Silence: Reading Tree Without Roots Sarjana Akter	২১৯-২২৬
A Foucauldian Analysis of Power, Culture and Politics Md. Najemul Alam	২২৭-২৩৬
الموازنة بين الشعراء أبي تمام والبُحتري في الأشعار العربية (কবি আবু তাম্মাম ও কবি আল-বুহতুরী'র মধ্যে তুলনামূলক আলোচনা) ড. মুহাম্মদ জুনাইদুল ইসলাম	২৩৭-২৫৬

চট্টগ্রামে জমিদার শ্রেণির উদ্ভব ও বিকাশ: ১৮৪৮ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত

ড. নূরুল ইসলাম*

প্রতিপাদ্যসার

চট্টগ্রাম একটি প্রাচীন সমৃদ্ধ জনপদ। আধুনিককালের মত অতীতেও চট্টগ্রাম সমগ্র প্রাচ্যে গৌরবোজ্জ্বল অর্থনৈতিক ও বাণিজ্যিক কেন্দ্র হিসেবে বিবেচিত হতো। এখানকার ভূমিব্যবস্থাও ছিল খুবই গুরুত্বপূর্ণ। চট্টগ্রামের ভূমিব্যবস্থার অন্যতম উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হলো এখানে অনেক ছোট ছোট জমিদারির উদ্ভব। এর কারণ, এ অঞ্চলের প্রতিরক্ষার জন্য সর্বদা দুর্গ-রক্ষী যে সৈন্যদল রাখা হতো বেতনের পরিবর্তে তাদেরকে কিছু কিছু জমি দিয়ে দেয়া হতো। সামরিক জায়গির প্রথা উঠে গেলে সরকার ঐ সকল জমির উপর রাজস্ব ধার্য করে। এগুলো উক্ত সময়ের মধ্যে জমিদারিতে পরিণত হয়। এছাড়াও ভাগ্যাত্মক নিরাপত্তার খাতিরে দলবদ্ধভাবে চট্টগ্রামে আসত। প্রত্যেক দলের নেতাকে তাঁর যতগুলো অনুচর থাকত ততটুকরা বা তার কিছু বেশি জমি দিয়ে দেয়া হতো। পরে এক নেতার অনুচররা যত টুকরা জমি চাষ করত ঐগুলোকে একত্রে ধরে ঐ নেতার নামে তরফ সৃষ্টি করা হয়। এটিই চট্টগ্রামের জমিদারি প্রথা এবং বাংলার অবশিষ্টাংশের মধ্যে পার্থক্যের সৃষ্টি করেছে। ১৭৬৪ খ্রিষ্টাব্দে চট্টগ্রামে প্রথম ভূমি জরিপ হয়। এ জরিপের আওতাভুক্ত তরফগুলি চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের অধীনে আসে। পরবর্তী সময়ে এখানে আরো অনেক জরিপ পরিচালিত হয়েছিল। ভূমি বন্দোবস্ত ভিত্তিক চট্টগ্রামে সর্বশেষ জরিপ পরিচালিত হয় ১৮৪৮ খ্রিষ্টাব্দে। চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত পরবর্তী এ সব জরিপের মাধ্যমে বন্দোবস্তকৃত ভূমি নোয়াবাদ ভূমি নামে পরিচিত। এছাড়াও আলোচ্য সময়ের মধ্যে আরাকান থেকে অনেকে চট্টগ্রামে এসে বসতি স্থাপন করে জমিদারি লাভ করে। এভাবে চট্টগ্রামে জমিদারের সংখ্যা বৃদ্ধি পায়। আলোচ্য প্রবন্ধে ১৮৪৮ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত চট্টগ্রামে জমিদারদের উদ্ভব ও বিকাশ আলোকপাত করা হয়েছে।

ভূমিকা

চট্টগ্রাম তথা বাংলার ভূমিব্যবস্থা ও ভূমিরাজস্ব ব্যবস্থার সবচেয়ে শক্তিশালী গোষ্ঠী ছিলেন জমিদার শ্রেণি। রাষ্ট্র ও কৃষকের মাঝখানে খাজনা-আদায়ের মাধ্যম হিসেবে এ শ্রেণি কাজ করত। ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির শাসনামলে এদেশে যে মধ্য, উপ ও নিম্ন ভূস্বত্বাধিকারী শ্রেণি ছিল তাদের সংখ্যা উপর থেকে নিচ পর্যন্ত ছিল

*অধ্যাপক, ইতিহাস বিভাগ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়

‘পিরামিড’ সদৃশ। W W Hunter এদের সংখ্যা উল্লেখ করেছেন ২০টি মত (Hunter 1875, 107)। B. H. Baden Powel -এর মতে, ক্ষেত্র বিশেষে এই সংখ্যা ছিল প্রায় ৬০টির মত (Powel 1875, 538)। লর্ড কর্ণওয়ালিসের চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত ব্যবস্থা চালুর পর বাংলায় অঞ্চল ভিত্তিক যে বৃহৎ জমিদারি গড়ে উঠেছিল, সে রকম কোন বড় জমিদারি চট্টগ্রামে ছিল না। এখানকার জমিদারিগুলি ছিল তুলনামূলকভাবে ছোট। ১৭৬১ খ্রিষ্টাব্দে যখন ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি চট্টগ্রামের শাসনভার হাতে নেয় তখন চট্টগ্রামে জমিদারের সংখ্যা ছিল ১৪০০ জন (Fifth Report 1917, 426)। ১৭৬৪-৬৫ খ্রিষ্টাব্দে ভূমি জরিপের মাধ্যমে এ সমস্ত জমিদারগণ চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের আওতায় আসে।

চট্টগ্রামে জমিদারদের উদ্ভব ও বিকাশ

আলোচ্য সময়ে চট্টগ্রামের জমিদারদের উৎপত্তির ইতিহাস পর্যালোচনা করে এদেরকে প্রধানত চার শ্রেণিতে বিভক্ত করা যায়। যথা:

- ক. সামরিক জমিদার;
- খ. প্রশাসনিক কাজে নিয়োজিত জমিদার;
- গ. ইউরোপীয় জমিদার;
- ঘ. আরাকানি জমিদার।

ক. সামরিক জমিদার

সামরিক জমিদারেরা বিশেষত মোগল আমলে বিভিন্ন দায়িত্বপ্রাপ্ত ছিলেন। এরা মূলত শাসকশ্রেণীর সাথে সামরিক ব্যক্তি হিসেবে চট্টগ্রামে আসেন এবং চট্টগ্রাম বিজয়ের পর তারা বিভিন্ন দায়িত্ব পালন করেন। কালক্রমে এরা জমিদারে পরিণত হয়।^১ সামরিক জমিদারদের মধ্যে নিয়ামত খান, জবরদস্ত খান, তাজ সিং ও মনগট রাম হাজারী উল্লেখযোগ্য।

নিয়ামত খানের পূর্বপুরুষ বুজুর্গ উমেদ খান কর্তৃক ১৬৬৫-৬৬ খ্রিষ্টাব্দে চট্টগ্রাম বিজয়ের সময় মোগল সৈন্যবাহিনীতে অংশ নিয়েছিলেন। বুজুর্গ উমেদ খাঁ চট্টগ্রাম বিজয়ের পর সীমান্ত রক্ষা এবং উপদ্রব দমনের জন্য ১২ জন হাজারীকে নিযুক্ত করেছিলেন। এদের মধ্যে দু’জনকে আরাকানি আক্রমণ প্রতিহত করার জন্য সঙ্খ নদীর তীরে নিযুক্ত করে জায়গীর প্রদান করেন। তাদের প্রত্যেকের অধীনে এক হাজার সৈন্য ছিল। তখন থেকে এ স্থান ‘দোহাজারী’ নামে পরিচিতি লাভ করে (মাহবুব উল আলম ১৯৬৭, ১৭)। এদের একজন আধু খাঁ এবং অপরজন হলেন জোরওয়ার সিংহ হাজারী।

আধু খাঁর পিতা নবাব বাহাদুর খাঁ বাদশাহ আলমগীরের রাজত্বকালে রোহিলাখণ্ডের আমীর ছিলেন। তিনি জাতিতে ছিলেন পাঠান। আধু খাঁ এ অঞ্চলের দায়িত্ব পেয়ে তা দক্ষতার সাথে পালন করেন এবং পাশাপাশি তাঁর পুত্র শের জামাল খাঁকে সাথে নিয়ে নিজ জমিদারি দক্ষিণে লোহাগাড়া থেকে উত্তরে রাঙ্গুনিয়া পর্যন্ত বিস্তার ঘটান। আধু খাঁয়ের মৃত্যুর পর তাঁর দুই পুত্র শের জামাল খাঁ ও রহমত খাঁ চট্টগ্রাম শহরের যথাক্রমে জামাল খাঁ ও রহমতগঞ্জ এলাকায় বসবাস করেন। এদের নামানুসারে আধুনিক জামাল খাঁ ও রহমতগঞ্জের উৎপত্তি হয়। শের জামাল খাঁ নিজামপুর পরগণার জমিদার চৌধুরী কাদের এয়ার খাঁর কন্যাকে বিয়ে করে তাঁর জমিদারির

চট্টগ্রামে জমিদার শ্রেণির উদ্ভব ও বিকাশ: ১৮৪৮ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত

আরো বিস্তৃতি ঘটান। ১৭৭৪ খ্রিষ্টাব্দে শের জামাল খাঁর পুত্র নিয়ামত খাঁয়ের নামে তাদের জমিদারি বন্দোবস্ত হয়। সাঙ্গু নদীর উভয় তীরে পটিয়া ও সাতকানিয়াসহ চট্টগ্রামের ৩৯টি গ্রামে এ জমিদারি বিস্তৃত ছিল (*Revenue Consultations* 6 September 1774)। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সময় ১২,৬৮৭ টাকায় এটি নূরচম্পা পুশা বিবির নামে বন্দোবস্ত হয়। তিনি নিয়ামত খাঁ ও নূর চেমনা পাঠানী দম্পতির মেয়ে ছিলেন। পুশা বিবির মৃত্যুর পর তাঁর পালকপুত্র ফজর আলী খাঁ দোহাজারী এস্টেটের মালিক হন (চৌধুরী শ্রীপূর্ণচন্দ্র দেববর্ম্ম তত্ত্বনিধি ২০০৪, ৬৯)।

জোরওয়ার সিংহ হাজারী সেনাপতি লক্ষ্মণ সিংহ হাজারীর পুত্র। লক্ষ্মণ সিংহ দুই হাজার সৈন্যের অধিপতি ছিলেন। শাঙ্গু নদীর তীরে আধু খাঁর মত তিনি দুর্গ স্থাপন করে সীমান্ত রক্ষায় নিয়োজিত ছিলেন। তিনিও বিস্তীর্ণ ভূমির জায়গির লাভ করে জমিদারে পরিণত হন। তাঁর পুত্র জোরওয়ার সিংহ হাজারীর সময় চট্টগ্রামের হাজারীরা (১২ জন হাজারী) বেশ শক্তিশালী হয়ে উঠে, যা মোগল সাম্রাজ্যের জন্য হুমকিস্বরূপ ছিল। ফলে এ সময় চট্টগ্রামের মোগল শাসক ‘দেওয়ান মহাসিংহ’ (১৭৫৩-১৭৫৮) ১২ জন হাজারীর মধ্যে ১০ জনকে কৌশলে সীতাকুণ্ডে তাঁর কার্যালয়ে নিয়ে বন্দী করে মুর্শিদাবাদে পাঠিয়ে দেন। নবাব আলীবর্দী খাঁ তাদেরকে পিঞ্জিরাবন্দী করে গঙ্গা নদীতে ডুবিয়ে মারেন (Cotton 1880, 6)। যে দু’জন হাজারী এ ঘটনার সাথে সম্পৃক্ত ছিলেন না তাঁরা হলেন আধু খাঁর পুত্র শের জামাল খাঁ এবং জোরওয়ার সিংহ হাজারী। ১৭৭৪ খ্রিষ্টাব্দে জোরওয়ার সিংহ হাজারী পুত্র মনগট রাম সিংহ হাজারীর নামে জমিদারি বন্দোবস্ত হয় (Alamgir Muhammad Serajuddin 1971, Appendix G)।

চট্টগ্রামের আনোয়ারা উপজেলার শোলকাটা গ্রামের বিখ্যাত জমিদার শেরমস্ত খানের পুত্র ছিলেন জবরদস্ত খান। কোন কোন গবেষক তাঁর অপর নাম মনু মিয়া বলে উল্লেখ করেছেন। তাঁর জমিদারির আয়তন ছিল ৩,১৯৪ একর এবং তাঁর সমুদয় সম্পত্তি ‘তরফ জবরদস্ত খাঁ’ নামে বন্দোবস্তকৃত ছিল (মমতাজ ও নাসরিন ২০১৩ : ২০৭)। এ জমিদারি জেলার ছয়টি থানার ৭১টি গ্রামের মধ্যে বিদ্যমান ছিল। তিনি ইতিহাসের কিংবদন্তী বাঁশখালির সরলা গ্রামের অপরূপ সুন্দরী মলকা বানুকে বিয়ে করেন। তাদের কোন সন্তানাদি ছিল না। জবরদস্ত খানের মৃত্যুর পর বিশাল জমিদারির অর্ধেক বড় বোন কালাবিবি এবং অপর অংশ স্ত্রী খোরশা বানু ও মলকা বানু ভাগাভাগি করে নেয়। বিশেষ করে কক্সবাজার এলাকার জমিদারি মলকা বানুর ভাগে পড়ে (জহিরুল ইসলাম ২০০১, ৬৩)।

রামু সিং ১৬৬৫-৬৭ খ্রিষ্টাব্দে বুজুর্গ উমেদ খাঁয়ের চট্টগ্রাম বিজয়ের সময় যুদ্ধে অংশ নিয়েছিলেন এবং জায়গীর প্রাপ্ত হয়েছিলেন। রামু সিং এর পৌত্র ছিলেন তাজ সিং। তাজ সিং ১৭৭৪ খ্রিষ্টাব্দের বন্দোবস্তে একজন জমিদার হিসেবে তালিকাভুক্ত হন। তাঁর জমিদারির মোট পরিমাণ ছিল ৪,৯২৮ একর, যা ৬১টি গ্রামের মধ্যে বিদ্যমান ছিল (Alamgir Muhammad Serajuddin 1971, 185)।

সামরিক জমিদারদের মধ্যে অন্যতম পরিবার ছিল মনোহর রায় জমিদারি। ১৭৭৬-৭৭ খ্রিষ্টাব্দের হিসেব মতে এ জমিদারি ছিল চট্টগ্রামের তৃতীয় বৃহত্তম জমিদারি। এ বংশের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন রাজারাম রায়। চট্টগ্রামের নোয়াপাড়ায় বিস্তৃর্ণ অঞ্চল জুড়ে তাঁর জমিদারি বিদ্যমান ছিল। তাঁর চার পুত্র শ্রীযুক্ত রায়, দুর্গাপ্রসাদ রায়, শ্যাম রায় ও চাঁদ রায়। এদের মধ্যে শ্যাম রায় পরবর্তীকালে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন এবং আনোয়ারার বিখ্যাত বড়উঠানের মিয়া বাড়ী জমিদারি প্রতিষ্ঠা করেন। শ্রীযুক্ত রায়ের তীর্থ-লব্ধ পত্নীর গর্ভে মনোহর রায়ের জন্ম হয়। মনোহর রায়ের জন্মের পর প্রথম স্ত্রীর গর্ভে জগদীশ রায় জন্মগ্রহণ করেছিলেন। শ্রীযুক্ত রায়ের মৃত্যুর

পর তাঁর জমিদারি দুই পুত্রের মধ্যে বিভক্ত হয় (শ্রীসজনীকান্ত দাস ১৩৬৬, ৩-৪)। মনোহর রায়ের বংশ ধরেরা পুরুষানুক্রমে চট্টগ্রামে তাদের জমিদারি পরিচালনা করেছিলেন। জমিদারি পরিচালনা ছাড়াও এ বংশের অনেকে শিক্ষা-দীক্ষা গ্রহণ করে ব্রিটিশ সরকারের উচ্চ পদে চাকরিরত অবস্থায় ছিলেন। এদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন নবীনচন্দ্র সেন। নবীনচন্দ্র সেন উচ্চ শিক্ষা গ্রহণ করে সরকারী চাকরিতে যোগ দেন এবং ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টর হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। চাকরী ছাড়াও তিনি কবি সাহিত্যিক হিসেবেও খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। তাঁর আত্মজীবনীমূলক গ্রন্থ “আমার জীবন” সুধি সমাজে আজও সমাদৃত।

বড়উঠানের জমিদার আছদ আলী খান

চট্টগ্রামের দেয়াঙ পরগণার প্রসিদ্ধ বড়উঠানের মিয়া বাড়ী জমিদারী ছিলেন আঞ্চলিকভাবে খুবই পরিচিত। এ জমিদারির প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন শ্যামরায় চৌধুরী। শ্যামরায় ১৬৬৬ খ্রিষ্টাব্দে নবাব শায়েস্তা খান কর্তৃক চট্টগ্রাম বিজয়কালে বুজুর্গ উমেদ খান'র সহযোগী সেনাধ্যক্ষ ছিলেন। যুদ্ধশেষে তিনি দেওয়ান পদে নিযুক্ত হন এবং রাউজানে বসবাস শুরু করেন। পরবর্তীতে ১৬৯৬ খ্রিষ্টাব্দে তিনি দেয়াঙ পরগণায় এসে জমিদারি প্রতিষ্ঠা করেন। এক পর্যায়ে তিনি ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন এবং তার প্রতিষ্ঠিত জমিদারি মনোহর আলী খান জমিদারি হিসেবে প্রতিষ্ঠা পায়। ইংরেজ আমলে এ বংশের অন্যতম জমিদার ছিলেন আছদ আলী খান। এছাড়াও জিন্নাত আলী খান, আকরম আলী খান, আনোয়ার আলী খান, ছালামত আলী খান, শের আলী খান এ বংশের জমিদারদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলেন।

চৌধুরী কাদির ইয়ার খান পরিবার

চৌধুরী কাদির ইয়ার খান পরিবার ছিল মীরসরাই পরগণার বিখ্যাত জমিদার পরিবার। এ পরিবারে প্রতিষ্ঠাতা মীর গফুর খান। মীর নামানুসারে মীরসরাই নামকরণ করা হয়েছে বলে গবেষক, ঐতিহাসিক সকলেই এক বাক্যে স্বীকার করেন (আহমদ মমতাজ ২০০৪, ৫১)। তিনি ষোল শতকের দ্বিতীয়ার্ধে মীরসরাই অঞ্চলের জমিদার ছিলেন। বাংলার বার ভূঁইয়ার প্রধান ঈসা খাঁ তাঁর আত্মীয় ছিলেন। মীর গফুর খান এ অঞ্চলে বসতি স্থাপন করে তৎকালীন সরকার থেকে বিশাল জমিদারি লাভ করেন।

চৌধুরী কাদির ইয়ার খান ছিলেন মীর গফুর খানের পুত্র। পিতার মৃত্যুর পর তিনি বিশাল জমিদারির মালিক হন। তাঁর মৃত্যুর পর দুই পুত্র আমানত খান ও দেয়ানত খান জমিদারির মালিক হয়েছিলেন। আমানত খান চিরকুমার ছিলেন। দেয়ানত খানের ছড়ি বিবি বা হাড়ি বিবি নামে এক কন্যা ছিল। এ হাড়ি বিবিও চিরকুমারী ছিলেন। তাঁর মৃত্যুর পর চৌধুরী কাদের ইয়ার বংশ শেষ হয়ে যায় (আহমদ মমতাজ ২০০৪, ৬৬৮)।

সন্দ্বীপের জমিদার

মুসলমান আমলে সন্দ্বীপের ক্ষমতাশালী জমিদার ছিলেন দিলাল খান। তিনি মোগল শাসকদের কাছ থেকে সন্দ্বীপ অধিকার করে প্রায় পঞ্চাশ বছর শাসন করেছিলেন (রাজকুমার চক্রবর্তী ১৯২৩, ১১২)। দিলাল খানের মৃত্যুর পর মোগল শাসকরা তাঁর জামাতা চাঁদ খানের সাথে সন্দ্বীপ অঞ্চলের ইজারার বন্দোবস্ত করেন। চাঁদ খান নিজে ও তাঁর দু'জন আত্মীয় এবং তৎকালীন কানুনগো দপ্তরের একজন কর্মচারীর মধ্যে সন্দ্বীপের এ সর্বময় ইজারা ভাগ করে নেন। ইংরেজ শাসনের প্রথম দিকে এরাই সন্দ্বীপের জমিদার হন (সুপ্রকাশ রায় ২০০০, ৫২)।

চাঁদ খানের মৃত্যুর পর তাঁর বংশের চতুর্থ পুরুষ আবু তোরাপ চৌধুরী জমিদারির একাংশ লাভ করেন। তিনি খুবই ক্ষমতাশালী ছিলেন। অল্পসময়ের মধ্যে তিনি অন্যান্য জমিদারদের বিতাড়িত করেন। কিন্তু কিছুদিনের মধ্যে তিনি গোকুল ঘোষালের সাথে দ্বন্দ্ব জড়িয়ে পড়েন। গোকুল বিতাড়িত জমিদারদের দিয়ে নবাব ও

ইংরেজদের কাছে অভিযোগ পেশ করেন। ইংরেজ গভর্নর আবু তোরাপকে দমনের জন্য ক্যাপ্টেন নলিকিনকে প্রেরণ করেন। ১৭৭৬ খ্রিষ্টাব্দের মধ্যভাগে উভয়ের মধ্যে ভীষণ যুদ্ধ হয় এবং যুদ্ধে আবু তোরাপের মৃত্যু হলে তাঁর সব সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করে পূর্বের জমিদারদের ফিরিয়ে দেয়া হয়। গোকুল ঘোষাল সন্দ্বীপের আহাদদার হওয়ার সুযোগে আবু তোরাপের জমিদারি ভবানীচরণ দাসের নামে বন্দোবস্ত করেন। নোয়াখালি ডিস্ট্রিক্ট গেজেটিয়ারে উল্লেখ আছে, আবু তোরাপের বিদ্রোহের সুযোগ নিয়ে গোকুল ঘোষাল কতিপয় চৌধুরীর জমিদারি বাজেয়াপ্ত করেন এবং তা নিজে কুক্ষিগত করে নেন। পরে ভীতি প্রদর্শন ও উৎপীড়নের দ্বারা অন্য জমিদারদেরও তাদের জমিদারী তাঁর নিকট বিক্রয় করতে বাধ্য করেন এবং এভাবে প্রায় সমস্ত দ্বীপটি তাঁর অধিকারভুক্ত হয় (Nurul Islam Khan 1977, 21-25)।

খোন্দকার পরিবার

কোম্পানির শাসনামলে কোয়েপাড়ায় খোন্দকারদের প্রাধান্য ছিল। ঐতিহাসিকদের মতে, এ বংশ গৌড় থেকে আরাকান যাওয়ার পথে শেষ পর্যন্ত কোয়েপাড়ায় এসে বসতি স্থাপন করেন। ব্রিটিশ আমলে এ বংশের খ্যাতমান ব্যক্তি ছিলেন মুন্সী নূরুদ্দীন খোন্দকার। ১৮৫৫ খ্রিষ্টাব্দের ২২শে মে চট্টগ্রামের কালেক্টরি সনদ অনুসারে রাউজান থানার বাগোয়ান মৌজার ৩৩৭২৬ নং বাজেয়াপ্ত তালুক নূর মোহাম্মদের নামে সনদ প্রদান করা হয়।

পার্বত্য অঞ্চল

চট্টগ্রামের ভূমি ব্যবস্থার ইতিহাসে অনেক মগ জমিদার প্রসিদ্ধ হয়ে আছেন। এসব জমিদাররা প্রথমে আলীকদম ও পরে রাঙ্গুনিয়া হয়ে পাবর্ত্য চট্টগ্রামের বিভিন্ন অঞ্চলে জমিদারি পরিচালনা করেন। জমিদারের পাশাপাশি এরা রাজা হিসেবেও পরিচিত ছিলেন। তারা মূলত শাহ সুজার অনুসারী। এদের মধ্যে ফতে খাঁ প্রথম আলীকদমে জমিদারির প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন। পরবর্তী সময়ে তিনি বুজুর্গ উমেদ খাঁর সাথে সন্ধি করে রামু পর্যন্ত জমিদারি বিস্তার করেন (জামাল উদ্দিন ২০১২, ৬০)। অশোক কুমার দেওয়ান চাকমা জাতি গ্রন্থে রামুর অধিপতি ফতে খাঁকে চাকমা রাজা বলে উল্লেখ করেছেন (অশোক কুমার দেওয়ান ১৯৮২)। ফতে খাঁর পর এ অঞ্চলে জমিদার ছিলেন যথাক্রমে রাণী সোনাবি, শের জব্বার খাঁ, নুরুল্লা খাঁ, চন্দন খাঁ এবং জালাল খাঁ। বিভিন্ন সময় উত্থান পতনের পর এ জমিদারি ১৭৩৭ খ্রিষ্টাব্দের দিকে চট্টগ্রামের রাঙ্গুনিয়ায় সরে আসে। রাঙ্গুনিয়ায় এ জমিদারির প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন শেরমস্ত খাঁ। ১৭৫৮ খ্রিষ্টাব্দে শেরমস্ত খাঁনের মৃত্যুর পর তাঁর ভাইপো শের জব্বার খাঁ রাঙ্গুনিয়ার জমিদারি ও পার্বত্যবাসীর নেতা হন। ১৭৬৫ খ্রিষ্টাব্দে শের জব্বার খাঁর মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র শের দৌলত খাঁ তাঁর স্থলাভিষিক্ত হন।

১৭৮২ খ্রিষ্টাব্দে জানবক্স খাঁ চাকমাদের জমিদার ও রাজা নির্বাচিত হন। জানবক্স নিজেকে জমিদার বলে পরিচয় দিলেও তিনি বহুকাল পর্যন্ত স্বাধীনতা রক্ষা করে চলেছিলেন। ১৭৮৭ খ্রিষ্টাব্দে জানবক্স ইংরেজদের বশ্যতা স্বীকার করে কলকাতায় গিয়ে গভর্নর-জেনারেলের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করেন এবং সীমান্তবর্তী অঞ্চলে শান্তি স্থাপনের অঙ্গীকার করে চুক্তি স্বাক্ষর করেন। হাচিসনের বিবরণে দেখা যায়, ১৭৮৭ খ্রিষ্টাব্দে আর একজন শের দৌলত খাঁ নেতৃত্বে চাকমাদের একটি বিদ্রোহ করেছিল। একে হাচিসন দ্বিতীয় শের দৌলত খাঁ নামে অভিহিত করেন। ১৭৮৯ খ্রিষ্টাব্দে দ্বিতীয় শের দৌলত খাঁও বশ্যতা স্বীকার করেন (Cotton 1880, 6)। জানবক্সের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র তব্বার খাঁ উক্ত অঞ্চলের জমিদার হন। ১৮০১ খ্রিষ্টাব্দে তব্বার খাঁনের মৃত্যু হলে তাঁর কনিষ্ঠভ্রাতা জব্বার খাঁ জুমিয়াদের জমিদার ও রাজা হন।

১৮১২ খ্রিষ্টাব্দে ধরমবক্স খাঁ জমিদারির লাভ করেন। ১৮৩২ খ্রিষ্টাব্দে বিশ বছর বয়সে জমিদার ধরমবক্স খাঁ অপুত্রক অবস্থায় মৃত্যুবরণ করায় কোর্ট অব ওয়ার্ডসের মাধ্যমে ইংরেজ সরকার মোগল বংশজাত সুখলাল খাঁকে জমিদারি পরিচালনার দায়িত্ব দেন। কিন্তু চাকমা সম্প্রদায় থেকে আসা ধরমবক্স খাঁ'র স্ত্রী কালিন্দী রাণী এ সিদ্ধান্ত মেনে না নিয়ে আদালতে মামলা করেন এবং দীর্ঘ ১২ বছর পর ১৮৪৪ খ্রিষ্টাব্দে তাঁর অনুকূলে আদালত রায় দেন। তারপর থেকে ১৮৭৩ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত কালিন্দী রাণী জমিদারি পরিচালনা করেন (Survey Report 1938, 54)। অবশ্য এরই মধ্যে ১৮৬০ খ্রিষ্টাব্দে পাবর্ত্য চট্টগ্রাম চট্টগ্রাম থেকে আলাদা হয়ে যায়।

খ. প্রশাসনিক কাজে নিয়োজিত জমিদার

মুসলমান শাসনামলে অনেক হিন্দু পরিবার বাংলার অন্যান্য অঞ্চল থেকে চট্টগ্রামে আসে। তারা মূলত রাজস্ব ও অন্যান্য প্রশাসনিক কাজে নিযুক্ত ছিলেন। কালক্রমে তারা জমিদারে পরিণত হন। এদের অধিকাংশ পটিয়া, রাউজান এবং আনোয়ারায় বসবাস করে। বর্তমানেও এসব অঞ্চলে হিন্দুদের আধিক্য রয়েছে। চট্টগ্রামে মোগল বিজয়ের পূর্বে এদের কেউ কেউ আরাকানি শাসকদের অধীনে চাকুরি করেছিলেন। এদের মধ্যে ভবানী প্রসাদ কানুনগো, শান্তিরাম কানুনগো, কালি চরণ রায়, লক্ষ্মণচন্দ্র কানুনগো, কিশোর কানুনগো, রাজবল্লভ কানুনগো, হরিচন্দ্র কানুনগো, শরৎচন্দ্র কানুনগো, রাজারাম চৌধুরী উল্লেখযোগ্য।

কানুনগো পরিবার

চট্টগ্রামের প্রসিদ্ধ কানুনগো পরিবারের পূর্ব-পুরুষরা ১৫৭৫ খ্রিষ্টাব্দের দিকে গৌড় থেকে চট্টগ্রামে আসেন। ১৭৭৪ খ্রিষ্টাব্দে ভবানী প্রসাদ কানুনগোর সাথে জমি বন্দোবস্ত দেয়া হয়। ১৭৯৩ খ্রিষ্টাব্দে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সময় ভবানী প্রসাদ কানুনগোর জমিদারি তাঁর পুত্র গৌরীশঙ্করের নামে বন্দোবস্ত হয়। গৌরীশঙ্কর ১৭৯০ থেকে ১৭৯৫ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত চট্টগ্রামে কোম্পানির দেওয়ানের দায়িত্ব পালন করেছিলেন (Survey Report 1938, 55)। কালিচরণ রায় ছিলেন ‘তরফ প্রভাবতী’র প্রতিষ্ঠাতা। কানুনগোদের মধ্যে তিনি বেশ প্রভাবশালী ও ব্যক্তিত্বসম্পন্ন ছিলেন। ১৭৮৬ খ্রিষ্টাব্দে কালেক্টর ফ্রাঙ্কলিন এর কাছ থেকে কালিচরণ রায় ৪০,০০০ টাকায় মহেশখালীর জমিদারি ক্রয় করেন। ১৭৯০ খ্রিষ্টাব্দে তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর বিধবা পত্নী প্রভাবতী জমিদারির মালিক হন। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সময় প্রভাবতীর নামেই জমিদারি বন্দোবস্ত হয়। প্রভাবতীর পর তাঁর পোষ্যপুত্র শরৎচন্দ্রের ছেলে কৈলাস চন্দ্র জমিদারির মালিক হন (Cotton 1880, 233)।

বৈদ্য বংশ

বৈদ্য বংশের প্রতিষ্ঠাতা শান্তিরাম কানুনগোর পূর্ব পুরুষরা খুলনা থেকে চট্টগ্রামে আসেন। ১৭৭৪ খ্রিষ্টাব্দে চট্টগ্রামের প্রশাসন শান্তিরামের সাথে জমি বন্দোবস্ত দেন। তিনি অসাধারণ ক্ষমতাশালী ছিলেন। তাঁর সম্পর্কে এখনও এরূপ প্রবাদ আছে যে, “শান্তিরামের নিকট মনসা আটকে যায়” (জামাল উদ্দিন ১৯৯১, ১১৩)। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে শান্তিরামের জমিদারি তাঁর পুত্র বৈদ্যনাথের নামে বন্দোবস্ত হয়। বৈদ্যনাথ ১৮১২ থেকে ১৮২১ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত চট্টগ্রামে কোম্পানির দেওয়ানের দায়িত্ব পালন করেছিলেন। তাঁর পুত্র হরচন্দ্র রায়ও একজন প্রভাবশালী জমিদার ছিলেন। এছাড়াও হরচন্দ্র রায়ের দত্তক পুত্র গিরিশ চন্দ্র রায় এবং তদীয় পুত্র পূর্ণেন্দু বিকাশ রায়, সুখেন্দু বিকাশ রায় ও অমলেন্দু বিকাশ রায় এ পরিবারের উল্লেখযোগ্য জমিদার ছিলেন।

কোয়েপাড়ার জমিদার

রাজারাম চৌধুরী রাউজানের কোয়েপাড়ার জমিদার ছিলেন। তার পূর্ব পুরুষ চন্দ্র রায় পশ্চিম বঙ্গের বর্ধমানের অধিবাসী ছিলেন। চন্দ্র রায় ১৫৭১ খ্রিষ্টাব্দের দিকে বর্ধমান থেকে চট্টগ্রামে আসেন এবং পটিয়া জেলার কুলগাঁও অঞ্চলে বসতি স্থাপন করেন। তার ছেলে রাম রায় কুলগাঁও থেকে রাউজানের কোয়েপাড়ায় এসে বসতি স্থাপন করেন। রাম রায়ের দুই ছেলে আরকান রাজের অধীনে রাজস্ব বিভাগে চাকরি করতেন (Alamgir Muhammad Serajuddin, 1971, 24)।

গঙ্গাধর মজুমদারও জমিদার হিসেবে বেশ খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। তার পূর্ব পুরুষ বল্লব রায় ১৬৩৭ খ্রিষ্টাব্দে চট্টগ্রাম আসেন। গঙ্গারাম মোগল আমলের শেষের দিকে এবং কোম্পানির আমলে খাজাঞ্চি বা কোষাধ্যক্ষ হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছিলেন। কোম্পানির আমলে চাকরীজীবী থাকা অবস্থায় তিনি নিজস্ব যোগ্যতা বলে বিশাল জমিদারির মালিক হন।

কোম্পানির আশীর্বাদপুষ্ট জমিদার

১৭৬১ খ্রিষ্টাব্দে চট্টগ্রাম ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির অধীনে আসার পর কোম্পানির কিছু দেওয়ান ও বেনিয়া জমিদারি লাভ করেন। এদের মধ্যে পরান সরফ, রাজবল্লব দুলাল, গৌরী কিশোর দুলাল ও জয়নগর জমিদার উল্লেখযোগ্য। পরান সরফ একজন মুদ্রা বিনিময়কারী বা ব্যংকার ছিলেন। ১৭৭৬-৭৭ খ্রিষ্টাব্দে তিনি জমিদারি বাবদ ২৭ টাকা রাজস্ব প্রদান করেছিলেন (Alamgir Muhammad Serajuddin 1971, 184)। রাজবল্লভ ছিলেন চট্টগ্রামের বড় বাইশ জমিদারের মধ্যে একজন। তিনি নোয়াখালী জেলার অধিবাসী ছিলেন এবং লক্ষীপুরে কোম্পানির দালাল হিসেবে কাজ করতেন (Committee of Revenue 25 June 1771)। চট্টগ্রামের অপর জমিদার গৌরী কিশোর দুলালও তার পরিবারের সদস্য ছিলেন। কিন্তু রাজবল্লভ কানুনগোর মৃত্যুর পর তাঁর পুত্ররা জমিদারি বিক্রি করা শুরু করেন। শেষের দিকে এ পরিবার জমিদারি হারিয়ে কষ্টে দিনাতিপাত করেন।

জয়নগর জমিদারি: (জমিদার জয়নারায়ণ ঘোষাল)

কলকাতার খিদিরপুরের ভূকৈলাসের গোকুল চন্দ্র ঘোষাল চট্টগ্রামের প্রসিদ্ধ জয়নগর জমিদারির প্রতিষ্ঠাতা। তিনি ১৭৬১ থেকে ১৭৬৪ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত হ্যারি ভেরেলস্টের সময় দেওয়ান ছিলেন। তাঁর প্রতিষ্ঠিত এ জমিদারিটি ছিল চট্টগ্রামের সর্বাপেক্ষা বৃহৎ জমিদারি (মনসুর সমকাল ৫ জুন, ২০১৩)। জয়নগর জমিদারি দু'ভাগে বিভক্ত ছিল। যথাঃ ক) তরফ জয়নগর এবং খ) জয়নগর নোয়াবাদ মহাল। তরফ জয়নগর অন্যান্য জমিদারির মত একটি প্রতিষ্ঠিত জমিদারি। জয়নগর নোয়াবাদ মহাল তথাকথিত সনদের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত এবং এটি ১৭৯৩ খ্রিষ্টাব্দে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের অন্তর্ভুক্ত হয়নি। দেওয়ান গোকুল ঘোষালের ভাইপো জয়নারায়ণ ঘোষালের নামে এটি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। গোকুল ঘোষাল ১৭৬১ খ্রিষ্টাব্দের এক সনদের মাধ্যমে তাঁর ভাইপো জয়নারায়ণ ঘোষালের নামে চট্টগ্রামের সমস্ত অনাবাদী জমি বন্দোবস্ত নিয়েছিলেন। কিন্তু ১৮১৫ খ্রিষ্টাব্দে সদর দেওয়ানী আদালতের এক মামলায় গোকুল ঘোষালের সনদ জাল বলে রায় দেয়া হয়। ফলে উক্ত সনদ বলে প্রাপ্ত সমস্ত জমি বাজেয়াপ্ত হয়ে যায় (Survey Report 1938, 65)।

অন্যান্য জমিদার

আবদুর রহিম খাঁ: আবদুর রহিম খাঁর বংশধর চট্টগ্রামের জমিদার হিসেবে খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। তিনি মীরসরাইয়ের বিখ্যাত জমিদার চৌধুরী কাদের ইয়ার খাঁর পুত্র দিয়ানত খাঁ ও কাজীর দেউড়ির বিখ্যাত মীর

এহিয়ার কন্যা হাড়ি বিবির গৃহশিক্ষক ছিলেন। পরবর্তী সময়ে হাড়ি বিবির সাথে আবদুর রহিম খাঁর বিয়ের প্রস্তাব উত্থাপিত হলে তিনি গোত্রপ্রীতির কারণে তাতে আপত্তি জানায়। হাড়ি বিবি আর বিবাহ করেননি এবং তার চাচা চৌধুরী আমানত খাঁও ছিলেন চিরকুমার। হাড়ি বিবির মৃত্যুর পর বাকি খাজনার দায়ে বিশেষত: দেওয়ান গোকুল ঘোষালের চক্রান্তে তার ভ্রাতুষ্পুত্র জয়নারায়ণ ঘোষালের নামে নিলামে ছড়িয়ে খরিদ করে নেন এবং তা ১২৭০ নং তরফ জয়নারায়ণ ঘোষালের নামে বন্দোবস্ত হয় (আহমদ মমতাজ ২০০৪, ৬৩)।

বাণীগ্রামের জমিদার

বাঁশখালির বাণীগ্রামের রায় এস্টেট জমিদারির প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন বনমালী মজুমদার।^২ ব্রিটিশ আমলে এ পরিবারের অন্যতম জমিদার ছিলেন হরিনারায়ন চৌধুরী। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের মাধ্যমে জমিদার হরিনারায়ন চৌধুরী বাণীগ্রাম ‘রায় এস্টেট’-এর মালিক হন। এ সময় দক্ষিণ চট্টগ্রামসহ টেকনাফ, উখিয়া, রামু, কক্সবাজার এবং চকরিয়ার বিশাল অংশ রায় এস্টেটের অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল।

বকশি হামিদ

চট্টগ্রামের বাঁশখালির ইলশা গ্রামের জমিদার ছিলেন বকশি হামিদ। তিনি বাঁশখালির জমিদারদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা প্রাচীন। তিনি সরকারী অফিসার ছিলেন, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে তিনি জমিদারও ছিলেন (আবদুল করিম ১৯৯৭, ২৩২)। ধারণা করা হয় মোগল সম্রাট আওরঙ্গজেবের সময় বকশি হামিদ সমগ্র বাঁশখালী ছাড়াও পার্শ্ববর্তী সাতকানিয়া ও চকরিয়া থানার জমিদারি লাভ করেছিলেন। সমসাময়িক কবি নওয়াজিশ খান তাঁর ‘গুলে বাকাওলী’ নামক পুঁথিতে বকশি হামিদের প্রশংসা করেছেন (মাহবুবউল আলম ১৯৯৮, ৪৩)।

মনু মিরজি পরিবার

মনু মিরজি বাঁশখালির ছনুয়া গ্রামের বাসিন্দা। এ পরিবারের আদি পুরুষ মীর দেওয়ান আলী (মোকারেমুলকাদের চৌধুরী ২)। মীর দেওয়ান আলীর পুত্র মীর মনওয়ার আলী ওরফে মনু মিরজি কুতুবদিয়ার উত্তর পশ্চিম দিকে জমি আবাদ করে বিশাল সম্পদের মালিক হন। কোম্পানির আমলে তিনি (১৭৭৮-১৮৭৫) বাঁশখালির ছনুয়া গ্রামে এসে বসতি স্থাপন করেন। এ পরিবারের দানকৃত (ওয়াকফ করা) প্রায় ৩৫ দ্রোণ সম্পত্তির উপর মসজিদ, মাদ্রাসা, স্কুল ও কবরস্থান বিদ্যমান (আবদুল করিম ১৯৯৭, ২৩৪)।

ফতেয়াবাদের জমিদার

চট্টগ্রাম শহর থেকে মাত্র আট মাইল উত্তরে ফতেয়াবাদের অবস্থান। মোগল ও ব্রিটিশ আমলে ফতেয়াবাদের কয়েকটি হিন্দু ও মুসলমান পরিবার রাজস্ব সংগ্রহের কাজে নিয়োজিত ছিল। এদের মধ্যে নন্দী বংশ, দাশ বংশ, রক্ষিত পরিবার, পাল বংশ, চৌধুরী বংশ প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

দক্ষিণ ফতেয়াবাদের নন্দী বংশ পটিয়া থানার জঙ্গলখাইন অঞ্চলের নন্দীদের একটি শাখা। এ বংশের প্রথম পুরুষ মধু সূদন নন্দী। তাঁর পুত্র শিবরাম নন্দী। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সময় শিব রাম নন্দীর নামে ‘তরফ শিব রাম নন্দী’ বন্দোবস্ত হয়। শিবরামের পুত্র ঈশ্বর চন্দ্র নন্দী ব্রিটিশ আমলে ‘বোর্ড অব রেভিনিউ’তে এবং পরে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট পদে নিযুক্ত হয়েছিলেন। ঈশ্বরচন্দ্র নন্দীর কল্যাণে চট্টগ্রামের সরকারী মহলে ফতেয়াবাদের প্রতিষ্ঠা লাভ হয় (মাহবুবউল আলম ১৫ই অক্টোবর ১৯৬৯)।

ফতেয়াবাদের দাশ বংশের প্রতিষ্ঠাতা দাশগুপ্তের আদি নিবাস বর্ধমান জেলার কালনা থানার বৈদ্যবাটী গ্রামে। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের পূর্বে এ বংশ ফতেয়াবাদে এসে বসতি স্থাপন করেন। ১৭৯৩ খ্রিষ্টাব্দে এ বংশের নামে ‘তরফ রাম সেবক’ বন্দোবস্ত হয়। এ বংশের শরৎচন্দ্র সাব ডেপুটি কালেক্টর নিযুক্ত হন। পরে তিনি ডেপুটি

ম্যাজিস্ট্রেট পদে উন্নীত হন। সিএস (CS) জরিপের সময় তিনি সেটেলমেন্ট অফিসার হিসেবে কাজ করেছিলেন (আবদুল করিম ১৯৯৭, ২৩৪)।

রক্ষিত পরিবার

রক্ষিত পরিবার প্রধানত সেন বংশের শাখা-প্রশাখা। বখতিয়ার খলজি কর্তৃক নদীয়া জয়ের পর লক্ষণ সেন ঢাকার বিক্রমপুরে এসে রাজ্য পরিচালনা করেন। এরই সূত্র ধরে এ বংশের কেউ কেউ চট্টগ্রামে চলে আসেন। এ বংশের আদি পুরুষ ছিলেন রঘুরাম। রঘুরামের দুই পুত্র গঙ্গারাম ও মধুরাম। গঙ্গারাম রক্ষিত বংশের নোয়াপাড়া শাখা এবং মধুরাম ফতেয়াবাদ শাখার প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সময় এ বংশের নামে ৭টি তরফ সৃষ্টি হয়। তরফগুলো হলো, তরফ ৪৭৭ (ব্রজলাল রক্ষিত), ১৩৭৯ (যদুরাম রক্ষিত), ১৮২৫ (মধুরাম রক্ষিত), ২৪২৪ (পার্বতী চরণ, ত্রাহিরাম ও রাধাচরণ রক্ষিত), ২৯৩৪ (সচিত্রাম রক্ষিত), ২৯৫২ (সচিত্রাম নারায়ণ রক্ষিত) এবং ৩১৭৪ (তিলক রাম রতন রক্ষিত) (মাহবুবউল আলম ১৯৬৬, চার)।

মৌলভী হামিদুল্লাহ খাঁ পরিবার

উনিশ শতকের স্বনামধন্য কবি খান বাহাদুর হামিদুল্লাহ খাঁ চট্টগ্রামের এক অভিজাত পরিবারে ১৮০৯ খ্রিষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পরিবারটি মোগল ও ইংরেজ আমলে চট্টগ্রামের অন্যতম বৃহৎ জমিদার পরিবার ছিল। তাঁর পিতা ওবেতুল্লাহ খাঁ প্রথমদিকে ‘সেরেস্টাদার’ ছিলেন। পরবর্তী সময়ে পদোন্নতি লাভ করে ক্রমে সদর মুনসেফ, ডেপুটি কালেক্টর ও আলা সদর আমীরের পদ প্রাপ্ত হন (মাহবুবউল আলম ১৯৬৬, ১২৩)। লোকে তাকে ‘চাঁদ মিঞা দারোগা’ বলে অভিহিত করত।

গ. ইউরোপীয় জমিদার

চট্টগ্রামের ভূমি-ব্যবস্থার অপর একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হলো ইউরোপীয় জমিদারদের উপস্থিতি। এ সকল ইউরোপীয় জমিদারদের মধ্যে পর্তুগীজদের সংখ্যা ছিল সর্বাধিক। তাদের মধ্যে পর্তুগীজ মহিলা জমিদার আওরা-দ্য-বারোজ ছিলেন উল্লেখযোগ্য। তিনি হাটহাজারীর অন্তর্গত ইছাপুরের প্রসিদ্ধ জমিদার ছিলেন। ১৭৯৮ খ্রিষ্টাব্দে আওরা-দ্য-বারোজের মৃত্যুর পর ডিয়েড্রিচ মার্কোয়াড্ তার জমিদারির মালিক হন। জোয়ান-দ্য-বারোজ নামে তাঁর এক ভাই ছিল। তিনি চট্টগ্রাম জেলার প্রধান পর্তুগীজ পরিবার ‘ফ্রীটাস’দের নিকট আত্মীয় ছিলেন (আহমদ শরীফ ১৩৬৫, ৩৮-৪১)।

১৭৬৩ খ্রিষ্টাব্দে হ্যারি ভেরেলস্ট জনৈক ইউরোপীয় হার্বাট সাদারল্যাণ্ডকে ‘খয়রাত মদদ-মাশ’ হিসেবে কুতুবদিয়া দান করেছিলেন। তাঁর মৃত্যুর পর পুত্র চার্লস সাদারল্যাণ্ড কুতুবদিয়ার মালিক হন। ১৭৯০ খ্রিষ্টাব্দে চার্লস সাদারল্যাণ্ডের মৃত্যুর পর তার বিধবা পত্নী সুসানা সাদারল্যাণ্ড উত্তরাধিকারী হন। কিন্তু জেলা কোর্টের ডিক্রির অনুবলে নিকটতম আত্মীয় হিসেবে তাঁর চাচাতো বোন জোহনা ফার্নেন্দেজও এর একাংশের মালিক হন। ১৮১৭ খ্রিষ্টাব্দে সদর দেওয়ানী আদালত প্রত্যক্ষ উত্তরাধিকারী না থাকায় খয়রাত দান সরকারে প্রত্যাখ্যাত ঘোষণা করেন (Cotton 1880, 231)।

ইউরোপীয় জমিদারদের মধ্যে মেরী স্পার্কসও ছিলেন অন্যতম। তিনি জমিদার হিসেবে বিবি ইসপ্রাক নামে সুপরিচিত ছিলেন। কালেক্টর ফ্রান্সিস ল প্রদত্ত এক পাট্রা বলে তিনি চকরিয়া থানার পেকুয়া দ্বীপের পহরচাঁদায় এক বিরাট তালুকের মালিক হন। তিনি বহু অর্থ ব্যয় করে উক্ত অঞ্চল আবাদ করেন। ১৭৮৯ খ্রিষ্টাব্দের ৮ই মে কালেক্টর শিয়ারম্যান বার্ড বোর্ডের কাছে রিপোর্ট করেন যে, এ স্থান মগদের হামলার এলাকায়

পড়ায় জঙ্গল কেটে আবাদ করতে মিসেস স্পার্কসের বহু অর্থ ব্যয় হয়েছে (*Revenue Consultation* 8 May, 1789)। ১৮৩৬ খ্রিষ্টাব্দে হার্ভে জরিপের মাধ্যমে ৩৮৩ নং তালুকে উক্ত অঞ্চলটি দখলদার হিসেবে মোহাম্মদ কালু ও কুমার আলী চৌধুরীর নামে বন্দোবস্ত হয় (*Noabad Correspondence* 1886, 122)।

ঘ. আরাকানি জমিদার

চট্টগ্রামে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির শাসন প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর তাজ মোহাম্মদ, আতিকুল্লাহ, ঠাকুরচাঁদ, সাদুল্লাহ, আজিজুল্লাহ, ফকীর মোহাম্মদ, রোশন প্রভৃতি বিশিষ্ট ব্যক্তির ১৭৭৫ খ্রিষ্টাব্দে আরাকান থেকে এসে কোম্পানির এলাকায় আশ্রয় নেয়। আরাকানে তারা জমিদার, তালুকদার ছিল বলে জানায়। বেইটম্যান তাঁদেরকে দক্ষিণ চট্টগ্রামের চাম্বল, পুইছড়ি, সোনাইছড়ি, পোলাও, কৌনিম, বড় ফালং, কুতুবদিয়া, হারবাং, সরল, বহলছড়ি, বঙ্গতেরাম, বড়ইতলি প্রভৃতি স্থানের জমিদারি বন্দোবস্ত দেন। কিন্তু পরবর্তী সময়ে জয়নগর মহালের আপত্তির ফলে তাঁদেরকে জয়নগর মহালের অধস্তন ভূমধ্যধিকারী হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করা হয় (*Cotton* 1880, 86)। অবশ্য এদের অধিকাংশ পরবর্তী সময়ে আরাকানে প্রত্যাবর্তন করেন।

আরাকানি জমিদারদের মধ্যে লাহুয়া মোরং -এর নাম সর্বাত্মে উল্লেখযোগ্য। তিনি ১৭৯৫ খ্রিষ্টাব্দে আরাকান হতে কোম্পানির অঞ্চলে আসেন। তাঁর প্রার্থনা মতে, কোম্পানির প্রশাসন দক্ষিণে নাফ নদী, পূর্বে উখিয়া ও নাফ নদী, পশ্চিমে সমুদ্র, উত্তরে রেজুখাল -এর অন্তর্ভুক্ত স্থানের ভূমি তাকে বন্দোবস্ত দেন। টেকনাফে লাহুয়া মোরং -কে ভূমি বন্দোবস্ত দেয়ায় পরবর্তীকালে কোম্পানির জন্য অনুকূল পরিবেশের সৃষ্টি হয়। তাঁর আগমনে আরাকানিরা উদ্বুদ্ধ হয় এবং পর্যায়ক্রমে আরাকানিরা চট্টগ্রামে এসে বসতি স্থাপন করে। এতে করে দক্ষিণ চট্টগ্রামে পতিত ও জঙ্গলভূমি আবাদ হয়ে দক্ষিণ চট্টগ্রাম নোয়াবাদ ভূমির আওতায় আসে (মাহবুবউল আলম ১৯৬৬, ১২৩)।

উপসংহার

উপরোক্ত আলোচনায় দেখা যায় যে, ১৮৪৮ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত বিভিন্ন জরিপের মাধ্যমে চট্টগ্রামে ভূমি বন্দোবস্ত দেয়া হয়। যার ফলে এখানে সর্বাধিক পরিমাণে জমিদারের উপস্থিতি লক্ষ করা যায়, যার অধিকাংশই ছিল কৃষকসম ছোট জমিদার। বাংলা তথা ভারতবর্ষের অন্য কোন অঞ্চলে বিপুল পরিমাণ জমিদারের অস্তিত্ব দেখা যায় না। আলোচনার মাধ্যমে আমরা চট্টগ্রামের ভূমি ব্যবস্থায় বিপুল পরিমাণ জমিদারের উৎপত্তির কারণ চিহ্নিত করেছি। মূলত ভৌগোলিক অবস্থা এর জন্য সর্বাধিক দায়ী ছিল। বাংলার অন্য যে কোন অঞ্চলের তুলনায় এখানে জমিদারের শ্রেণি বিভাগও আলাদা। চট্টগ্রাম বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন শাসকের অধীনে থাকলেও ঔপনিবেশিক শাসনের শুরুতে এখানে মুসলমান এবং হিন্দুরাই ছিল প্রধান জনগোষ্ঠী। সীমান্তবর্তী প্রদেশ হওয়ায় এখানে সামরিক বাহিনীর প্রধান্য ছিল সর্বাধিক। কালক্রমে সামরিক বাহিনীর পদস্থ ব্যক্তির এবং প্রশাসনের সাথে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির জমিদারি পরিণত হলেও নোয়াবাদ ভূমির সম্প্রসারণের সাথে সাথে জমিদারের সংখ্যা বৃদ্ধি পায়। ১৮৪৮ খ্রিষ্টাব্দের জরিপের ফলেই কেবল ৩২,২৫৮ জন জমিদারের সৃষ্টি হয়। এছাড়াও ঔপনিবেশিক শাসনের শুরু থেকে আরাকানিদের আগমন এবং তাদের কারও কারও জমিদারি লাভ এবং পরবর্তী সময়ে তাদের স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের ফলেও নতুন জমিদারের উদ্ভব হয়। এদেশে অবস্থানরত ইউরোপীয়রাও চট্টগ্রামের জমিদারি পরিণত হয়েছিল। তাদের মধ্যে অনেকে প্রজাতিতৈষী জমিদার হিসেবে খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। তবে অন্যান্য অঞ্চলের (যে সমস্ত অঞ্চলে বড় জমিদারি বিরাজমান ছিল) জমিদারদের মত চট্টগ্রামের অধিকাংশ জমিদাররা

ঐতিহাসিক নিদর্শনের স্বাক্ষর রেখে যেতে পারেনি। মূলত চট্টগ্রামে কৃষকসম অধিকাংশ জমিদার কোন প্রকারে জীবন ধারণ করত।

টীকা

^১ আঠারো শতকের এ সমস্ত জমিদারদের মধ্যে রসিদ খান, এয়াছিন খান, ফরদাস খান, মজুফর খান, নুরউল্লা খান, রহমতউল্লা খান, সবরলন্দা খান, দেওয়ান মণিরাম, ছুটি খান, সদাকত খান, আফর খান, জাফর খান, আকা মহাম্মদ নেজাম, বিল্লা খান, ইশা খান, শেরমস্ত খান, জবরদস্ত খান, ফেদাই খান, এয়াকুপ খান, আদিকত খান, বশরত খান, সেরাজউদ্দিন মহাম্মদ খান, হোসেন কুলী খান, সরফরাজ খান এবং নিয়ামত খান প্রভৃতি ছিলেন আফগান বংশোদ্ভূত। অপরদিকে তুল্লা গাজী, ফতে গাজী, চান গাজী, সোনা গাজী, মিনা গাজী, জাফর গাজী প্রভৃতি সামরিক যুদ্ধে কৃতিত্ব প্রদর্শনের মাধ্যমে গাজী উপাধি লাভ করে। এছাড়া বিজয় সিং, সোরাল সিং, জয় সিং, আজিব সিং, দেবী সিং, হারি সিং, ফসাল সিং, লোচমান সিং, তাজ সিং প্রভৃতি জমিদাররা ছিলেন হিন্দুস্থানী। মনগট রাম হাজারী, জগত হাজারী মোগল আমলে মনসবদার উপাধিধারী ছিলেন (চৌধুরী শ্রীপূর্ণচন্দ্র দেববর্ম্ম তত্ত্বনিধি ২০০৪, ৬৪-৬৫)।

^২ বাণীগ্রামের জমিদারদের আদি পুরুষ হলেন দনুজ দলন দেব। প্রথম দিকে এ বংশের পূর্বপুরুষ শাহ শুজার দেওয়ান হিসেবে আরাকানে আশ্রয় গ্রহণ করেন। এর প্রায় ৫০/৬০ বছর পর সে বংশের কোন উত্তর পুরুষ চট্টগ্রামে আগমন করেন। চট্টগ্রামের ফটিকছড়ি ও চন্দনাইশের হারাদা গ্রামে কিছুকাল অবস্থানের পর রাণীগ্রাম এসে স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করেন (আবদুল করিম, ২৩০)।

তথ্যসূত্র

- আবদুল করিম। *বাঁশখালির ইতিহাস ও ঐতিক্য*। ঢাকা: জাতীয় সাহিত্য প্রকাশ, ১৯৯৭।
- আহমদ মমতাজ। *মীরসরাইর ইতিহাস, সমাজ ও সংস্কৃতি*। ঢাকা: দিবা প্রকাশনী, ২০০৪।
- আহমদ মমতাজ ও রাইহান নাসরিন। *চট্টল মনীষা, প্রাচীন ও মধ্যযুগ থেকে ১৯ শতক পর্যন্ত*। ঢাকা: চট্টল প্রকাশনা, ২০১৩।
- চৌধুরী শ্রীপূর্ণচন্দ্র দেববর্ম্ম তত্ত্বনিধি। *চট্টগ্রামের ইতিহাস*। ঢাকা: গতিধারা (দ্বিতীয় সংস্করণ), ২০০৪।
- জহিরুল ইসলাম। *খুরুশকুলের ইতিহাস*। কক্সবাজার: কক্সবাজার সাহিত্য একাডেমী, ২০০১।
- জামাল উদ্দিন। *দেয়াঙ পরগণার ইতিহাস, আদিকাল*। চট্টগ্রাম: বলাকা প্রকাশন, ১৯৯১।
- জামাল উদ্দিন। *মোগল সাম্রাজ্যের বিলুপ্ত অধ্যায় দোহাজারী*। চট্টগ্রাম: বলাকা প্রকাশন, ২০১২।
- মাহবুবউল আলম। *চট্টগ্রামের ইতিহাস, নবাবী আমল*। চট্টগ্রাম: নয়ালোক প্রকাশনী, ১৯৬৫।
- *চট্টগ্রামের কতিপয় জমিদার পরিবার*। চট্টগ্রাম: নয়ালোক প্রকাশনী, ১৯৬৬।
- *চট্টগ্রামের ইতিহাস, কোম্পানী আমল*। চট্টগ্রাম: নয়ালোক প্রকাশনী, ১৯৬৭।
- *রঙ বেরঙ*। চট্টগ্রাম: নয়ালোক প্রকাশনী, ১৯৬৮।
- মুহম্মদ নূরুল ইসলাম। *উখিয়ার ইতিহাস*। কক্সবাজার: কক্সবাজার সাহিত্য একাডেমী, ২০১০।
- মোকারেমুলকাদের চৌধুরী (সম্পাদনা)। *মনুমিয়াজী পরিবারের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস*। (আংশিক) ছনুয়া, বাঁশখালি, চট্টগ্রাম।
- মৌলবী হামিদুল্লাহ খান বাহাদুর। *আহাদিসুল খাওয়ানিন (চট্টগ্রামের প্রাচীন ইতিহাস)*। অনুবাদ ড. খালেক মাসুকে রসুল, সম্পাদনা ও টীকাভাষ্য তানবীর মুহম্মদ। ঢাকা: অনুপম প্রকাশনী, ২০১৩।

শ্রীসজনীকান্ত দাস (সম্পাদনা)। *নবীনচন্দ্র-রচনাবলী আমার জীবন*। (প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগ) কলকাতা: বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, ১৩৬৬।

রাজকুমার চক্রবর্তী। *সম্বীপের ইতিহাস*। ১৯২৩।

সুপ্রকাশ রায়। *ভারতের কৃষক বিদ্রোহ ও গণতান্ত্রিক সংগ্রাম*। কলকাতা: বুক ওয়াল্ড, ২০০০।

প্রবন্ধ

অশোক কুমার দেওয়ান। *চাকমা জাতির ইতিহাস*। উপজাতীয় সাংস্কৃতিক ইনস্টিটিউট গবেষণা পত্রিকা, ৩য় সংখ্যা, জুন ১৯৮২।

আহমদ শরীফ। এতিম কাসেম বিরচিত আওরা-দে-বারোজ প্রশস্তি, [১৭৭৫-৮০]। *বাঙলা একাডেমী পত্রিকা*, ১৩৬৫ বাংলা।

কাজী আবুল মনসুর। *চট্টগ্রামের গৌরবগাথা -৩ ইংরেজ ও একজন গোকুল ঘোষাল*, সমকাল, ৫ জুন, ২০১৩।

Books

Alamgir Muhammad Serajuddin. *The Revenue Administration of the East India Company in Chittagong, 1761-1785*. Chittagong: University of Chittagong, 1971.

Cotton, Henry J. S. *Memorandum on the Revenue History of Chittagong*. Calcutta: Bengal Secretariate Press, 1880.

Hunter, W W. *A Statistical Account of Bengal*, Vol. VI. London: Turbner & Co. 1876. Delhi: Reprinted by D. K. Publishing House, 1973.

Hutchinson, R. H. S., *Eastern Bengal and Assam District Gazetteers*. Allahabad: Chittagong Hill Tracts, Pioneer Press, 1909.

Nurul Islam Khan (Edited), *Bangladesh District Gazetteer Noakhali*, Bangladesh Government Press, Dacca, 1977.

Powel, B. H. Baden., *The Land Systems of British India*. Vol. I. Oxford Clarendon Press, 1892.

দলিল (প্রকাশিত ও অপ্রকাশিত)

মাহবুব উল আলম কর্তৃক পাকিস্তান কাউন্সিল চট্টগ্রাম আয়োজিত ফতেয়াবাদ হাই স্কুলে অনুষ্ঠিত প্রাচীন ফতেয়াবাদ শীর্ষক আলোচনা সভায় ১৫ই অক্টোবর ১৯৬৯ তারিখে পঠিত প্রবন্ধ।

Bengal Revenue Consultation (Revenue Consultation)

Correspondence on the Resettlement of the Noabad Lands in the District of Chittagong and on the Survey of the District, Vol. III, Calcutta, Bengal Secretariat Press, 1886 ((Noabad Correspondence).

Final Report on the Survey and Settlement Operations in the District of Chittagong, 1923-33, by J. B. Kindersley, Alipore, Bengal Government Press, 1938 (*Survey Report, 1923-33*).

.Final Report of the Survey and Settlement of the District of Chittagong, 1888 to 1898, by C. G. H Allen, Calcutta, Bengal Secretariat Press, 1817 (*Survey Report*).

Firminger, W. K. *Historical Introduction to the Bengal Portion of the Fifth Report*, (Delhi, Today and Tomorrow's Printers & Publishers, 1917.

Proceedings of the Committee of Revenue (Committee of Revenue).

প্রিন্টমেকিং: ছাপাইশিল্প শিক্ষা কার্যক্রমে অ-বিষাক্ত ছাপাইশিল্পের সমসাময়িক করণকৌশলের চর্চা ও আবশ্যিকতা

মো. জসিম উদ্দিন*

প্রতিপাদ্যসার

ছাপাইশিল্প - Printmaking চারুকলা শিক্ষার অন্যতম মাধ্যম হিসেবে সর্বজনীনভাবে স্বীকৃত এবং ব্যাপকভাবে অনুশীলন করা পদ্ধতি বা শৃঙ্খলা যার ঐতিহাসিক শেখড় প্রোথিত রয়েছে কয়েক শতাব্দী পূর্বে। দুর্ভাগ্যক্রমে, পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা এবং পরিবেশগত সচেতনতার ধারণা তৈরি হওয়ার শত শত বছর আগে বেশিরভাগ ঐতিহ্যবাহী প্রিন্টমেকিং কৌশলসমূহ উদ্ভাবিত হয়েছিল। ফলস্বরূপ পরিবেশগত সংরক্ষণ, স্বাস্থ্য-সুরক্ষা সম্পর্কিত সমস্যাগুলি ছাপাইশিল্পের ঐতিহ্যগত প্রাচীন পদ্ধতি বিষাক্ত ছাপাইশিল্প Toxic printmaking অনুশীলনের সাথে সম্পূর্ণরূপে সমন্বয় সাধন করা হয়নি। উন্নত বিশ্বে বিশেষত ইউরোপ ও অ্যামেরিকার শিল্পশিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ইতোমধ্যে ছাপাইশিল্প শিক্ষাকার্যক্রমে সমসাময়িক অ-বিষাক্ত ছাপাইশিল্প Contemporary Non-Toxic printmaking পদ্ধতির সাথে খাপ খাইয়ে নিতে শুরু করেছে। এশিয়া, দক্ষিণ এশিয়া ও মধ্যপ্রাচ্যের দেশ সমূহের প্রাতিষ্ঠানিক শিল্পশিক্ষার ক্যারিকুলাম বা প্রোগ্রামগুলি এখনও প্রাচীন পদ্ধতি বা ‘Original printmaking’ এর ঐতিহ্যগত ধারণা এবং অনুশীলনের সীমাবদ্ধতার সাথে প্রতিযোগিতা করেছে। এই প্রবন্ধে বাংলাদেশের পাবলিক/প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের চারুকলা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ঐতিহ্যগত ছাপাইশিল্পের কৌশল অনুশীলন ও গবেষণা সম্পর্কিত বিভিন্ন স্বাস্থ্য সচেতনতাবৃদ্ধি এবং পরিবেশগত সুরক্ষার সাক্ষরী ও টেকসই ব্যবহারিক দিকসমূহ চিহ্নিত করার প্রয়াস। বহুল প্রচলিত ছাপাইশিল্পের নিরাপদ, সহজ, সাক্ষরী বিকল্প পদ্ধতি, অন্যান্য প্রাসঙ্গিক এবং সমসাময়িক অ-বিষাক্ত ছাপাইশিল্পের Contemporary

*অধ্যাপক, চারুকলা ইনস্টিটিউট, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়

Non-Toxic printmaking পদ্ধতিসমূহ অনুশীলনের আবশ্যিকতা ও করণীয় নির্ধারণ সম্পর্কে
সম্যক ধারণা দেয়া হয়েছে।

ভূমিকা:

সমসাময়িক অ-বিষাক্ত ছাপাইশিল্প মাধ্যমের উন্নত পদ্ধতিকে সমসাময়িক শিল্পী, শিক্ষক এবং শিক্ষার্থীদের ব্যাপক ব্যবহারের জন্য নিরাপদ, যা পর্যাপ্ত বিকল্পের সাথে বিষাক্ত রাসায়নিক দ্রব্য ধারণ, ব্যবহার, মজুদসহ নানাবিধ প্রিন্টমেকিং উপকরণগুলোকে সর্বাধিক প্রতিস্থাপন নিশ্চিত করা। আলোচ্য ছাপাইশিল্প মাধ্যমটি সমগ্রবিশ্বে চারুকলার প্রায় সকল স্তরের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সমধিক চর্চা করা না হলেও বিশেষত কানাডা এবং যুক্তরাজ্যে ব্যাপক হারে চর্চা নিশ্চিত করা হয়ে থাকে। কেননা গবেষণায় প্রমাণিত এবং কার্যত Contemporary Non-Toxic printmaking সমসাময়িক অ-বিষাক্ত ছাপাইশিল্প একটি নিরাপদ, ব্যয় সংকোচনমূলক ও সহজ পদ্ধতি বা কার্যকর শিল্পশিক্ষার ক্যারিকুলাম, এই অনুশীলনে প্রিন্টের গুণগতমানের কোনো অংশে ঘাটতি বা পশ্চাৎপদ নির্দেশিত হয়না। বেশিরভাগ প্রতিষ্ঠান যারা প্রথাগত প্রিন্টমেকিং অনুশীলনগুলি বজায় রাখে, তাঁদের স্টুডিওগুলিকে গ্রহণযোগ্য স্বাস্থ্য নিরাপত্তা স্তরে উন্নীত করতে হাজার/লক্ষ অর্থ ব্যয় করতে বাধ্য হয়। অপরপক্ষে Non-Toxic printmaking অ-বিষাক্ত ছাপাইশিল্প নিরাপদ, ছাপাইশিল্প অনুশীলনের জন্য শারীরিক প্রতিরক্ষামূলক সরঞ্জাম, যেমন ব্যাবহুল স্বাস্থ্যকর (গ্যাস মাস্ক), ফিউম-এক্সস্ট সিস্টেমস, রাসায়নিক দ্রব্য সংরক্ষণে ব্যাবহুল বরাদ্দ, অতিমাত্রায় সচেতনতা এবং নবায়নযোগ্য রাসায়নিক দ্রব্য মজুদ সনদপত্র ইত্যাদি অতিরিক্ত ব্যয়ের কোনো প্রয়োজন নেই। কারণ এই ক্ষেত্রে শুধুমাত্র নিরাপদ, স্বল্পব্যয়ে পরিবেশবান্ধব গৃহস্থালী উপকরণ ব্যবহার নিশ্চিত করা হয়েছে। এই প্রবন্ধের সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য হল প্রাচীন প্রথাগত বিষাক্ত ছাপাইশিল্প (Toxic printmaking) পদ্ধতির উপকরণের বিপজ্জনক প্রকৃতির বিষয়ে শিল্পী, শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদেরকে ছাপাইশিল্প তৈরিতে সচেতনতা বৃদ্ধি করা এবং মূল প্রেরণা হলো অ-বিষাক্ত ছাপাইশিল্প পদ্ধতির সাথে শিক্ষার্থীদের মধ্যে আরও ব্যাপক আগ্রহ সৃষ্টি করা। চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলা ইনস্টিটিউটের ছাপচিত্র শাখা এই ক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা পালন করতে পারে। কারণ বাংলাদেশে শুধুমাত্র চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়, চারুকলা ইনস্টিটিউটের ছাপচিত্র শাখায় বিগত ২০১২ খ্রিষ্টাব্দ থেকে সাম্প্রতিক সময়ে ধারাবাহিকভাবে অ-বিষাক্ত ছাপাইশিল্প তৈরী পদ্ধতির বিভিন্ন মাধ্যমে নিরাপদ, স্বাস্থ্যকর, পরিবেশবান্ধব, স্বল্পমূল্যে সমসাময়িক ও সর্বাধুনিক ছাপাইশিল্প চর্চার সোপান গড়ে উঠেছে। বাণিজ্যিক অফসেট মুদ্রণের সমস্ত শিল্প উপকরণ এক্ষেত্রে সফলভাবে স্বল্প ব্যয়ে ব্যবহার শিক্ষক, শিক্ষার্থীদের প্রথম পছন্দ হয়ে ওঠেছে।

প্রিন্টমেকিং:

প্রিন্টমেকিং বা ছাপাইশিল্প হলো একটি শৈল্পিক প্রক্রিয়া যা সাধারণত মেট্রিক্স বা প্লেট বা সমতল থেকে চিত্রগুলিকে অন্য পৃষ্ঠে স্থানান্তর করার নীতির উপর ভিত্তি করে প্রতিষ্ঠিত, যেমন কাগজ, কাপড়, ধাতব তল, প্লাস্টিক, কাঠ, রাবার, পণ্যের মোড়ক ইত্যাদি। এই মেট্রিক্স বা প্লেটের সমতলকে খোদাই, আঁচড় কেটে, পেস্টিং বা প্রতিস্থাপন করে, রাসায়নিক বিক্রিয়ার মাধ্যমে খোদাইকৃত, কম্পিউটার এইডেড ডিজাইন CAD, লেজার প্রিন্টিং, লেজার কাটিং, CNC, থার্মাল ইঙ্ক ডিজিটাল প্রিন্টিংসহ অনেক সমসাময়িক মাধ্যমে কালি প্রয়োগ করে, বিশেষ নিয়ন্ত্রিত যন্ত্রের সাহায্যে চাপ প্রয়োগ, অত্যাধুনিক প্রিন্টিং প্রেস, হ্যান্ডপ্রেসার বা যে কোনো প্রকারে মেট্রিক্স থেকে কালি বারংবার উপযোগী পৃষ্ঠে স্থানান্তর করা হলে কাজিত নকশার একটি অনুরূপ ছাপ বা ইম্প্রেশন তৈরি হয়। শিল্পকলার এই মাধ্যমে একটি বড় সুবিধা হলো একই নকশার হুবহু একাধিক ইম্প্রেশন বা

প্রিন্টমেকিং: ছাপাইশিল্প শিক্ষা কার্যক্রমে অ-বিষাক্ত ছাপাইশিল্পের সমসাময়িক করণকৌশলের চর্চা ও আবশ্যিকতা

শিল্পকর্ম একটি একক বা একাধিক মেট্রিক্স বা প্লেট থেকে একাধিক রঙে প্রিন্ট করা সম্ভব। ঐতিহ্যগত ছাপাইশিল্পের কৌশলসমূহ যেমন: ক) রিলিফ প্রিন্ট: উডকাট, লিনোকাট, উড এনগ্রেভিং, খ) ইন্টাগলিও প্রিন্ট: এচিং, অ্যাকুয়াটিন্ট, ড্রাইপয়েন্ট, মেমোটিন্ট, কার্বোরেভাম, কলোগ্রাফ, গ) প্ল্যানোগ্রাফিক প্রিন্ট: স্টোন লিথোগ্রাফি, ওয়াটারলেস লিথোগ্রাফি, প্লেট লিথোগ্রাফি, উড লিথোগ্রাফি, পলিয়েস্টার লিথোগ্রাফি, পেপার লিথোগ্রাফি, কিচেন লিথোগ্রাফি ঘ) স্টেলি প্রিন্ট: সিল্কস্ক্রীণ, মনোপ্রিন্ট, ঙ) মাল্টিকালার প্রিন্ট: ভিস্কোসিটি প্রিন্ট, চ) ডিজিটাল প্রিন্ট: ইঙ্কজেট প্রিন্ট, জেরক্স- ফটোকপি প্রিন্ট, লেজার প্রিন্ট, সলভেন্ট ইকো প্রিন্ট, এনকেড প্রিন্ট, ইউভি প্রিন্ট, ত্রি-ডি প্রিন্ট ইত্যাদি প্রেসেসের মাধ্যমে প্রিন্টমেকিং চর্চা অব্যাহত রয়েছে।

যুক্তরাজ্য ও কানাডায় বহুলাংশে অ-বিষাক্ত ছাপাইশিল্প পদ্ধতির আবিষ্কার হয়েছে। এই মাধ্যমের চর্চা ও প্রথাগত টেক্সিক প্রিন্টমেকিং পদ্ধতির বিকল্প ও নবতর অ-বিষাক্ত ছাপাইশিল্প পদ্ধতির প্রতিস্থাপনে এসব দেশ অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছে। বিশেষত কানাডিয়ান শিল্পী Professor Nik Semenoff, ১৯৯১ খ্রিষ্টাব্দে অ-বিষাক্ত ছাপাইশিল্প পদ্ধতির আবিষ্কার করেন। কানাডার সাস্কাচুয়ান বিশ্ববিদ্যালয়ে শিল্পী প্রফেসর নিক্‌ সিমিনফের ঘনিষ্ঠ সহযোগী হিসেবে বাংলাদেশের শিল্পী এ.কে.এম. আলমগীর হক (কানাডা প্রবাসী) দীর্ঘ সময় অ-বিষাক্ত ছাপাইশিল্প পদ্ধতির পরীক্ষা নিরীক্ষায় ব্যস্ত সময় কাটিয়েছেন, গবেষণা করেছেন। বাংলাদেশে শুধুমাত্র চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলা ইনস্টিটিউটের প্রিন্টমেকিং শাখার আমন্ত্রণে কানাডা প্রবাসী শিল্পী এ.কে.এম. আলমগীর হকের (গেস্ট প্রফেসর) সার্বিক তত্ত্ববধানে এবং প্রবন্ধকারের সহযোগিতায় ও চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের উদ্যোগে ২০১২ খ্রি. এক মাসব্যাপী অ-বিষাক্ত ছাপাইশিল্পের কর্মশালা, ২০১৫ খ্রি. তিন মাসব্যাপী অ-বিষাক্ত ছাপাইশিল্পের কর্মশালা, ২০১৮ খ্রি. চার মাসব্যাপী অ-বিষাক্ত ছাপাইশিল্পের কর্মশালা ধারাবাহিকভাবে বহুবিধ ছাপাইশিল্প পদ্ধতি চর্চার সূচনা করা হয়। প্রিন্টমেকিং: ছাপচিত্র শিক্ষা কার্যক্রমে অ-বিষাক্ত ছাপাইশিল্প মাধ্যমের সমসাময়িক পদ্ধতির চর্চা ও আবশ্যিকতা শীর্ষক এই আলোচনার প্রধান লক্ষ্য হলো বাংলাদেশের শিল্পশিক্ষালয় (বিশ্ববিদ্যালয়) সমূহে ঐতিহ্যগত বিষাক্ত ছাপাইশিল্পের করণকৌশল শেখানোর পরিবর্তে অ-বিষাক্ত ছাপাইশিল্পের মুদ্রণশৈলী ও ছাপচিত্র তৈরির সমসাময়িক আন্তঃবিভাগীয় ধারণা প্রতিষ্ঠা ও অনুশীলন নিশ্চিত করা। সমসাময়িক নতুন পদ্ধতিসমূহ প্রবর্তন করে ঐতিহ্যবাহী ছাপাইশিল্পকে প্রাতিষ্ঠানিক শিল্পশিক্ষার প্রোগ্রামগুলিতে প্রচলিত অনুশীলনগুলির ঐতিহ্য অক্ষুণ্ন রেখে ব্যবহৃত উপাদান সমূহকে যুগোপযোগী, নিরাপদ ও উচ্চধারায় উন্নীত করা। বিশ্ব জুড়ে ছাপাইশিল্পের চর্চা ও ব্যবহারিক ক্ষেত্রে ব্যাপক পরিবর্তন সত্ত্বেও সাম্প্রতিক সময়ে বাংলাদেশের বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে ছাপাইশিল্প পদ্ধতির চর্চা, অনুশীলন বা পঠন-পাঠনে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে অতীতের ঐতিহ্যবাহী চর্চা দ্বারা বিমোহিত। প্রাচীন প্রথাগত বিষাক্ত বা টেক্সিক প্রিন্টমেকিং প্রোগ্রামে শিল্পী, শিক্ষক এবং শিক্ষার্থীরা একটি অনুপযুক্তভাবে সজ্জিত পরিবেশে অত্যন্ত বিপজ্জনকভাবে রাসায়নিক উপকরণগুলি ব্যবহারের মাধ্যমে তাদের স্বাস্থ্যকে বিপন্ন করে চলেছে। পাশাপাশি পরিবেশ দূষণও মারাত্মক আকার ধারণ করেছে।

অ-বিষাক্ত ছাপাইশিল্পের প্রযুক্তিগতভাবে মূল লক্ষ্য হল ডিজাইন এবং প্রিন্টিং সিস্টেমের সবচেয়ে দক্ষ এবং নিরাপদ পদ্ধতি নির্ধারণ করা যা প্রাচীন প্রথাগত ও বিষাক্ত ছাপাইশিল্পের পদ্ধতিকে প্রতিস্থাপনসহ একটি স্থায়ী, স্বল্পব্যয়ী ও সমন্বিতযোগ্য আকর্ষণীয় মাধ্যম চর্চায় প্রযোজ্য হবে। নিরাপদ ছাপাইশিল্প পদ্ধতির গুরুত্ব এই সত্যসত্য থেকে উদ্ভূত হয় যে এটি অ-বিষাক্ত ছাপাইশিল্পের এবং প্রথাগত টেক্সিক প্রিন্টমেকিং বা বিষাক্ত ছাপচিত্র প্রোগ্রামগুলির মধ্যে সমসাময়িক ছাপাইশিল্প শিক্ষার ধারণা এবং অনুশীলনের বিস্তৃত ব্যবধানকে

সংকুচিত করবে। সর্বোপরি প্রিন্টমেকিং বা ছাপাইশিল্পের একটি ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি নির্দেশিত করে এবং ছাপাইশিল্প যেভাবে চর্চা, অনুশীলন করা উচিত সে লক্ষ্যে ছাপাইশিল্প শিক্ষার ধারা বা পদ্ধতিতে প্রচলিত ধারণায় আমূল পরিবর্তনের জন্য একটি মাইলফলক হতে পারে। এছাড়াও অ-বিষাক্ত ছাপাইশিল্প পদ্ধতিগুলি বাংলাদেশের বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে ছাপাইশিল্পের শিল্পী, শিক্ষক, শিক্ষার্থীদের জন্য নিরাপদ প্রিন্টমেকিংয়ের বিকল্প চালু করার প্রথম প্রচেষ্টা। কারণ এখনো প্রিন্টমেকিং স্টুডিওতে দৈনন্দিন অনুশীলনের সময় যে স্বাস্থ্যগত বিপদগুলির সম্মুখীন হতে হয় সে সম্পর্কে আমরা সম্পূর্ণ সচেতন নই। একই সময়ে ছাপাইশিল্প শিক্ষার নিরাপদ, স্বল্পব্যয়ী আয়োজন বা জাতীয় পরিসরে বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের চারুকলা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক, শিল্পশিক্ষার্থীদের সার্বিক অংশগ্রহণের মাধ্যমে ‘অ-বিষাক্ত ছাপাইশিল্প কর্মশালা’ আয়োজন করা হলে এই পদ্ধতিসমূহের কৌশলগত বিভিন্ন সৃজনশীল সম্ভাবনার বিস্তৃত পরিসরে দৃষ্টি নিবদ্ধিত হবে। অপরপক্ষে এই পদ্ধতিসমূহ ব্যাপকভাবে যে সব প্রিন্টমেকাদের ব্যক্তিগত স্টুডিওসমূহে প্রিন্টমেকিং যন্ত্রপাতি, রাসায়নিক দ্রব্যের অভাব এবং সীমাবদ্ধতা রয়েছে তাদের মুদ্রণ সমস্যা সমাধানের বিকল্প ও যৌক্তিক পরামর্শ হিসেবে অগ্রণী ভূমিকা পালন করবে।

অ-বিষাক্ত ছাপাইশিল্প

অ-বিষাক্ত অর্থাৎ যা এমন একটি পণ্য, পদার্থ বা রাসায়নিক দ্রব্য যার তাৎক্ষণিক, দীর্ঘমেয়াদী প্রতিকূল পরিবেশ, স্বাস্থ্যহানীকর প্রভাব নেই। এই বিষয়টি সম্প্রতি ছাপচিত্র অঙ্গণে বহুল প্রচারিত পস্থা। ছাপাইশিল্প তৈরিতে রাসায়নিক পদার্থের ব্যবহার শত শত বছরের পুরোনো, রাসায়নিক ব্যবহার ছাড়া সম্পূর্ণ অ-বিষাক্ত উপায়ে ছাপাইশিল্প চর্চা, অনুশীলন প্রায় অসম্ভব। ছাপাইয়ের প্লেট তৈরি, প্লেট পরিষ্কার, স্টুডিওতে ব্যবহৃত আসবাবপত্র পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন কাজে রাসায়নিক পদার্থ, তেল জাতীয় দাহ্য পদার্থ ব্যবহার বাধ্যতামূলক যা প্রতিক্রিয়াশীল এবং মারাত্মক ক্ষতিকারক। বর্তমানে ছাপাইশিল্পে ব্যবহারের জন্য বিজ্ঞানী, রসায়নবিদ, শিল্পীগণ ছাপাইশিল্প তৈরিতে বিষাক্ত রাসায়নিক পদার্থের পরিবর্তে গৃহস্থালী কাজে ব্যবহৃত কম ক্ষারযুক্ত, পরিবেশবান্ধব, কম ক্ষতিকারক বেশ কিছু দ্রাবক (Mordent), ক্লিনিং রিয়েজেন্ট ও ধাতবপ্লেট ব্যবহার করে ভাল ফল পেতে শুরু করেছেন। যা ঐতিহ্যগত প্রাচীন বিষাক্ত ছাপাইশিল্পে ব্যবহৃত রাসায়নিক পদ্ধতিগুলির চাইতে কম বিপজ্জনক। আর এই কম বিপজ্জনক ছাপাই পদ্ধতিসমূহকে ‘স্বাস্থ্যকর ছাপাইশিল্প’ healthy printmaking বা less toxic printmaking বা green printmaking, বা eco-friendly printmaking ইত্যাদি নামে সঙ্গায়িত করা যেতে পারে।

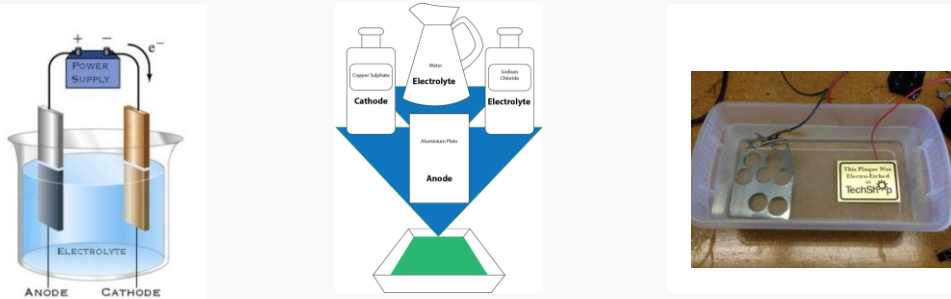
অ-বিষাক্ত ছাপাইশিল্প সাম্প্রতিক সময়ে উন্নতবিশ্বের বহু দেশে উল্লেখযোগ্য হারে নিম্নেউল্লেখকৃত মাধ্যমসমূহ নিরাপদ, স্বল্পব্যয়, সুবিধাজনক, পরিবেশ-বান্ধব ও দ্রুততম সময়ে প্রিন্ট সম্পন্ন করার ক্ষেত্রে ব্যাপকভাবে চর্চা শুরু হয়েছে। যেমন: ফটো পলিমার এটিং, সোলার এটিং, স্যালাইন সালফেট এটিং, সল্ট বাইট এটিং, ওয়াটারলেস লিথোগ্রাফ, কার্বোরেভাম এটিং প্রিন্ট ইত্যাদি। শিল্প উপকরণের সহজলভ্যতার সুবাদে আমাদের দেশেও উপর্যুক্ত ছাপাই মাধ্যমে নিরাপদ অ-বিষাক্ত উপায়ে ছাপাই শিল্পচর্চা ও গবেষণা সহজতর হয়েছে।

ফটো-পলিমার প্লেট এটিং: ১৯৭২ খ্রিষ্টাব্দে অ-বিষাক্ত ছাপাইশিল্প পদ্ধতির নতুন ধারণাটি প্রাথমিকভাবে শিল্পী ওয়েন্ডেনের যুগান্তকারী আবিষ্কার হিসেবে ছাপাইশিল্পীদের কাছে আকর্ষণীয়ভাবে উপস্থাপিত হয়। ওয়েন্ডেন অস্ট্রেলিয়ার শিল্পী ও স্থায়ী বাসিন্দা। তিনিই প্রথম ফটো-সেন্সিটিভ বা আলোক-সংবেদনশীল বা ফটো পলিমার প্লেট এটিং আবিষ্কার করেন। বিংশ শতাব্দীর সত্তরের দশকের শেষার্ধ্বে আমেরিকান শিল্প কর্পোরেশন ‘ডুপন্ট’

প্রিন্টমেকিং: ছাপাইশিল্প শিক্ষা কার্যক্রমে অ-বিষাক্ত ছাপাইশিল্পের সমসাময়িক করণকৌশলের চর্চা ও আবশ্যিকতা

উৎপাদিত (রিস্টন) প্রথম ফটো-সেন্সিটিভ বা আলোক-সংবেদনশীল এই ফটো পলিমার প্লেট বাজারজাত করে, যা বর্তমান সময়েও প্রিন্টমেকিংয়ে শিল্পশিক্ষা প্রতিষ্ঠানসহ বাণিজ্যিক মুদ্রণশিল্পে বহুল ব্যবহৃত হচ্ছে। বর্তমানে ইউরোপ, আমেরিকাসহ বিশ্বের উন্নতদেশসমূহের ছাপাই শিল্পীদের কাছে উপস্থাপিত হয় ঐতিহ্যগত বিষাক্ত ছাপাইশিল্পে ব্যবহৃত নানা মাধ্যমের বিকল্প হিসেবে। এক্ষেত্রে মাইলার বা ট্রান্সপারেন্ট ফিল্মের উপর অস্বচ্ছ কালো-কালি, পারমানেন্ট গ্লাস মার্কারের সাহায্যে মার্ক মেকিং বা শিল্পীর চাহিদা অনুযায়ী একটি সুসংহত লে-আউট তৈরী করতে হয়। অথবা কম্পিউটারে এডবি ফটোশপ, এডবি ইলাস্ট্রেটর বা শিল্পীর সুবিধা অনুযায়ী গ্রাফিক্স সফটওয়্যার ব্যবহার করে তৈরীকৃত ইমেজের একটি সাদা-কালো লেজার প্রিন্ট নিতে হয়। প্রিন্ট অবশ্যই ট্রান্সপারেন্ট ফিল্ম বা ট্রেসিং পেপারে নিতে হবে। এ পর্যায়ে ফটো-পলিমার প্লেটে হাতে আঁকা বা লেজার প্রিন্টটি সেট করতে হবে। লেজার প্রিন্টের উপর পাঁচ মিলিমিটারের একটি স্বচ্ছ কাঁচের সীটকে পেপার ক্লিপ দ্বারা সেটে সূর্যের আলোতে এক থেকে দুই মিনিট এক্সপোজ করলে কাঙ্ক্ষিত নকশাটি ফটো-পলিমার প্লেটে স্থানান্তরিত হবে। এবারে এক্সপোজকৃত প্লেটটিতে সাধারণ টেপের জলের ধারা প্রবাহিত করলে ফটোপলিমার প্লেটটি এচিং হয়ে যাবে। অর্থাৎ লেজার প্রিন্ট বা কালো মার্কার পেনের ড্রয়িং এর জন্য যেসব এরিয়াতে সূর্যের আলো প্রবেশ করতে পারেনি সেসব এরিয়ায় পলিমার ইমালশান থেকে যাবে আর সূর্যের আলোর সংস্পর্শে এসেছে এমন এরিয়া জলের ধারায় ওয়াশ আউট হবে বা এচিং হবে। আশ্চর্য বিষয় লেজার প্রিন্টের হাফটোন অপরিবর্তিতভাবে এচিং হবে। খুব সাবধানে এচিংকৃত তলটিতে কোনো প্রকার স্পর্শ বা আঁচড় না পড়ে সে দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। কক্ষের স্বাভাবিক তাপমাত্রায় ত্রিশ মিনিট রেখে দিলে প্লেটটি প্রিন্টের জন্য উপযোগী হবে। এচিং প্রিন্ট পদ্ধতি অনুসরণ করে শিল্পীর চাহিদা অনুযায়ী প্রয়োজনীয় সংখ্যক প্রিন্ট নেয়া সম্ভব (Paul Coldwell 2010, – 4-5)।

যুক্তরাষ্ট্রের নাব্রস্কা লিংকন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর, শিল্পী ‘ক্যারিগ কুন্স’ ১৯৯৭ খ্রি. বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি, ঢাকা আয়োজিত পক্ষকালব্যাপী ছাপাইশিল্প কর্মশালায় এই ফটো-পলিমার প্লেট এচিং মাধ্যমটির সফলভাবে অনুশীলন করিয়েছেন। এই মাধ্যমে একই প্লেটকে ইন্টাগ্ৰিও ড্রাইপয়েন্ট ও রিলিফ প্রিন্ট উভয় ক্ষেত্রে প্রিন্ট নেয়া সম্ভব।



চিত্র-১, সোলার প্লেট এচিং

সোলার প্লেট এটিং: শিল্পী ওয়েল্ডেন তাঁর নতুন আবিষ্কারের নামকরণ করেন ‘সোলার প্লেট এটিং’; যাতে মূলত: ঐতিহ্যগত বিষাক্ত ছাপাইশিল্পের মূল স্ফারক নাইট্রিক অ্যাসিড, বার্নিশ এবং জৈব দ্রাবকের ব্যবহারকে সম্পূর্ণ পরিহার করা হয়েছে। অবিসাক্ত ছাপাইশিল্প পদ্ধতিগুলির মধ্যে অন্যতম সোলার প্লেট এটিং অনেক বেশি নিরাপদ কারণ এটি একটি ডিসি ব্যাটারী দ্বারা সংযোগকৃত, যা ইলেক্ট্রোলাইট নীতিমালার ওপর ভিত্তি করে নিয়ন্ত্রিত ও পরীক্ষিত। ধাতব আয়নগুলি এনোড (+) ও কেথোড (-) এই দুই ধরনের ধাতুর খুঁটির মধ্যে পরিকল্পিতভাবে সঞ্চালন করা হয়, যেগুলির মধ্যে বৈদ্যুতিক শক্তির প্রয়োগ ঘটে; প্রাচীন ঐতিহ্যগত বিষাক্ত ছাপাইশিল্পে ব্যবহৃত রাসায়নিক সংমিশ্রণে তথা নাইট্রিক অ্যাসিড বাইট এটিং পদ্ধতিতে অনেক বেশি আক্রমণাত্মক রাসায়নিক বিক্রিয়া ঘটে। এই ক্ষেত্রে দ্রাবক হিসেবে ব্যবহার করা হয় কপার সালফেট ও দৈনন্দিন রান্নায় ব্যবহৃত সাধারণ খাবার লবন তথা সোডিয়াম ক্লোরাইড। নেগেটিভ ও পজেটিভ দুই প্রক্রিয়ায় এটিং করা সম্ভব। সিএনসি ভিনাইল কাটিং ডিজাইন অ্যাসিড রোধকের সাহায্যে জিঙ্ক বা কপার প্লেটের ওপর সেটে কাটিং এরিয়ার ভিনাইল সরিয়ে নিয়ে প্লেটটি ইলেক্ট্রোলাইট করতে হয়। সনাতন পদ্ধতির হার্ড গ্রাউন্ড বা সফট গ্রাউন্ড এটিংয়ের পরিবর্তে এ্যাক্রেলিক বেজড লিকুইড হার্ড গ্রাউন্ড এবং সফট গ্রাউন্ড এটিং করাও খুবই সহজ। এছাড়াও প্লেটের উপর এ্যারোসল স্প্রে পেইন্ট ব্যবহার করে অত্যন্ত নিরাপদভাবে এ্যাকুয়াটিন্ট পদ্ধতিতে প্রিন্টমেকিং সম্ভব। এই ধারায় প্রাচীন ঐতিহ্যগত বিষাক্ত ছাপাইশিল্পে ব্যবহৃত রাসায়নিক সংমিশ্রণে মারাত্মক পরিবেশ বিপর্যয়ের পরিবর্তে অ-বিষাক্ত ছাপাইশিল্প পদ্ধতিগুলি আমাদেরকে নিরাপদ পরিবেশবান্ধব ছাপাইশিল্প তৈরির অপার সম্ভাবনার দ্বার উন্মোচন করে যা অন্য কোনো উপায়ে অর্জন করা সম্ভব নয়। ছাপাইশিল্পের পাশাপাশি ‘সোলার প্লেট এটিং’ পদ্ধতিতে বাণিজ্যিকভাবে গাড়ির নাম্বার প্লেট, হোটেল-মোটেলের কক্ষ নাম্বার, নেম প্লেট, অনার বোর্ড, রোড নির্দেশিকা ইত্যাদি এটিং করার কাজে সর্বাধিক ব্যবহৃত হচ্ছে।

ওয়াটারলেস লিথোগ্রাফি:

স্টোন লিথোগ্রাফির পরিবর্তে ‘ওয়াটারলেস লিথোগ্রাফি’তে ছাপাইশিল্প তৈরি; কানাডীয় শিল্পী প্রফেসর নিক্‌ সিমিনফ ১৯৯১ খ্রিষ্টাব্দে সফলভাবে এই পদ্ধতিটি আবিষ্কার করেন। অ-বিষাক্ত ছাপাইশিল্প তৈরি পদ্ধতির ফটো-সেন্সিটিভ বা আলোক-সংবেদনশীল অফসেট লিথো প্লেটে ‘লেজার টোনার’ বা ‘জেরক্স টোনার’ ড্রইংয়ের আকর্ষণীয় সল্পব্যয়ী বিকল্প লিথোগ্রাফ প্রিন্টিং মাধ্যম হিসেবে জনপ্রিয়তা পাচ্ছে। অ-বিষাক্ত ছাপাইশিল্প তৈরির ক্ষেত্রে সবুজ বিপ্লব, একই সাথে ছাপাইশিল্পের অন্যান্য শাখায় প্রসারিত হয়েছে পলিয়েস্টার প্লেট এবং ওয়াটারলেস লিথোগ্রাফি (অফসেট প্লেট) আবিষ্কারের সাথে। বর্তমানে অনেক শিল্পীর প্রথম পছন্দ ও বিবেচনা করা হয়ে থাকে ঐতিহ্যবাহী স্টোন লিথোগ্রাফির চমৎকার নিরাপদ বিকল্প হিসেবে। এতে পেইন্টলেস স্বচ্ছ সিলিকন গ্লু ব্যবহারের ক্ষেত্রে অর্ডারলেস পেইন্ট থিনার দ্রবণীয় হিসেবে ব্যবহার করা হয়। এই প্রক্রিয়ায় সবচেয়ে সহজ আকারে মুদ্রণ কালি ইমেজ এরিয়া এবং নন-ইমেজ এরিয়াতে অবস্থান করা, মুদ্রণ কালি গ্রহণ করা বা প্রত্যাখান করার জন্য সিলিকনের ক্ষমতার উপর ভিত্তি করে গঠিত। লেজার টোনার বা জেরক্স টোনার, লিকুইড সোপ ও জলের সংমিশ্রণের সাহায্যে মাইলার ফিল্মের উপর ইমেজ তৈরি করতে হয়। অথবা কম্পিউটারের সাহায্যে এডবি ফটোশপ, এডবি ইলাস্ট্রেটর বা শিল্পীর সুবিধা অনুযায়ী সফটওয়্যার ব্যবহার করে তৈরিকৃত ইমেজের একটি সাদা-কালো পজিটিভ বা নেগেটিভ ফ্লিম প্রিন্ট নিতে হয়। প্রিন্ট অবশ্যই ট্রান্সপারেন্ট ফিল্ম বা ট্রেসিং পেপারে নিতে হবে। ম্যানুয়েল পদ্ধতিতে মাইলারের উপর তৈরিকৃত ইমেজ বা কম্পিউটার লেজার প্রিন্ট বা পজেটিভ প্রসেস ফিল্ম অফসেট প্রিন্টিং প্লেটের উপর সেট করে লাইট এক্সপোজারের মাধ্যমে

প্রিন্টমেকিং: ছাপাইশিল্প শিক্ষা কার্যক্রমে অ-বিষাক্ত ছাপাইশিল্পের সমসাময়িক করণকৌশলের চর্চা ও আবশ্যিকতা

কাঙ্ক্ষিত সময় ধরে প্লেট এক্সপোজ করার পর প্লেটটিতে (১ : ৫ - পানি : প্লেট ডেভেলাপার) ডেভেলাপার প্রয়োগের মাধ্যমে প্লেট মেকিং বা প্লেট প্রসেসিং করতে হয়। সনাতন পদ্ধতির এ্যারাবিক গামের পরিবর্তে তরলীকৃত ওয়াটার স্যালিয়েন্ট সিলিকন গ্লু প্রয়োগ করে ফেসিয়েল টিস্যুর সাহায্যে বাফিং করার পর প্লেটটিকে কমপক্ষে বারো ঘন্টা স্বাভাবিক তাপমাত্রায় সম্পূর্ণ শুকানো হয়। প্রিন্টিং পর্যায়ে অ্যাসিটোন বা আইসোপ্রোপাইল অ্যালকোহল (IPA) ব্যবহার করে প্লেটে থেকে যাওয়া ইমালশানকে ফ্যাসিয়াল টিস্যুর সাহায্যে মুছে ফেলতে হয়। প্লেটে একটি গোস্ট ইমেজ লক্ষ্য করা যাবে, পরে ইঙ্কিং রোলার বা প্রফেসর নিক্ সেমিনফ আবিষ্কৃত ত্রিপার্ট রোলার (চিত্র-২)-এর



(Three Part Roller for waterless Lithography invented by Professor Nik Semenov - 1991)

সাহায্যে মুদ্রণ কালি প্রয়োগ করা হলে সিলিকন যুক্ত নন-ইমেজ এরিয়াতে মুদ্রণ কালি স্পর্শ করবে না, শুধুমাত্র ফটো-সেন্সিটিভ বা আলোক-সংবেদনশীল অফসেট লিথো প্লেটে থেকে যাওয়া ইমালশানে মুদ্রণ কালি সংস্থাপিত হবে। যা এটিং প্রেস বা লিথোগ্রাফি প্রেসের মাধ্যমে অনায়াসে প্রিন্ট করা সম্ভব। এই প্রক্রিয়ায় অফসেট প্লেট ব্যবহার করা হয় কিন্তু চমৎকার বিষয় এই যে, এতে প্লেট এবং প্রিন্টিং পেপার ডেম্পিং প্রয়োজন হয়না বা জল ব্যবহার করা হয় না। সম্পূর্ণ শুকনো পদ্ধতিতে প্লেট লিথোগ্রাফ তথা ওয়াটারলেস লিথোগ্রাফি প্রিন্টমেকিংয়ে অত্যন্ত নিরাপদ ও বামেলানুগ প্রক্রিয়া সম্পন্ন করা যায়। ফলে প্রিন্ট অত্যন্ত পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকে এবং পুরো প্রক্রিয়াটিতে কায়িক পরিশ্রম কম হয়।

সল্টবাইট এটিং: সল্ট-বাইট এটিং কানাডীয় শিল্পী প্রফেসর নিক্ সেমিনফ ১৯৯২ খ্রিষ্টাব্দে অ-বিষাক্ত পদ্ধতির অত্যন্ত আকর্ষণীয় মেটাল এনগ্রেভিং বা মেটাল এটিংয়ের সর্বোপরি সহজ মাধ্যমটি আবিষ্কার করেন। এ্যালুমিনিয়াম, জিঙ্ক প্লেট এটিংয়ের জন্য সর্বাধুনিক ও নিরাপদ, পরিবেশবান্ধব অ-বিষাক্ত ছাপাইশিল্প মাধ্যম হিসেবে শিল্পী, শিক্ষক, শিক্ষার্থীদের মধ্যে সমধিক চর্চা ও পছন্দের শীর্ষে অবস্থান করছে। জিঙ্ক এবং এ্যালুমিনিয়াম প্লেট এটিংয়ের জন্য কপার সালফেট CuSO_4 ও সোডিয়াম ক্লোরাইড NaCl এবং পানির অনুপাত নিম্নরূপ—

নং	CuSO ₄ , NaCl এবং পানির অনুপাত	নাইট্রিক অ্যাসিডের দ্রবণ
১.	ডিপ অ্যাচ এবং রিলিফ অ্যাচ : ২০০ গ্রাম কপার সালফেট, ২০০ গ্রাম সাধারণ লবন এবং ১ লিটার পানি	নাইট্রিক অ্যাসিডের সাথে তুলনীয় ১৬ - ১৮% অ্যাসিড দ্রবণ
২.	সাধারণ লাইন এটিং: ১০০ গ্রাম কপার সালফেট, ১০০ গ্রাম সাধারণ লবন এবং ১ লিটার পানি	নাইট্রিক অ্যাসিড দ্রবণের সাথে তুলনীয় ১২-১৩% অ্যাসিড দ্রবণ
৩.	ফাইন লাইন, মোটা অ্যাকুয়াটিন্ট, নরম-গ্রাউন্ড: ৫০ গ্রাম কপার সালফেট, ৫০ গ্রাম সাধারণ লবন এবং ১ লিটার পানি	নাইট্রিক অ্যাসিড দ্রবণের সাথে তুলনীয় ৭-৮% অ্যাসিড দ্রবণ
৪.	ফাইন অ্যাকুয়াটিন্ট: ২৫ গ্রাম কপার সালফেট, ২৫ গ্রাম সাধারণ লবন এবং ১ লিটার পানি	নাইট্রিক অ্যাসিড দ্রবণের সাথে তুলনীয় ৪-৫% অ্যাসিড দ্রবণ

এই দ্রবণের শক্তিমাত্রা বৃদ্ধি করার ক্ষেত্রে কপার সালফেটের সাথে সাধারণ লবণের পরিমাণ আনুপাতিকহারে বৃদ্ধি করতে হয়। দ্রবণ যত শক্তিশালী হবে তত দ্রুত এটি খোদাই হবে। ধাতব তক্ষণ বা এটিংয়ের প্রক্রিয়া ঐতিহ্যগত ও প্রচলিত পদ্ধতিতে ধারাবাহিকভাবে সম্পন্ন করতে হয় (Printsafe 1990)।

ডিজিটাল মিডিয়া: সম্প্রতি প্রযুক্তির যুগান্তকারী উৎকর্ষের সাথে কম্পিউটার ডিজাইন প্রোগ্রাম (সফটওয়্যার) ডিজিটাল মিডিয়ার সর্বাধিক বিবর্তনের ফলে এবং আধুনিকতার অত্যাধুনিক সফলতা ও ক্ষমতা সম্পন্ন ইকো সলভেন্ট ডিজিটাল প্রিন্টার, স্ক্যানার, ডিজিটাল ক্যামেরা, ফটোকপি মেশিন, লেজার কাটিং, সয়ংক্রিয় স্ক্রিনপ্রিন্টিং সিস্টেম ইত্যাদির নতুন প্রবণতা অ-বিষাক্ত ছাপাইশিল্প বা পদ্ধতির সাথে শিল্পী, শিক্ষক, শিক্ষার্থীদের সমসাময়িক চিন্তার প্রসার ঘটিয়ে সর্বজনগ্রাহ্য ছাপাইশিল্পের অনন্য দিক উন্মোচিত হয়েছে। অ-বিষাক্ত পদ্ধতির সাথে একীভূত করা অনেক সমসাময়িক শিল্পীর দ্বারা গৃহীত ডিজিটাল মিডিয়ার আন্তর্গোষ্ঠীভাগীয় সৃজনশীল সম্ভাবনা দ্বারা অনেকেই প্রলুব্ধ হচ্ছেন। ডিজিটাল পদ্ধতির দুয়ার অব্যাহত হয়েছে সমসাময়িক শিল্পীর কল্পনা বাস্তবায়নের জন্য। এনালগ পদ্ধতি বা ঐতিহ্যবাহী ছাপাইশিল্পের সাথে একীভূতকরণ, ম্যানিপুলেশন বা বশীকরণ করার সীমাহীন বিকল্প ছাপাই পদ্ধতি, ডিজিটাল প্রিন্টিং প্রসেস সম্প্রতি শিল্পী, শিক্ষক, শিক্ষার্থীদের সৃজনশীল দৃষ্টিকে প্রসারিত করেছে। তারা তাদের শিল্পকর্মে বৌদ্ধিক এবং মানসিক বিষয়বস্তু প্রকাশের মূল দৃষ্টিভঙ্গিকে প্রযুক্তিগত বিবেচনায় সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিত করেছে। এক্ষেত্রে বিষাক্ত ছাপাইশিল্প থেকে অ-বিষাক্ত ছাপাইশিল্পের পদ্ধতির দিকে অগ্রসর হওয়ার প্রবণতা তুলনামূলকভাবে নতুন। অ-বিষাক্ত ছাপাইশিল্পের পদ্ধতি বিগত কয়েক বছর জুড়ে শিল্পকলার বড় বড় গুরুত্বপূর্ণ আসরে ছাপাইশিল্পের নতুন অবস্থানকে প্রতিষ্ঠিত করে সর্বাধিক দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে।

স্বাস্থ্য ও পরিবেশ দূষণ নিরাপত্তা

বাণিজ্যিক মুদ্রণ প্রতিষ্ঠান ও শিল্পশিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে বিভিন্ন ঐতিহ্যবাহী বিষাক্ত ছাপাইশিল্প পদ্ধতি এবং অ-বিষাক্ত ছাপাইশিল্প পদ্ধতিতে স্বাস্থ্য ও পরিবেশ দূষণ নিরাপত্তা প্রবিধানের পার্থক্যসমূহ নিম্নরূপ:

প্রিন্টমেকিং: ছাপাইশিল্প শিক্ষা কার্যক্রমে অ-বিষাক্ত ছাপাইশিল্পের সমসাময়িক করণকৌশলের চর্চা ও আবশ্যিকতা

নং	বিষাক্ত ছাপাইশিল্প পদ্ধতি	অ-বিষাক্ত ছাপাইশিল্প পদ্ধতি
১.	বিষাক্ত ছাপাইশিল্প পদ্ধতিতে ঐতিহ্যগত অ্যাসিড এচিং প্রক্রিয়ায় উল্লেখযোগ্য পরিমাণে বিষাক্ত ধোঁয়া উৎপন্ন করে। সাধারণত নাইট্রিক অ্যাসিড অ্যাচ্ উৎপাদিত নাইট্রাস অক্সাইড গ্যাসগুলি চোখ, শ্বাস, ফুসফুস এবং কিডনির ক্ষতি করে, একইসাথে পুরুষত্বহীনতা এবং জেনেটিক প্রভাব সৃষ্টির মূলে চিহ্নিত।	অ-বিষাক্ত ছাপাইশিল্প পদ্ধতিতে ‘মেটাল সল্ট এচিং’ দুইটি মৌলিক ধরনের প্রক্রিয়া নিয়ে গঠিত; এডিনবার্গ এচ্ এবং স্যালাইন সালফেট এচ্। এডিনবার্গ এচ্ - তামা, পিতল এবং ইস্পাতের জন্য উপযুক্ত একটি চেলেটিং এজেন্ট বা অনুঘটক হিসাবে সাইট্রিক অ্যাসিড যুক্ত করে ফেরিক ক্লোরাইডের একটি নির্দিষ্ট দ্রবণ নিয়ে গঠিত। এটি ব্যবহারে অপেক্ষাকৃত নিরাপদ ও পরিবেশ-বান্ধব।
২.	বিষাক্ত ছাপাইশিল্প পদ্ধতিতে সাধারণ সলভেন্ট রিয়েজেন্ট বা দ্রবণীয় পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার পণ্যে পাওয়া ক্লোরিনের সংস্পর্শে, নাইট্রিক অ্যাসিড এমনকি সরিষা গ্যাসে পরিণত হতে পারে; এই চরম বিপদটি কেবল তাত্ত্বিক নয়। যুক্তরাজ্য ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র উভয় দেশের ক্ষেত্রেই পেশাদার প্রিন্ট স্টুডিওতে ঘটে যাওয়া বেশ কয়েকটি সরিষা গ্যাসের ঘটনাগুলি প্রমাণিত হয়েছে।	স্যালাইন সালফেট এচ্ মূলত: দস্তা, অ্যালুমিনিয়াম এবং হালকা ইস্পাত এচিং করার জন্য তৈরি করা হয়েছে। এর সমান অংশে কপার সালফেট এবং সোডিয়াম ক্লোরাইড বা সাধারণ লবন মিশ্রণ নিয়ে গঠিত। এইসব উপাদানের কম ঝুঁকির মাত্রার কারণে ধাতব এচিং পদ্ধতিগুলির পেশাদার প্রিন্টমেকিং স্টুডিওতে ব্যবহারের জন্য উভয়ই উপযুক্ত, নিরাপদ ও কার্যকরী। এতে মজুদ সনদের প্রয়োজন হয় না।
৩.	বর্তমানে ভারীশিল্পে প্রবিধানগুলি পারমাণবিক শিল্পে ব্যবহৃত অনুরূপ, সম্পূর্ণরূপে নিষ্কাশিত এবং পরিশ্রুত গ্লাভস ইউনিট ছাড়া নাইট্রিক অ্যাসিডের ব্যবহার নিষিদ্ধ করা হয়েছে। দুঃখজনকভাবে এই বাধ্যতামূলক প্রচারণা সত্ত্বেও বিষাক্ত ছাপাইশিল্প পদ্ধতিতে অনেক শিল্পী, শিক্ষার্থী তাদের স্টুডিওতে এবং বাণিজ্যিক মুদ্রণশিল্পে চরম অবহেলা করছে।	অ-বিষাক্ত ছাপাইশিল্প পদ্ধতিতে বিপরীত চরিত্র লক্ষণীয়; মেটাল সল্ট এচিং পদ্ধতিতে ক্ষতিকারক গ্যাস নির্গমন থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত। এচিংয়ের সময় রাসায়নিক বিক্রিয়া উপ-পণ্যসমূহ স্টুডিওর আন্তরীণ বায়ুমণ্ডলকে দূষিত না করেই এচিং দ্রবণের মধ্যে মজুদ থাকে; এমনকি প্রক্রিয়াগুলি তাপ উৎপন্ন করে না এবং প্লেটে খোদাই করার সময় কোনো খারাপ প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করা যায় না।
৪.	বিষাক্ত ছাপাইশিল্প পদ্ধতিতে এচিংয়ের প্রধান কেন্দ্র ক্ষয়কারী রাসায়নিক পদার্থের ব্যবহার করে ধাতব প্লেটে ‘বাইট’ দেওয়া; তাই সব ক্ষেত্রে ত্বক ও চোখের সুরক্ষা নিশ্চিত করা গুরুত্বপূর্ণ। নাইট্রিল গন্টলেট এই ক্ষেত্রে দ্রাবক ও মর্ডান্ট থেকে সুরক্ষা দেয়; হালকা ওজনের নাইট্রিল গ্লাভস্ প্লেটে ইঞ্চিংয়ের সময় অমূল্য	বিষাক্ত ছাপাইশিল্প পদ্ধতিতে এচিংয়ের জন্য নাইট্রিক অ্যাসিড বা পটাসিয়াম ক্রোরেট (কখনও কখনও ডাচ মর্ডান্ট হিসেবে উল্লেখ করা হয়) ঐতিহ্যগতভাবে ধাতব পাতে এচিংয়ের মূল ক্ষার হিসেবে ব্যবহার করা হয়ে থাকে। এই প্রক্রিয়ায় ধাতব লবণের খোদাই পিতল, তামার প্লেট বাইট করার বিকল্প ও নিরাপদ পদ্ধতি। বিকল্প ও নিরাপদ

প্রমাণিত। অ্যাসিড, লবণ বা দ্রাবকের যেকোনো অনিচ্ছাকৃত স্প্যাশ থেকে চোখকে রক্ষা করার জন্য গগলস বা সেফটি গগলস ব্যবহার অত্যন্ত জরুরী। ঐতিহ্যগত অ্যাকুয়াটিন্ট কৌশলে এটিং ছাপাইশিল্প তৈরির প্রস্তুতিকালে অবশ্যই (FFP3) মাস্ক ব্যবহার করতে হবে। এছাড়াও যারা বিষাক্ত ছাপাইশিল্পের পদ্ধতিতে এটিংয়ে ছাপাইশিল্প তৈরি করতে প্রয়োজনীয় রাসায়নিক দ্রব্য, ধাতব প্লেট ব্যবহারে আতঙ্কিত বোধ করেন তাদের জন্য এ্যাক্রেলিক প্লাস্টিক গ্লাস-স্বচ্ছ প্লেট ড্রাইপয়েন্ট, এটিংয়ের জন্য আদর্শ। একটি ধারালো বা সূঁচালো এটিং টুলসের সাহায্যে অনায়াসে কাঙ্ক্ষিত লে-আউট অনুযায়ী প্লেটে আঁচড় কেটে সাফল্য পেতে পারেন। ছাপাইশিল্প তৈরীর ক্ষেত্রে তুলনামূলক নিরাপদ এই করণকৌশলটি সমসাময়িক ইন্টাগলিও প্রিন্টের জগতে অনন্য সূচনা এবং এটিং-এ অন্বেষণের যথার্থ অগ্রদূত। এই প্লেট সহজলভ্য, স্বল্পব্যয়ী যা মনোটাইপ প্রিন্টমেকিংয়ের জন্য উপযোগী এবং এটি পুনর্ব্যবহারযোগ্য।	দ্রবণ হিসেবে ফেরিক ক্লোরাইড অনন্য; লোহার পারক্লোরেট নামেও সমধিক পরিচিত। এই দ্রবণটি যে কোনো শক্ত অ্যাসিডের তুলনায় অনেক কম বিপজ্জনক ধোঁয়া নির্গত করে ফলে শিল্পী, শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের স্টুডিওতে নিরাপদে ব্যবহারযোগ্য। যদিও এটি অ্যাসিডের চেয়ে নিরাপদ তবুও ত্বক এবং চোখের সংস্পর্শ এড়াতে যত্ন নেওয়া উচিত; ফেরিক মেশানো এবং ডিক্যান্ট করার সময় বা ধাতব প্লেট এটিং করার সময় প্রতিরক্ষামূলক পোষাক, সেফটি গগলস, হালকা ওজনের নাইট্রিল গ্লাভস ব্যবহার করা আবশ্যিক। ফেরিক ক্লোরাইড দ্রবণ হিসেবে ক্যামিকেলস সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠানে বিক্রয় করা হয়ে থাকে। শিল্পীরা তাদের এটিং প্রক্রিয়ার সময়, খোদাইয়ের তারতম্যের ওপর ভিত্তি করে খুব নির্দিষ্ট পরিমাণে পানি ব্যবহার করে আরও পাতলা করে ব্যবহার করতে পারেন। এটিতে সাইট্রিক অ্যাসিড যুক্ত করে ‘এডিনবার্গ এচ’ তৈরি করা যেতে পারে। পিতল, তামার প্লেট, পাতলা স্টিলের প্লেট বাইট করার সবচেয়ে নিরাপদ এবং সর্বোত্তম পারফর্মিং এজেন্ট হিসেবে পরিচিত।
--	--

৫. স্টোন লিথোগ্রাফি: ঐতিহ্যবাহী স্টোন লিথোগ্রাফি প্রথম ১৭৯৮ সালে জার্মান শিল্পী এলয় সেনিফেল্ডার আবিষ্কার করেছিলেন। বাণিজ্যিক মুদ্রণশিল্পে যুগান্তকারী পরিবর্তন ও সর্বাধিক সুবিধা সম্বলিত মুদ্রণ হিসেবে অত্যাধুনিক অফসেট প্রেস আবিষ্কারের আগ পর্যন্ত পৃথিবী জুড়ে সমাদৃত ছিল। একটি সমতল চূনাপাথর, পরে গ্রেইন্ড জিঙ্ক প্লেট ‘তেল ও জলের বিপরীত অবস্থানের মূলমন্ত্র’কে কাজে লাগিয়ে একই সমতলে তেল বা গিঁজযুক্ত কালি, কন্টি, ক্রেন ইত্যাদির ড্রইং, তুশ্ - ওয়াশের সাহায্যে ইমেজ এরিয়া এবং নন ইমেজ এরিয়া অবস্থানের সৃষ্টি করা হয়। গাম এরাবিক ও অতি অল্প পরিমাণ নাইট্রিক অ্যাসিড ব্যবহার করে চূনাপাথরে কাঙ্ক্ষিত ইমেজ তৈরি করে পরে রোলারের সাহায্যে প্রিন্টিং কালি প্রয়োগ করে প্রেসের মাধ্যমে প্রিন্ট বা ছাপ নেয়া হয়। প্রিন্টের সময় স্টোনের উপর অবশ্যই জলের ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে অন্যথায় স্টোনে অবাঞ্ছিতভাবে ইঙ্ক লেগে যাবে।^৩	জলহীন লিথোগ্রাফি: স্টোন লিথোগ্রাফির পরিবর্তে ‘ওয়াটারলেস লিথোগ্রাফি’তে ছাপাইশিল্প তৈরি করা; কানাডীয় শিল্পী প্রফেসর নিক্ সিমিনফ ১৯৯১ খ্রিষ্টাব্দে অ-বিষাক্ত ছাপাইশিল্পের ফটো-সেন্সিটিভ বা আলোক-সংবেদনশীল অফসেট লিথো প্লেটে ‘লেজার টোনার’ বা ‘জেরক্স টোনার’ ড্রইংয়ের আকর্ষণীয় ও সল্পব্যয়ী বিকল্প লিথোগ্রাফি প্রিন্টিং পদ্ধতির আবিষ্কার করেন। অ-বিষাক্ত ছাপাইশিল্প তৈরির ক্ষেত্রে সবুজ বিপ্লব একই সাথে শিল্পের অন্যান্য শাখায় প্রসারিত হয়েছে পলিয়েস্টার লিথোগ্রাফি প্লেট এবং ওয়াটারলেস লিথোগ্রাফি (পি.এস -অফসেট লিথোগ্রাফি প্লেট) আবিষ্কারের সাথে, যা অনেক শিল্পীর প্রথম পছন্দ ও বিবেচনা করা হয়ে থাকে ঐতিহ্যবাহী স্টোন লিথোগ্রাফির চমৎকার ও নিরাপদ বিকল্প হিসেবে। প্লেট প্রসেসের ক্ষেত্রে স্বচ্ছ সিলিকন গ্লু অর্ডারলেস থিনারের সাহায্যে পাতলা করে প্রয়োগসহ ফেসিয়াল টিস্যুর সাহায্যে বাফিং করতে হয়। ফলে ইমেজ এরিয়া ও নন-ইমেজ এরিয়া একই সমতলে অবস্থান করে।^৩
--	--

<https://research-groups.usask.ca/saferprintmaking>

ছাপাইশিল্পে স্বাস্থ্য ও পরিবেশ নিরাপত্তা

শিল্পচর্চার অন্যতম মাধ্যম প্রিন্টমেকিং: ছাপাইশিল্প শিক্ষা কার্যক্রমে বা অ-বিষাক্ত ছাপাইশিল্প সমসাময়িক করণকৌশলের চর্চা ও আবশ্যিকতা শীর্ষক আলোচনার এই পর্বে ‘ছাপাইশিল্পে স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা’ বিষয়ক প্রকাশিত একটি ম্যানুয়েল অনুসারে, এডমন্টনের আলবার্টা লেবার, অক্যুপেশনাল হেলথ অ্যান্ড সেফ্টি ডিভিশন কর্তৃক কানাডায় প্রকাশিত প্রায় বারোটি প্রথাগত প্রাচীন ছাপাইশিল্প মাধ্যমের অনুশীলনকারীদের দ্বারা সাধারণত ব্যবহৃত বিষাক্ত (Toxic) পদার্থের মধ্যে কিছু বিপজ্জনক রাসায়নিক দ্রব্য এবং দ্রাবক হল নাইট্রিক অ্যাসিড (HNO₃), হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড (HCl), সালফিউরিক অ্যাসিড (H₂SO₄), হাইড্রোফ্লোরিক অ্যাসিড (HF), বেনজিন (C₆H₆), টারপেন্টাইন (C₁₀H₁₆), লিকুইড বার্নিশ এবং অ্যাসিটোন (C₃H₆O) দ্রাবক, ফটো থেকে ফরাসি চক, কস্টিক সোডা এবং অতিবেগুনী বিকিরণ আলোক সম্প্রতিসহ এক্সপোজার ইউনিট মারাত্মক হারে বিপজ্জনক। এছাড়াও কম পরিমাণ হলেও ‘রোসিন এবং অ্যাসফাল্টাম পাউডার’ প্রচণ্ড বিস্ফোরক হতে পারে। ছাপাইশিল্পীদের স্বাস্থ্য সুরক্ষার বিষয়ে উল্লেখকৃত রাসায়নিক পদার্থ ব্যবহারের ফলে মানবদেহে নানা জটিলতা তৈরি হতে পারে, পাশাপাশি পরিবেশেও বিরূপ প্রতিক্রিয়া দেখা দিতে পারে। যেমন: স্প্ল্যাশিংয়ের অ্যাসিড

শিল্পী, শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের মধ্যে তুকে পোড়া এবং চোখের মারাত্মক আঘাতের কারণ হতে পারে। বিষাক্ত পদার্থের শ্বাস-প্রশ্বাস সাধারণ ক্ষুদ্র রাসায়নিক কণা, ধোঁয়া, বায়ুবাহিত বাষ্প এবং বিষাক্ত ধোঁয়া ফুসফুসের গভীরে প্রবেশ করে। বাণিজ্যিক মুদ্রণকর্মী এবং শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের শিল্পশিক্ষা গবেষণাগারে বরিষ্ঠ বিখ্যাত (মাস্টার প্রিন্টার) মুদ্রণ নির্মাতাদের মধ্যে অতিবেগুনী এক্সপোজার ইউনিট সম্পর্কিত রোগের মারাত্মক ঝুঁকি ডার্মাটাইটিসের একটি উচ্চ শতাংশ দর্শনীয়। কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্রের ক্ষতি, হাঁপানি, এমফিসেমা, অ্যালার্জি সংবেদনশীলতা, গুরুতর পোড়া যা থেকে গ্যাংগ্রিন হতে পারে। পদ্ধতিগত বিষক্রিয়া যা ফুসফুস, লিভার, কিডনী, হৃৎপিণ্ড, স্নায়বিক ব্যাধি, ত্বকের সংক্রমণকে প্রভাবিত করে, ওপরের শ্বাসযন্ত্রের ট্র্যাক্টের মারাত্মক ক্ষতি হতে পারে। কারণ বেশিরভাগ ঐতিহ্যবাহী প্রিন্টমেকিং স্টুডিও বিষাক্ত রাসায়নিক দ্রব্য, দ্রাবক, পণ্যসমূহ পর্যাপ্তহারে একই সাথে ব্যবহৃত হয়ে থাকে; এই বিষাক্ত পদার্থগুলিকে একত্রিত করার সাথে শ্বাস-প্রশ্বাস গ্রহণে, স্পর্শ জনিত কারণে শরীরের বিভিন্ন অঙ্গে জমে থাকার ফলে দীর্ঘমেয়াদে স্বাস্থ্যের ক্ষতি হয়। ফলে সামগ্রিকভাবে একটি প্রশ্নই বারংবার প্রিন্টমেকার বা ছাপাইশিল্পীগণের নিজেদেরকে জিজ্ঞাসা করা উচিত, বিষাক্ত ছাপাইশিল্পের ঐতিহ্যগুলি কি সত্যিই মৃত্যুর মূল কারণ?

চিকিৎসা ইতিহাসবিদরা অনুমান করেছেন যে অনেক পুরোনো মাস্টার শিল্পী অসুস্থতা এবং এমনকি মৃত্যুবরণ করেছেন, কারণ হিসেবে তারা যে উপকরণসমূহ ব্যবহার করেছিলেন তারই ফল। ফরাসি প্রখ্যাত শিল্পী ফ্রান্সিসকো গোইয়্যা (১৭৪৬-১৮২৮) যন্ত্রণাদায়ক অসুস্থতায় ভুগেছিলেন। তিনি শিল্পী জীবনে প্রচুর পরিমাণে ছাপাই শিল্পকর্ম করেছিলেন, ছাপচিত্রের অন্যতম মাধ্যম এ্যাকুয়াটিন্ট তথা জিক্স প্লেট এটিং - নাইট্রিক অ্যাসিডের (HNO_3) এবং রোসিন গুড়ার ব্যাপক ব্যবহার করেছেন। চিকিৎসকগণ তাঁর অসুস্থতাকে মারাত্মক সীসার বিষক্রিয়ার জন্য দায়ি করেছেন। ফ্রান্সিসকো গোইয়্যা বিষণ্ণতা, প্যারানয়েড চিন্তাভাবনা, প্রতিবন্ধী শ্রবণশক্তি, দৃষ্টিশক্তি, কোমা, ব্যক্তিত্বের লক্ষণগুলিতে পরিবর্তন জটিলতায় ভুগেছেন (Bill Fick and Beth Grabowski, 2015, 124-129)।

বিভিন্ন ধরনের প্রিন্ট তৈরির উপকরণ যেমন প্রিন্টিং ইঙ্ক এবং বায়ুবাহিত রাসায়নিক দ্রব্যের মিথস্ক্রিয়ার ফলে বা ব্যাপক ব্যবহারে আজকাল অনেক সমসাময়িক শিল্পী স্বাস্থ্যগত জটিলতার বিভিন্ন মাত্রায় ভুগছেন। প্রিন্ট স্টুডিওতে বা বাণিজ্যিক মুদ্রণশিল্পে বিষাক্ত পদার্থের ব্যবহারে পরিবেশের ওপর আরও মারাত্মক নেতিবাচক প্রভাব ফেলে। বায়ুবাহিত রাসায়নিক মিথস্ক্রিয়ার ফলে বাণিজ্যিক বা শিল্পশিক্ষা প্রতিষ্ঠানের স্টুডিও থেকে নির্গত বিষ এবং বিষাক্ত পদার্থ সাধারণত কোনো পরিশ্রবণ ছাড়াই নিঃশেষ হয় পার্শ্ববর্তী পরিবেশে। অন্যান্য তরল এবং কঠিন বর্জ্য যদি উপযুক্ত পরিবেশে নিঃশেষিত করা না হয় বা পুনর্ব্যবহার সঠিকভাবে নিশ্চিত করা না হয় তা মহামারী আকারে পরিবেশগত বিপর্যয় সৃষ্টি করে এবং আমাদেরকে মারাত্মকভাবে প্রভাবিত কওে (Louise Woods, 2008, 49)।

প্রথাগত প্রাচীন ছাপাইশিল্প শিক্ষা কার্যক্রমে স্টুডিওসমূহে ধোঁয়া বায়ুবাহিত বাষ্প এবং বিষাক্ত ধোঁয়া পরিশ্রাবন সুরক্ষার জন্য পর্যবেক্ষণ, অবাধ বায়ু চলাচল, বাষ্প নিষ্কাশন ব্যবস্থা (ফিউম-এক্সস্ট সিস্টেমস) ইত্যাদির কোনো পূর্বপ্রস্তুতি, দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা এখনও আমাদের দেশে গ্রহণ করা হয়নি। পরিবেশ সংরক্ষণের জন্য পুনর্ব্যবহারযোগ্য এবং নিরপেক্ষকরণ (Neutralizing systems) প্রক্রিয়া সম্পর্কে এখনও সচেতনতা বা প্রয়োজনবোধ মনে করা হয় না। এই অত্যন্ত অনিয়ন্ত্রিত অবস্থার অধীনে ঐতিহ্যগত বিষাক্ত ছাপাইশিল্প কৌশলগুলিতে শিল্পী, শিক্ষক, শিক্ষার্থীরা প্রতিষ্ঠানের নিয়ন্ত্রিত সীমা অতিক্রম করে শিল্পচর্চা করার

প্রিন্টমেকিং: ছাপাইশিল্প শিক্ষা কার্যক্রমে অ-বিষাক্ত ছাপাইশিল্পের সমসাময়িক করণকৌশলের চর্চা ও আবশ্যিকতা

উদ্যোগ গ্রহণ করতে পারে না। ফলে প্রিন্টমেকিং প্রোগ্রামে মেধা সম্পন্ন শিক্ষার্থীদের আগ্রহ তেমন অগ্রাধিকার পায় না। এই অবস্থায় ব্যাপক ব্যবহারের জন্য উন্নত বিশ্বে বিশেষত ইউরোপ, যুক্তরাজ্য, যুক্তরাষ্ট্রসহ অনেক দেশে অতিসাম্প্রতিক ঐতিহ্যগত বিষাক্ত ছাপাইশিল্প পরিহার করাসহ সমসাময়িক কৌশলগুলিতে প্রযুক্তিগত, উপাদান-উপকরণ ব্যবহার, সংরক্ষণ ইত্যাদি বিষয়ে দ্রুত পরিবর্তন সাধন করছে।

বর্তমানে উন্নত বিশ্বে শিল্পী, শিক্ষক, গবেষকগণ কঠোর স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা এবং পরিবেশগত দূষণমুক্তির জন্য পুরোনো ঐতিহ্যগত বিষাক্ত ছাপাইশিল্পের কৌশলগুলি প্রতিস্থাপন করার আইনগত ব্যবস্থার দ্বারস্থ হয়ে সমসাময়িক অ-বিষাক্ত ছাপাইশিল্প পদ্ধতির সাথে খাপ খাইয়ে নিতে শুরু করেছে। একইসাথে বিষাক্ত ছাপাইশিল্পের কৌশলগুলি চারুকলা শিক্ষা বা প্রোগ্রামগুলি থেকে নির্মূল করার কঠোর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করছে। অনুন্নত, স্বল্পনোত বা উন্নয়নশীল দেশসমূহে ক্রমবর্ধমান পরিবেশ নিরাপত্তা, স্বাস্থ্য সতর্কতা, পুরোনো ঐতিহ্যগত বিষাক্ত ছাপাইশিল্পের ক্ষতিকারক দিক সম্পর্কে খুবই অল্প জ্ঞান বা একেবারে অজ্ঞতায় শিল্পী, শিক্ষক, শিল্পশিক্ষার্থীগণ সন্দেহাতীতভাবে তাদের স্বাস্থ্য এবং পরিবেশকে বিপন্ন করে চলেছে। অনুপযুক্তভাবে সজ্জিত শিল্পশিক্ষার স্টুডিওসমূহে বিপজ্জনক রাসায়নিক দ্রব্য, দ্রাবক, তেলজাতীয় দার্যপদার্থ অনিয়ন্ত্রিত ব্যবহারের মাধ্যমে অগণিত স্বাস্থ্যের হানীকারক পরিণতি ভোগ করছে। দীর্ঘমেয়াদে শ্বাস-প্রশ্বাস জনিত জটিল রোগ, হৃদরোগ এমনকি ক্যান্সারযুক্ত পদার্থের দ্বারা সরাসরি আক্রান্ত হচ্ছে। এখন প্রশ্ন হচ্ছে প্রিন্টমেকিং শিল্পী, শিক্ষক, শিক্ষার্থীদের শিল্পশিক্ষায় নিয়োজিত থেকে কী তাদের স্বাস্থ্যঝুঁকি বা জীবন বিসর্জন দিবেন? এই প্রশ্নের সহজ উত্তর হবে ‘না’ প্রিন্টমেকিং শিল্পী, শিক্ষক, শিক্ষার্থীরা শিল্পশিক্ষায় অত্যন্ত কঠোরভাবে যা শিখতে হবে তা হলো; অ-বিষাক্ত ছাপাইশিল্পের নিরাপদ পদ্ধতিসমূহ। এই ঝুঁকিমুক্ত পদ্ধতির দিকে আগ্রহ বৃদ্ধি করা, গবেষণায় উদ্বুদ্ধ করা। কারণ উপরোক্ত আলোচনা থেকে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায়, অ-বিষাক্ত ছাপাইশিল্প পদ্ধতি পরিবেশবান্ধব, স্বাস্থ্য সুরক্ষা ও ঝুঁকিমুক্ত। এছাড়াও অনুন্নত, স্বল্পনোত বা উন্নয়নশীল দেশসমূহে ক্রমবর্ধমান দ্রব্যমূল্যের উর্ধ্বগতিতে স্বল্পমূল্যে শিল্পশিক্ষায় চমৎকার বিকল্প হিসেবে অ-বিষাক্ত ছাপাইশিল্প পদ্ধতিসমূহ প্রতিনিধিত্ব করবে। ছাপাইশিল্প শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসহ বাণিজ্যিক মুদ্রণ তৈরির ক্ষেত্রে পরিবর্তনের প্রয়োজনীয়তা বাধ্যতামূলক: প্রচলিত অর্থে এইসব প্রতিষ্ঠানে বৈজ্ঞানিক গবেষণাগারে ঐতিহ্যগতভাবে ব্যবহৃত এমন সব অনেক দ্রাবক, অ্যাসিড এবং অন্যান্য রাসায়নিক উপাদানের বিষাক্ততা নিশ্চিত করে। অনভিজ্ঞতা, অবহেলা ও সৃজনশীল সৃষ্টিকল্পে অনেক প্রচলিত অভ্যাস স্বাস্থ্যের ক্ষতি, পরিবেশের মারাত্মক বিপর্যয় অগোচরে থেকে যায়। ঐতিহ্যবাহী ছাপাইশিল্পের প্রধানতম মাধ্যমসমূহ যেমন-এটিং, অ্যাকুয়াটিন্ট, লিথোগ্রাফ (স্টোন লিথোগ্রাফ), স্ক্রীনপ্রিন্টিংয়ের দীর্ঘমেয়াদী অনুশীলনকারীদের গুরুতর শারীরিক অসুস্থতা, পক্ষাঘাতগ্রস্ততা এবং অকাল মৃত্যুও হতে পারে। নিরাপদ পরিবেশবান্ধব ছাপাইশিল্প তৈরির সর্বোচ্চ পন্থা অ-বিষাক্ত ছাপাইশিল্প পদ্ধতির অবলম্বনে আমরা আমাদের নিজেদের স্বাস্থ্য, অন্যান্য অনুশীলনকারীদের এবং পরিবেশের সুস্বাস্থ্য নিশ্চিত করতে পারবো। ছাপাইশিল্প শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিল্পী, শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা পদ্ধতি কেমন হওয়া উচিত সে সম্পর্কে পরামর্শ নিম্নরূপ; যেমন-

ক. প্রাচীন ঐতিহ্যগত বিষাক্ত (Toxic) ছাপাইশিল্পে ব্যবহৃত রাসায়নিক সংমিশ্রণে কঠোর নাইট্রিক অ্যাসিডের পরিবর্তে স্যালাইন সালফেট এবং ফেরিক ক্লোরাইড লবণ ব্যবহার করা নিরাপদ;

- খ. বিআইজি (B.I.G) গ্রাউন্ড, সাইট্রাস-ভিত্তিক এবং গন্ধহীন ক্লিনার ব্যবহার করে সীসা, আলকাতরা এবং ভারী রাসায়নিক দ্রাবকগুলির ব্যবহার কমাতে ল্যাকার থিনার, অ্যাসিটোন বা মিনারেল স্পিরিটের বিপরীতে গ্যামাসোল, আইসো-প্রোপাইল এলকোহল (আই পি এ) এবং সিম্পল গ্রিন ব্যবহার করা যেতে পারে;
- গ. সল্ট-বাইট এচিং (কপার সালফেট ও সোডিয়াম ক্লোরাইড) ও ইন্টাগলিও প্রিন্টমেকিংয়ের জন্য ফটো-সেন্সিটিভ বা আলোক-সংবেদনশীল বা ফটো পলিমার প্লেট ব্যবহার করা, শিল্পশিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও বাণিজ্যিক মুদ্রণশিল্পে ব্যবহৃত বাতিল বা খারাপ প্রিন্টের সমস্ত কাগজ পুনর্ব্যবহার করা; কাগজ তৈরিতে, মুদ্রণ কাজে বাতিল বা খারাপ কাগজ পুনরায় ব্যবহার নিশ্চিত করা;
- ঘ. স্টোন লিথোগ্রাফির মূল মেট্রিক্স, স্টোনের (Litho Stone) পরিবর্তে ‘ওয়াটারলেস লিথোগ্রাফি’তে ছাপাইশিল্প তৈরিতে বাণিজ্যিকভাবে মুদ্রণশিল্পে বহুল ব্যবহৃত অফসেট প্লেট (এ্যালুমিনিয়াম) ব্যবহার করা হয়। এই ওয়াটারলেস লিথোগ্রাফি প্রিন্ট প্রসেসে অ-বিষাক্ত ছাপাইশিল্পের পদ্ধতিতে ছাপাইশিল্প তৈরি অনেকাংশে সহজ, স্বল্পব্যয়, সহজলভ্য। অন্যদিকে স্টোন লিথোগ্রাফির মূল উপকরণ লিথোস্টোন (Litho Stone) সহজলভ্য নয় বা লিথোস্টোন প্রিন্টিংয়ের বাণিজ্যিক মুদ্রণ প্রসেসটি প্রতিস্থাপিত হয়েছে অত্যাধুনিক অফসেট প্রিন্টিং প্রসেস দ্বারা। লিথোস্টোন আমদানীকারক প্রতিষ্ঠানসমূহ লিথোস্টোন আমদানি স্থগিত করেছে। ফলে বিভিন্ন দেশের চারুকলা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে লিথোস্টোন এবং লিথো প্রিন্টিং প্রেস সংগ্রহ করা দুঃসাধ্য ব্যাপার হয়ে উঠেছে। স্টোন লিথোগ্রাফিতে স্টোন প্রিপারেশন, স্থানান্তর করা, এচিং প্রসেসে ব্যবহৃত বিষাক্ত রাসায়নিক দ্রব্যের ক্ষতিকারক দিক বিবেচনায় অনেক উন্নতদেশে স্টোন লিথোগ্রাফি পরিহার করে নতুন ফটো-সেন্সিটিভ বা আলোক-সংবেদনশীল অফসেট লিথো প্লেটে ‘লেজার টোনার’ বা ‘জেরক্স টোনার’ ড্রইংয়ের আকর্ষণীয় সল্পব্যয়ী বিকল্প ‘ওয়াটারলেস লিথোগ্রাফি’ প্রিন্টিং পদ্ধতির ব্যাপক ব্যবহার নিশ্চিত করেছে। অ-বিষাক্ত ছাপাইশিল্প তৈরীর ক্ষেত্রে এই সবুজ বিপ্লব একই সাথে শিল্পের অন্যান্য শাখায় প্রসারিত হয়েছে পলিয়েস্টার লিথোগ্রাফি প্লেট এবং ওয়াটারলেস লিথোগ্রাফি (পি এস -অফসেট লিথোগ্রাফি প্লেট) সম্প্রতি অনেক শিল্পীর প্রথম পছন্দ। বিবেচনা করা হয়ে থাকে ঐতিহ্যবাহী স্টোন লিথোগ্রাফির চমৎকার ও নিরাপদ বিকল্প হিসেবে;
- ঙ. ছাপাইশিল্প শিক্ষার সকল স্তরে বাধ্যতামূলক স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা সরঞ্জাম সরবরাহ নিশ্চিত করা, প্রতিষ্ঠানের পরামর্শ ও তালিকা অনুযায়ী স্বাস্থ্য সুরক্ষা সরঞ্জাম স্থানীয় বাজার থেকে সংগ্রহ করতে হবে যেমন: মাস্ক, নাইট্রিল গন্টলেট, নাইট্রিল গ্লাভস, এপ্রন, ল্যাবরেটরীতে ব্যবহারযোগ্য জুতা এবং পোষাক;
- চ. স্টুডিওতে যেখানে যে ধরনের প্রক্রিয়া চলাকালীন সময়ে রাসায়নিক দ্রব্য ব্যবহৃত হয় সে অনুযায়ী ফেসমাস্ক ব্যবহার বাধ্যতামূলক; বিশেষত: ধাতব প্লেট রাসায়নিক বিক্রিয়া বা বাইট করানোর সময়, স্প্রে বুথ, প্লেট - স্ক্রীন ওয়াশআউট বুথ, প্লেট প্রসেস এরিয়া ইত্যাদি;

প্রিন্টমেকিং: ছাপাইশিল্প শিক্ষা কার্যক্রমে অ-বিষাক্ত ছাপাইশিল্পের সমসাময়িক করণকৌশলের চর্চা ও আবশ্যিকতা

- ছ. স্টুডিওতে কর্মরত কর্মকর্তা, কর্মচারী, শিল্পী, শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের নিয়মিত রেসপিরেটর ফিটনেস টেস্ট করতে হবে; মাস্ক পরিধান যথাযথ হয়েছে কিনা একে অপরকে লক্ষ্য করতে হবে;
- জ. স্টুডিওতে কোনোভাবে খাদ্য গ্রহণ করা যাবে না;
- ঝ. স্টুডিওতে আসবাবপত্র, প্লেট পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার ক্ষেত্রে স্ফার ও উদ্বায়ী দ্রাবকের বিকল্প এস্টিসোল এস্টার, সাইট্রাসফট, আইসো-প্রোফাইল অ্যালকোহল (আইপিএ) ব্যবহার করা শ্রেয়। এছাড়া হোমমেড দ্রাবক যেমন- ভিনেগার, লিকুইড হ্যাণ্ড ওয়াশ, বেকিং পাউডার এবং পানি পরিমাণ মত একত্রে মিশিয়ে ক্লিনিং রিয়েজেন্ট তৈরি ও ব্যবহার অত্যন্ত নিরাপদ ও সাশ্রয়ী;
- ঞ. লিথোগ্রাফি ও এটিং স্টুডিওতে বাতাসের অবাধ চলাচল নিশ্চিত করতে হবে;
- ট. ফিউচার ফ্লোর ওয়াশ, বাল্ডউইন ইন্টাগলিও গ্রাউন্ডস (বিআইজি) এটিং পদ্ধতির প্রবর্তন করা; কারণ অ্যাসফাল্টাম একটি পরিচিত কার্সিনোজেন ফলে এটিং, লিথোগ্রাফি স্টুডিও থেকে এটি নির্মূল করা উচিত;
- ঠ. ছাপাইশিল্পে ছাপার কাজে ব্যবহৃত তেলরঙ বা প্রিন্টিং ইঙ্ক প্রচুর পরিমাণে সীসা ব্যবহার করা হয়, এর বিকল্প হিসেবে আজকাল ইন্টাগলিও, রিলিফ প্রিন্টিং, মনোটাইপ প্রিন্টিংয়ের ক্ষেত্রে সয়া ভিত্তিক ইঙ্ক বা ওয়াটার সলিউবল প্রিন্টিং ইঙ্ক (আকুয়া ইঙ্ক), রাবার বেস (আকুয়া ইঙ্ক) বহুলাংশে ব্যবহার উন্নত দেশসমূহে কার্যকর করা হচ্ছে; এ ধরনের ইঙ্ক ব্যবহারে দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।
- ড. অ্যাকুয়াটিন্ট ছাপাইশিল্প তৈরিতে ফিউচার ফ্লোর ওয়াশ, ইন্ডিয়া ইঙ্ক এয়ারব্রাশ অ্যাসফাল্টামকে ইন্টাগলিও গ্রাউন্ডস স্টপ আউট দ্রাবক হিসেবে প্রতিস্থাপন করা যেতে পারে;
- ঢ. ছাপাইশিল্প শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অবশ্যই অগ্নিনির্বাপক যন্ত্র (Fire extingisher) রাখতে হবে এবং স্টুডিওতে কর্মরত কর্মকর্তা, কর্মচারী, শিল্পী, শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদেরকে এটি ব্যবহারের প্রশিক্ষণ দিতে হবে;
- ণ. ছাপাইশিল্প শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অবশ্যই প্রাথমিক চিকিৎসা সরঞ্জাম (First Aid Box) মজুদ রাখতে হবে;
- ত. ছাপাইশিল্প শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অনুশীলন কক্ষ বা স্টুডিওসমূহ অবশ্যই নিয়মিত পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখতে হবে; স্টুডিওতে কর্মরত কর্মকর্তা, কর্মচারী, শিল্পী, শিক্ষক ও শিক্ষার্থীরা প্রয়োজনে প্রতি দুইমাস অন্তর একটি নির্দিষ্ট দিন নির্ধারণ করে পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার বিষয়টি নিশ্চিত করে ‘পরিচ্ছন্নতা বিদস’ পালন করতে পারে Louise Woods, 2008, 78।

পুনঃব্যবহারযোগ্য (Recycling systems) এবং নিরপেক্ষকরণ (Neutralizing systems):

নিঃশেষিত এটিং সমাধানগুলি নিরপেক্ষকরণ (Neutralizing systems) করার সবচেয়ে নিরাপদ উপায় হলো সেগুলিকে একটি রাসায়নিক নিরপেক্ষকরণ সংস্থাতে নিয়ে যাওয়া। ফেরিক ক্লোরাইড বা এডিনবার্গ এচকে খুব সহজে সোডা স্ফটিক যোগ করে নিষ্ক্রিয় করা যায়। নিরপেক্ষ দ্রবণটি খুব বেশি মিশ্রিত হলে স্থানীয় কর্তৃপক্ষ ড্রেনের নিচে নিষ্ক্রিয় করার অনুমতি দিতে পারে। এছাড়াও শক্তিশালী সোডিয়াম কার্বনেট দ্রবণ যোগ করলে স্থির হয়ে যাবে (পানিতে ১ঃ১ সোডা স্ফটিক)। তেলভিত্তিক প্রিন্টমেকিংয়ের দৈনিক কার্য সম্পন্ন করে প্লেট এবং ইঙ্কিংয়ের স্ল্যাব বা টেবিল পরিষ্কার করার জন্য প্রথাগত টারপেন্টাইন এবং হোয়াইট স্পিরিট

প্রায়শই প্রিন্টমেকিং স্টুডিওতে ব্যবহার করা হয়ে থাকে। এক্ষেত্রে বিকল্প হিসেবে আইসো-প্রোফাইল এ্যালকোহল (IPA), গ্যামসোল (Gamsol), পিওর সোল (Pure-sol) ডিসওয়াশ লিকুইড সোপ ইত্যাদি কম গন্ধহীন সলভেন্ট ব্যবহার করা যেতে পারে। ইঙ্কিং রোলার ধোয়ার জন্য দুই লিটার পানিতে ২০০ এমএল হোয়াইট ভিনেগার, ১০০ এমএল ডিসওয়াশ লিকুইড সোপ ভালভাবে মিশিয়ে একটি দ্রবণ তৈরি করা যায়। এই দ্রবণে বারবার রোলার পরিষ্কার করলে ইঙ্কিং রোলার দীর্ঘদিন সংরক্ষণ ও ভালভাবে ব্যবহার করা যায়।

উপসংহার:

ছাপাইশিল্প শিক্ষার প্রাতিষ্ঠানিক দৃষ্টিকোণ থেকে প্রবন্ধকার বিশ্বাস করেন যে, অ-বিষাক্ত ছাপাইশিল্প পদ্ধতির পরিবর্তন কম সুবিধাপ্রাপ্ত ছাপাইশিল্পের করণকৌশল শিল্পী, শিক্ষক, শিক্ষার্থীদের জন্য বিশেষভাবে অপরিহার্য হবে? না শুধুমাত্র একটি নিরাপদ শিল্পমাধ্যম হিসেবে ছাপাইশিল্প অনুশীলনের দিকে ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি হবে? না নিছক একটি দক্ষ সাশ্রয়ী মূল্যের বিকল্প ছাপাইশিল্পের করণকৌশল হিসেবে চর্চা করা হবে? এতসব প্রশ্নের উত্তরে বলা চলে; মৌলিক ঐতিহ্যবাহী মুদ্রণ উপকরণ যেমন ইন্টাগলিও প্রিন্টমেকিংয়ের জন্য ব্যবহৃত জিঙ্ক প্লেট, কপার প্লেট ইত্যাদির বর্তমান বিশ্বের বাজার মূল্যের উর্ধ্বগতি এবং সরবরাহের ধীরগতির কারণে শিল্পী, শিক্ষক, শিক্ষার্থীরা বাধ্য হচ্ছেন অপেক্ষাকৃত ছোট আকারে ছাপাইশিল্প তৈরিতে। এক্ষেত্রে আশার বাণী হচ্ছে এ্যালুমিনিয়াম প্লেট অপেক্ষাকৃত স্বল্পমূল্য ও সহজলভ্য ফলে ছাপাইশিল্প তৈরীতে শিল্পীদের পছন্দ ও আগ্রহ বৃদ্ধি পেয়েছে। ভয়াবহ অবস্থা হচ্ছে স্টোন লিথোগ্রাফি ছাপাইশিল্পের ক্ষেত্রে; লিথো স্টোন আমদানীর অনুপলব্ধতার কারণে বাংলাদেশের প্রিন্টমেকিং প্রোগ্রামে ইতোমধ্যে অনেক পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলায় ছাপাইশিল্প শিক্ষা কার্যক্রমে স্টোন লিথোগ্রাফি পদ্ধতিতে ছাপাইশিল্প অনুশীলন সম্ভব হয়ে ওঠেনি। এই ক্ষেত্রে অ-বিষাক্ত ছাপাইশিল্প পদ্ধতির ওয়াটারলেস লিথোগ্রাফি (Non-Toxic printmaking: Waterless Lithography) একটি আদর্শ, সহজলভ্য, স্বল্পব্যয়ী ছাপাইশিল্পের করণকৌশল যা শিল্পী, শিক্ষক, শিক্ষার্থীদের জন্য আশীর্বাদ স্বরূপ বিষয় হবে। বৈশ্বিক উষ্ণতা বৃদ্ধি, পরিবেশ বিপর্যয়ের ব্যাপকতা থেকে অনুরত, স্বল্পনোত ও উন্নয়নশীল দেশ সমূহের চারুকলা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সমসাময়িক সময়ে প্রিন্টমেকিং প্রোগ্রামের শিল্পী, শিক্ষক, শিক্ষার্থীদের শারীরিক সুস্বাস্থ্য ও পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষার জন্য দায়িত্বশীল ভূমিকা প্রদর্শন এবং অ-বিষাক্ত ছাপাইশিল্প পদ্ধতির প্রশ্নাতীত ও ব্যাপক ব্যবহার নিশ্চিত করে কোর্স- কারিকুলাম সাজাতে হবে। এই উদ্দেশ্যকে মূল উপজীব্য করে এই প্রবন্ধে প্রত্যক্ষভাবে অ-বিষাক্ত ছাপাইশিল্প পদ্ধতি কি? এবং কেন? অ-বিষাক্ত ছাপাইশিল্প পদ্ধতিতে ছাপাইশিল্পের স্বপক্ষে যৌক্তিকতা প্রদর্শনপূর্বক বিকল্প ও নিরাপদ এই কৌশল অনুসরণ করার জন্য বিশেষভাবে যথোপযুক্ত চারুশিল্প শিক্ষা প্রতিষ্ঠান চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলা ইনস্টিটিউটের প্রিন্টমেকিং শাখার শিক্ষা - কার্যক্রম উৎকৃষ্ট

প্রিন্টমেকিং: ছাপাইশিল্প শিক্ষা কার্যক্রমে অ-বিষাক্ত ছাপাইশিল্পের সমসাময়িক করণকৌশলের চর্চা ও আবশ্যিকতা

উদাহরণ হতে পারে। কারণ ইতোমধ্যে দেশের পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের চারুকলা শিক্ষাকার্যক্রমে অ-বিষাক্ত ছাপাইশিল্প পদ্ধতির নতুন সমসাময়িক ধারার চর্চা বা পদ্ধতি শিক্ষার পীঠস্থান হিসেবে নতুন এই পদ্ধতির প্রতি আকর্ষণ এবং শিল্পী, শিক্ষক, শিক্ষার্থীদেরকে আকৃষ্ট করার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। আশাকরি বিষাক্ত ছাপাইশিল্প বা Toxic Printmaking পদ্ধতির করণকৌশল পরিহার করে চারুকলা শিক্ষাকার্যক্রমে অ-বিষাক্ত ছাপাইশিল্প বা Non-Toxic Printmaking পদ্ধতির চর্চা ও প্রতিস্থাপনের মাধ্যমে শারীরিক সুস্বাস্থ্য ও পরিবেশ দূষণের মাত্রায় ভারসাম্য রক্ষা, সর্বোপরি নতুন পদ্ধতি অনুশীলনের মাধ্যমে প্রাচীন ঐতিহ্যবাহী বিষাক্ত প্রিন্টমেকিং পদ্ধতিগুলি পরিহার বা পরিবর্তন করে নতুন অ-বিষাক্ত ছাপাইশিল্প পদ্ধতিগুলির জন্য বিশেষ দৃষ্টি হয়ে উঠবে। শিল্পী, শিক্ষক, শিক্ষার্থীদেরকে ছাপাইশিল্পের অপার সম্ভাবনার একটি বিস্তৃত বিন্যাস আহ্বান করে; যা সমসাময়িক প্রযুক্তির সুবিধাগুলিকে অন্বেষণ করে অ-বিষাক্ত ছাপাইশিল্প পদ্ধতিগুলির সাথে পরম সংযোগ স্থাপন করবে। এই যুক্তির স্বপক্ষে সম্পূর্ণ একমত পোষণ করা সমীচীন হবে যে, অ-বিষাক্ত ছাপাইশিল্পের বিভিন্ন পদ্ধতির উল্লেখ্যকৃত নতুন ও সংস্থাপিত নিরাপদ মাধ্যম হিসেবে এর ব্যাপকতা গৃহীত হয়েছে কম ক্ষতিকারক, পরিবেশগত প্রভাবসহ নিরাপদ অনুশীলন, সহজ ও বামেলানুমিত ছাপাইশিল্প কৌশল হিসেবে। ছাপাইশিল্পের বর্তমান শিল্পচর্চায় অ-বিষাক্ত ছাপাইশিল্পের বিভিন্ন পদ্ধতির করণকৌশলের প্রতিটি ধাপে যতটা সম্ভব নিরাপদ থাকা এবং অপ্রয়োজনীয় টক্সিন, ক্ষতিকারক রাসায়নিক পদার্থের সংস্পর্শ এড়ানো হবে বুদ্ধিমানের কাজ। সর্বোপরি শিল্পী, শিক্ষক, শিক্ষার্থীদেরকে ছাপাইশিল্পের সমসাময়িক নিরাপদ, পরিবেশবান্ধব ও ব্যয় সংকোচন করে ছাপাইশিল্পের বর্তমান প্রবাহ অনুসরণ ও নিয়মিতভাবে নিয়োজিত থেকে ছাপাইশিল্পের উৎকর্ষে পৌঁছাতে হবে। ছাপাইশিল্পের নতুন পদক্ষেপগুলির যথাযথ চর্চায় তরুণ শিক্ষার্থীদের জন্য অ-বিষাক্ত ছাপাইশিল্পের (Non-Toxic printmaking) উপযুক্ত বিভিন্ন পদ্ধতির সম্ভাবনাগুলি অন্বেষণে আগ্রহ সৃষ্টি করাই হবে মূল উদ্দেশ্য। ছাপচিত্র শিক্ষা কার্যক্রমের সাম্প্রতিক লক্ষ্য হওয়া উচিত অ-বিষাক্ত ছাপাইশিল্পের ব্যাপক প্রাতিষ্ঠানিক চর্চা বৃদ্ধি করা; প্রাচীন, প্রথাগত বিষাক্ত প্রিন্টমেকিংয়ে ব্যবহৃত রাসায়নিক উপাদান পরিহার করা। শিল্পী, শিক্ষক এবং শিক্ষার্থীদের জন্য শিল্পশিক্ষা প্রতিষ্ঠানে নিরাপদ, বিকল্প, প্রযুক্তিগতভাবে উন্নত ও সহজ, স্বল্পব্যয়ী, কিন্তু স্থায়ী গুণগতমান রক্ষায় আপোষহীন ধারা অব্যাহত রাখা।

তথ্যসূত্র

আব্দুস সাত্তার। শিল্পের উপকরণ ও ব্যবহার পদ্ধতি। ঢাকা: কনটেম্পোরারি কনসেপ্ট, ১৯৮৯।

হীরা সোবহান (ড.) ছাপাই ছবির করণকৌশল। ঢাকা: প্র. তোফাজ্জল হোসেন তপু, ১০৯ গ্রিন রোড, ২০১৭।

Paul Coldwell. *Printmaking: A Contemporary Perspective*. Black Dog Publishing, March 23, 2010.

The Chittagong University Journal of Arts and Humanities

Printsafe. *A Guide to Safe, Healthy & Green Printmaking*. Tim Challis. London: Estamp, 1990.

<https://research-groups.usask.ca/saferprintmaking>.

Bill Fick and Beth Grabowski. *Printmaking: A Complete Guide to Materials & Process*. (Printmaker's Bible, process shots, techniques, step-by-step illustrations) August 25, 2015.

Louise Woods. *The Printmaking Handbook: Simple Techniques and Step-by-Step Projects*, July 23, 2008, Publisher: Search Press

Louise Woods. *The Printmaking Handbook: Simple Techniques and Step-by-Step Projects*, July 23, 2008, Publisher: Search Press

কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে ব্যবসা-বাণিজ্যের বিধান

ড. মুহাম্মদ নূরুল আমিন নূরী*

প্রতিপাদ্যসার

পবিত্র কুরআন ও সুন্নাহর মধ্যে ব্যবসা-বাণিজ্যের আইনগত বিধান রয়েছে। ব্যবসা হলো, ক্রয়-বিক্রয়ের মাধ্যমে লাভ অন্বেষণ করা বা লাভের আশায় মূলধনের মধ্যে বিভিন্নভাবে রূপান্তর করা। আল্লাহ তা'আলা ব্যবসাকে হালাল করেছেন এবং সুদকে হারাম করেছেন। ব্যবসায়ীদেরকে ব্যবসার মধ্যে কিছু বিধি-নিষেধ মেনে চলতে হবে। যেমন, ব্যবসা যেন আল্লাহর আনুগত্য থেকে দূরে সরে না নেয়। ব্যবসার ক্ষেত্রে শার'ঈ বিধানসমূহ যেন পালন করা হয়। হারাম উপায়ে ব্যবসা করা বা হারাম পণ্যের ব্যবসা থেকে নিজেকে বিরত রাখা। বৈধ ব্যবসা-বাণিজ্য, হালাল উপার্জন ইত্যাদি শরী'আত সম্মত পদ্ধতি ব্যতীত সম্পদ উপার্জনকে ইসলাম হারাম আখ্যায়িত করেছেন। মূলত ব্যবসা-বাণিজ্যের পরিচয়, পবিত্র কুরআন ও সুন্নাহর ব্যবসার দিকনির্দেশনা, ব্যবসার লাভ ও লক্ষ্য-উদ্দেশ্য, ব্যবসায়ীর জন্য আবশ্যিক বিধান এবং সাধারণনীতি, ব্যবসার উপাদানসমূহ ইত্যাদি বিষয় নিয়ে পবিত্র কুরআন ও হাদীছ এবং ইসলামি ফিকহের আলোকে আলোচনা করা হয়েছে।

ভূমিকা

ব্যবসা-বাণিজ্য করা এবং রিয়ক অন্বেষণ করা ইসলামের বিধিবদ্ধ বিধান এবং বৈধ বিষয়াবলির অন্তর্ভুক্ত। সম্পদ হলো মানুষের আবশ্যিক বিষয়, যা ব্যতীত ইহকালীন জীবনের স্বার্থ সম্পাদিত হয় না। সম্পদ হলো মানব জীবনের মূলভিত্তি এবং তাদের জীবনধারণ ব্যবস্থাপত্র। ইবনু হাজার (র.) বলেন, আল্লাহ তা'আলা বান্দাদের স্বার্থসিদ্ধি ও উপকারার্থে সম্পদ সৃষ্টি করেছেন (ইবনু হাজার ১৩৭৯, ১০/৪০৮)। বৈধ ব্যবসা-বাণিজ্য, হালাল উপার্জন, মুদারাবা, মুশারাকা, ইজারা ইত্যাদি শরী'আত সম্মত পদ্ধতি ব্যতীত সম্পদ উপার্জন সম্ভব নয়। ব্যক্তি ও সমাজ উভয়ের জন্য সম্পদ ও ব্যবসা-বাণিজ্য অত্যন্ত জরুরী বিষয়। যদি ব্যক্তি পর্যায়ে সমস্যা সৃষ্টি হয় তাহলে সমাজ পর্যায়েও সমস্যা সৃষ্টি হবে। ব্যবসা-বাণিজ্যের আইনগত বিধান সম্পর্কে সকলের অবগত হওয়া জরুরী। অত্র প্রবন্ধে ব্যবসার পরিচয়, পবিত্র কুরআনে তিজারা'হ এর ব্যবহার, ইসলামী শরী'আতে ব্যবসার

*অধ্যাপক, ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়

দিকনির্দেশনা, ব্যবসার লক্ষ্য-উদ্দেশ্য, ব্যবসার লাভ, ব্যবসায়ীর জন্য অপরিহার্য বিধান এবং সাধারণনীতি ইত্যাদি বিষয় নিয়ে পবিত্র করআন ও সন্নাহ এবং ফিকহের আলোকে আলোচনা-পর্যালোচনা করা হয়েছে।

ব্যবসার পরিচয়

ব্যবসা শব্দের আরবী শব্দ হলো, ‘তিজারাহ্’। শব্দটি মাসদার তথা ক্রিয়া বিশেষ্য। যেমন বলা হয়, (تَجَرَّ) তাজারাহ্, (يَتَجَرَّ) ইয়াতজুরু, (تِجَارَةٌ) তিজারাতান, (تَجَرُّوا) তাজরান, বাবে নাসারা, অর্থ, ক্রয়-বিক্রয় করা, ব্যবসা-বাণিজ্য করা। (تَجَرَّ) ইত্তাজারাহ্, (يَتَجَرَّ) ইয়াত্তাজিরু, (تِجَارًا) ইত্তিজারান, বাবে ইফতি‘আল, অর্থ, ক্রয়-বিক্রয় করা। আর (تِجَارَةٌ) তিজারাহ্ একবচন, (تِجَارَاتٍ) তিজারাত বহুবচন, অর্থ, ব্যবসা, বাণিজ্য, কারবার, তিজারত, পণ্যদ্রব্য (ইবন মানযূর ১৪১৪, ৪/৮৯; মাজ্মা‘উল লুগাতিল ‘আরাবিয়াহ্ ১৯৯৬, ১/৮২; মুখতার ১৪২৯/২০০৮, ১/২৮৪)।

এর পারিভাষিক অর্থ বর্ণনায়, ইমাম রাগিব (র.) বলেন, التَّجَارَةُ: التَّصَرُّفُ فِي رَأْسِ الْمَالِ طَلِبًا لِلرِّبْحِ, “ব্যবসা হলো, লাভের আশায় মূলধনের মধ্যে বিভিন্নভাবে রূপান্তর করা” (রাগিব ১৪১২, ১৬৪)। জুরজানী (র.) বলেন, عبارة عن شراء شيء لبيع بالربح “তিজারাত হলো, লাভে বিক্রয় করার নিমিত্তে কোন জিনিস ক্রয় করা” (আল-জুরজানী, ১৪০৩, ৫৩)। মুফতি আমিমুল ইহসান (র.) বলেন, التجارة: عبارة عن شراء شيء لبيع بالربح أو “লাভে বিক্রি করার জন্য কোন বস্তু ক্রয় করা কিংবা লাভের উদ্দেশ্যে সম্পদের হাতবদল করা” (আল-মুজাদ্দি ১৪২৪/ ২০০৩, ৫২)। কেউ কেউ বলেন, الاسترباح بالبيع و الشراء “ব্যবসা হলো, “ক্রয়-বিক্রয়ের মাধ্যমে লাভ অন্বেষণ করা” (আল-হুবায়সী তাবি, ২০২)।

পবিত্র কুরআনে “তিজারাহ” শব্দের ব্যবহার

পবিত্র কুরআনে ‘তিজারাহ্’ শব্দটি নয় বার ব্যবহার হয়েছে। যথা, আল্লাহ্ তা‘আলা বলেন, **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكُنْ بِكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ... أَلَا إِنَّا نَحْنُ حَاضِرَةٌ لَّذِي تَدِيرُونَ فَاكْتُبُوا مَا تَدِيرُونَ عَلَى نَفْسِكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا**। “হে মু‘মিনগণ! তোমরা যখন একে অন্যের সহিত নির্ধারিত সময়ের জন্য ঋণের কারবার কর তখন উহা লিখিয়া রাখিও, তোমাদের মধ্যে কোন লেখক যেন ন্যায্যভাবে লিখিয়া দেয় ... কিন্তু তোমরা পরস্পর যে ব্যবসার নগদ আদান-প্রদান কর তাহা তোমরা না লিখিলে কোন দোষ নেই” (সূরাতুল বাকারাহ্, ২ : ২৮২)। উপর্যুক্ত আয়াত থেকে আমরা বুঝতে পারলাম যে, পবিত্র কুরআনে ব্যবসা-বাণিজ্যের কথা উল্লেখ রয়েছে। আল্লাহ্ তা‘আলা মানবজাতিকে হালাল ব্যবসার প্রতি উদ্বুদ্ধ করেছেন।

শরী'আতের দৃষ্টিতে ব্যবসা

আল্লাহ্ তা'আলা ব্যবসা হালাল হওয়ার মূলনীতি বর্ণনা করেছেন। তা হলো, ব্যবসা হতে হবে পরস্পর সন্তুষ্টির ভিত্তিতে। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ** “হে মু'মিনগণ! তোমরা একে অপরের সম্পত্তি অন্যায়ভাবে গ্রাস করিও না। কেবলমাত্র তোমাদের পরস্পরের সম্মতিক্রমে যে ব্যবসা করা হয় তা বৈধ” (সূরা তুন নিসা', ৪ : ২৯)। এই জন্যে ব্যবসার ক্ষেত্রে যে

সমস্ত অজ্ঞতা পরস্পর ঝগড়া-বিবাদের দিকে আহ্বান করবে ঐ ধরনের ব্যবসা হারাম। (ইবনু ‘আবিদীন ১৪১২/১৯৯২, ৪/৫৩০)।

হাদীছ শরীফেও রাসূলুল্লাহ ﷺ ব্যবসা-বাণিজ্য সম্পর্কে কিছু দিক-নির্দেশনা দিয়েছেন। তা নিম্নে আলোচনা করা হল। কায়স ইবন আবী গারায়াহ (রা.) বলেন, كُنَّا فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- نُسَمَّى "يا مَعْشَرَ التَّجَارِ، إِنَّ الْبَيْعَ يَحْضُرُهُ السَّمَابِرَةُ، فَمَرَّ بِنَا رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فَسَمَانَا بِاسْمِ هُوَ أَحْسَنُ مِنْهُ، فَقَالَ: "أَمَرْنَا رَاسُلُؤُلَّاہُ ﷺ-এর যুগে ব্যবসাকে সামাসিরাহ্ তথা দালালি বলতাম। একদা রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের পার্শ্ব দিয়ে গমনকালে আমাদেরকে এর চেয়ে উত্তম নামে অবিহিত করে বললেন, হে ব্যবসায়ী সমাজ! নিশ্চয় ব্যবসার মধ্যে শপথ ও অযথা মিথ্যা কথার মিশ্রণ ঘটে। সুতরাং তোমরা একে মিটিয়ে দিবে দান-সাদাকার মাধ্যমে" (ইবনু মাজাহ্ ১৪৩০/ ২০০৯, ৩/২১৪৫/২৭৬; আবু দাউদ ১৪৩০/ ২০০৯, ৫/৩৩২৬/২১৫)। রাসূলুল্লাহ ﷺ উম্মাতকে সঠিকভাবে ব্যবসা-বাণিজ্য করার প্রতি তাকিদ করেছেন। আর ব্যবসার মধ্যে ধোঁকা ও প্রতারণা করা থেকে বাঁচতে বলেছেন।

নবীগণের আমলী জীবন

নবীগণ প্রয়োজনের সময় নিজেদের জন্যে ব্যবসা-বাণিজ্য করেছেন।

মাদায়েন শহরে প্রেরিত শু'আয়ব (আ.)-এর সঙ্গে মূসা (আ.)-এর ঘটনা উল্লেখ করে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, ﴿قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ نَمُنَّكَ إِحْدَى أَبْنَائِنَا عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَانِي حَجَّاجَ﴾ “শু'আয়ব মূসাকে বললেন, আমি আমার এই কন্যাদ্বয়ের একজনকে তোমার সাথে বিবাহ দিতে চাই এই শর্তে যে, তুমি আট বছর আমার চাকরী করবে” (সূরা তুল বাকারাহ, ২৮ : ২৭)। মূসা (আ.) তাঁরই নিকট দশ বছর অবস্থান করলেন সততার সহিত হালাল রিয়ক উপার্জন করলেন।

দাউদ (আ.)-এর ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলা বলেন, **وَوَلَّأْنَا لَهُ الْحَدِيدَ أَنْ أَعْمَلَ سَابِغَاتٍ وَقَدِّرَ فِي السَّرْدِ** "আমি তাঁর জন্য লৌহকে নমনীয় করেছিলাম- যাতে তুমি পূর্ণ মাপের বর্ম তৈয়ার করতে এবং বুননে পরিমাণ রক্ষা করতে পার এবং তোমরা সৎকর্ম কর" (সূরা তু সাবা, ৩৪ : ১০-১১)। দাউদ (আ.) লৌহ বর্ম তৈরি করতেন। বর্তমান কামারের পেশা যা আমাদের সামনে রয়েছে তারই আবিষ্কারক তিনিই।

রাসূলুল্লাহ ﷺ প্রথম পর্যায়ে ব্যবসার উদ্দেশ্যে সিরিয়া গমন করেছিলেন (ইবন হিশাম ১৪১১, ১/৩১৯-৩২০)।

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "أَنَّ دَاوُدَ النَّبِيَّ عَلَيْهِ السَّلَامُ، كَانَ لَا يَأْكُلُ إِلَّا مِنْ عَمَلِ يَدِهِ." (আল-বুখারী আস-সহীহ, ২/১৯৬৭/৭৩০)। রাসূলুল্লাহ ﷺ নিজের হাতের উপার্জন থেকেই খেতেন" (আল-বুখারী আস-সহীহ, ২/১৯৬৭/৭৩০)। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "كَانَ زَكْرِيَّا يَأْكُلُ مِنْ عَمَلِ يَدَيْهِ." "নিশ্চয় যাকারিয়া (আ.) কাঠমিস্ত্রী ছিলেন" (আল-কুশায়রী তাবি, ৪/২৩৭৯/১৮৪৭)। ইবন আব্বাস (রা.) বলেন, "كَانَ آدَمُ عَلَيْهِ السَّلَامُ حَرَاثًا، وَنُوحٌ نَجَارًا، وَإِدْرِيسُ خِيَاطًا، وَ إِبْرَاهِيمُ وَلُوطُ زَارِعِينَ، وَصَالِحٌ تَاجِرًا، وَدَاوُدُ زَرَادًا، وَمُوسَى وَشُعَيْبٌ وَمُحَمَّدٌ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ رِعَاةً." (আ.) ছিলেন কৃষক, নূহ (আ.) ছিলেন কাঠমিস্ত্রী, ইদরীস (আ.) ছিলেন দর্জি, ইবরাহীম (আ.) এবং লূত (আ.)

ছিলেন চাষী, সালিহ (আ.) ছিলেন ব্যবসায়ী, দাউদ (আ.) ছিলেন বর্ম নির্মাতা, মূসা (আ.) ও শু'আয়ব (আ.) এবং মুহাম্মদ ছিলেন রাখাল” (ইবনু হাজার ১৩৭৯, ৪/৩০৬; আল-হাকিম ১৪১১/ ১৯৯০, ২/৪১৬৫/৬৫২)।

পূর্ববর্তী মনীষীদের জীবন পরিক্রমা

পূর্বকার মনীষীগণ বিশ্বাস করতেন যে, অকর্মণ্য হয়ে বসে থাকার চেয়ে রিয্ক অন্বেষণ করা এবং সম্পদ উপার্জন করা সর্বোত্তম ‘ইবাদত। আনস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আব্দুর রহমান ইবন আওফ (রা.) মদীনায়ে আগমন করলে নবী করীম ﷺ তাঁর ও সা‘দ ইবন রাবী‘ আনসারীর মাঝে ভ্রাতৃত্ব বন্ধন করে দেন। সা‘দ (রা.) ধনী ব্যক্তি ছিলেন। তিনি আব্দুর রাহমান (রা.)-কে বললেন, قَالَ: بَارَكَ أَفَاسُكَ مَا لِي نَصْفَيْنِ وَأَرْوَجُكَ، قَالَ: بَارَكَ

“আমি তোমার উদ্দেশ্যে আমার সম্পত্তি অর্ধেক অর্ধেক ভাগ করে দিতে চাই এবং তোমাকে বিবাহ করিয়ে দিতে চাই। তিনি বলেন, আল্লাহ তা‘আলা তোমার পরিবার ও সম্পদে বরকত দান করুন। আমাকে বাজার দিখেয়ে দাও। তিনি বাজার হতে মুনাফা করে নিয়ে আসলেন পনীর ও ঘি” (আল-বুখারী আস-সহীহ, ২/১৯৪৪/৭২২)। ইমাম বুখারী (র.) হাদীছটি ক্রয়-বিক্রয় অধ্যায়ে উল্লেখ করেছেন। এর উদ্দেশ্য হলো, এ বিষয়ে প্রমাণ করা যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর যুগে সাহাবায়ে কিরামদের কেউ কেউ ব্যবসা-বাণিজ্য করতেন (ইবনু হাজার ১৩৭৯, ৪/২৯০)।

আবুল মিনহাল (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, “আমি বার’ ইবন আযিব ও যায়দ ইবন আকরাম (রা.)-কে সোনা-রূপার ব্যবসা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে তাঁরা উভয়ে বললেন, আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর যুগে ব্যবসায়ী ছিলাম। আমরা তাঁকে সোনা-রূপার ব্যবসা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বললেন, যদি হাতে হাতে (নগদ) হয়, তবে কোন দোষ নেই, আর যদি বাকী হয় তবে বৈধ নয়” (আল-বুখারী আস-সহীহ, ২/১৯৫৫/৭২৬)।

উপরিউক্ত আলোচনা থেকে এ বিষয়টি সুস্পষ্ট হয়েছে যে, আখিয়ায়ে কিরাম (আ.) ও সাহাবায়ে কিরাম এবং সালফে সালিহীন আল্লাহ তা‘আলার দরবারে তাদের উচ্চ মর্যাদা এবং আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার অতি আগ্রহ হওয়া সত্ত্বেও তারা মানুষের নিকট হাত পাতানো থেকে বাঁচার জন্যে ব্যবসা-বাণিজ্য করতেন এবং জনগণকে ব্যবসার প্রতি উৎসাহ যোগাতেন।

ব্যবসার লক্ষ-উদ্দেশ্য

ব্যবসার উদ্দেশ্য হলো, সম্পদ উপার্জন করা। সম্পদের ধর্মীয় ও দুনিয়াবী লাভ রয়েছে। দুনিয়াবী লাভ তো সকলেরই জানা রয়েছে। যার কারণে সম্পদ অর্জনের পিছনে মানুষ নিজেকে ধ্বংসে নিমজ্জিত করে বসে। তবে ধর্মীয় লাভ তিনটি বিষয়ের মধ্যে সীমিত।

এক. নিজের উপর খরচ করবে। হয়ত ‘ইবাদতের উদ্দেশ্যে যেমন হজ্জ-উমরা পালন করা, সাদাকা করা এবং মুসলমানদের সাহায্য করা। অথবা ‘ইবাদতের সহযোগী বিষয়াবলিতে খরচ করবে। যেমন খাদ্য, পোষাক, বাসস্থান ইত্যাদি জীবন নির্বাহ করার জন্য আবশ্যকীয় উপাদান।

দুই. যা অন্য মানুষের জন্য খরচ করা হয়। যেমন, সাদাকা করা যার লাভ সম্পর্কে সবাই অবগত আছে। নিজের ব্যক্তিত্ব বজায় রাখার কাজে ব্যয় করা। যেমন, বন্ধু-বান্ধবদের মেহমানদারী করা। নিজের সম্মান রক্ষা করার জন্য ব্যয় করা। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, “وَمَا وَفَى الرَّجُلُ بِهِ عِرْضَهُ كُتِبَ لَهُ بِهِ صَدَقَةٌ.” “যে সম্পদ ব্যয় করার মাধ্যমে ব্যক্তি নিজের সম্মান রক্ষা করতে পারে, তার জন্য সাদাকা স্বরূপ লিখা হবে” (আল-বায়হাকী আল-আদাব, ১৪০৮, ১/১২৭/৫২)।

তিন. যা ব্যয় করা হয় কল্যাণমূলককাজে। যেমন মসজিদ-মাদ্রাসা নির্মাণ করা, সামাজিক ও ভাল কাজে সহায়তা প্রদানকারী বিভিন্ন সংস্থার সহযোগিতা করা (ইবন কুদামাহ্ ১৩৯৮/ ১৯৭৮, ১৯৬-১৯৭)।

ব্যবসার লাভ

ব্যবসার অসংখ্য লাভ রয়েছে। দুনিয়াবী লাভ রয়েছে এবং পরকালীন লাভ রয়েছে। একটি রাষ্ট্রের সুখম অর্থনৈতিক ব্যবস্থা সেই দেশের ভাল ব্যবসায়ীদের উপর অনেকটা নির্ভরশীল। নিম্নে প্রসিদ্ধ লাভগুলো উল্লেখ করা হলো।

এক. ব্যবসার মাধ্যমে মানুষ থেকে মুখাপেক্ষিতাহীন জীবন উপহার পাওয়া যায়। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, "اسْتَعْنُوا عَنِ النَّاسِ وَلَوْ بِشَوْصِ السَّوَالِكِ." "মানুষ থেকে অমুখাপেক্ষী থাকবে। যদিও মিসওয়াক ধৌত করার পানি হলেও তাও চাইবে না" (আত-তাবারানী আল-মু'জামুল কাবীর ১৪০৪/ ১৯৮৩, ১১/১২২৫৭/৪৪৪; আল-মাকদাসী ১৪২০/২০০০, ১০/১৭৪/১৭৬)।

দুই. ব্যবসা হলো, পৃথিবীতে আল্লাহ্ তা'আলার দাসত্ব প্রতিষ্ঠা করার অন্যতম উপাদান।

যে ব্যক্তি সম্পদের মালিক হবেন, সে নিজেকে অসংখ্য ছাওয়াবের অধিকারী করতে পারেন। যেমন ওয়াকফ করা, আল্লাহর দিকে আহবান করা, সাদাকা করা, দুর্বলদের সাহায্য করা, রোযাদারদের ইফতার করানো ইত্যাদি বিভিন্ন প্রকার বন্দেগী ও ইবাদাত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর হাদীছে এসেছে, "ذَهَبَ أَهْلُ الدُّثُورِ بِالْأُجُورِ" "বিভবানরা সাওয়াব নিয়ে যাচ্ছেন" (আল-কুশায়রী, ২/১০০৬/৬৯৭; আশ-শায়বানী, ৩৫/১১৪৭৩/৩৭৬)।

তিন. ব্যবসা আল্লাহ্ তা'আলার উপর নির্ভরশীলতাকে শক্তিশালী করে তুলে।

ব্যবসা হলো অন্তরের বিষয়সমূহের অন্যতম। কারণ মানুষ উপার্জন করে, তদুপরি অনেক সময় ঋণগ্রস্থ হয়ে পড়ে। যার কারণে ব্যবসায়ীর অন্তরটি সর্বদা আল্লাহ্ তা'আলার সাথে সম্পৃক্ত থাকে এবং তাঁরই অনুগ্রহের প্রতি মুখাপেক্ষী থাকে।

চার. ব্যবসা ব্যক্তির চিন্তা-চেতনায় নতুন গবেষণার দ্বার উৎকর্ষসাধন করে।

ব্যবসায়ী সর্বসময় চেষ্টা করে তার ব্যবসার উন্নতসাধন করতে এবং তাতে নতুন নতুন পলিসি অবলম্বন করে যাতে সে তার ব্যবসায় সফল হতে পারেন এবং তার কাক্ষিত লক্ষ্যে পৌছতে পারেন।

পাঁচ. ব্যবসা মুসলিম জাতির জন্য অর্থনৈতিক নিরাপত্তার বিধান বাস্তবায়িত করে।

যে জাতি অর্থনৈতিকভাবে উন্নত হবে না সেই জাতি নিজস্ব স্বকীয়তা ও স্থায়িত্বের অধিকারী হয় না। যেমনটি ছুমামা ইবন আছাল ইসলাম গ্রহণ করার পর কুরায়শদের লক্ষ করে বললেন, "আর আল্লাহর কসম! রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর বিনানুমতিতে তোমাদের কাছে ইমামা থেকে গমের একটি দানাও আসবে না" (আল-বুখারী আস-সহীহ, ৪/৪১১৪/১৫৮৯; আল-কুশায়রী, ৩/১৭৬৪/১৩৮৬)।

ইসলামী আইনে ব্যবসায়ীর জন্য অপরিহার্য বিধান

ব্যবসায়ীদের জন্য ইসলামী আইনে কিছু অপরিহার্য বিধান রয়েছে। যেগুলো একজন সফল ব্যবসায়ীকে অবশ্যই মেনে চলতে হবে। এরই মাধ্যমে তারা দুনিয়া ও পরকালে সফলতা লাভ করতে পারবেন। নিম্নে প্রসিদ্ধ বিধানগুলো উল্লেখ করা হলো।

ব্যবসা যেন আল্লাহ্র আনুগত্য থেকে দূরে সরে না নেয়

কিছু বিষয় রয়েছে যা অবশ্যই পালন করতে হবে এবং এমন কিছু বিষয় রয়েছে যা আপেক্ষিক ভাবে অপরিহার্য। ব্যবসায়ীকে ব্যবসা করতে গিয়ে যেন সেই বিষয়গুলোর ত্রুটি না হয়। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, “অতঃপর নামায সমাপ্ত হলে তোমরা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড় এবং আল্লাহ্র অনুগ্রহ তাল্লাশ কর ও আল্লাহ্কে অধিক স্মরণ কর” (সূরা তুল জুমু'আ, ৬২ : ১০)।

আল্লামা দূসারী (র.) বলেন, “ব্যবসা যদি আল্লাহ্র আনুগত্যে ত্রুটি সৃষ্টি করে তাহলে ব্যবসা বৈধ হবে না। বরং আনুগত্যে ত্রুটি অনুযায়ী মাকরুহ বা হারাম হবে। যাকে ব্যবসা তাহায়াতুল মাসজিদ বা নামাযের তাকবীরে উলা পাওয়া থেকে বিরত রাখে তার জন্য এই ব্যবসা মাকরুহ। যাকে ব্যবসা জামাতে সালাত আদায় বা প্রথম ওয়াকতে নামায আদায় করা থেকে বিরত রাখে তার জন্য ব্যবসা হারাম। যাকে ব্যবসা ওয়াজিব আদায় করা থেকে বিরত রাখে যদিও সে তার পরিবারের সাথে থাকে, ওয়াজিব কর্ম আদায় করা থেকে বিরত রাখার কারণে তা হারাম হবে” (আদ-দূসারী তাবি, ৩/৩৭৭)

ব্যবসার ক্ষেত্রে শার'ঈ বিধানসমূহ পালন অপরিহার্য

একজন ব্যবসায়ীকে অবশ্যই ইসলামী আইনের আওতায় ব্যবসা করতে হবে। আর ব্যবসার ক্ষেত্রে শরী'আতের বিধানসমূহ যেন যথাযথ পালন করা হয়। কোনভাবেই যেন ব্যবসা চলাকালে ফরজসমূহ আদায়ে ত্রুটি না ঘটে। যেমন ব্যবসায়ী পণ্যের যাকাত আদায় করা এবং গরীবকে দান করা ও আত্মীয়স্বজনের খবর নেওয়া ইত্যাদি।

হারাম উপায়ে ব্যবসা করা এবং হালাল রিয়ক অন্তর্গত করা

একজন ব্যবসায়ীর উচিত, সে যেন হালাল ভাবে ব্যবসা করে ও হারাম উপায় থেকে নিজেকে বিরত রাখে এবং সন্দেহমূলক বিষয় থেকে নিজেকে বিরত রাখবে। নবী করীম ﷺ বলেছেন, হালাল সুস্পষ্ট এবং হারামও সুস্পষ্ট, উভয়ের মাঝে বহু অস্পষ্ট বিষয় রয়েছে। যে ব্যক্তি গুনাহের সন্দেহযুক্ত কাজ পরিত্যাগ করে, সে ব্যক্তি যে বিষয়ে গুনাহ হওয়া সুস্পষ্ট, সে বিষয়ে অধিকতর পরিত্যাগকারী হবে। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি গুনাহের সন্দেহযুক্ত কাজ করতে দুঃসাহস করে, সে ব্যক্তির সুস্পষ্ট গুনাহের কাজে পতিত হবার যথেষ্ট আশঙ্কা রয়েছে। গুনাহসমূহ আল্লাহ্র সংরক্ষিত এলাকা, যে জানোয়ার সংরক্ষিত এলাকার চার পাশে চরতে থাকে, তার ঐ সংরক্ষিত এলাকায় প্রবেশ করার সম্ভাবনা রয়েছে (আল-বুখারী আস-সহীহ, ২/১৯৪৬/৭২৩)। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, “يَأْتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ، لَا يُبَالِي الْمَرْءُ مَا أَخَذَ مِنْهُ، أَمِنَ الْحَلَالِ أَمْ مِنَ الْحَرَامِ.” “এমন এক যুগ আসবে, যখন মানুষ পরোয়া করবে না যে, সে কোথা থেকে অর্জন করল, হালাল থেকে না হারাম থেকে” (আল-বুখারী আস-সহীহ, ২/১৯৪৫/৭২৬)।

ব্যবসা যেন তার মুখ্য উদ্দেশ্য না হয়

প্রত্যেক ব্যবসায়ী যেন তার এই ব্যবসাকে আল্লাহ্র পরিপূর্ণ আনুগত্য করে তাকওয়া অর্জনের ওয়াসীলাহ হিসেবে গ্রহণ করে। ব্যবসার মাধ্যমে তার মূল চেতনা হবে পরকাল। বাহ্যিকভাবে দুনিয়ার কারবার করলেও অন্তরে থাকবে একমাত্র পরকালের চেতনা। এরই প্রেক্ষিতে নবী করীম ﷺ বলেছেন, “যে ব্যক্তি সকাল করল এই অবস্থায় যে, দুনিয়াই তার মূল লক্ষ্য উদ্দেশ্য, তাহলে আল্লাহ্ তা'আলা তার কার্যাবলিকে তার সামনে বিক্ষিপ্ত আকারে করে দিবেন ও অভাব-অনটন তার দুই চক্ষুর সামনে ভাসবে এবং দুনিয়া থেকে সে কেবল ঐ পরিমাণ পাবে যা তার ভাগ্যে লিপিবদ্ধ ছিল। যে ব্যক্তি সকাল করল এই অবস্থায় যে, আখিরাতই তার মূল লক্ষ্য উদ্দেশ্য,

তাহলে আল্লাহ্ তা'আলা তার কার্যাবলিকে তার সামনে একত্রিত আকারে পেশ করে দিবেন ও তার অন্তরকে ধনী করে দিবেন এবং দুনিয়া তার নিকট অপমানিত হয়ে আগমন করবে” (ইবন মাজাহ, ৫/৪১০৫/২২৭; আত-তিরমিযী, ৪/২৪৬৫/৬৪২; আশ-শায়বানী, ৩৫/২১৫৯০/৪৬৭)।

ব্যবসায়ীকে ক্রয়-বিক্রয়ের বিধানাবলি শিক্ষা করা জরুরি

একজন ব্যবসায়ীক লেনদেন ও ক্রয়-বিক্রয়ের নিয়ম-কানুন জানা থাকা দরকার। ব্যবসায়ী যেন মানুষের নিকট হারাম বিষয়/পণ্য বিক্রি না করে। তাদেরকে প্রতারণা না করে ও ধোঁকা না দেয় এবং সে যেন তার পণ্যকে মিথ্যা শপথ করে বাজারজাত না করে। উমর ইবনুল খাত্তাব (রা.) বললেন, *لَا يَبِيعُ فِي سُوْقِنَا إِلَّا مَنْ قَدْ تَفَقَّهَ فِيهِ*, “ধর্মের ব্যাপারে বিশেষ জ্ঞান অর্জন করা ব্যতীত কেউ যেন আমাদের বাজারে ক্রয়-বিক্রয় না করে” (আত-তিরমিযী, ২/৪৮৭/৩৫৭)। যাতে কোন প্রকার প্রতারণা ও ধোঁকাবাজী থাকবে না (আত-তিরমিযী, ২/৪৮৭/৩৫৭)। সুস্পষ্ট হলো যে, একজন বিক্রেতাকে ক্রয়-বিক্রয় ও কারবারের বিধানাবলি এবং ব্যবসার ক্ষেত্রে যা যা বিধানের প্রয়োজন সে বিষয়ে গভীর জ্ঞানের অধিকারী হতে হবে।

ক্রেতার শুভাকাঙ্ক্ষী হওয়া

ক্রেতা-বিক্রেতা কর্তৃক কোন কিছু গোপন না করে পণ্যের পূর্ণ অবস্থা বর্ণনা করা এবং একে অন্যের কল্যাণ কামনা করা। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, “ক্রেতা-বিক্রেতা যতক্ষণ পরস্পর বিচ্ছিন্ন না হয়, ততক্ষণ তাদের ইখতিয়ার থাকবে। যদি তারা সত্য বলে এবং অবস্থা ব্যক্ত করে তবে তাদের ক্রয়-বিক্রয়ে বরকত হবে আর যদি মিথ্যা বলে এবং দোষ গোপন করে তবে তাদের ক্রয়-বিক্রয়ের বরকত চলে যাবে” (আল-বুখারী আস-সহীহ, ২/১৯৭৩/৭২৩)।

বিক্রয় বা ক্রয়কৃত জিনিস ফেরত নেয়া

ব্যবসায়ীর জন্য বরকতময় কাজসমূহের অন্যতম হলো, বিক্রয় বা ক্রয়কৃত জিনিস কেউ ফেরত দিতে চাইলে ফেরত নেয়া। বিক্রয়কৃত জিনিস ফেরত নিলে আল্লাহ্ তা'আলা কিয়ামত দিবসে তার ক্রটিগুলো ক্ষমা করে দিবেন। হাদীছে এসেছে, *أَفْأَلُ مُسْلِمًا، أَفْأَلُهُ اللَّهُ عَثْرَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ*, “যে ব্যক্তি কোনো মুসলমানের বিক্রয়কৃত বা ক্রয়কৃত জিনিস ফেরত নিতে রাজি হয়ে যায়, আল্লাহ্ তা'আলা কিয়ামতের দিন তার ক্রটি বিচ্যুতি মাফ করে দেন” (ইবন মাজাহ, ৩/২১৯৯/৩১৮; আবু দাউদ, ৫/৩৪৬০/৩২৮)।

ন্যায়সংগত মূল্য নেয়া

বাজার দরের চেয়ে অতিরিক্ত মূল্য না নেয়া, যদিও ত্রেতা সম্মত হলে যে কোন মূল্যে তার নিকট বিক্রয় করা যায়। কিন্তু ক্রেতা অজ্ঞ বা সে ঠেকায় পড়েছে, যে কোন মূল্যে সে নিতে বাধ্য-এরূপ অবস্থায় বিক্রেতার নৈতিক কর্তব্য হলো স্বাভাবিক বাজার দরের চেয়ে অতিরিক্ত না নেয়া।

ক্রয়বিক্রয়ে কসম না খাওয়া

একজন সফল ব্যবসায়ীর জন্য একান্ত উচিত যে, ক্রয়বিক্রয়ে কসম না খাওয়া। এমনকি সাধারণ কথাবার্তায়ও ঘন ঘন শপথ করা পরিহার করা জরুরী।

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, "إِيَّاكُمْ وَكَثْرَةَ الْخَلْفِ فِي الْبَيْعِ، فَإِنَّهُ يُنْفَقُ، ثُمَّ يَمْحَقُ." "তোমরা ব্যবসা-বাণিজ্যে অধিকাধিক কসম থেকে দূরে থাকো। কারণ, কসম পণদ্রব্য চালু করে ঠিকই, কিন্তু তা উপার্জনের (বরকত) বিনষ্ট করে দেয় (আল-কুশায়রী, ৩/১৬০৭/১২২৮)।

ব্যবসায়ী সংকাজের আদেশ করবে এবং অসৎ কাজ থেকে নিষেধ করবে

ব্যবসায়ী যখন তার ব্যবসা প্রতিষ্ঠান চলাকালে আল্লাহর অসন্তুষ্টির বেড়াজালে আবদ্ধ হবে এমন কোন অন্যায় কর্ম প্রত্যক্ষ করলে তার উপর অপরিহার্য দায়িত্ব হলো, চুপ না থেকে তা প্রতিরোধ করা। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "তোমাদের কেউ যদি অন্যায় কাজ দেখে, তাহলে সে যেন হাত দ্বারা এর সংশোধন করে দেয়। যদি এর ক্ষমতা না থাকে, তাহলে মুখের দ্বারা, যদি তাও সম্ভব না হয়, তাহলে অন্তর দ্বারা (উক্ত কাজকে ঘৃণা করবে), আর এটাই ঈমানের নিম্নতর স্তর" (আল-কুশায়রী, ১/৪৯/৬৯)।

গুদামজাত না করা

একজন ব্যবসায়ী গুদামজাতের মাধ্যমে কৃত্রিম সংকট করে মালের মূল্য বৃদ্ধি যেন না করে। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, "الْمُخْتَكِرُ مُلْغُونٌ." "গুদামজাতকারী অভিশপ্ত" (আল-হাকিম, ২/২১৬৪/১৪)। বিশেষ করে দুস্থাপ্যতার সময় কিংবা কলেরা, করোনা ইত্যাদির মত মহামারীর সময় অথবা বন্যা পরবর্তী দুর্যোগের সময় খাদ্য গুদামজাত করে রেখে দাম বাড়ানো বৈধ নয়। অবশ্য দুস্থাপ্যতার বাজার না হলে খাদ্য বেঁধে রেখে মূল্য বৃদ্ধি হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করে তা বিক্রয় করা অবৈধ নয়।

ব্যবসার মধ্যে প্রতারণার আশ্রয় গ্রহণ না করা

একজন ব্যবসায়ীর একান্ত উচিত যে, যেন সে ব্যবসার মধ্যে প্রতারণার আশ্রয় গ্রহণ না করে। আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, "একদা রাসূলুল্লাহ ﷺ স্তম্ভীকৃত খাদ্যশস্যের পাশ দিয়া যাচ্ছিলেন। তখন তিনি স্তম্ভের মধ্যে হাত ঢুকালেন। তাঁর আঙ্গুলগুলো আদ্রতা স্পর্শ করে। তিনি বললেন, হে খাদ্যশস্যের মালিক! এটা কি? সে বলল, হে আল্লাহর রাসূল! এতে বৃষ্টি পড়েছিল। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, কেন তুমি ভিজা অংশ খাদ্যশস্যের উপরে রাখনি, যাতে লোকেরা তা দেখতে পায়। যে ব্যক্তি ধোঁকা দেয় সে আমার দলভুক্ত নয়" (আল-কুশায়রী, ১/১০২/৯৯)।

কৃত্রিমভাবে দরবৃদ্ধি না করা

এক শ্রেণির দালাল বিক্রেতার সাথে চুক্তি করে ক্রেতা ক্রয় করতে এলে পণ্যের মিথ্যা প্রশংসা করে অথবা নিজে নেওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করে পণ্যের মূল্য বৃদ্ধি করে। এমন দালালি আমাদের শরী'আতে নিষেধ। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, "هَيَّا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ النَّجْشِ." "তোমরা ক্রেতাকে ধোঁকা দেয়ার লক্ষ্যে ক্রেতার দরের উপর দর বৃদ্ধি করে ক্রেতাকে ধোঁকা দিয়ো না" (আল-বুখারী আস-সহীহ, ২/২০৩৫/৭৫৩)।

পণ্যের দোষ গোপন না করা

একজন ব্যবসায়ীর একান্ত উচিত যে, যেন সে ব্যবসার মধ্যে পণ্যের দোষ গোপন না করে।

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ، وَلَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ بَاغٌ مِنْ أَخِيهِ بَيْعًا فِيهِ عَيْبٌ، إِلَّا بَيَّنَّهُ لَهُ." "মুসলিম মুসলিমের ভাই। কোন মুসলিমের জন্য বৈধ নয় যে, সে তার ভাইকে কোন জিনিস বিক্রয় করার সময় তার কোন ত্রুটি বয়ান না করে গোপন করে রাখে" (ইবন মাজাহ, ৩/২২৪৬/৩৫৬)।

ওজনে বা মাফে কম না দেয়া

একজন সফল ব্যবসায়ীর একান্ত উচিত যে, যেন সে ব্যবসার মধ্যে ওজনে ও মাফে কম না দেয়।

আল্লাহ তা'আলা বলেন, ﴿وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا أَكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ﴾. “যারা মাপে কম করে, তাদের জন্যে দুর্ভোগ, যারা লোকদের কাছ থেকে যখন মেপে নেয়, তখন পূর্ণ মাত্রায় নেয় এবং যখন লোকদেরকে মেপে দেয় কিংবা ওজন করে দেয়, তখন কম করে দেয়” (সূরা তুল মুতাফ্ফীনে, ৮৩ : ১-৩)। “অতএব তোমরা মাপ ও ওজন পূর্ণ কর এবং মানুষকে তাদের দ্রব্যাদি কম দিয়ো না” (সূরা তুল আ'রাফ, ৭ : ৮৫)।

ব্যবসার মধ্যে সুদের আশ্রয় গ্রহণ না করা

একজন সফল ব্যবসায়ীর জন্য কোনভাবেই ব্যবসার মধ্যে সুদের আশ্রয় গ্রহণ করা বৈধ নয়।

আল্লাহ তা'আলা বলেন, ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾ “আল্লাহ ক্রয়-বিক্রয়কে বৈধ এবং সুদকে হারাম করেছেন” (সূরা তুল বাকারাহ, ২ : ২৭৫)। “আল্লাহ সুদকে নিষিদ্ধ করেন এবং দানকে বর্ধিত করেন” (সূরা তুল বাকারাহ, ২ : ২৭৬)। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, “كُلُّ قَرْضٍ جَرٌّ مُنْفَعَةٌ فَهُوَ رِبَاٌ.” “যে ঋণ কোন মুনাফা টানে, তাই সুদ” (ইবন আবী উসামা ১৪১৩/ ১৯৯২, ১/৫০০)। মোট কথা, কাউকে ঋণ দিয়ে তার মাধ্যমে মুনাফা গ্রহণ করাই সুদ বা রিবা।

ইসলামী আইনে ব্যবসায়ীর ক্ষেত্রে সাধারণনীতি

ব্যবসায়ীদের ক্ষেত্রে ইসলামী আইনে কিছু সাধারণনীতি রয়েছে। একজন ব্যবসায়ীকে এগুলো মনে চলা একান্ত উচিত। নিম্নে প্রসিদ্ধ সাধারণনীতিগুলো উল্লেখ করা হলো।

ক্রয়-বিক্রয়ে ইসলামী চরিত্রে চরিত্রবান হওয়া এবং নশ্তা ও সন্দেহহার করা

বিক্রেতাকে ক্রয়-বিক্রয়ে নশ্তা ও সন্দেহহার করা উচিত। প্রকাশ্যে ও গোপনে আল্লাহ তা'আলার কথা স্মরণ রাখবে, কথায় ও কাজে সততা বজায় রাখবে এবং সম্পদে আমানতদারীতা রক্ষা করবে ইত্যাদি উত্তম চরিত্রে চরিত্রবান হবে। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, “رَجِمَ اللَّهُ رَجُلًا سَمَحًا إِذَا بَاعَ، وَإِذَا اشْتَرَى، وَإِذَا اقْتَضَى.” “যে ব্যক্তি ক্রয়-বিক্রয় এবং পাওনা তাগাদায় নশ্তা ব্যবহার করে, আল্লাহ তা'আলা তার উপর রহম করুন” (আল-বুখারী আস-সহীহ, ২/১৯৭০/৭৩০)।

ধনীদেবপল সময় দেওয়া এবং অভাবস্থতকে অবকাশ প্রদান করা বা মাফ করে দেওয়া

একজন সফল ব্যবসায়ীর উচিত, যেন সে ধনীদেব সময় দেয় এবং অভাবস্থতকে অবকাশ প্রদান করে কিংবা মাফ করে দেয়।

নবী করীম ﷺ বলেছেন, “كَانَ تاجِرٌ يُدَايِنُ النَّاسَ، فَإِذَا رَأَى مُعْسِرًا قَالَ لِفَتْيَانِهِ: تَجَاوَزُوا عَنْهُ، لَعَلَّ اللَّهَ أَنْ يَتَجَاوَزَ عَنْهُ، فَتَجَاوَزَ اللَّهُ عَنْهُ.” “জৈনিক ব্যবসায়ী লোকদের ঋণ দিত। কোন অভাবস্থতকে দেখলে সে তার কর্মচারীদেরকে বলত, তাকে মাফ করে দাও, হয়তো আল্লাহ তা'আলা আমাদের মাফ করে দিবেন। এর ফলে আল্লাহ তা'আলা তাকে মাফ করে দেন” (আল-বুখারী আস-সহীহ, ২/১৯৭২/৭৩১)। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, তোমাদের পূর্ববর্তীগণের মধ্যে এক ব্যক্তির রুহের সাথে ফিরিশতা সাক্ষাৎ করে জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি কি কোন নেক কাজ

করেছো? লোকটি উত্তর দিল, আমি সচ্ছলকে অবকাশ দিতাম এবং অভাবগ্রস্তকে মাফ করে দিতাম। রাবী বলেন, ফিরিশতারাত্তাও তাঁকে ক্ষমা করে দেন” (আল-বুখারী আস-সহীহ, ২/১৯৭১/৭৩১)।

আল্লাহ্ তা‘আলা প্রদত্ত রিয়কে সম্ভ্রষ্ট থাকা

প্রাপ্ত রিয়কের উপর সম্ভ্রষ্ট থাকা মহান সম্পদ। যে ব্যক্তিকে প্রয়োজন অনুযায়ী রিয়ক দেওয়া হল এবং সে প্রাপ্ত রিয়কের উপর সম্ভ্রষ্ট, তাকেই রাসূলুল্লাহ্ ﷺ সফলকাম ঘোষণা করেছেন। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, **قَدْ** “যে ব্যক্তি ইসলাম গ্রহণ করল, তাকে প্রয়োজনমত জীবিকা প্রদান করা হল এবং আল্লাহ্ যা দিয়েছেন তার উপর সম্ভ্রষ্ট থাকল, সেই সফলকাম হল” (আল-কুশায়রী তাবি, ২/১০৫৪/৭৩০)। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, **لَيْسَ الْغَنَى عَنْ كَثْرَةِ الْعَرَضِ، وَلَكِنَّ الْغَنَى غِنَى النَّفْسِ**”, “অধিক ধন-সম্পদে ঐশ্বর্য নেই। অন্তরের অভাব মুক্তিই প্রকৃত ঐশ্বর্য” (আল-বুখারী আস-সহীহ, ৫/৬০৮১/২৩৬৮; আল-কুশায়রী, ২/১০৫১/৭২৬)।

নির্ধারিত ভাগ্যের উপর পূর্ণ বিশ্বাস রাখা

এ বিষয়ে পূর্ণ জ্ঞান ও বিশ্বাস করতে হবে যে, ভাগ্যে নির্ধারিত যা আছে এর বেশি অর্জন সম্ভব নয় যতই চেষ্টা মেহনত করুক না কেন, মূল্যবান সময় ও শ্রম বিনিয়োগ করুক না কেন, আল্লাহর পক্ষ থেকে পার্থিব ভাগ্যে যা আছে এর বেশি প্রাপ্ত হবে না। আল্লাহ্ তা‘আলা বলেন, **﴿أَلَمْ يَقْسِمُوا رَبِّكَ إِنَّهُمْ يَحْتَسِبُونَ أَنَّ قَسَمَنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي﴾** “তারা কি আপনার পালনকর্তার রহমত বন্টন করে? আমি তাদের মধ্যে তাদের জীবিকা বন্টন করেছি পার্থিব জীবনে এবং একের মর্যাদাকে অপরের উপর উন্নীত করেছি, যাতে একে অপরকে সেবক রূপে গ্রহণ করে” (সূরা তুয যুখরুফ, ৪৩ : ৩২)। **﴿مَا يَفْتَحُ اللَّهُ﴾** “আল্লাহ্ মানুষের জন্য অনুগ্রহের মধ্য থেকে যা খুলে দেন, তা ফেরাবার কেউ নেই এবং তিনি যা বারণ করেন, তা কেউ প্রেরণ করতে পারে না তিনি ব্যতীত” (সূরা তু ফাতির, ৩৫ : ২)।

দুনিয়ার প্রতি আসক্ত না হওয়া

দুনিয়ার প্রতি অনাসক্ততা মানে সম্পদের অধিক্যতা বা স্বল্পতা নয়। বরং দুনিয়ার প্রতি অনাসক্ততা হলো, সম্পদ হস্তে থাকবে তবে অন্তরে সম্পদের মোহ থাকবে না। সালফে সালিহীনদের এক দল বলেন, যুহদ হলো, আসা-আকাজ্জা কম করা। কেউ কেউ বলেন, যুহদ হলো, পরকালের উৎকৃষ্টতার তুলনায় দুনিয়াকে তুচ্ছ ভেবে পরিত্যাগ করা (ইবন কুদামাহ, ৩২৪)। এক ব্যক্তি সুফইয়ান ইবন উয়াইনাহ (র.)-কে বলল, এক ব্যক্তির নিকট একশত দিনার থাকা অবস্থায় সে কি যাহিদ (দুনিয়া বিমুখ) হতে পারে? তিনি উত্তরে বললেন, হ্যাঁ! সে বলল, তা কিভাবে? তিনি বললেন, সম্পদ যদি কমে যায় সে চিন্তিত হয় না, যদি বৃদ্ধি পায় খুশিও হয় না, সেই সম্পদ পরিত্যাগ করে চলে যেতে মৃত্যুকেও অপছন্দ করে না (আল-খাল্লাল ১৪০৭, ১/১৯/৪৯)।

আল্লাহ্ তা‘আলার সাথে ব্যবসা করা

একজন ব্যবসায়ীকে দুনিয়াবী ব্যবসার সাথে সাথে আল্লাহর সাথেও ব্যবসা করা উচিত। আল্লাহর সাথে ব্যবসা হলো এমন ব্যবসা যার মধ্যে ক্ষতির সম্ভাবনা নেই। বরং সেটি হলো সর্বোৎকৃষ্ট এবং সর্বোত্তম ব্যবসা। তা হলো,

﴿إِنَّ الَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً يَرْجُونَ تِجَارَةً لَّن تَبُورَ﴾ “যারা আল্লাহর কিতাব পাঠ করে, নামায কায়েম করে এবং আমি যা দিয়েছি, তা থেকে গোপনে ও প্রকাশ্যে ব্যয় করে, তারা এমন ব্যবসা আশা করে, যাতে কখনও লোকসান হবে না” (সূরাতু ফাতির, ৩৫ : ২৯)। অন্যত্র আল্লাহ তা‘আলা বলেন, ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَى تِجَارَةٍ تُنْجِيكُمْ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ﴾ “মু‘মিনগণ! আমি কি তোমাদেরকে এমন এক বাণিজ্যের সম্ভান দিব, যা তোমাদেরকে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি থেকে মুক্তি দেবে?” (সূরাতুস সাফ, ৬১ : ১০)। অতঃপর এর পরবর্তী আয়াতে এই ব্যবসার প্রকৃতি সম্পর্কে আল্লাহ তা‘আলা বলেন, ﴿تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ﴾ “তা এই যে, তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করবে এবং আল্লাহর পথে নিজেদের ধন-সম্পদ ও জীবনপণ করে জিহাদ করবে। ইহাই তোমাদের জন্য শ্রেয় যদি তোমরা জানিতে” (সূরাতুস সাফ, ৬১ : ১১)।

আল্লাহর সাথে ব্যবসার উপাদানসমূহ

দুনিয়াবী ব্যবসার সাথে সাথে আল্লাহ তা‘আলার সাথেও ব্যবসা করা তথা আল্লাহর সম্বন্ধি অর্জনের চেষ্টা অব্যাহত রাখা। আল্লাহ তা‘আলার সাথে ব্যবসা করার কতিপয় উপাদান রয়েছে। যা মূলত রিয়ক প্রাপ্তিরও মহৎ উপাদান। নিম্নে আল্লাহ তা‘আলার সাথে ব্যবসা করার মৌলিক উপাদানগুলো আলোচনা করা হল।

তাকওয়া অর্জন করা ও পাপসমূহ সম্পূর্ণরূপে পরিহার করা

মূলত তাকওয়া অর্জন করা আল্লাহ তা‘আলা পক্ষ থেকে রিয়ক প্রাপ্তির অন্যতম উপাদান। আল্লাহ তা‘আলা বলেন, ﴿وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ﴾ “আর যে আল্লাহকে ভয় করে, আল্লাহ তার জন্যে নিষ্কৃতির পথ করে দেবেন এবং তাকে তার ধারণাতীত জায়গা থেকে রিয়ক দেবেন” (সূরাতুত তালাক, ৬৫ : ৩)। তিনি আরও বলেন, ﴿وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْفُرَى آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَكِنْ كَذَّبُوا﴾ “যদি সেই সকল জনপদের অধিবাসীবৃন্দ ঈমান আনিত ও তাকওয়া অবলম্বন করিত তবে আমি তাদের জন্য আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর কল্যাণ উন্মুক্ত করিতাম, কিন্তু তারা প্রত্যাখ্যান করেছিল; সুতরাং তাদের কৃতকর্মের জন্য তাদেরকে শাস্তি দিয়েছি” (সূরাতুল আ‘রাফ, ৭ : ৯৬)।

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, “নিশ্চয় বান্দা গোনাহের কারণে প্রাপ্ত রিয়ক থেকে বঞ্চিত হয়ে যায়। দু‘আই কেবল তাকদীরকে পরিবর্তন করতে পারে এবং একমাত্র পুণ্যকাজই হায়াতকে বৃদ্ধি করে” (আশ-শায়বানী, ৩৭/২২৪৩৮/১১১; ইবন হিব্বান ১৪১৪/ ১৯৯২, ৩/৮৭২/১৫৩; ইবন মাজাহ, ১/৯০/৬৮)।

ইস্তিগফার করা

ইস্তিগফার হলো একটি স্বতন্ত্র ইবাদত। এরই মাধ্যমে দুনিয়া ও আখিরাতের কল্যাণ সাধিত হয়। পবিত্র কুরআন ও হাদীছে ইস্তিগফার করার অসংখ্য ফজীলত রয়েছে। নিম্নে প্রসিদ্ধগুলো উল্লেখ করা হলো। আল্লাহ তা‘আলা হযরত নূহ (আ.) সম্পর্কে বলেন, ﴿فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيَمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ﴾ “আমি (হযরত নূহ) বলেছি, তোমরা তোমাদের পালনকর্তার নিকট ক্ষমা

প্রার্থনা কর, তিনি অত্যন্ত ক্ষমাশীল। তিনি তোমাদের জন্য প্রচুর বৃষ্টিপাত করবেন, তিনি তোমাদেরকে সমৃদ্ধ করবেন ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততিতে এবং তোমাদের জন্য স্থাপন করবেন উদ্যান ও প্রবাহিত করবেন নদী-নালা” (সূরা তু নূহ, ৭১ : ১০-১২)। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, “যে ব্যক্তি অধিকহারে ইস্তিগ্ফার পাঠ করবে, আল্লাহ তা’আলা তার প্রত্যেক চিন্তার উপশম করবেন আর প্রত্যেক সংকীর্ণতা থেকে বের হওয়ার পথ করে দিবেন এবং তাকে কল্লনাভীত স্থান থেকে রিযকের ব্যবস্থা করবেন” (আশ-শায়বানী, ৪/২২৩৪/১০৪; ইবন মাজাহ, ৪/৩৪১৮/৭২১; আল-হাকিম, ৪/৭৬৭৭/২৯১; আবু দাউদ, ২/১৫১৮/৬২৮)।

আত্মীয়ের সাথে সদভাব বজায় রাখা

ব্যবসায়ীর উচিত, সর্বসময় আত্মীয়দের সাথে সদভাব বজায় রাখা। সর্বাবস্থায় আত্মীয়দের খবর নেওয়া। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলছেন, “مَنْ سَرَّهُ أَنْ يُبْسَطَ لَهُ فِي رِزْقِهِ، وَأَنْ يُنْسَأَ لَهُ فِي أَثَرِهِ، فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ.” “যে লোক তার রিযক প্রশস্ত করতে এবং আয়ু বৃদ্ধি করতে চায়, সে যেন তার আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা করে” (আল-বুখারী আস-সহীহ, ৫/৫৬৩৯/২২৩২; আল-কুশায়রী, ৪/২৫৫৭/১৯৮২)। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, “আত্মীয়দের সাথে সুসম্পর্ক বাজায় রাখার কারণে সম্পদ বৃদ্ধি পায়, পরিবার-পরিজনে মুহাব্বত সৃষ্টি হয় এবং আয়ু বৃদ্ধি হয়” (আত-তাবারানী আল-মু’জামুল আওসাত, ৮/৭৮১০/১৪; আত-তিরমিযী, ৪/১৯৭৯/৩৫১)।

হজ্জ ও উমরা বারংবার আদায় করা

ব্যবসায়ীর একান্ত উচিত, সুযোগ থাকলে হজ্জ ও উমরা বারংবার আদায় করার চেষ্টা করা। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, “تَابِعُوا بَيْنَ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ، فَإِنَّهُمَا يَنْفِيَانِ الْفَقْرَ وَالذُّنُوبَ، كَمَا يَنْفِي الْكَبِيرُ حَبَثَ الْحَدِيدِ وَالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ.” “তোমরা হজ্জ ও উমরাহ পালন কর, যেহেতু এ দু’টি আমল অভাব এবং গুনাহকে এমনভাবে দূর করে যেন হাপর দ্বারা (যন্ত্রবিশেষ) লোহা, স্বর্ণ ও রৌপ্যের মরিচা দূর করা হয়” (আশ-শায়বানী, ৬/৩৬৬৯/১৮৫; আত-তিরমিযী, ৩৮১০//১৬৬; আন-নাসাঈ আস-সুনানুল কুবরা, ৪/৩৫৯৭/৯; ইবন খুযায়মা আস-সাহীহ ১৩৯০/১৯৭০ : ৪/২৫১২/১৩০)।

উত্তম চরিত্রে চরিত্রবান হওয়া

ব্যবসায়ীকে উত্তম চরিত্রে চরিত্রবান হওয়া একান্ত জরুরী। কারণ সৎচরিত্রের অসংখ্য ফজীলত রয়েছে। নবী করীম ﷺ বলেছেন, “وَصِلَةُ الرَّحِمِ وَحُسْنُ الْخُلُقِ وَحُسْنُ الْجَوَارِ يَعْمُرَانِ الدِّيَارَ، وَيَزِيدَانِ فِي الْأَعْمَارِ.” “আত্মীয়ের সাথে সুসম্পর্ক বাজায় রাখা, উত্তম চরিত্র এবং প্রতিবেশির সাথে ভাল আচরণ করা সুখ্যাতি অর্জিত হয় এবং আয়ু বৃদ্ধি পায়” (আশ-শায়বানী, ৪২/২৫২৫৯/১৫৩)। ইয়াহইয়া ইবনু মু’আয (রা.) বলেন, “উত্তম ও প্রশস্ত চরিত্রে রিযকের ধনভাণ্ডার রয়েছে” (আল-গাযালী তাবি, ৩/৫২)।

দু’আ করা

ব্যবসায়ীকে ব্যবসার সাথে সাথে দু’আ করাও জরুরী বিষয়। মনে মনেও দু’আ করা যায়। তবে দুই হাত তুলে দু’আ করা দু’আর আদব। মূলত প্রত্যক্ষভাবে দু’আও একটি ইবাদত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, «الدُّعَاءُ هُوَ الْعِبَادَةُ» “দু’আই হলো ইবাদত” (আবু দাউদ, ২/১৪৭৯/৬০৩; আল-বুখারী আল-আদাবুল মুফরাদ ১৪০৯/১৯৮৯, ৭১৪/২৪৯; আশ-শায়বানী, ৩০/১৮৩৯১/৩৪০; আন-নাসাঈ, ১০/১১৪০০/২৪৪)। দু’আ হলো আল্লাহ তা’আলার ভাণ্ডার থেকে নেওয়ার বড় হাতিয়ার। রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদেরকে আল্লাহ তা’আলার নিকট

চাওয়ার পদ্ধতি শিখিয়ে দিয়ে বলেন, "اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْهُدَى وَالتُّقَى وَالْعَفَافَ وَالْغِنَى" "হে আল্লাহ তোমার নিকট হিদায়াত, তাকওয়া, নিষ্পাপ, প্রাচুর্য কামনা করছি" (আল-কুশায়রী, ৪/২৭২১/২০৮৭)।

বিবাহ করা

বিবাহ করা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর অন্যতম সুন্নাহ। বিবাহ একটি স্বতন্ত্র ইবাদতও বটে। বিবাহের মাধ্যমে চক্ষু অবনমিত হয় ও লজ্জাস্থানের হিফাজত হয় এবং প্রাচুর্য লাভ হয়।

আল্লাহ তা'আলা বলেন, وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنَ الصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ "তোমাদের মধ্যে যারা বিবাহহীন, তাদের বিবাহ সম্পাদন করে দাও এবং তোমাদের দাস ও দাসীদের মধ্যে যারা সৎকর্মপরায়ন তাদেরও। তারা অভাবগ্রস্ত হইলে আল্লাহ নিজ অনুগ্রহে তাদেরকে অভাবমুক্ত করে দিবেন; আল্লাহ তো প্রাচুর্যময়, সর্বজ্ঞ" (সূরা তুন নূর, ২৪ : ৩২)। ইবন আবী হাতিম (র.) বর্ণনা করেন, আবু বকর সিদ্দীক (রা.) একবার মুসলমানদেরকে সম্বোধন করে বললেন, أَطِيعُوا اللَّهَ فِيمَا أَمَرَكُمْ بِهِ مِنَ النِّكَاحِ يُنْجِزْ "তোমরা বিবাহের ব্যাপারে আল্লাহর আদেশ পালন কর। তিনি যে ধনাঢ্যতা দান করার ওয়াদা করেছেন, তা পূর্ণ করবেন। অতঃপর তিনি এই আয়াত পাঠ করলেন, "তারা যদি নিঃশ্ব হয়, তবে আল্লাহ নিজ অনুগ্রহে তাদেরকে সচ্ছল করে দেবেন" (ইবন কাছীর, ৩/২৯৩)। ইবন মাসউদ (রা.) বলেন, "الْتِمِسُوا الْغِنَى فِي النِّكَاحِ" "তোমরা যদি ধনী হতে চাও, তবে বিবাহ কর। কেননা আল্লাহ তা'আলা বলেন, "তারা যদি নিঃশ্ব হয়, তবে আল্লাহ নিজ অনুগ্রহে তাদেরকে সচ্ছল করে দেবেন" (ইবন কাছীর, ৩/২৯৩)।

আল্লাহ তা'আলার উপর ভরসা করা

একজন সফল ব্যবসায়ীর জন্য সর্বাবস্থায় আল্লাহ তা'আলার উপর পরিপূর্ণ ভরসা করা একান্ত উচিত বরং এটি ঈমানের চাহিদাও বটে। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "لَوْ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَوَكَّلُونَ عَلَى اللَّهِ حَقَّ تَوَكُّلِهِ لَرِزِقْتُمْ كَمَا يُرْزَقُ الطَّيْرُ" "যদি তোমরা আল্লাহর প্রতি যথাযথ ভরসা কর তাহা হইলে তিনি তোমাদেরকে অনুরূপ রিয্ক দান করবেন, যেইরূপ পাখিকে রিয্ক দিয়া থাকেন। তারা ভোরে খালি পেটে বাহির হয় এবং দিনের শেষে ভরা পেটে বাসায় ফিরিয়া আসে" (আত-তিরমিযী, ৪/২৩৪৪/৫৭৩; ইবন মাজাহ, ৫/৪১৬৪/২৬৬)। আবু হাতিম আর-রাযী (র.) বলেন, অত্র হাদীছ তাওয়াঙ্কুলের ব্যাপারে বড় দলীল এবং রিয্ক প্রাপ্ত হওয়ার অন্যতম উপাদান (ইবন রাজাব ১৪২২/ ২০০১, ২/৪৯৬)।

উপসংহার

ব্যবসা হলো, লাভের আশায় মূলধনের মধ্যে বিভিন্নভাবে রূপান্তর করা বা লাভে বিক্রয় করার নিমিত্তে কোন জিনিস ক্রয় করা অথবা ক্রয়-বিক্রয়ের মাধ্যমে লাভ অন্বেষণ করা। আল্লাহ তা'আলা ব্যবসাকে হালাল করেছেন এবং সুদকে হারাম করেছেন। ব্যবসা নবীগণের সুন্নাহ, সাহাবীদের তারীকা। আল্লাহ তা'আলা ঐ সমস্ত বাবসায়ীদের প্রশংসা করেছেন যাদেরকে তাদের ব্যবসা নামায আদায় এবং আল্লাহ তা'আলার যিক্র থেকে বিরত রাখে না। তবে ব্যবসায়ীদেরকে ব্যবসার মধ্যে কিছু বিধি-নিষেধ মেনে চলতে হবে। যেমন, ব্যবসা যেন আল্লাহর আনুগত্য থেকে দূরে সরে না নেয়। ব্যবসার ক্ষেত্রে শার'ঈ বিধানসমূহ যেন পালন করা হয়। হারাম

উপায়ে ব্যবসা করা বা হারাম পণ্যের ব্যবসা থেকে নিজেকে বিরত রাখা এবং হালাল রিয়ক অন্বেষণ করা। ব্যবসায়ীকে ক্রয়-বিক্রয়ের বিধানাবলি শিক্ষা করা জরুরী। ব্যবসায়ী ক্রেতার শুভাকাঙ্ক্ষী হবে, গুদামজাত করবে না, ব্যবসার মধ্যে প্রতারণার আশ্রয় গ্রহণ করবে না। ক্রয়-বিক্রয়ে ইসলামী চরিত্রে চরিত্রবান হওয়া এবং নশ্রতা ও সদ্ভাবহার করা। সম্পদের ফিতনা থেকে সতর্কতা অবলম্বন করা। একজন ব্যবসায়ীকে দুনিয়াবী ব্যবসার সাথে সাথে আল্লাহর সম্ভ্রুতি অর্জন করার প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখা। সুতরাং আমাদেরকে ব্যবসার নিয়মনীতি মেনে ব্যবসা-বণিজ্য করা উচিত।

তথ্যসূত্র

- আল-আসবাহানী, আহমদ, *হলিয়াতুল আওলিয়া ওয়া তাবকাতুল আসফিয়া*, মিসর: দারুস সা'আদাহ, ১৩৯৪।
- আল-কুরতুবী, মুহাম্মদ, *আল-জামী' লিআহকামিল কুরআন*, কায়রো: দারুল কুতুবিল মিসরিয়্যাহ, ২য় সং, ১৩৮৪।
- আল-কুশায়রী, মুসলিম, *আস-সহীহ*, বৈরুত: দারু ইহুইয়াইত তুরাখিল 'আরবী, তাবি।
- আল-খাল্লাল, 'আহমদ, *আল-হাচ্ছ আলাত তিজারাতি ওয়াস সুনা' আতি*, রিয়াদ: দারুল 'আসিমা, ১ম সং, ১৪০৭।
- আল-গাযালী, মুহাম্মদ, *ইহুইয়াউ 'উলুমিদ দ্বীন*, বৈরুত: দারুল মা'রিফাহ, তাবি।
- আল-জুরজানী, 'আলী, *আত-তা' রীফাত*, বৈরুত: দারুল কুতুব আল-ইলমিয়্যাহ, ১ম সং, ১৪০৩।
- আল-জাসসাস, 'আহমদ, *আহকামুল কুরআন*, বৈরুত: দারুল কুতুবিল 'ইলমিয়্যাহ, ১ম সং, ১৪১৫।
- আল-জারবু', 'আব্দুল্লাহ, *আহকামুল ঈমান ফী তাহসীনিল উম্মাতিল ইসলামিয়্যাহ*, আল-মাদীনুল মুনাওয়ারাহ: ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় উচ্চ শিক্ষা পরিষদ, ১৪২৩।
- আল-বায়হাকী, 'আহমদ, *আল-আদাব*, বৈরুত: মু'আস্সাসাতুল কুতুবিছ ছিকফিয়্যাহ, ১ম সং, ১৪০৮।
- আল-বায়হাকী, *আদ-দা' ওয়াতুল কুবীর*, তাহকীক: বদর ইবন 'আব্দিল্লাহ, কুয়েত: গরাস, ১ম সং, ২০০৯।
- আল-বায়হাকী, *শু' আবুল ঈমান*, রিয়াদ: মাকতাবাতুর রুশদ, ১ম সং, ১৪২৩/ ২০০৩
- আল-বায়হার, *মুসনাদুল বাযহার*, আল-মাদীনাতুল মুনাওয়ারাহ: মাকতাবাতুল 'উলুম ওয়াল হিকাম, ১ম সং, ১৯৮৮-২০০৯।
- আল-বুখারী, মুহাম্মদ, *আস-সহীহ*, বৈরুত: দারু ইবন কাছীর, ৩য় সং, ১৪০৭।
- আল-বুখারী, *আল-'আদাবুল মুফরাদ*, বৈরুত: দারুল বাশাইর আল-ইসলামিয়্যাহ, ৩য় সং, ১৪০৯।
- আবু দাউদ, সুলায়মান, *আস-সুনান*, বৈরুত: দারুল রিসালাহ, ১ম সং, ১৪৩০।
- আদ-দারু কুতনী, আলী, *আস-সুনান*, কিতাবুল বুযু, বৈরুত: মু'আস্সাসাতুর রিসালাহ, ১ম সং, ১৪২৪।
- আদ-দুসুরী, আশ-শেখ 'আব্দুর রাহমান, *সাফওয়াতুল আছার*, তাবি।
- আদ-দীনুরী, আহমদ ইবন মারওয়ান, *আল-মাজালিসাতু ওয়া জাওয়াহিরুল ইলম*, বৈরুত: দারু ইবন হাযাম, ১৪১৯।
- আত-তাবারী, মুহাম্মদ, *জামি'উল বাযান 'আন তা'বীলি আ'ঈল কুরআন*, বৈরুত: মু'আস্সাসাতুর রিসালাহ, ১ম সং, ২০০০/ ১৪২০।
- আত-তিরমিযী, মুহাম্মদ, *আস-সুনান*, মিসর: মাকতাবাতু মুস্তাফা, ২য় সং, ১৩৯৫।
- আত-তাবারানী, সুলায়মান, *আল-মু'জামুল কাবীর*, আল-মোসাল: মাকতাবাতুল উলুম ওয়াল হিকাম, ২য় সং, ১৪০৪।

- আত-তাবারানী, আল-মু'জামুল আওসাত, কায়রো: দারুল হারামায়ন, ১৪১৫।
- আন-নাসা'ঈ, 'আহমদ, আস-সুনানুল কুবরা, বৈরুত: মু'আসসাসাভুর রিসালাহ, ১ম সং, ১৪২১/ ২০০১।
- আল-মুজাদ্দিদী, আমিমুল ইহুসান, আত-তা'রীফাতুল ফিকহিয়াহ, বৈরুত: দারুল কুতুবিল ইলমিয়াহ, ১ম সং, ১৪২৪।
- আল-মাকদাসী, মুহাম্মদ, আল-'আহাদীছুল মুখতারাহ, বৈরুত: দারু খুদার, ৩য় সং, ১৪২০/ ২০০০।
- আল-মাওসুআতুল ফিকহীয়াহ আল-কুয়েতিয়াহ, কুয়েত: ওয়াযারাতুল আওকাফ ওয়াশ শু'উনুল ইসলামিয়াহ, ১ম সং, ১৪০৪।
- আয-যারকানী, মুহাম্মদ, শারহুয যারকানী, বৈরুত: দারুল কুতুবিল 'ইলমিয়াহ, ১ম সং, ১৪১১।
- আয-যুহায়লী, ড. ওয়াহাবাহ, আত-তাফসীরুল মুনীর, দামেস্ক: দারুল ফিকর আল-মু'আসির, ২য় সং, ১৪১৮।
- আয-যাহাবী, মুহাম্মদ, সিয়াক 'আ'লামিন নুবাল', বৈরুত: মু'আসসাসাভুর রিসালাহ, ৩য় সং, ১৪০৫।
- আর-রাযী, মুহাম্মদ, মাফাতীহুল গায়ব, বৈরুত: দারু 'ইহ'ইয়া'ইত তুরাখিল 'আরাবী, ৩য় সং, ১৪২০।
- আশ-শায়বানী, 'আহমদ, আল-মুসনাদু, বৈরুত: মু'আসসাসাভুর রিসালাহ, ১ম সং, ১৪২১/ ২০০১।
- আস-সা'দী, 'আব্দুর রহমান, তায়সীরিল কারীমির রহমান, বৈরুত: মু'আসসাসাভুর রিসালাহ, ১ম সং, ১৪২০।
- আস-সুযুতী, 'আব্দুর রহমান, আল-ফাতুহুল কাবীর, বৈরুত: দারুল ফিকর, ২য় সং, ১৪২৩।
- আল-হাকিম, মুহাম্মদ, আল-মুত্তাদরাক 'আলাস-সহীহায়ন, বৈরুত দারুল কুতুবিল 'ইলমিয়াহ, ১ম সং, ১৪১১।
- আল-হুযায়সী, মুহাম্মদ, আল-বারাকাতু ফী ফাদলিস সা'ই ওয়াল হারাকাহ, তাবি।
- ইবনু 'আবিদীন, মুহাম্মদ 'আমীন, রাব্দুল মুখতার, বৈরুত: দারুল ফিকরি, ২য় সং, ১৪১২।
- ইবন আবী শায়বা, আল-মুসান্নিফ, রিয়াদ: মাকতাবাতুর রশদ, ১ম সং, ১৪০৯।
- ইবনু কাছীর, 'ইসমা'ঈল, তাফসীরুল কুরআনিল 'আযীম, কায়রো: 'আল-মাকতাবুস সাকাফী, ১ম সং, ২০০১।
- ইবন কুদামাহ, আহমদ, মুহতাসার মিনহাজিল কাসিদীন, দামেস্ক: মাকতাবাতু দারিল বায়ান, ১৩৯৮।
- ইবন খাল্লিকান, 'আহমদ, ওয়াফাইয়াতুল 'আ'য়ান ওয়া আন্নাউ 'আবনা'ইয যামান, বৈরুত: দারু সাদির, ১৯৭১।
- ইবন খুযায়মা, মুহাম্মদ, আস-সাহীহ, বৈরুত: আল-মাকতাবুল 'ইসলামী, ১৩৯০।
- ইবন তায়মিয়া, 'আমরাদুল কুলুবি ওয়া শিফাউহা, কায়রো: আল-মাকতাবাতুস সালাফিয়াহ, ২য় সং, ১৩৯৯।
- ইবন তায়মিয়া, মাজমু'উল ফাতাওয়া, আল-মাদীনাতুন নাবাবীয়াহ: মুজাম্মা'উল মালিক ফাহাদ, ১৪১৬।
- ইবন মানযুর আল-আফরীকী, মুহাম্মদ, লিসানুল 'আরব, বৈরুত: দারু সাদির, ৩য় সং, ১৪১৪।
- ইবনু মাজাহ, মুহাম্মদ, আস-সুনান, বৈরুত: দারুল রিসালাহ আল-'আলামিয়াহ, ১ম সং, ১৪৩০।
- ইবন মুফলিহ, 'আব্দুল্লাহ, আল-আদাবুশ শার'ইয়াহ, বৈরুত: মু'আসসাসাভুর রিসালাহ, ২য় সং, ১৪১৯।
- ইবন রাজাব, 'আব্দুর রহমান, জার্মি'উল উলুম ওয়াল হিকাম, বৈরুত: মু'আসসাসাভুর রিসালাহ, ৭ম সং, ১৪২২।
- ইবনু হাজার, আহমদ, ফাতহুল বারী, বৈরুত: দারুল মা'রিফাহ, ১৩৭৯।
- ইবন হিশাম, আব্দুল মালিক, আস-সীরাতুন নাবাবিয়াহ, বৈরুত: দারুল জায়ল, ১৪১১।
- ইবন হিব্বান, মুহাম্মদ, সহীছ ইবন হিব্বান, বৈরুত: মু'আসসাসাভুর রিসালাহ, ২য় সং, ১৪১৪।
- পানীপথী, মুহাম্মদ ছানাতুলাহ, আত-তাফসীরুল মাযহারী, পাকিস্তান, মাকতাবাতুর রাশীদিয়াহ, ১৪১২।

The Chittagong University Journal of Arts and Humanities

- মাজ্জমা'উল লুগাতিল 'আরাবিয়্যাহ্, আল-মু'জামুল ওয়াসীত, ভারত: হুসায়নিয়া কুতুবখানা, ৭ম সং, ১৯৯৬।
- মুখতার, ড. 'আহমদ, মু'জামুল লুগাতিল 'আরাবিয়্যাহ্ আল-মু'আসিরাহ্, বৈরুত: দারু 'আলামিল কুতুব, ১৪২৯।
- মুবারক, আব্দুল্লাহ্ ইবনুল, আয-যুহদু ওয়ার রাকাইক, বৈরুত: দারুল কুতুবিল 'ইলমিয়াহ্, তাবি।
- রাগিব, আল-হুসায়ন, আল-মুফরাদাত, দামেস্ক: দারুল কালাম, ১ম সং, ১৪১২।
- শফী, মুফতী মুহাম্মদ, মা'আরিফুল কুরআন, অনু: মুহীউদ্দীন খান, ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ৭ম সং, ২০০৫।
- শফী, মুফতী মুহাম্মদ, মা'আরিফুল কুরআন, অনু: মুহীউদ্দীন খান, ঢাকা: ইফাবা, ৬ষ্ঠ সং, ২০০৫।

মানবজীবনে “আল-আমানাহ্ ও আল-খিয়ানাহ্”-এর স্বরূপ এবং সমাজ জীবনে এর প্রতিফলন: একটি পর্যালোচনা

ড. মুহাম্মদ নেজাম উদ্দীন*

প্রতিপাদ্যসার

‘আল-আমানাহ্’ ও ‘আল-খিয়ানাহ্’ শব্দ দুটি আরবী এবং ইসলামী শরীয়তে বহুল পরিচিত পরিভাষা। শব্দ দুটির অর্থ ও পরিধি ব্যাপক ও বিস্তৃত। তবে এ ব্যাপারে যথাযথ অবগতি আমাদের সমাজে নেই। তাই আলোচ্য প্রবন্ধের বিষয়বস্তু হচ্ছে ‘আল-আমানাহ্’ ও ‘আল-খিয়ানাহ্’-এর পরিচয় ও স্বরূপ বর্ণনা এবং এর প্রতিফলন সম্পর্কে পর্যালোচনা। এর মাধ্যমে সমাজ জীবনে বিশেষত শিক্ষা ও চিকিৎসার অঙ্গনে সততা ও শুদ্ধাচার বৃদ্ধি করা। যেহেতু সামাজিক জীবনে অসততা ও অনাচার ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পাচ্ছে। অতএব, এই প্রবন্ধে কুরআন-হাদীসসহ ইসলামী শরীয়তের মূলনীতির আলোকে উপরোক্ত বিষয়ে আলোচনা উপস্থাপনের প্রয়াস চালানো হয়েছে।

ভূমিকা

আরবী ভাষার দুটি শব্দ ‘আল-আমানাহ্’ ও ‘আল-খিয়ানাহ্’ আমাদের সমাজে আমানত বা আমানতদারী ও খিয়ানত বা খিয়ানত করা হিসেবে অধিক প্রচলিত। আমানতকারীর পুরস্কার এবং খিয়ানতের শাস্তি ও পরিণাম সম্পর্কে মোটামুটি অবগতি থাকলেও শব্দ দুটির অর্থের বিস্তৃত পরিধি ও প্রতিফলন সম্পর্কে অধিকাংশ মানুষ অবগত নয়। ফলে সমাজের সর্বক্ষেত্রে খিয়ানত তথা অনাচার-দুর্নীতি বৃদ্ধি পাচ্ছে লাগামহীনভাবে। তাই সমাজ ও রাষ্ট্রের কল্যাণ ভাবনায় ইবাদত-বন্দেগীসহ কর্মজীবনের সকল দিক ও বিভাগ বিশেষত শিক্ষা ও চিকিৎসা বিভাগের প্রতি ‘আমানাহ্’ ও ‘খিয়ানাহ্’ সম্পর্কে বিশেষভাবে পর্যালোচনা করা হয়েছে এই প্রবন্ধে। অতএব, শব্দ দুটির আভিধানিক বিশ্লেষণসহ প্রাত্যহিক জীবনের নির্দিষ্ট দিক-বিভাগে এর প্রতিফলন সংক্রান্ত পর্যালোচনা নিম্নে পেশ করা হলো।

*সহযোগী অধ্যাপক, আরবি বিভাগ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়

আমানাহ (أمانة) ও খিয়ানাহ (خيانة) বিপরীত অর্থবোধক দু'টি আরবী শব্দ। 'أمانة' শব্দটি أ-ম-ن (أمن-يأمن) হতে নির্গত। 'আমান' ও 'আমন'-এর মাদ্দাহ (ক্রিয়ামূল) হিসেবে ব্যবহৃত হয়। এর আভিধানিক অর্থ হলো শঙ্কামুক্ত হওয়া, নিশ্চিত হওয়া। শব্দটি أَمِنُ-يَأْمُنُ এর মাছদার হলে অর্থ হবে, আমানতদার হওয়া, বিশ্বস্ত হওয়া ও ধার্মিক হওয়া ইত্যাদি (কায়রানজী, ওয়াহিদুয্যামান কাশেমী ২০০১, ১৩৬)।

ঈমান ও আমানাহ-এর উৎসমূল অভিন্ন। তাই উভয়ের মধ্যে সম্পর্কও অবিচ্ছিন্ন। সংশয়মুক্ত হয়ে সংবাদদাতাকে বিশ্বস্ত মনে করে তার সংবাদের উপর বিশ্বাস স্থাপন করা হয় বলে “ঈমান”কে এ নামে নামকরণ করা হয়েছে। আর অপরের নিকট পরিপূর্ণ বিশ্বস্ত ও নির্ভরযোগ্য হবার নাম আমানতদারী। আমানতকারী শংকা ও সংশয় মুক্ত হয়েই আমানতদারের নিকট আমানত রাখে।

‘খিয়ানাহ’ হলো ‘আমানাহ’ এর বিপরীত শব্দ। এটি خ-و-ن (خان-يخون) হতে নির্গত। এর আভিধানিক অর্থ হলো খিয়ানত করা, প্রতারণা করা, ধোকা দেয়া, আমানত আদায় না করা, কারো অধিকার বুঝিয়ে না দেয়া ইত্যাদি (সা’দী আবুজীব ৪৮৭)। আমানতদারী ও সততার বিপরীত সকল অপকর্ম ও মন্দ স্বভাবের জন্য ব্যাপকভাবে শব্দটি ব্যবহৃত হয়। এমনকি ইসলামী শরীআতের দৃষ্টিতে ছোটো-বড়ো সকল পাপের জন্যও শব্দটি ব্যবহার হয়ে থাকে (হাফিজ ইবনু কাছীর দিমাশকী, ইমামুদ্দীন ইসমাঈল ১৯৯২, ৩৩৩)।

“আমানাহ” শব্দটি বর্তমানে মুসলিম সমাজে ‘আমানত’ বা ‘আমানতদারী’ হিসেবে সমধিক প্রচলিত। অপরের নিকট গচ্ছিত অর্থ বা সম্পদকে বলা হয়ে থাকে ‘আমানত’। অথচ ‘আমানাহ’ শব্দটি ব্যাপক অর্থবোধক।

‘আমানাহ’ ইসলামী জীবন আদর্শের অতীব গুরুত্বপূর্ণ অংশ, ঈমানের অন্যতম দাবি ও একজন সফলকাম মুমিনের অনিবার্য গুণ। খিয়ানত করা মুনাফিকদের চরিত্র। আমানত সংরক্ষণ করা ফরজ, আর খিয়ানত করা হারাম। আমানতদারী সং লোকের নিদর্শন, আর চরিত্রহীনদের পরিচয় হচ্ছে খিয়ানত করা। প্রতিষ্ঠান, সমষ্টি এবং সমাজের শান্তি, কল্যাণ ও স্থিতিশীলতার জন্য অপরিহার্য মানবগুণ হচ্ছে আমানতদারী। পক্ষান্তরে প্রতিষ্ঠান ও সমাজের বিপর্যয় ও ভাঙ্গনের প্রধান কারণ হচ্ছে খিয়ানত করা। এ প্রসঙ্গে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

إِذَا ضَيَعَتِ الْأَمَانَةُ فَانْظُرِ السَّاعَةَ

অর্থাৎ ‘যখন আমানতের খিয়ানত হবে, তখন কেয়ামতের অপেক্ষা করবে (বুখারী ৯৬১)। নিষ্ঠা, সততা ও বিশ্বাসপরায়ণতার সাথে সকল প্রকার দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পাদন করা এর অন্তর্ভুক্ত। চুক্তিবদ্ধ বা চুক্তিহীনভাবে কোনো সম্পদ কারো নিকট রাখলে তা কর্তব্য বা ভাড়াভিত্তিক হলেও আমানত। আমানতদারী কেবল গচ্ছিত সম্পদের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয় (বারকাভী, মুফতী আমীমুল ইহসান ১৯০-১৯৯)। বরং একজন ঈমানদারের উপর আল্লাহ তায়ালার অর্পিত সকল দায়িত্বও আমানত। সকল প্রকার আল্লাহ’র হুক ও বান্দার হকের সাথে আমানতের গুণ সম্পৃক্ত। অতএব, সকল প্রকার কুফর ও শিরক পরিহার করে শরীকবিহীন মহান আল্লাহ’র প্রতি ঈমান রাখাও আমানতের অন্তর্ভুক্ত। সূরা আল-আহযাবের নিম্নোক্ত ‘আমানাহ’ শব্দ দ্বারা সে বিস্তৃত কর্তব্য কে বুঝানো হয়েছে:

إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا

মানবজীবনে “আল-আমানাহ্ ও আল-খিয়ানাহ্”-এর স্বরূপ এবং সমাজ জীবনে এর প্রতিফলন: একটি পর্যালোচনা

“আমি আকাশ, জমিন ও পাহাড়ের প্রতি আমানাহকে (শরীয়তের যাবতীয় কর্তব্য) পেশ করলাম, তারা সবাই তা বহন করতে অক্ষমতা প্রকাশ করলো, এবং তাতে ভীত হয়ে পড়ল। আর তা বহন করল মানবজাতি। নিশ্চয়ই সে অত্যাচারী ও একান্তই অজ্ঞ (সূরা আল-আহযাব: ৭২)।”

মানব জীবনের সকল দিক ও বিভাগের প্রতি বিস্তৃত বলেই মহান আল্লাহ্ কোরআন হাকিমের একাধিক স্থানে ‘আমানাহ্’ এর বহুবচন ব্যবহার করেছেন। যেমন সূরা নিসা এর ৫৮ নং আয়াতে বলা হয়েছে,

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا

অর্থাৎ “নিঃসন্দেহে আল্লাহ্ তোমাদের আদেশ করেছেন পাওনাদারের নিকট আমানতসমূহ বুঝিয়ে দিতে।” আমানতদারীর বিস্তৃতি ও পরিধি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর হাদিসের মাধ্যমেও স্পষ্ট হয়ে যায়। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

لا إيمان لمن لا أمانة له

অর্থাৎ ‘যার আমানতদারী নেই তার ঈমান নেই (ইমাম আয-যাহাবী, মুহাম্মদ ইব্ন আহমদ শামসুদ্দীন ১৪২১ হি., ১৭৩)।

‘আমানাহ্’ তথা আমানতদারী সম্পর্কে প্রচলিত অস্পষ্টতা ও সীমাবদ্ধতা নিরসনের লক্ষ্যে এর কয়েকটি বাছাইকৃত প্রয়োগ ক্ষেত্র নিম্নে উপস্থাপন করা হলো:

১। আল্লাহ্‌র হক সংক্রান্ত

(ক) শিরকমুক্ত ঈমান

সকল প্রকার শিরক হতে মুক্ত হয়ে মহান আল্লাহ্‌র একত্ববাদকে মেনে নেয়া সবচেয়ে বড়ো আমানত। শিরক হচ্ছে মহান আল্লাহ্‌র জন্য নির্ধারিত গুণ ও বৈশিষ্ট্য সৃষ্টির কাউকে শরীক বা সমান মনে করা (ড. ইব্রাহীম আল বারীকান ১৯৯২, ১২৫)। আল্লাহ্‌পাকের সাথে শিরক করাই হলো বড়ো জুলুম ও খিয়ানত। মহান আল্লাহ্‌ বলেন,

إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ

অর্থাৎ ‘নিশ্চয়ই শিরক বড়ো জুলুম-অত্যাচার (সূরা লুকমান: ১৩)। মহান আল্লাহ্‌র সত্তা, গুণাবলি, ক্ষমতা ও অধিকারে কেউ সমতুল্য-সমকক্ষ নয়। ইবাদত ও আনুগত্য পাওয়ার অধিকারী একমাত্র আল্লাহ্‌। মানবজীবনের সকল দিক ও বিভাগের জন্য নির্ভুল ও কল্যাণকর আইন জারির মালিক একমাত্র আল্লাহ্‌। মহান আল্লাহ্‌র মর্যাদা ও অধিকারের পরিপন্থী যে-কোনো ধরনের বিশ্বাস ও ধ্যান-ধারণা শিরকের অন্তর্ভুক্ত।

মানবজীবন পরিচালনার জন্য আল্লাহ্‌ প্রদত্ত সকল বিধি-বিধান শ্রদ্ধাভরে গ্রহণ করা এবং মহান আল্লাহ্‌র কিতাব ও মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর রীতি-নীতির আলোকে মানব জীবনের সকল কিছু পরিচালনা করা আমানতদারী। পক্ষান্তরে মহান আল্লাহ্‌র বিধান বাদ দিয়ে অন্য যে-কোনো বিধানের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হওয়া কিংবা তদনুযায়ী জীবন পরিচালনা করা সুস্পষ্ট খিয়ানত।

(খ) পরিপূর্ণ ইবাদত-আনুগত্য

বান্দার প্রতি আরোপিত সকল প্রকার ইবাদত হলো ‘আমানাহ্’। সেই ইবাদত পালন না করা কিংবা তাতে শৈথিল্য প্রদর্শন করা ‘খিয়ানাহ্’। তাই নামাজ, যাকাত, রোযা, হজ্জ, ওযু, পবিত্রতা অর্জনের জন্য গোসল করা ইত্যাদি হলো ‘আমানাহ্’। ঈমানের আলোকে সকল সং গুণাবলি অবলম্বন করা ‘আমানাহ্’। এর বিপরীতে

কবির গুনাহসমূহ যেমন-খুন, ডাকাতি, ছিনতাই, অবিচার, অত্যাচার, মিথ্যা বলা, ঘুষ খাওয়া, মদ্যপান, সূদ খাওয়া হচ্ছে খিয়ানত। আল্লাহ্‌র সকল প্রকার নাফরমানি বা অবাধ্যতা খিয়ানতের অন্তর্ভুক্ত(ইবনু কাছীর, ৩৩৩)।

২। রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর হক সংক্রান্ত

মহান আল্লাহ্‌ তাঁর হাবিবকে যে শান ও অধিকার সহকারে প্রেরণ করেছেন, সেভাবে রাসূল কারীম-সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর প্রতি ঈমান রাখা একজন ঈমানদারের জন্য ‘আমানাহ্’। সেভাবে মেনে না নিলে হবে ‘খিয়ানাহ্’। আমাদের সম্মানিত রাসূল নিষ্পাপ, সকল মানবিক গুণে পরিপূর্ণ এবং সকল যুগের সকল মানুষের জন্য একমাত্র পরিপূর্ণ আদর্শ(সূরা আহযাব: ২১)। রাসূল কারীম সাল্লাল্লাহু ওয়া সাল্লাম এর সুন্যাহ গ্রহণ না করা, তাঁকে পরিপূর্ণ আদর্শ হিসেবে মেনে না নেওয়া কিংবা তাঁর যাবতীয় আদেশ-নিষেধকে গুরুত্ব না দেয়া হচ্ছে ‘খিয়ানাহ্’। তাই মহান আল্লাহ্‌ বলেন,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

“হে ঈমানদারগণ, তোমরা মহান আল্লাহ্‌ ও তাঁর রাসূলের সাথে কখনো বিশ্বাসঘাতকতা করো না এবং জেনেগুনে নিজেদের আমানতেরও খিয়ানত করো না”(সূরা আনফাল: ২৭)।

৩। বান্দার অধিকার সংক্রান্ত

মানুষ সমাজবদ্ধ জীব। মানুষ কখনো একাকী জীবন যাপন করতে পারে না। সমাজ জীবনে একে অপরের সহায়তা নিতে বাধ্য। এভাবে পরস্পরের মধ্যকার আচরণের নাম মু’আমালাত। মু’আমালাত তথা পারস্পরিক লেনদেনে বিশ্বাসঘাতকতা না করে আমানতদারী রক্ষা করাও ঈমানের দাবি। মুমিনগণ সকল প্রকারের ‘আমানাহ্’ সংরক্ষণকারী। মহান আল্লাহ্‌ বলেন,

وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ

‘আর তারা এমন লোক, যারা আমানাহ্‌ ও প্রতিশ্রুতিসমূহের সংরক্ষণকারী’(সূরা আল মুমিনুন: ০৮)।

কোনো ব্যক্তির নিকট অপর ব্যক্তি, সমাজ বা রাষ্ট্রের অধিকার বা ন্যায্য দাবিই হচ্ছে ‘আমানাহ্’। অতএব সমাজের প্রত্যেক ব্যক্তি আমানতের দায়িত্বপ্রাপ্ত। স্ব স্ব আমানতের বিষয়ে প্রত্যেক ব্যক্তি শেষ বিচারের দিবসে জিজ্ঞাসিত হবে। প্রত্যেক পেশার সাথে জড়িত ব্যক্তির জন্য ‘আমানাহ্’-এর প্রকৃতি ও পরিধি ভিন্ন ভিন্ন। বান্দার হকের ভিত্তিতে প্রসিদ্ধ কয়েক শ্রেণির মানুষের আমানতদারী ও বিশ্বাসপরায়ণতা সম্পর্কে নিম্নে আলোকপাত করা হলো:

(ক) শাসক

প্রত্যেক শাসক, প্রশাসক ও বিচারক হচ্ছেন আমানতের বড়ো বোঝা বহনকারী, সে আমানতদারী সম্পর্কে তারা হাশরের ময়দানে জিজ্ঞাসিত হবেন। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, রাষ্ট্রীয় পদ হচ্ছে ‘আমানাহ্’। নিঃসন্দেহে কেয়ামতের দিন তা হবে লাঞ্ছনা ও লজ্জার কারণ। কেউ যদি সে পদের হক সঠিকভাবে আদায় করতে পারে, তাহলে ভিন্ন ব্যাপার(আবু হানিফা, নুমান ইবন ছাবিত ২০১৬, ৫২৬ ও বুখারী ১০৫৮)। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরো বলেছেন, কোনো শাসক যদি কিছু সংখ্যক মুসলমানের শাসন ক্ষমতা লাভ করেন, আর সে শাসক ওই মুসলমানদের প্রতি বিশ্বাসঘাতক হিসাবে মৃত্যুবরণ করেন, তাহলে মহান আল্লাহ্‌ সে বিশ্বাসঘাতক শাসকের জন্য বেহেশত হারাম করে দেন(বুখারী ৪৪১)। অতএব প্রতিষ্ঠান, সংস্থা,

মানবজীবনে “আল-আমানাহ্ ও আল-খিয়ানাহ্”-এর স্বরূপ এবং সমাজ জীবনে এর প্রতিফলন: একটি পর্যালোচনা

সমাজ ও রাষ্ট্রের কর্ণধার ও পরিচালকবৃন্দ মাথার উপর বিরাট বোঝা বহনকারী। আমানতদারী সম্পর্কে তাদের জবাব দিতেই হবে।

(খ) শিক্ষক

একজন শিক্ষক নিঃসন্দেহে সমাজের অতি সম্মানী ব্যক্তি। শিক্ষক একটি জনপদের পথপ্রদর্শক। একজন শিক্ষক সমাজ পরিচালকদের কারিগর। তাই সকল প্রকার ‘খিয়ানাহ্’ থেকে আত্মরক্ষা করা একজন শিক্ষকের জন্য অতীব জরুরি। একজন শিক্ষকের জন্য আমানতদার হিসেবে পেশাগত দায়িত্ব পালন করতে হলে নিম্নোক্ত বিষয়সমূহ প্রণিধানযোগ্য:

(১) আমানাত ও খিয়ানত সম্পর্কে যথার্থ জ্ঞান

একজন শিক্ষককে জানতে হবে আমানতদারী ও খিয়ানতের পরিধি সম্পর্কে। কোনো বিষয়ের নির্ধারিত সীমা না জানলে তা রক্ষা করাও সম্ভব হয় না। একজন শিক্ষকের উচিত তাঁর দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা লাভ করা। এ প্রসঙ্গে মহান আল্লাহ্ বলেছেন, হে রাসূল, আপনি বলুন, যারা জানে আর যারা জানে না তারা সমান হতে পারে না (সূরা যুমার: ০৯)।

(২) পাঠদান প্রস্তুতি গ্রহণ করা

পাঠদানের জন্য একজন শিক্ষকের পাঠদান প্রস্তুতি গ্রহণ করা বড়ো আমানত। শ্রেণিকক্ষে ছাত্রদের সামনে নির্ধারিত সময়ের জন্য সাজানো গোছানো একটি মানব অবয়ব উপস্থাপন করার নাম শিক্ষাদান নয় নিঃসন্দেহে। ছাত্ররা বুঝে না এমন পাঠদান কিংবা গল্প-গুজবের মাধ্যমে সময় কাটানো খিয়ানাত। শিক্ষকের পাঠপ্রস্তুতি না থাকলে ছাত্রদের প্রাসঙ্গিক প্রশ্নে শিক্ষকের মাথা গরম হয়ে যায়। যে শিক্ষক স্বার্থপরতার নেতৃত্ব দেন, বিভিন্ন দপ্তরে তদবির করেন, অন্য শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের পার্ট-টাইম ক্লাস এবং সারাক্ষণ ব্যবসা-বাণিজ্য ও খতম-দাওয়াতে ব্যস্ত থাকেন, সংশ্লিষ্ট বিষয় অধ্যয়ন না করেন, তিনি কীভাবে খিয়ানত থেকে আত্মরক্ষা করবেন? দুই যুগ পূর্বের নোট নিয়ে বর্তমান কালে পাঠদান করলে ছাত্রদের হক কি আদায় হবে? প্রস্তুতিহীন পাঠদানে শিক্ষার্থীদের কোনো উপকার যেমন থাকে না, তেমনিভাবে তাতে কোনো ফলও অর্জিত হয় না। তাইতো দেখা যায়, কোনো কোনো শিক্ষকের শ্রেণিকক্ষে ছাত্রদের সংখ্যা এতই কম, যেন সে শিক্ষক একজন এতিম, উপায় উপকরণহীন। সংশ্লিষ্ট বিষয়ে সর্বাধুনিক তথ্য উপস্থাপন করা একজন শিক্ষকের জন্য আমানত। প্রতিবছর একই বিষয় একই রূপে বারবার উপস্থাপন করা বড়ো খিয়ানাত।

(৩) সর্বোচ্চ সামর্থ্য ব্যয় করে পাঠদান করা

একজন আমানতদার শিক্ষকের উচিত পাঠদানে আধুনিক সকল উপায় উপকরণ ব্যবহার করা। পরিকল্পিতভাবে সহজ উপায়ে পাঠদান করা, মেধাহীন ছাত্রদের প্রতি বিশেষভাবে দৃষ্টি দান করা, সময়ের সদ্ব্যবহার করে ছাত্রদেরকে অধিকতর যোগ্য করে গড়ে তোলার লক্ষ্যে আশ্রয় প্রচেষ্টা চালানোও একজন শিক্ষকের কর্তব্য। প্রত্যক্ষ কিংবা পরোক্ষভাবে ছাত্রদেরকে প্রাইভেট পড়তে নির্দেশনা দেয়া বা উৎসাহিত করা, সহজভাবে পাঠদান না করে কোনো গাইড বই বা নোট বইয়ের প্রতি পরামর্শ দেয়া বড়ো খিয়ানত। প্রাইভেট পড়ানোর জন্যও অনেক শিক্ষক শ্রেণিকক্ষে ইচ্ছাকৃতভাবে সিলেবাস শেষ করেন না। শ্রেণিকক্ষে সকল ছাত্রছাত্রীকে পাঠের প্রতি আকৃষ্ট না করা ও খিয়ানত। শ্রেণিকক্ষে মোবাইল ফোন ব্যবহার করা, ছাত্রদের সাথে গল্প করা, নির্দিষ্ট সংখ্যক ছাত্রদের প্রতি মনোনিবেশ করে পাঠদান করাও বিশ্বাসঘাতকতার অন্তর্ভুক্ত। শ্রেণিকক্ষে

দেরিতে যাওয়া ও নির্ধারিত সময়ের পূর্বে শ্রেণিকক্ষ হতে চলে আসা চাতুর্যপূর্ণ খিয়ানত। পাঠকে সহজবোধ্য করার জন্য সর্বোচ্চ প্রচেষ্টাও আমানতদারী। উল্লেখ্য, বিশ্বাসঘাতক শিক্ষকের বেতন বা উপার্জন কখনো হালাল হবে না। আর অবৈধ উপার্জনের খাবার খেয়ে ইবাদত-বন্দেগী করলে মহান আল্লাহ সে ইবাদত, দান সদকা কবুল করেন না। যেহেতু নবী (সা.) বলেছেন, মহান আল্লাহ পবিত্র-হালাল (বৈধ) ছাড়া কিছুই গ্রহণ করেন না (বুখারী, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৮৯)। এ ক্ষেত্রে কুরআন হাকিম-এর ঘোষণা নিম্নরূপ:

وَيَلِّ لِلْمُطَفِّينَ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ. وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ.

“দুর্ভোগ তাদের জন্য যারা মাপে কম দেয়। যারা মানুষের কাছ থেকে যখন মাপে নেয় তখন পুরোপুরি আদায় করে নেয়, আবার নিজেরা যখন (অন্যের জন্য) কিছু ওজন কিংবা পরিমাপ করে তখন কম দেয়” (সূরা আল-মুত্‌ফফীন: ১-৩)।

উপরোক্ত আয়াতমসূহের বিধান কেবল ওজন ও পরিমাপের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়; বরং আল্লাহ ও বান্দার হকের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। এমনকি কোনো প্রশাসক, কর্মকর্তা, মজুর-কর্মচারী যদি চুক্তিভিত্তিক কাজ না করে কিংবা সময় না দেয় সেও একই অপরাধী ও শাস্তির যোগ্য (মুফতী মুহাম্মদ শফী ১৯৯৮, ৬৯৩-৬৯৪)।

(৪) সততায় নিজেকে অনুকরণীয় হিসেবে উপস্থাপন করা

একজন শিক্ষকের আমানতদারীর দাবি হলো, তিনি হবেন চরিত্রবান ও সৎ গুণাবলিতে গুণান্বিত। সততা, নিষ্ঠা ও ন্যায়পরায়ণতায় তিনি হবেন মূর্ত প্রতীক। তিনি সুশিক্ষা যেমন দেবেন, তেমনিভাবে নিজেকেও সে ক্ষেত্রে নমুনা হিসেবে পেশ করবেন। তাঁর চলাফেরা, কথাবার্তা, খাওয়া দাওয়া, স্বভাব-চরিত্র সবকিছুই ছাত্রদের জন্য হবে চুম্বকের মতো আকর্ষণকারী। একজন ছাত্র অনুসরণের জন্য একজন পরিপূর্ণ সৎ ও আদর্শবান লোক হিসেবে তার শিক্ষককেই বেছে নেবে। কেবল পুঁথিগত পাঠদান করে একজন আমানতদার শিক্ষক হওয়া যায় না। সৎ গুণাবলি অবলম্বন ও অসদগুণাবলি বর্জনের ক্ষেত্রে একজন শিক্ষক ছাত্রদের জন্য অনুপ্রেরণা লাভের উৎস হবেন। তাই একজন শিক্ষক ধূমপায়ী, তামাকসেবী বা মাদকসেবী হতে পারেন না। তিনি অশ্লীল শব্দ ও বাক্য প্রয়োগ করতে পারেন না। শ্রেণিকক্ষে ছাত্রদের গালমন্দ করা, অন্য শিক্ষকের নিন্দা করা, ছাত্রদের সাথে আশ্বলিক বা নিচু ভাষায় কথা বলা, তুই তোকারি বলা ও আপত্তিকর অঙ্গভঙ্গি একজন শিক্ষকের জন্য খিয়ানত। প্রকৃতপক্ষে একজন খিয়ানতকারী তথা বিশ্বাসঘাতক ব্যক্তি কখনো আদর্শ শিক্ষক হতে পারেন না।

অন্যায়ভাবে পরীক্ষার উত্তরপত্রে নম্বর দেয়া, অগ্রিম প্রশ্ন বলে দেয়া বা অন্যায়ভাবে পরীক্ষার হলে সহায়তা করা কিংবা পরীক্ষার হলে অসদুপায় অবলম্বনের সুযোগ দেয়া একজন শিক্ষকের জন্য যে বড়ো অপরাধ-এ কথা অবৈধ সুযোগ গ্রহণকারী ছাত্ররাও ভবিষ্যতে কোনো একদিন অনুভব করবে ও বলবে। সার্টিফিকেট ও তথ্য জালিয়াতি করে কিংবা শর্ত পূরণ না করে শিক্ষকতার পদে অধিষ্ঠিত হলে ছাত্রদের সামনে একজন শিক্ষক কি নিজেকে সৎ প্রমাণ করতে পারেন? যে বিষয়ে নিয়োজিত শিক্ষক, সে বিষয়ে পাঠদান করাই আমানাত, অন্যথায় তা খিয়ানাত। একজন শিক্ষক যদি শিক্ষক বা কর্মচারী নিয়োগে পক্ষপাতিত্ব করেন কিংবা অযোগ্য প্রার্থীকে যোগ্য ঘোষণা করেন বা কর্তৃপক্ষ নির্ধারিত সম্মানী পাওয়ার পরেও অর্থ, আতিথেয়তা বা কোনো উপটোকন দাবি করেন বা তদবির করেন তাহলে তিনি নিকৃষ্ট খিয়ানতকারী ও অপরাধী। শিক্ষকের জীবনের প্রত্যেকটি দিক হবে পরিচ্ছন্ন ও অনুকরণীয়। এক্ষেত্রে মহান আল্লাহ’র নিম্নোক্ত বাণী প্রণিধানযোগ্য:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ

মানবজীবনে “আল-আমানাহ্ ও আল-খিয়ানাহ্”-এর স্বরূপ এবং সমাজ জীবনে এর প্রতিফলন: একটি পর্যালোচনা

“হে মুমিনগণ, তোমরা এমন কথা কেন বলো, যা তোমরা বাস্তবে করো না” (সূরা হুফ্ফ: ০২)।

(গ) ছাত্র-ছাত্রী

ছাত্র-ছাত্রীদের ওপরও রয়েছে আমানতের বড়ো দায়িত্ব। তারা যেহেতু পরিবার ও সমাজের কল্যাণকর কোনো ভূমিকা পালন করা থেকে মুক্ত হয়ে বৃহৎ কল্যাণে জ্ঞানার্জনে আত্মনিয়োগ করে, সেহেতু যথাযথ জ্ঞানার্জনে সকল শক্তি-সামর্থ্য নিয়োগ করাই বড়ো আমানত। জ্ঞানার্জনে সাধ্য অনুযায়ী প্রচেষ্টা না চালানো, এতে অবহেলা করা ও সময় নষ্ট করা তার পক্ষ থেকে খিয়ানত। অসৎ চরিত্র পরিহার করে সৎ চরিত্র অবলম্বনে সর্বদা সচেতন থাকা তার জন্য আমানতদারী। নিম্নোক্ত বিষয়সমূহও একজন ছাত্রের জন্য আমানতদারীর অন্তর্ভুক্ত।

১. শিক্ষকবৃন্দের সম্মান করা

সম্মানিত শিক্ষকবৃন্দ ছাত্রদের জন্য পিতৃতুল্য অভিভাবক। তাঁরা ছাত্রদের জন্য জ্ঞানের আলো লাভ করার উপায়। তাই তাঁদের প্রতি যথাযথ শ্রদ্ধাবোধ পোষণ করা, আচরণে সম্মান প্রদর্শন করা। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য, মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যারা ছোটদের প্রতি স্নেহশীল না, এবং বড়োদের প্রতি সম্মান প্রদর্শনে তৎপর নয়, তারা আমাদের দলভুক্ত নয়। তাদের ব্যাপারে অসদাচরণ থেকে বিরত থাকা, তাদের জীবদ্দশায় যথাসম্ভব উপকার সাধনের চেষ্টা এবং মৃত্যুর পর তাদের মাগফিরাত ও কল্যাণ কামনা করা ছাত্রদের আমানতদারীর অন্তর্ভুক্ত (ড. মুহাম্মদ নেজামুদ্দীন ১২৩)।

২. শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কল্যাণ সাধন

ছাত্ররা যে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অধ্যয়ন করে, সে প্রতিষ্ঠানের কল্যাণ সাধনের প্রচেষ্টা চালানো ছাত্রদের জন্য আমানাহ। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কোনো ধরনের ক্ষতি সাধন সে করবে না। প্রতিষ্ঠানের কোনো সম্পদ সে নষ্ট করবে না, কিংবা অন্যায়ভাবে নিজের দখলে রাখবে না। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের দুর্নাম হয় এমন আচরণ কোথাও করবে না। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের পাওনা-ফি আদায়ে গড়িমসি করবে না অথবা আদায় না করে পালিয়ে যাবে না। ছাত্রত্ব শেষ করার পরেও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের উপকার করা একজন ছাত্রের নৈতিক দায়িত্ব। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি অপর মানুষের (উপকারের) কৃতজ্ঞতা জানায় না, সে আল্লাহ্‌র শোকরও আদায় করে না (আবু দাউদ ৬৬২)।

৩. অধ্যয়ন ও চরিত্র গঠনে পুরোপুরি আত্মনিয়োগ করা

অধ্যয়ন করাই ছাত্রদের প্রধান কর্তব্য। জ্ঞানার্জনে ও আখলাক সংশোধনে সে পূর্ণ প্রচেষ্টা চালাবে। নিয়মিত অধ্যয়ন না করে পরীক্ষার দিনসমূহের জন্য পাঠসমূহ রেখে দেয়া তার জন্য খিয়ানত। কেননা সে তার মেধা, চক্ষু, কর্ণ, সুস্থতা ইত্যাদি নেয়ামতের অপব্যবহার করে নিজেকে ধ্বংস ও অপরাধের দিকে নিয়ে যাচ্ছে। পরীক্ষায় যে-কোনো প্রকারের অসদুপায় অবলম্বন করা হারাম ও খিয়ানত। সে তার শিক্ষাজীবনে অধ্যয়ন ও জ্ঞানার্জনের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধক হয় এমন কোনো কর্মে জড়িয়ে পড়বে না। প্রচলিত রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে সে অংশগ্রহণ করবে না। অধ্যয়নের পাশাপাশি সে ইসলামের মৌলিক ইবাদতসমূহ পালন করবে নিষ্ঠার সাথে। সে বিপথগামী ও উচ্ছৃঙ্খল সহপাঠীদের সঙ্গ থেকে সর্বাবস্থায় আত্মরক্ষা করবে। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ও শিক্ষকবৃন্দের পক্ষ থেকে আরোপিত সকল নিয়মকানুন শ্রদ্ধাভরে মেনে নেয়া হচ্ছে ছাত্রদের জন্য আমানতদারী। শ্রেণিকক্ষে অনুপস্থিত থাকা বা দৈনিক পাঠসমূহ শিখে না রাখা একজন ছাত্রের জন্য খিয়ানত তথা বিশ্বাসঘাতকতা। বর্তমানে

অপ্রয়োজনে ও অনিয়ন্ত্রিতভাবে মোবাইল ফোন ব্যবহার করা বা অশ্লীল অনুষ্ঠানাদি ভোগ করাও ছাত্রদের জন্য গর্হিত কাজ ও খিয়ানত।

(ঘ) চিকিৎসক

একজন ডাক্তার হচ্ছেন অসুস্থ লোকদের আমানতদার। রোগীর কল্যাণ কামনা করে মেধার যথার্থ প্রয়োগের মাধ্যমে সততার সাথে চিকিৎসা করাই একজন ডাক্তারের জন্য আমানত। এর বিপরীত আচরণ খিয়ানত। রোগ নির্ণয় না করতে পেরেও চিকিৎসা কার্য চালিয়ে যাওয়া, রোগী দেখার সময় পর্যাপ্ত সময় না দেয়া, প্যাথলজি থেকে কমিশন নেওয়া, কমিশন নিয়ে অপ্রয়োজনীয় বা তুলনামূলক নিম্নমানের ঔষধ নির্বাচন করা, বিনা প্রয়োজনে প্যাথলজিক্যাল পরীক্ষার নির্দেশ দেয়া, সঠিক সময়ে কর্মস্থলে না থাকা, নির্ধারিত কর্মস্থলে প্রাইভেট চিকিৎসা করা, কর্মস্থলে থাকলেও রোগীর প্রতি মনোযোগ না দেয়া সুস্পষ্ট খিয়ানত। একজন চিকিৎসকের সর্বোচ্চ খিয়ানত হচ্ছে মানব হত্যা। অনেকাংশে চিকিৎসকের ভূমিকা ডাকাত, ঘুষখোর ও প্রতারকের চরিত্রে রূপান্তরিত হয়। রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, শঠতা ও প্রতারণার কারণে ব্যক্তি জাহান্নামে প্রবেশ করবে (আয-যাহাবী ২৭১)।

(ঙ) অন্যান্য পেশাজীবী

সকল প্রকার খিয়ানত পরিহার করে আমানতের গুণে সার্বক্ষণিক গুণান্বিত থাকা ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে প্রত্যেক সৎ নাগরিকের জন্য আবশ্যিক। বিশেষ করে সমাজের সকল পেশাজীবীর জন্য আমানতের গুণ অত্যাবশ্যিক। একজন ব্যবসায়ীর জন্য আমানত হচ্ছে ওজনে কম না দেয়া, মিথ্যা না বলা, নিম্নমান বা ভেজাল পণ্য বিক্রি না করা। একজন আইনজীবীর উচিত অপরাধী ও অসৎ লোকের পক্ষে আইনি লড়াই না করা, সৎ নিরীহ নাগরিকের বিপক্ষে না দাঁড়ানো। যে-কোনো দফতর প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তাদের আমানত হলো অবৈধ সুবিধা গ্রহণ না করা, কমিশন না খাওয়া, যোগ্য প্রার্থীকে বঞ্চিত করে তুলনামূলক কমযোগ্য প্রার্থীকে নিয়োগ না দেয়া বা পদায়ন না করা এবং মান ও গুণ-এর ব্যাপারে আপোষ না করা। একজন আলিম তথা ইসলামী বিশেষজ্ঞ ও ধর্মীয় বক্তার আমানতদারী হচ্ছে, সত্যকে গোপন না করা, পার্থিব স্বার্থকে প্রাধান্য না দেয়া ও ধর্মীয় ভেদাভেদ বা অনৈক্য সৃষ্টি না করা।

এভাবে মালিক, শ্রমিক কর্মচারী, জনপ্রতিনিধি, সকল প্রকার চাকুরে, পরিবারের কর্তা ও সকল নাগরিকের উপর রয়েছে আমানত তথা সততার দায়িত্ব। আর সেই দায়িত্ব পালনের ব্যাপারেই আমরা জিজ্ঞাসিত হবো শেষ বিচারালয়ে। তাইতো মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

أَلَا كَلِمَ رَاعٍ وَكَلِمَ مَسْنُولٍ عَنْ رَعِيَّتِهِ

“জেনে রাখো, তোমরা সবাই দায়িত্বশীল, তোমরা সবাই সে দায়িত্বের ব্যাপারে জিজ্ঞাসিত হবে” (বুখারী ১০৫৭)।

উপসংহার

একটি সুন্দর ও ভারসাম্যপূর্ণ সমাজ ও রাষ্ট্রের জন্য অনিবার্য শর্ত হলো সংশ্লিষ্ট লোকদের আমানতদারীর গুণ। অনুরূপভাবে একটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের মান, অগ্রগতি ও সার্বিক শৃঙ্খলা নির্ভর করে এর সংশ্লিষ্ট জনবলের আমানতদারী চর্চার উপরে। আমানতদারী পরিহার করে খিয়ানাত করা সমাজ ও ব্যক্তির পতন ও ব্যর্থতার মূল

মানবজীবনে “আল-আমানাহ্ ও আল-খিয়ানাহ্”-এর স্বরূপ এবং সমাজ জীবনে এর প্রতিফলন: একটি পর্যালোচনা

কারণ। আমানতদারী উঠে যাওয়া কেয়ামত তথা মহাপ্রলয়ের আলামত। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

أول ما يرفع من الناس الأمانة

“মানবজাতি থেকে প্রথমে যে সদগুণ উঠে যাবে তা হলো আমানত”(আয-যাহাবী ১৭৪)। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরো বলেছেন, শেষ যুগে কর্মস্থল ও লেনদেনে আমানতদার একজন ব্যক্তি পাওয়াও মুশকিল হবে। এমনকি, একদিন বলা হবে অমুক গোত্রে একজন আমানতদার ব্যক্তি আছে। আরো বলা হবে, লোকটি কতই না জ্ঞানী, সাহসী, বিচক্ষণ, অথচ তার হৃদয়ে শস্যদানা পরিমাণ ঈমান নেই (বুখারী ১০৪৯-১০৫০)।

অতএব, মানব জাতির সার্বিক কল্যাণে, সমাজের সর্বক্ষেত্রে মানবিকতা রক্ষায় আমানত ও খিয়ানতের বিস্তৃত পরিধি সম্পর্কে যথাযথ অবগতি ও আরো গবেষণা সময়ের দাবি। বিশেষ করে একজন মুসলিমের জন্যে আমানতদারী পরিহার করে বাহ্যত: ধার্মিক বা সৎ পরিচয় দেয়ার সুযোগ যেমন নেই, তেমনিভাবে পরকালের অন্তহীন জীবনে পরিত্রাণ পাওয়ারও উপায় নেই। তাই “আমানাহ্ ও খিয়ানাহ্” প্রসঙ্গে সচেতনতা বৃদ্ধি করতে শিক্ষিত ও দায়িত্বশীল মহলের আরো জোরালো ভূমিকা প্রয়োজন।

গ্রন্থপঞ্জি

আবু দাউদ, সুলায়মান ইবনে আশআস। সুনান। ঢাকা: আল ফাতাহ লাইব্রেরী।

আবু হানিফা, নুমান ইবন ছাবিত। মুসনাদে ইমাম আযম আবু হানিফ (র.)। বাংলায় অনূদিত, ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ২০১৬।

ইব্রাহীম আল বারীকান (ড.)। আল-মাদখাল। রিয়াদ: দারুস সুন্নাহ, সৌদি আরব, ১৯৯২।

ইমাম আয-যাহাবী, মুহাম্মদ ইবন আহমদ শামসুদ্দীন। আল কাবাইর (মুসনাদে ইবনে আহমদের বরাতে)। কায়রো: দারুল হাদিস, ১৪২১ হিজরি।

কায়রানভী, ওয়াহিদুয়্যামান কাশেমী। আল-কামূসুল ওয়াহীদ। দেওবন্দ: কুতুবখানা হোসাইনিয়া, ভারত, ২০০১।

তিরমিযী, মুহাম্মদ ইবন ঈসা। আস-সুনান, ২য় খণ্ড। দেওবন্দ: থানভী লাইব্রেরী, ভারত।

বুখারী, আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে ইসমাইল। আল-জামিউল মুসনাদুস সাহীহুল মুখ্তাসার মিন উম্মির রাসূলিল্লাহি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ওয়া সুনানিহী ওয়া আয্যামিহী। দেওবন্দ: বাংলা ইসলামিক একাডেমী, ভারত।

বারকাতী, মুফতী আমীমুল ইহসান। কাওয়াইদুল ফিক্হ। দেওবন্দ: আশরাফী বুক ডিপো, ভারত।

মুফতী মুহাম্মদ শফী। মা'আরিফুল কুরআন ৮ম খণ্ড। দিল্লী: ফরীদ বুকডিপো, ১৯৯৮।

মুহাম্মদ নেজামুদ্দীন(ড.)। হক্কুল ইবাদ। চট্টগ্রাম: জমজম প্রকাশনী, ২০২১।

The Chittagong University Journal of Arts and Humanities

সা'দী আবুজীব। *আল-কামুসুল ফিক্‌হী*। করাচী: ইদারাতুল কুরআন ওয়াল উলূমিল ইসলামিয়াহ।
হাফিজ ইবনু কাছীর দিমাশকী, ইমামুদ্দীন ইসমাঈল, *তাফসীরুল কুরআনিল আজীম* ২য় খণ্ড। রিয়াদ:
মাকতাবাতু দারিস সালাম, ১৯৯২।

নির্বাসিতের আত্মকথা: ব্রিটিশ ভারত ও আন্দামান জেলের চিত্র (১৯০৮-১৯২১)

মোহাম্মদ মীর সাইফুদ্দীন খালেদ চৌধুরী*

প্রতিপাদ্যসার

দক্ষিণ এশিয়ার রাজনৈতিক ইতিহাসে চরমপন্থী দলসমূহের উত্থান ও কার্যাবলি স্বাধীনতা অর্জনের সংগ্রামকে অনন্য মাত্রা যুক্ত করে। ব্রিটিশ বিরোধী নিক্রিয় প্রতিরোধ ইংরেজদের বিবেককে জ্বালাত করতে একেবারেই ব্যর্থ হয়। তখন সন্ত্রাসবাদের মধ্যেই অরবিন্দ, বারীন্দ্র, হেমচন্দ্র, উপেন্দ্রনাথ প্রমুখ সাফল্যের হাতছানি দেখতে পাচ্ছিলেন। বঙ্কিম সাহিত্যও বিপ্লবীদের আদর্শগতভাবে উদ্বুদ্ধ করেছিল। বিশেষত ১৯০৫ সালের লর্ড কার্জনের ‘বঙ্গভঙ্গ’ এর সিদ্ধান্তে বিক্ষুব্ধ বাঙালি সমাজে বিপ্লববাদের উৎপত্তি। বিশ শতকের প্রথম দশকে বাংলায় আত্মপ্রকাশ করা বিপ্লবী সংগঠনের অন্যতম যুগান্তর। বারীন্দ্র কুমার ঘোষ, অরবিন্দ ঘোষ, হেমচন্দ্র কানুনগো, উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ এ দলের প্রধান সংগঠক। ১৯০৬ সালে যুগান্তর দলটি গঠিত হয়। ব্রিটিশ সরকার ১৯০৮ সালের ৩০ এপ্রিল কলিকাতার মানিকতলায় বাগান বাড়ী হতে গ্রুপটিকে গ্রেপ্তার করেন। এ সকল বন্দীদের প্রথমে আলীপুর জেলে পাঠানো হয়। ১৯০৯ সালে চূড়ান্ত বিচারের রায়ে উল্লাসকর, বারীন্দ্র, হেমচন্দ্র ও উপেন্দ্রনাথের ‘যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর’ দণ্ড হয়। এ সময়ে উপেন্দ্রনাথকে অন্যান্য রাজবন্দীদের সাথে আন্দামানের পোর্ট ব্লেয়ারের জেলে পাঠানো হয়। বিপ্লবী উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর সুদীর্ঘ বারো বৎসর জেলজীবন নিয়ে লিখেছেন *নির্বাসিতের আত্মকথা*। তিনি ব্রিটিশ ভারত ও আন্দামান জেলে তাঁর ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা এখানে তুলে ধরেছেন। আলোচ্য প্রবন্ধে এটির আলোকে ব্রিটিশ ভারত ও আন্দামান সেলুলার জেলের প্রশাসন, পরিবেশ, খাবার, শাস্তিসহ বিভিন্ন দিক উপস্থাপন করা হয়েছে।

ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি ও ব্রিটিশ সরকারের ভারত শাসন দক্ষিণ এশিয়ার জনগণের জন্য সুখকর ছিল না। এদেশের জাতীয়তাবাদী চেতনায় উদ্বুদ্ধ জনগণ দেশকে রক্ষার জন্য সর্বাত্মক সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়ে। বিশ শতকে

*সহযোগী অধ্যাপক, ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়

ইতালি, আয়ারল্যান্ড, পোলান্ডের ন্যায় দক্ষিণ এশিয়ায়ও স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা হতে বিভিন্ন গুপ্ত সমিতি অনিবার্যভাবে সৃষ্টি হয়েছে, যার অন্যতম সংঘটন যুগান্তর।^১ এটি প্রথমে পত্রিকা হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। পরবর্তীতে বারীন্দ্র কুমার ঘোষ, হেমচন্দ্র কানুনগো, অরবিন্দ ঘোষসহ বেশ কিছু একই ভাবাদর্শের তরুণকে নিয়ে বিপ্লবী দল যুগান্তর গঠিত হয়। এ যুগান্তরের একজন সক্রিয় সদস্য উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়^২। ১৯০৮ সালের এপ্রিলে ব্রিটিশ সরকার পুরো গ্রুপকে ধোঁকা দিতে প্রথমে আলীপুর প্রেসিডেন্সি জেলে প্রেরণ করেন। পরবর্তীতে বিচারের পর কয়েকজনকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দিয়ে আন্দামানে পাঠানো হয়। উপেন্দ্রনাথও আন্দামানে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত কয়েদী হিসেবে প্রেরিত হন। আলীপুর ও আন্দামান জেলে নিজের স্মৃতি তিনি *নির্বাসিতের আত্মকথা*^৩ গ্রন্থে তুলে ধরেছেন। এখানে লেখক নিজের কারা জীবন ও রাজনৈতিক জীবনের স্মৃতি উপস্থাপন করেছেন। লেখকের কারা স্মৃতি আলীপুরের প্রেসিডেন্সি জেল ও আন্দামানের পোর্ট ব্লেয়ারের সেলুলার জেল দুই ভাগে বিভক্ত। এটিতে তৎকালীন সময়ের রাজনীতি, সমাজ ও ব্রিটিশ ভারতে আন্দামান কারাগারের বাস্তব চিত্র উঠে এসেছে। বিশ শতকের প্রথম দুই দশকে ব্রিটিশ শাসনামলে দক্ষিণ এশিয়ার সমাজ, রাজনীতি, সরকারের প্রতিহিংসামূলক আচরণ ও কৌশল, কারাগারের পরিবেশ এবং বন্দীদের সুযোগ সুবিধা প্রভৃতি তাঁর লিখায় স্থান পেয়েছে। আলোচ্য প্রবন্ধে তৎকালীন সময়ের রাজনীতি, রাজবন্দীদের অবস্থা এবং আন্দামান জেলের পরিবেশ ও প্রশাসন প্রভৃতি বিষয় সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে।

দক্ষিণ এশিয়ায় ব্রিটিশ বিরোধী স্বাধীনতা সংগ্রামে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল, গুপ্তসমিতি ও সংঘটন যুক্ত হয়। এসকল সংঘটনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য শোষণের হাত থেকে মুক্তি ও স্বদেশের স্বাধীনতা। এ বিষয়ে সমগ্র দক্ষিণ এশিয়ায় অসংখ্য প্রবন্ধ ও গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। এ সকল বিপ্লবীদের আত্মজীবনী, ইতিহাস ও জেল জীবন নিয়েও অনেক লিখা রয়েছে। কিন্তু ব্রিটিশ ভারতের ভয়ংকর জেল হচ্ছে আন্দামান জেল। যার উপর লেখনি অপ্ৰতুল। এমতাবস্থায় ব্রিটিশ ভারতের জেল চিত্র তথা আন্দামান জেলের চিত্রের মাধ্যমে আলোচ্য সময়ে ব্রিটিশ শাসকদের চরিত্র আমরা অনুমান করতে পারি। অন্যদিকে স্বদেশের স্বাধীনতার জন্য এদেশীয় জনগণের প্রবল আকাঙ্ক্ষাও প্রতিফলিত হয়। বর্তমান সময়ে বাংলাদেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বকে সমুন্নত রাখার জন্য এসকল গবেষণা সাধারণ মানুষকে স্বদেশ প্রেমে উজ্জীবিত করবে যা এ গবেষণার লক্ষ্য। *নির্বাসিতের আত্মকথা* কারা- ইতিহাসের গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। এটি বাংলাদেশে ‘জেল ইতিহাস’ এর চর্চায় তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা রাখবে বলে মনে করি। সুতরাং এ ডিসকোর্সটির আলোচনায় গবেষণা কর্মটির যৌক্তিকতা রয়েছে।

প্রস্তাবিত গবেষণাটি মূলত মৌলিক (Primary) উৎসের ভিত্তিতে রচিত হয়েছে। অবশ্য ক্ষেত্রবিশেষে দ্বিতীয় (Secondary) উৎসের সহায়তা নেয়া হয়। মৌলিক উৎসের মধ্যে অপ্রকাশিত রিপোর্ট, রেকর্ড, বিভিন্ন অফিসিয়াল ডকুমেন্ট প্রভৃতি। বইপত্র, সংবাদপত্রসহ বিভিন্ন তথ্যসূত্র হলো দ্বিতীয় উৎস। প্রাথমিক ও দ্বিতীয় উৎসসমূহের তথ্যাবলী Cross Check করা হয় এবং কোয়ালিটিটিভ পদ্ধতিতে গবেষণা কর্মটি সম্পাদন করা হয়।

১৯০৬ সালের এপ্রিল মাসে সাপ্তাহিক যুগান্তর পত্রিকার প্রকাশনা শুরু হয়। দেবব্রত (স্বামী প্রজ্ঞানন্দ) ও ভূপেন (স্বামী বিবেকানন্দের ছোটভাই) সম্পাদক এবং আবিলাশ ম্যানেজার হিসেবে কাজ শুরু করেন। পরবর্তীতে দেবব্রত ‘নবশক্তি’তে যোগ দিলে বারীন্দ্র কুমার ঘোষ ও উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় পত্রিকাটি সম্পাদনা শুরু করেন। পত্রিকাটি শুরুতেই ব্রিটিশ শাসকদের বাঁধার সম্মুখীন হয় এবং সম্পাদক ভূপেন ও প্রিন্টার বসন্ত কুমারকে গ্রেপ্তার করা হয় (উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ২০১৪,৮)। পরবর্তীতে বারীন্দ্র বিপ্লবী মন্ত্রে দীক্ষিত হয়ে

বঙ্গ-ভঙ্গ বিরোধী আন্দোলন গড়ে তোলেন। তিনি ও তাঁর একশজন অনুসারী অস্ত্র, বিস্ফোরক দ্রব্য সংগ্রহ করে বোমা তৈরী করেন এবং বিপ্লবী দলের গোড়াপত্তন করেন যার নাম যুগান্তর।

প্রাথমিক বিপ্লবী দলের মধ্যে হেমচন্দ্র কানুনগো অন্যতম সংগঠক। তিনি বিদেশে গমন করেন এবং রাজনৈতিক ও সামরিক প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন। তিনি রাশিয়ান E9migrE9 হতে প্যারিসে প্রশিক্ষণ নেন। ১৯০৮ সালের জানুয়ারিতে ফিরে এসে কলিকাতার মানিকতলায় বারীন্দ্রনাথের বাগান বাড়ীতে ধর্মীয় স্কুল ও বোমার ফ্যাক্টরি স্থাপন করেন। ১৯০৮ সালের ৩০ এপ্রিল কেনেডি হত্যার কয়েক ঘণ্টার মধ্যে গ্রুপটিকে গ্রেপ্তার করা হয়। গ্রেপ্তারের পর বন্দীদের প্রথমে লালবাজার পুলিশ কোর্টে হাজির করা হয়। পরবর্তীতে আলিপুরের ম্যাজিস্ট্রেট কোর্টে হাজির করা হয়। ম্যাজিস্ট্রেট বার্লি (Birly) এর নির্দেশনানুযায়ী বন্দীদের আলিপুর জেলে পাঠানো হয়। লেখক আলীপুর জেলের বর্ণনায় লিখেন:

সাত হাত দৈর্ঘ্য ও পাঁচ হাত প্রশস্ত কুঠুরিতে তিনজনকে রাখা হয়েছে এবং কামরাটির এককোণে দুটি গামলা হচ্ছে শৌচাগার। কুঠুরির সামনে একটি ছোট বারান্দা। সেখানে হাতমুখ ধোয়া ও স্নানাহার করার ব্যবস্থা রয়েছে। বারান্দার সামনে সরু লম্বা উঠানের শেষ প্রান্তেই সুউচ্চ প্রাচীর (উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ৩৬)।

আলীপুর জেলে দৈনিক খাবারের মধ্যে সকালে লাপসি, যা হচ্ছে ফেন মেশানো ভাত। সাড়ে দশটায় এক বাটি রেশুন চালের ভাত, অড়হর ডাল, পাতা ও ভাঁটা সিদ্ধ এবং একটু তেঁতুল গোলা। সন্ধ্যায়ও একই খাবার সরবরাহ করা হয়। জেলের ৪৪ ডিগ্রীতে তিনটি কামরায় প্রায় চল্লিশ থেকে পঞ্চাশ জন কয়েদীকে রাখা হয়েছে। পরবর্তীকালে ডাক্তারের নির্দেশে একটি ওয়ার্ড খালি করে সবাইকে রাখা হয়। এ সময়ে ডাক্তার বন্দীদের জন্য বাইরের ফলমূল, মিষ্টান্ন পাবার ব্যবস্থা করেন। রাজবন্দী সুশীল সেনের পিতা ও অন্যান্য বন্দিগণের আত্মীয়রা প্রায়ই আম, কাঠাল ও মিষ্টান্ন পাঠাত। কলিকাতার ‘অনুশীলন সমিতি’র^৪ ছেলেরাও মাঝে মাঝে ঘি, চাল, মসলা ও মাংস সরবরাহ করেছে। এজন্য প্রাথমিক পর্যায়ে জেলের নিষ্ঠুর বাস্তবতা রাজবন্দীরা বুঝতে পারেননি। কিন্তু ধীরে ধীরে কারাগারের কঠোরতা ও নির্মম বাস্তবতা তাঁরা অনুধাবন করেন। লেখকের মতে, ‘তাঁর দেড় বৎসরের বাচ্চাকে কোলে নিয়ে আদর করতে ব্যর্থ হয় তখন কারাগারের প্রকৃত বাস্তবতা অনুভব করেছেন’ (উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ৪২-৪৩)।

অন্যদিকে কলকাতায় আসামীদের রাষ্ট্রদ্রোহীতার অভিযোগে ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে বিচার শুরু হয় এবং মিথ্যা সাক্ষীর জন্য বিপ্লবীদের মধ্যে নরেন্দ্র গোস্বামীকে রাজসাক্ষী করা হয়। নরেন সরকারী সাক্ষী হওয়ার পর ইউরোপীয় প্রহরীর তত্ত্বাবধানে পৃথকভাবে রাখা হয়। কেউ তাকে আক্রমণ করার ভয়ে জেলারগণ সর্বদা সতর্ক থাকত। বন্দীদের মধ্যে কানাইলাল দত্ত ও সত্যেন ব্যাপারটিকে সহজভাবে নেয়নি। তারা অসুস্থতার কথা বলে হাসপাতালে অবস্থান করেন এবং কৌশলে পিস্তল সংগ্রহ করেন। সত্যেন রাজসাক্ষী হওয়ার ইচ্ছা নরেনের নিকট প্রকাশ করেন। কিন্তু পুলিশকে কি কি বলতে হবে তা দু’জনে পরামর্শ করে ঠিক করার জন্য নরেনকে হাসপাতালে ডেকে পাঠায়। নরেন হাসপাতালে আসার পর সত্যেন ও কানাইলাল নরেনকে গুলি করে হত্যা করেন (উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ৪৭)। এ ঘটনার পর কানাইলাল ও সত্যেনসহ সকল বন্দীকে পুনরায় জেলে ৪৪ ডিগ্রীতে হস্তান্তর করা হয়। এ সময়ে হাসপাতালে যাওয়া সম্পূর্ণ বন্ধ এবং অসুখ হলে জেলের কুঠুরিতেই

পড়ে থাকতে হয়। কেউ কারও সাথে কথা বলা নিষেধ এবং সারাদিন কুঠুরির মধ্যে থাওয়া ও অন্যান্য কাজ সারতে হয়। কারাগারে দেশীয় প্রহরীর পরিবর্তে ইউরোপীয় প্রহরী দেওয়া হয় এবং রাত্রে একদল গোরা সৈন্য জেলের ভিতর ও বাইরে পাহারা দেয়। জেল কর্তৃপক্ষের সন্দেহ হয় যে, বিপ্লবীরা জেল হতে পালাতে পারে। জেলের অন্য অংশ হতে কোন লোক রাজবন্দীদের ৪৪ ডিগ্রিতে প্রবেশ করতে পারত না। প্রথম দুই কুঠুরিতে কানাইলাল ও সত্যেনকে আবদ্ধ করে রাখা হয়। অন্যান্য কয়েদীগণ পাঁচ-সাত দিন পর পর এক কুঠুরি হতে অন্যকুঠুরীতে বদলী হতে পারত। সকালে ও বিকালে আধঘন্টা করে সবাই ঘুরা ফেরা করলেও পরস্পরের কাছে যাওয়া এবং কথা বলা সম্ভব হত না। জেলে হত্যাকাণ্ডের ঘটনায় সত্যেন ও কানাইলাল এর বিচারের চূড়ান্ত রায়ে মৃত্যুদণ্ড হয়। কানাইলাল এর ফাঁসির দিন নির্ধারিত হলে তাঁর সাথে দেখা করার জন্য জেলার সবাইকে সুযোগ করে দেয়। সাক্ষাতের সময় কানাইলালের প্রশান্ত ও দৃষ্টিভঙ্গি মুখাবয়ব দেখে বিপ্লবীগণ বিস্মিত হন। ফাঁসির সময় তাঁর বীরত্বপূর্ণ মুখচ্ছবি ও কালীঘাটের শ্মাশানে জনতার উচ্ছ্বাসে দেখে ব্রিটিশ সরকারও ভয় পায়। লেখকের ভাষায়:

কিন্তু ফাঁসির সময় তাহার নির্ভীক, প্রশান্ত ও হাস্যময় মুখশ্রী দেখিয়ে জেলার কর্তৃপক্ষরা বেশ একটু ভাবাচাকা হইয়া গেলেন। একজন ইউরোপীয় প্রহরী আসিয়া চুপি চুপি বারীন্দ্রকে জিজ্ঞাসা করিল, ‘তোমাদের হাতে এ রকম ছেলে আর কতগুলি আছে’। যে উন্মত্ত জনসঙ্ঘ কালীঘাটের শ্মাশানে কানাইলালের চিতার উপর পুষ্পবর্ষণ করিতে ছুটিয়া আসিল, তাহারাই প্রমাণ করিয়া দিল যে, কানাইলালে মরিয়াও মরে নাই (উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ৪৯)।

জনতার এমন উচ্ছ্বাসের জন্য সত্যেনকে ব্রিটিশ সরকার গোপনে ফাঁসি দিতে বাধ্য হয়। কলিকাতায় জেলের কুঠুরিতে থাকাকালীন সময়ে আলিপুর জজের কাছে অন্যান্য আসামীদের বিচার আরম্ভ হয়। বিপ্লবীরা টাকার অভাবে ঠিকমত মামলা পরিচালনা করতে পারেনি। শুধু চিত্তরঞ্জনদাশ বিপ্লবীদের পক্ষে প্রায় বিনা খরচে মামলা পরিচালনা করেন। বারীন্দ্র ঘোষের ইউরোপে জন্ম হওয়ায় সরকার বিচারে বিদেশী অধিকারের প্রস্তাব দেয়। কিন্তু তিনি তা নাকচ করে দেন। মামলা চলাকালীন সময়ে কোর্টে যাওয়া আসার পথে হাত কড়ার ভিতর দিয়ে শিকল বাঁধা থাকত। কয়েদীগণকে দুপুরে শৌচকর্ম করতে হলে হাতকড়া অবস্থায় রাস্তা দিয়ে টেনে নিয়ে যেত। কোর্টের মামলায় বিভিন্ন ব্যক্তি তাদের বিরুদ্ধে মিথ্যা সাক্ষ্য দিচ্ছে এবং উকিলরা তাদের জেরা করছে যা সত্যিই দুঃখজনক ছিল। লেখকের ভাষায়:

সাক্ষীরা একে একে আসিয়া আমাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিয়া যাইত; আমাদের মনে হইত যেন থিয়েটার দেখিতে আসিয়াছি। উকিল-ব্যারিস্টারের জেরা, পুলিশ-কর্মচারীদের ছুটাছুটি, সবই যেন এক বিরাট তামাশা। আমাদের হাস্য-কোলাহলে মাঝে মাঝে আদালতের কাজকর্ম বন্ধ হইয়া যাইবার উপক্রম হইত। জজ সাহেব আমাদের হাতকড়া লাগাইবার ভয় দেখাইতেন, ব্যারিস্টাররা ছুটিয়া আসিয়া অরবিন্দ বাবুকে অনুরোধ করিতেন, “ছেলেদের একটু থামতে বলুন”। অরবিন্দ বাবু নির্বিকার প্রস্তর মূর্তির মত এক কোণে চুপ করিয়া বসিয়া থাকিতেন; ব্যারিস্টারদের অনুরোধের উত্তরে জানাইতেন যে, ছেলেদের উপর তাহার কোনও হাত নাই (উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ৫০-৫১)।

নির্বাসিতের আত্মকথা: ব্রিটিশ ভারত ও আন্দামান জেলের চিত্র (১৯০৮-১৯২১)

১৯০৯ সালের মে মাসে এ রাষ্ট্রদ্রোহী মামলার রায় ঘোষণা করা হয়। এ রায়ে বারীন্দ্র ও উল্লাসকরের ফাঁসি হয় এবং দশজনের যাবজ্জীবন দীপান্তর। কয়েকজন আসামীকে পাঁচ থেকে সাত বৎসরের জেল এবং অরবিন্দ ঘোষসহ অন্যান্যরা খালাস পায়। কলিকাতার সেশস কোর্টের রায়ের পর জেলে সবাইকে পায়ে বেড়ি পরানো হয় এবং কুঠুরিতেই আবদ্ধ রাখা হয়। এ সময়ে বিপ্লবীদের উপর জেলখানায় অত্যাচার আরো বেড়ে যায়। তাদের সঙ্গে আদালতে ও জেলখানায় সরকারী কর্মকর্তা-কর্মচারীরা দুর্ব্যবহার করত। পুলিশ ইন্সপেক্টর শামসুল আলম সহ অন্যান্যরা পদোন্নতির আশায় মিথ্যা স্বাক্ষর জোগাড় করে বিপ্লবীদের ফাঁসানোর চেষ্টা করত। কিন্তু কোর্ট ইন্সপেক্টর আবদুর রহমানকে ভদ্রলোক হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়। বিপ্লবীদের দীপান্তরের সাজা হওয়ায় তাঁর সহানুভূতি প্রকাশের কথা লেখক উল্লেখ করেন। লেখক জেলের চিত্র বর্ণনায় দেওয়ালের লিখা একটি কবিতার উদ্ধৃতি দেন, যা নিম্নরূপ:

ছিঁড়িতে ছিঁড়িতে পাট শরীর হইল কাঠ
সোনার বরণ হৈল কালি।
প্রহরী যতক বেটা বুদ্ধিতে বোকা পাঠ
দিনরাত দেয় গালাগালি (উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ৫৬)।

রাজবন্দীরা কলিকাতার সেশস কোর্টের রায়ের বিরুদ্ধে আপিল করেন এবং ১৯০৯ সালের নভেম্বরে হাইকোর্টের রায় আসে। উল্লাস কর, বারীন্দ্র, হেমচন্দ্র ও উপেন্দ্রনাথের যাবজ্জীবন দীপান্তরের দণ্ড হয়। অন্যান্য আসামীদেরকে ভারতের অভ্যন্তরে বিভিন্ন জেলে পাঠানো হয়। আন্দামান নিকোবর ম্যানুয়াল অনুসারে যাবজ্জীবন দীপান্তর বলতে পঁচিশ বৎসর কারাবাসকে বুঝায়।

রাষ্ট্রদ্রোহী মামলায় সাজাপ্রাপ্ত হবার কিছু দিন পর সিভিল সার্জন এসে সবার স্বাস্থ্য পরীক্ষা করেন এবং অসুস্থতার জন্য উপেন্দ্র ও সুধীর ছাড়া অন্যান্যদের আন্দামানে পাঠানো হয়। ছয় সপ্তাহের মধ্যে তাদেরকেও খিদিরপুর ডক হয়ে জাহাজে করে আন্দামানে পাঠানো হয়। এ সময়ে এসকল রাজবন্দীদের মনের অবস্থা নাজুক ছিল কিন্তু তাঁরা মানসিকভাবে দৃঢ়তার পরিচয় দেন। রাজবন্দীদের অবস্থা সম্পর্কে লেখক বলেন:

জাহাজ উঠাইয়া দিয়া একজন সার্জেন্ট বিদ্রূপ করিয়া বলিল, ‘Now say native land farewell’
আমরা হাসিয়া বললাম ‘Ar revoir’ বলিলাম বটে কিন্তু ফিরিবার আশাটা নিতান্তই জবরদস্তি
মনে হইতে লাগিল (উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ৫৯)।

রাজবন্দীদের জাহাজটি কলিকাতার খিদিরপুর ডক ইয়ার্ড হতে আন্দামানের পোর্ট ব্লেয়ারের উদ্দেশ্যে ছেড়ে যায় এবং তিনদিন তিনরাত অবস্থানের পর পোর্ট ব্লেয়ার এসে পৌঁছে। কয়েদিরা নিজেদের বিছানাপত্র নিয়ে আন্দামানের জেলে প্রবেশ করেন। আন্দামান জেলের প্রধান শ্বেতাঙ্গ শ্রীমান ব্যারি।^৫ তিনি কয়েদিকে শায়েস্তা করতে সিদ্ধহস্ত। প্রথম দেখায় উপেন্দ্রনাথদের বলেন, ‘So here you are at last; well there but mind you dont talk’ (উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ৬০)। শ্রীমান ব্যারি তার রক্ষমূর্তি ও শায়েস্তা করার দক্ষতার জন্য কয়েদীদের কাছে সাক্ষাৎ যমদূত। ব্যারি বলেন, ‘জেলখানা আমার রাজ্য, এটা ভগবানের এলাকাভুক্ত নহে। ত্রিশ বৎসর ধরিয়া আমি পোর্ট ব্লেয়ারে আছি। একদিনও এখানে ভগবানকে আসিতে দেখি নাই’ (উপেন্দ্রনাথ

বন্দ্যোপাধ্যায়, ৬০)। তাঁর কর্মকাণ্ড এটিই প্রমাণ করে। শুধু যীশুখ্রিষ্টের জন্মদিনে সে শান্তসৌম্য মূর্তি ধারণ করে।

আন্দামান জেলের বন্দী ব্রাহ্মণদের পৈতা কেড়ে নেয়া হত এবং উপেন্দ্রনাথের পৈতাও কেড়ে নেয়া হয়। অপরদিকে মুসলমানের দাড়ি ও শিখদের চুলের গোছা অক্ষত থাকে। জেলখানায় জাতিভেদ প্রথা না থাকলেও এ নিয়ম ছিল। পৈতার প্রতিবাদে উত্তর প্রদেশের একজন কয়েদি দুই মাস অনশন করে মৃত্যুবরণ করেন। আন্দামান জেলে বহু জাতি একসাথে বসবাস করে। বাঙালি, হিন্দুস্তানি, পাঞ্জাবি, সিন্ধি, বর্মি, মাদ্রাজি সবাই একসাথে বসবাস করেছে। হিন্দু ও মুসলমান সংখ্যা প্রায় সমান। জেলখানায় হিন্দু-মুসলমান দলাদলিতে মুসলমানেরা দাড়ি ও হিন্দুরা টিকি রাখা শুরু করে। মুসলমানেরা আলীর সাথে হনুমানের যুদ্ধ, শিবের সাথে মহম্মদের লড়াই ও সোনাভান বিবির কেছা প্রভৃতি কাল্পনিক আখ্যান পাঠ করে। অন্যদিকে আর্য়সমাজীরাও জেলের মধ্যে প্রচার কার্য চালায়। রাজনৈতিক বন্দীরা এসব বিভক্তিতে যোগ দেয়নি।

অন্যদিকে রাজনৈতিক বন্দীদের মধ্যেও বিভক্তি দেখা যায়। মারাঠা নেতারা বঙ্কিমচন্দ্রের ‘বন্দে মাতরম’ এর সমালোচনা করেন। তাদের মতে, তিনি ভারতের জনগণের সাত কোটির কথা বলেছেন, ত্রিশ কোটির কথা বলেননি বলে বাঙালি জাতীয়তাবাদ অতি সংকীর্ণ। পাঞ্জাবি আর্য়সমাজী নেতাগণ বাঙালিদের বিরোধিতা করেন। রাজা রামমোহনকে ইংরেজি শিক্ষা প্রচলনের সুপারিশের জন্য দেশদ্রোহী বিশ্বাসঘাতক বলে অভিহিত করেন। মারাঠি নেতারা মনে করেন ভারতবর্ষ তাদের নেতৃত্বেই একতাবদ্ধ হওয়া প্রয়োজন। পেশোয়ারের বংশধরেরাই ভারতবর্ষে শ্রেষ্ঠ বলে প্রমাণ করায় সচেষ্ট ছিল। উপেন্দ্রনাথের ভাষায়, ‘হিন্দুস্তানি ও পাঞ্জাবিরা গোঁয়ার, বাঙালি বাক্যবাগীশ, মাদ্রাজি দুর্বল ও ভীর্ণ’। একমাত্র পেশোয়ার বংশধরেরাই মানুষের মত মানুষ নানা যুক্তি তর্কের ভিতর দিয়া এই সুরই ফুটিয়া উঠিত’ (উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ৭১)।

আন্দামানে জেলখানার প্রধান কাজ নারিকেলের ছোবড়া পিটাইয়া তার বাহির করা ও দড়ি পাকানো, নারিকেল ও সরিষার ঘানিতে পিষে তেল তৈরী করা, নারিকেলের মালা হতে হুঁকার খোল প্রস্তুত করা। এছাড়া অল্প বয়স্ক ছেলেদের বেতের কারখানার কাজ করানো হয়। ঘানি ঘুরানো ও ছোবড়া পেটানোই কঠিন কাজ। প্রতিদিন সকালে প্রত্যেক কয়েদিকে বিশটি নারিকেলের শুষ্ক ছোবড়া দেয়া হয়। একখণ্ড কাঠের উপর রেখে মুণ্ডর দিয়ে পিটালে নরম হয়ে আসে এবং উপরের খোসা ফেলে পানিতে ভেজনো হয়। পুনরায় পিটালে ভুসি ঝরে কেবলমাত্র তারগুলোই বের হয়ে আসে। এ তার রৌদ্রে শুকাইয়া পরিস্কার করা হয়। দৈনিক এক সেরের একটি গোছা প্রস্তুত করাই কয়েদির কাজ। সরিষার ঘানি দুই প্রকার। একটি হচ্ছে গরু বা অন্যান্য পশুর পরিবর্তে মানুষকে ব্যবহার করা এবং অন্যটি হলো হাতে ঘানি ঘুরিয়ে তেল তৈরী করা। প্রতিদিন একজন কয়েদিকে দশ পাউন্ড সরিষার তেল বা ত্রিশ পাউন্ড নারিকেল তেল প্রস্তুত করতে হয়। রবিবার বন্ধের দিনে নীচতলা হতে বালতি দিয়ে জল উঠিয়ে দোতলা ও তিনতলার বারান্দা নারিকেলের ছোবড়া দিয়ে পরিস্কার করা বাধ্যতামূলক। বন্দীদের প্রতি সরকারের দৃষ্টিভঙ্গি লেখকের নিম্নোক্ত মন্তব্যে স্পষ্ট হয়। তিনি বলেন:

অপরাধের তারতম্য অনুসারে কয়েদীদের ভিন্ন শ্রেণীভুক্ত করিবার প্রথা সরকারি পুর্ন্থিতে আছে বটে কিন্তু কার্যকালে তাহা ঘটয়া উঠে না। কিসে জেলের আয় বৃদ্ধি হয়, সুপারিটেন্ডেন্ট হইতে আরম্ভ করিয়া চুনোপুটি অফিসার পর্যন্ত সকলের দৃষ্টি সেই দিকে। কয়েদি মরুক আর বাঁচুক, কে তাহার খবর রাখে? ভারতবর্ষে লোকের অভাবও নাই, আর

নির্বাসিতের আত্মকথা: ব্রিটিশ ভারত ও আন্দামান জেলের চিত্র (১৯০৮-১৯২১)

মাসে মাসে জাহাজ বোঝাই করিয়া দরকার মত কয়েদী সরবরাহ করিবার জন্য বিলাতী বিচারকেরও অভাব নাই (উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ৬৩)।

আন্দামান জেলের খাবার বলতে রেশুন চালের ভাত ও মোটা রুটি। তরকারি হিসেবে কচুর গোঁড়া, ডাটা ও পাতা, চুপড়ি আলু, খোসাসহ কাঁচা কলা ও পুইশাক, ছোট কার্কর ও ইদুরনাদ এক সঙ্গে সিদ্ধ করা হয়। কারো শাস্তি হলে খাবার হচ্ছে কঞ্জি (Penal diet)। গুড়া চাউল ফুটন্ত গরম জলে ঢেলে দিয়ে প্রস্তুতকৃত খাদ্যই কঞ্জি। এ ধরনের নিম্ন মানের খাবার ও অখাদ্য খেতে বন্দীদের বাধ্য করা হয়। ভারতীয় জেলে বন্দীদের খাবারের প্রকৃত চিত্র ইতিহাসবিদ Madhurima Sen এর উদ্ধৃতিতে পাওয়া যায়। তিনি লিখেন:

The Poverty of the Indian Prisoner's diet Could be inferred from the fact that Where as the government spent four anna per head daily on an ordinary European's diet in jail, the Indian diet not cost more then one anna per head (Madhurima sen, 2007, 47).

ভারতীয় জেলের মধ্যেও কয়েদিদের এটুকু অধিকার দেওয়া হতো না। আন্দামানের জেলে এসব নিয়মের কোন বালাই ছিল না। বিপ্লবী বীণা দাস (১৯১১-১৯৮৬) তাঁর আত্মজীবনীতে কারাগারে বন্দীকালীন সময়ে জেলের বিভিন্ন অনিয়মের মধ্যে খাবারের বিষয়টিও উল্লেখ করেন। ব্রিটিশ জেলে কয়েদীদের ভগ্ন স্বাস্থ্যের জন্য তিনি দৈনন্দিন খাবারকেও দায়ী করেন (বীণা দাস ২০০৫, ৪৯)।

ভারতের জেলে মেট ও কালপাগড়ীর ন্যায় সেলুলার জেলের Warder, Petty officer, Tindal ও জমাদার রয়েছে। সাধারণ কয়েদীরা পাঁচ থেকে সাত বৎসর সাজার পর এসব পদে উন্নীত হয়। এসব জেলে ছোট বড় সব কাজের ভার ও কর্তৃত্ব তাদের উপর ন্যস্ত। এরা প্রত্যেক কয়েদীকে তীক্ষ্ণ নজরে রাখে এবং সামান্য ত্রুটিবিচ্যুতির জন্যও কঠোর শাস্তির প্রদানের মাধ্যমে জেলখানার শাস্তি শৃঙ্খলা রক্ষা করে। শাস্তির ধরন উপেন্দ্রনাথের লিখায় সুন্দরভাবে উঠে এসেছে। তিনি বলেন:

রামলাল ফাইলে টেড়া হইয়া বসিয়াছে। দাও ইহার ঘাড়ে দুইটা রদা; মুস্তফা আওয়াজ দিবামাত্র খাড়া হয় নাই। অতএব উহার গোফ ছিড়িয়া লও। বাকউল্লার পায়খানা হইতে ফিরিতে বিলম্ব হইয়াছে, অতএব তিন ডাঙা লাগাইয়া উহার পশ্চাদ্দেশ ঢিলা করিয়া দাও (উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ৬৬)।

জেল প্রশাসন লঘু পাপে গুরুদণ্ড প্রদান করে কঠোরভাবে জেলের শৃঙ্খলা রক্ষা করত। এরা কয়েদীদের নানারূপ অত্যাচারের মাধ্যমে পয়সা কড়ি ও অন্যান্য সুবিধার ভাগ নেয়। উপেন্দ্রনাথ ও উল্লাসকর একই জায়গায় রবিবারের কাজের সময় কাছাকাছি এসে কথা বলার চেষ্টা করলে প্রহরী পিটে কিল ও মুখে ঘুষি দেয়। উপেন্দ্রনাথ ঘানিতে তেল পিষতে অস্বীকার করায় তাকে জেলার শাস্তিস্বরূপ কুঠুরিতে বন্ধ রেখে হাতকড়ি, বেড়ি ও কঞ্জি (Penal diet) এর ব্যবস্থা করেছে। এরূপ কঠিন শাস্তির মধ্য দিয়েই জেলের কয়েদিগণের দিন অতিবাহিত হয়।

আন্দামান জেলে প্রতিদিন ঘানিতে কাজ করতে করতে রাজবন্দীরা হাঁপিয়ে উঠতো এবং জেল কর্তৃপক্ষও তাদের সাথে বিমাতাসুলভ আচরণ করত। এর প্রতিবাদে রাজবন্দীরা ধর্মঘটে যোগ দেয়। ধর্মঘটের শাস্তি হিসেবে চারদিন কঞ্জি ও সাতদিন দাড়া হাত কড়ি প্রদান করে। বন্দীদের সাজার পর সাজা ও নানা বেড়ির

পর কুঠুরিতে বন্দী রাখা হয়। ধর্মঘটে অংশগ্রহণকারী বন্দীদের কুঠুরিবাসে সাধারণ কয়েদিদের ন্যায় সুযোগ না রেখে নির্জন কারাবাসের ব্যবস্থা করা হয়। তিন মাসেরও বেশী কুঠুরিতে বাসের পর কয়েদিগণের মধ্যে অনেকের স্বাস্থ্য ভেঙ্গে পড়ে। বিভিন্ন রোগের প্রাদুর্ভাবের জন্য কয়েকজনকে করোনেশন উৎসবের সময় জেলের বাহিরে Settlement এ পাঠায়। এ সময়ে কয়েদিগণকে বাইরে রোদ বৃষ্টিতে কাজ করতে হয়। জেলের বাহিরে কয়েদিদের খাবার ঠিকমত পাওয়া যায় না এবং চিকিৎসারও ব্যবস্থা নেই। এ সকল ঘটনার পরস্পরায় ইন্দুভূষণের আত্মহত্যা ও উল্লাসকরের উন্মাদ হওয়ায় রাজবন্দীদের সংকল্প আরো দৃঢ় হয়। ভাল খাওয়া পরা, পরিশ্রম হতে অব্যাহতি ও পরস্পরের সাথে মেলামেশার সুবিধার দাবীতে কয়েদিরা ধর্মঘটকে আরো তীব্র করেছে। জেলারদের শাস্তি ও অন্য কৌশল নিষ্ফল হয়ে যায়। এমতাবস্থায় দশ-বারোজনকে নারিকেল পাহারায় জেলের বাইরে পাঠানো হয়। জেলখানায় ধর্মঘট অব্যাহত থাকায় নন্দগোপাল ও ননীগোপালকে vipes দ্বীপে একটি ছোট জেলে বদলি করা হয়। কিন্তু ননীগোপাল সেখানে আহার বন্ধ করেন। এজন্য কর্তৃপক্ষ অন্যান্য কয়েদিদের বাইরের জেলে পাঠানোর পরিকল্পনা ত্যাগ করে। কয়েদিরা নানা অসুবিধার জন্য জেলের বাইরের কাজে অস্বীকৃতি জানায় এবং তিনমাসের সাজা নিয়ে ফিরে আসে। জেলের ধর্মঘটও ঐ সময় ভেঙ্গে যায়। কিন্তু ননীগোপালের মরণপণ অনশনে জেলে পুণরায় Hunger strike ছড়িয়ে পড়ে। আন্দামান জেল কর্তৃপক্ষের সর্তকতার মধ্যেও ইন্দুভূষণ, উল্লাসকর ও ননীগোপালের কথা দেশের সংবাদপত্রে আলোচনা হয়। সরকার বাধ্য হয়ে তদন্তের জন্য Dr. Lukis কে পাঠান। Dr. Lukis-এর রিপোর্ট কখনও প্রকাশিত হয়নি কিন্তু রাজবন্দীগণ কিছু দিনের জন্য নিষ্কৃতি পায়।

দ্বিতীয়বারের ধর্মঘট ননীগোপালের কর্মকাণ্ড নিয়ে শুরু হয়। সে কাজ করতে অস্বীকৃতি জানায়। জেল কর্তৃপক্ষ চট্টের কাপড়ের পরিবর্তে জাঙ্গিয়া পড়লে তা-ও ছিনিয়ে নেয় এবং তাঁকে চট্টের জাঙ্গিয়া দেয়া হয়। ননীগোপাল এসবের পরিবর্তে নগ্ন হয়ে বসে থাকে এবং বলতে থাকে, 'Naked we come out of our mather's womb and naked shall we return' (উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ৭৯)। গলার টিকেট ভেঙ্গে ফেলে নির্বিকার বসে থাকে। জেলের চীফ কমিশনার আসলেও সম্মান করে না। তাঁর যুক্তি হচ্ছে ইংরেজরা নিজেদের স্বার্থে আইন তৈরী করেছে। যা এ দেশের লোকের সাথে সম্পর্ক নেই। সুতারাং এ আইন মেনে চলারও বাধ্যবাধকতা নেই। উপেন্দ্রনাদের ভাষায়:

ইংরাজ যখন নিজের খুশিমত আইন-আদালত বানাইয়াছে সে সকল ব্যবস্থার সহিত যখন তাহার দেশের লোকের কোনও সম্বন্ধ নাই, তখন কেন যে সে এই সমস্ত আইন ন্যায়তঃ ধর্মতঃ মাথা পাতিয়া মানিয়া লইতে বাধ্য এ প্রশ্নের মীমাংসা লইয়াই ননীগোপাল ব্যস্ত। তাহার ধর্মবুদ্ধি যাহাতে সায় দেয় না। শুধু প্রাণটা বাঁচাইবার জন্য সে কেন সে কাজ করিতে যাইবে প্রাণ রাখিতে রাখিতেই যেখানে প্রানান্ত হইতে হয়, সেখানে প্রাণের মূল্য কতটুকু? (উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়)।

কলিকাতার পত্রিকায় আন্দামানের রাজনৈতিক কয়েদিদের সম্পর্কে সংবাদ প্রকাশিত হওয়ায় কর্তৃপক্ষ বিপ্লবী বারীন্দ্রদের সন্দেহ করে। আন্দামান জেলের চীফ কমিশনারের আদেশে রাজবন্দীরা বাহির হতে জেলে ফেরত আসে। এবার কয়েদিদের বিরুদ্ধে কর্তৃপক্ষ বোমা বিস্ফোরণ ঘটানো এবং সরকারী স্টিমার ছিনিয়ে পালানোর কাল্পনিক অভিযোগ করেছে। এটি প্রমাণের জন্য পুলিশের একজন সাক্ষী বোমা বানানোর নমুনা সংগ্রহ

করে। ভারত সরকারের প্রতিনিধি Sir Reginald Craddock পোর্ট ব্লেয়ার পরিদর্শনের সময় রাজবন্দীরা তাদের অভিযোগ জানানোর চেষ্টা করে। কিন্তু চিফ কমিশনার তাদের বাধা দিয়ে বলেন তোমরা বাহিরে রাজদ্রোহের পরামর্শ দিয়েছ বলে অভিযোগ রয়েছে। রাজবন্দীরা নিজেদের পক্ষে যুক্তি উপস্থাপনের চেষ্টা করেন। এ সময় রাজবন্দী ননীগোপাল তাঁর নিজের পক্ষে যুক্তি দিলেন এবং জবাবে ক্র্যাডক বলেন তুমি সরকারের শত্রু, তোমাকে মারিয়া ফেলাই উচিত ছিল (উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ৮১)। এ উক্তি রাজবন্দীদের প্রতি ব্রিটিশ সরকারের নীতিই প্রতিফলিত হয়েছে। এভাবে নিরাশ হয়ে সকল রাজবন্দী ও সাধারণ কয়েদি কাজ-কর্ম ছেড়ে দেয় এবং কারা কর্তৃপক্ষও শাস্তি দিয়ে হাঁপিয়ে উঠে। কারাগারের ডেপুটি কমিশনার Lowis ধর্মঘটের কারণ অনুসন্ধান করতে আসেন। তিনি রাজবন্দীদের অভিযোগের উত্তরে ভারত সরকারের আদেশের কথা বলেন। পোর্ট ব্লেয়ার কর্তৃপক্ষ এ ব্যাপারে নির্দোষ প্রমাণের চেষ্টা করেন। জেলের অভ্যন্তরীণ শান্তি, শৃংখলা রক্ষার জন্যই এই শাস্তির নীতি বলে তিনি মন্তব্য করেন। লেখকের ভাষায়:

আমাদের প্রতি যেরূপ ব্যবহার করা হইয়াছিল তাহা শুনিয়া তিনি বলিলেন, ইন্ডিয়া গভর্নমেন্টের ইচ্ছা যে, আমাদের প্রতি সাধারণ কয়েদী অপেক্ষা ভাল ব্যবহার করা না হয়; এ বিষয়ে পোর্ট ব্লেয়ারের কাহারও কোনও হাত নাই। “কিন্তু সাধারণ কয়েদীর যে সমস্ত সুবিধা আছে, আমাদের সে সমস্ত কিছুই নাই। সাধারণ কয়েদী লেখাপড়া জানিলে অফিসে ভাল কাজকর্ম পায়; তাহারা লেখাপড়া না জানিলেও ওয়ার্ডার, পেটি অফিসার হইতে পারে। আমরা যে সে সমস্ত অধিকার হইতে বঞ্চিত। অপরে পাঁচ বৎসর পরে মাসে বা-রো আনা করিয়া মাহিনা পায় এবং দশ বৎসর পরে নিজে উপার্জন করিয়া খাইতে পারে, আর আমাদের যে চিরদিনই জেলে পঁচিয়া মরিবার ব্যবস্থা।” Lowis সাহেব উত্তর করিলেন যে, এ সমস্ত ব্যবহার ও দায়িত্ব ইন্ডিয়া গভর্নমেন্টের। একজন জিজ্ঞাসা করিলেন “সাহেব ভাল করিবার কোন অধিকারই তোমাদের নাই; শুধু কি সাজা দিবার অধিকারটুকুই হাতে রাখিয়াছিলেন? (উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ৮১-৮২)।

স্যার রেজিনাল ক্র্যাডক ও লুইসের কথায় ভারতীয় সরকার ও পোর্ট ব্লেয়ার কর্তৃপক্ষের প্রকৃত চরিত্র প্রকাশিত হয়েছে। ডেপুটি কমিশনার রাজবন্দী উল্লাসকরের আচরণে সন্তুষ্ট হয়ে বলেন, ‘Ullaskar is one of the noblest boys I have ever seen, but he is too idealistic’ (উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ৮২)। তবুও তিনি সরকারী চাকুরে হিসেবে অভ্যন্তরীণ শৃংখলা রক্ষার নামে রাজবন্দীদের কারো সাজা একমাস, কারো তিন মাস, কারো ছয়মাস বৃদ্ধি করলেন (উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়)।

কিন্তু সাধারণ কয়েদিগণও ক্রমান্বয়ে ধর্মঘটের দলে যোগ দেয় এবং এতে জেলের কাজকর্মে ব্যাঘাত ঘটে। রাজনৈতিক কয়েদিদের মধ্যে মেয়াদী কয়েদী ৭/৮ জনকে দেশের জেলে পাঠানো হয়। পোর্ট ব্লেয়ার কারাগারের জেলার স্বয়ং ধর্মঘট ছাড়ার অনুরোধ করে। কারাগারের মেয়াদী কয়েদিদের দেশের জেলে পাঠানো এবং অন্যান্যদের সুযোগ সুবিধার আশ্বাস প্রদান করেন। এ সুযোগে রাজবন্দীরাও জেলারকে দু’মাসের সময় বেঁধে দিয়ে ধর্মঘট প্রত্যাহার করেন। অল্পদিনের মধ্যে বারীন্দ্র, হেমচন্দ্র, ঢাকার পুলিনবিহারী ও সুরেশচন্দ্র এবং নাসিকের সাভারকার ভাত্‌দয় ও যোশী ব্যতীত অন্যান্য রাজবন্দীদের দেশের জেলে পাঠিয়ে দেয়া হয়। আন্দামান

জেলের রাজবন্দীদের সংখ্যা কমিয়ে কর্তৃপক্ষ অভ্যন্তরীণ শান্তি, শৃংখলা রক্ষা এবং জেলের পরিবেশ পরিস্থিতি অনুকূলে রাখতে সক্ষম হয়।

১৯১৪ সালে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় ‘লাহোর ষড়যন্ত্র’ এর ভিত্তিতে ‘গদর’ দলের পঞ্চাশ জন পোর্ট ব্লেয়ার জেলে প্রেরিত হয়। রাজনৈতিক অপরাধে দণ্ডিত পল্টনের অনেক শিখ সৈন্য এবং বাংলাদেশের পনের/ষোল জন বন্দীও প্রেরিত হয়। এতে রাজনৈতিক বন্দীর সংখ্যা বৃদ্ধি পায়। আন্দামান জেলে বিভিন্ন কারণে তাদের সাথে কাজ, খাবার এবং অন্যান্য বিষয়াদি নিয়ে কারা কর্তৃপক্ষের সাথে মনোমালিন্য ধর্মঘটে রূপ নেয়। জেল কর্তৃপক্ষ তাদের ভবিষ্যতে সদব্যবহারের আশ্বাস দিয়ে ধর্মঘট প্রত্যাহার করায়। আমেরিকার ‘গদর’ পত্রিকার সম্পাদক জগৎরাম ও কয়েকজন বন্দী রবিবারের কাজের প্রতিবাদ করেন। এটির শাস্তি হিসেবে জগৎরামসহ কয়েকজনকে ছয়মাসের বেড়ি ও কুঠুরিবদ্ধ হওয়ার দণ্ড প্রদান করা হয়। জেলের অতিরিক্ত শাস্তি এবং দিন দিন কঠোরতার মাত্রা বৃদ্ধিতে সবাই কাজ ত্যাগ করেন। একজন বৃদ্ধ শিখকে পিটানোর ফলে তার মৃত্যু হয়। এ ঘটনায় পৃথিবীসিংহের আমরণ অনশন এবং যক্ষা রোগে কয়েকজন শিখের মৃত্যু উল্লেখযোগ্য ঘটনা। তাছাড়া একজন কয়েদী সীসাখও খেয়ে আত্মহত্যা করেন। এ সকল রাজবন্দীদের প্রতি আন্দামান জেল কর্তৃপক্ষের অত্যাচারের মাত্রা দিনদিন সীমা অতিক্রম করে। ছত্র সিংহ ও অমর সিং কে জেল কর্তৃপক্ষ দীর্ঘ দুই বৎসর পিঁজরার মধ্যে আবদ্ধ রাখে। এ সকল মাত্রাতিরিক্ত অত্যাচার, নিপীড়ন ছিল পোর্ট ব্লেয়ারে নিত্য দিনের চিত্র। লেখকের ভাষায়:

যাঁহারা মরিলেন তাঁহারা ত বাঁচিয়া গেলেন; যাঁহারা পাগল হইয়া জীবন্ত মরিয়া রহিলেন, তাহাদের অবস্থা আরও শোচনীয়। বালেশ্বর মকদ্দমার যতীশচন্দ্র পাল তাঁহাদের অন্যতম। কুঠুরিবদ্ধ অবস্থায় তিনি একেবারে উন্মাদ হইয়া যান। তাঁহাকে পাগলা গারদে পাঠান হয়; পরে ভারতবর্ষে লইয়া আসা হয়। এখন বহরমপুর পাগলাগারদে তাহার দিন কাটিতেছে (উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ৮৪)।

রাজবন্দীদের ধর্মঘটে সরকারের সাথে আপোষ হয় এবং বারীন্দ্র, উপেন্দ্রনাথসহ বেশ কিছু বন্দীকে আলাদা সুযোগ সুবিধার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়। বারীন্দ্রকে বেত কারখানার তত্ত্বাবধায়ক, হেমচন্দ্রকে পুস্তকাগারের অধ্যক্ষ ও উপেন্দ্রনাথকে ঘানি ঘরের মোড়লের দায়িত্ব দেওয়া হয়। তাঁরা নিজেরা রান্না করে খাওয়ার অধিকার পায়। জেলের ভিতর ছাপাখানা প্রতিষ্ঠিত করে বারীন্দ্রকে তত্ত্বাবধায়ক ও হেমচন্দ্রকে বাঁধাই বিভাগের অধ্যক্ষ করা হয়। তাঁদেরকে মাসিক এক টাকা বেতন দেওয়ার সিদ্ধান্ত হয়। কর্তৃপক্ষের এ সিদ্ধান্ত রাজবন্দীদের জন্য কিছুটা স্বস্তিদায়ক। আন্দামান জেল কর্তৃপক্ষের শত চেষ্টার পরও অত্যাচারের অনেক সংবাদ ভারতের পত্রিকায় মাঝে মাঝে প্রকাশিত হয়। এজন্য কর্তৃপক্ষ রাজবন্দীদের প্রতি কিছুটা নমনীয় আচরণ করে।

এদিকে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ জার্মান বা প্যারিস শহরের বিশ মাইলের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে এবং এমডেন জাহাজ মাদ্রাজে গোলাবর্ষণ আন্দামানের সাধারণ কয়েদিরাও অবগত হয়। ব্রিটিশদের ব্যবসা বাণিজ্যের প্রচুর ক্ষতি হয়। জেলের ঘানির তেল গুদামেই পড়ে আছে এবং ঘানি চালানো বন্ধ হয়েছে। কয়েদির নিকট হতে নানা কৌশলে যুদ্ধের জন্য টাকা সংগ্রহ (War loan) করা হয়। জেলের শত্রু-মিত্র সবাই মিলে জার্মানদের জয় কামনা করছে। জেলের সুপার রাজবন্দীদের টাইমস্ পত্রিকার সাপ্তাহিক সংস্করণ পড়ার জন্য সরবরাহ

করত। কিন্তু টাইমসের বর্ণনানুযায়ী ইংরেজ ও ফরাসি সৈন্যের দৈনিক অগ্রসরের বর্ণনা অবিশ্বাস্য হয়ে দাঁড়ায়। সাধারণ কয়েদিরা ইংরেজদের স্বপক্ষে কেউ কথা বললেই রেগে যেত। টাইমস্ পত্রিকার অসত্য কাহিনী দিয়ে প্রকৃত সত্য চাপা দেওয়া ঘটনা সবাই বুঝতে সক্ষম হয়। মেসোপটেমিয় পল্টন হতে বিদ্রোহী পাঠান ও শিখ সৈন্যদের আন্দামানে পাঠানো হয়। পাঠানদের মুখে অর্ডুত সব গল্প শোনা যায়। গদর দলের শিখরা কয়েদি হওয়ার পর জেলের মধ্যে বিশৃংখলার আশংকায় জেল পাহারায় দেশী বিদেশী সৈন্য নিয়ে আসা হয়। ব্রিটিশ কর্তৃক এমডেন জাহাজ ধরা পড়ার পর পোর্ট ব্লেয়ার আক্রমণের মানচিত্র পাওয়ার গুজবও শোনা যায়। পোর্ট ব্লেয়ার রক্ষায় সৈন্য সংখ্যা বৃদ্ধি ও কামান মোতায়ন করা হয়। পোর্ট ব্লেয়ারের মিলিটারি পুলিশে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক শিখ রয়েছে। জেলের কয়েদি গদর দলের শিখ এবং শিখ সৈন্যদের মধ্যে সম্পর্ক স্থাপন না করার জন্য কর্তৃপক্ষ সর্বদা সচেতন থাকে। জেল কর্তৃপক্ষের উদ্যোগ সফল হয়। ব্রিটিশ সরকার বিশ্বযুদ্ধের নাজুক সময়ে শান্তি, শৃংখলা রক্ষা ও কারাগারের পরিবেশ স্থিতিশীল রাখতে সক্ষম হয়।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শেষ হওয়ার পর সরকার সিদ্ধান্ত নেয় রাজবন্দীদের মধ্যে যারা পেনাল কোর্ডের ৩০২ ধারা অনুসারে অপরাধী নয় এবং জেলে সাত বৎসর সাজা ভোগ করেছে তাদের মুক্তি দেয়া হবে। এটি কয়েদিদের জন্য একটি অবিশ্বাস্য ঘটনা।

উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতে:

এ পর্যন্ত কোনও যাবজ্জীবন দণ্ডে দণ্ডিত রাজনৈতিক কয়েদি পোর্টব্লেয়ার হইতে বাঁচিয়া ফিরে নাই। ১৮৫৭ সালে যাহারা সিপাহী বিপ্লবের পর পোর্টব্লেয়ারে গিয়াছিল তাহাদের সকলকেই সেখানে একে একে দেহরক্ষা করিতে হইয়াছে। থিবেস সহিত যুদ্ধের পর যে সমস্ত ব্রহ্মদেশীয় কয়েদি আসিয়াছিল তাহারাও কেহ ছাড়া পায় নাই। আজ আমাদের জন্য যে ইন্ডিয়া গভর্নমেন্টের ইতিহাসে নতুন অধ্যায় আরম্ভ হইবে একথা সহসা বিশ্বাস করিতে সাহস হইল না। কিন্তু না বিশ্বাস করিয়াই বা কি করি? প্রাণ যে ফুলিয়া ফুলিয়া হাঁপাইয়া উঠিতেছে (উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ৯২-৯৩)।

যুদ্ধ শেষ হওয়ার প্রায় একবৎসর পর জেল সুপার রাজবন্দীদের মুক্তির সংবাদ প্রদান করে। বারীন্দ্র, হেমচন্দ্র ও উপেন্দ্রনাথকে বেঙ্গল গভর্নমেন্টের আদেশ অনুযায়ী আলীপুর জেলে পাঠানো হয়। পোর্ট ব্লেয়ারের জেল হতে ছাব্বিশ জন রাজবন্দীকে একটি জাহাজে করে দেশে পাঠানো হয়। আলীপুর জেলে পৌঁছানোর পর তাদেরকে মুক্তি দেওয়া হয়। এভাবে লেখকের দীর্ঘ বার বৎসর জেল জীবনের অবসান ঘটে।

উপরিউক্ত আলোচনার আলোকে বলা যায় যে, উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর *নির্বাসিতের আত্মকথা*-য় জেল জীবনের স্মৃতি অত্যন্ত সুন্দরভাবে উপস্থাপন করেছেন। এ বর্ণনায় ব্রিটিশ শাসনামলে ভারতীয় বিশেষত আন্দামানের সেলুলার জেলের প্রকৃত চিত্র রয়েছে। ব্রিটিশ শাসনামলে জেলের নিয়মকানুন, কাজের ধরন, শাস্তি, থাকার সুবিধা ও অসুবিধা, চিকিৎসা ব্যবস্থা, জেলার ও অন্যান্য কর্মকর্তাদের আচরণ লেখক দক্ষতার সঙ্গে তুলে ধরেছেন। অপরদিকে জাতীয়তাবাদী কয়েদিদের অটুট মনোবল এবং তাদের প্রতি কারা কর্তৃপক্ষের বৈষম্যমূলক আচরণও উঠে এসেছে। রাজবন্দীগণ ভারতীয়

জেলে মাত্রাতিরিক্ত নিপীড়ন, অন্যায় ও অত্যাচারের স্বীকার হতেন। পোর্টব্লেয়ারেও তাদের প্রতি মাত্রাতিরিক্ত নিযাতন করা হতো। এরূপ নিযাতন হতে মুক্তির জন্য অনেক রাজবন্দী মৃত্যুকেই শ্রেয় মনে করেছেন। এদেশ তথা ভারতের স্বাধীনতার জন্য জাতীয়তাবাদী চেতনায় উদ্বুদ্ধ অসংখ্য রাজনৈতিক নেতা-কর্মী নিজের জীবনকে উৎসর্গ করেছেন। ব্রিটিশদের সাম্রাজ্যবাদী চরিত্র ও শোষণের প্রকৃতিরূপ লেখকের বর্ণনা হতে আমরা অনুধাবন করতে পারি। এক কথায় উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় নিজের কারা স্মৃতির মাধ্যমে এ দেশে ব্রিটিশ শাসকদের স্বরূপ উন্মোচন করেছেন। ব্রিটিশ শাসনামলে সমগ্র দক্ষিণ এশিয়া তথা বাংলার কারাগারের প্রকৃত ইতিহাস পূর্ণাঙ্গভাবে তুলে ধরা সময়ের দাবী, যা ব্যাপক গবেষণার দাবী রাখে।

টীকা

- ১। যুগান্তর দল ব্রিটিশ বিরোধী বিপ্লববাদী গুপ্ত সংস্থা। এটির জন্ম ১৯০৬ সালে এবং প্রধান কার্যালয় ৯৩/এ, বাবুজার স্ট্রীট, কলকাতা। অরবিন্দ ঘোষ, বারীন্দ্রকুমার ঘোষ, উল্লোস কর দত্ত প্রমুখ দলটির নেতৃত্ব দেন। পরবর্তীতে ঢাকায়ও এটির শাখা প্রতিষ্ঠিত হয়। বিপ্লবী ক্ষুদিরাম বসু ও প্রফুল্ল চাকী এ দলের সদস্য ছিলেন।
- ২। গুপ্ত সংঘটন যুগান্তরের একজন সক্রিয় কর্মী উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। ১৯০৮ সালে তিনি যুগান্তরের অন্যান্য সদস্যদের সাথে কলিকাতার মানিকতলা থেকে বন্দী হন। ১৯০৯ সালের মে মাসে বিচারের চূড়ান্ত রায়ে আন্দামানের পোর্ট ব্লেয়ারের সেলুলার জেলে যাবজ্জীবন সাজা প্রাপ্ত হন। তিনি সুদীর্ঘ ১২ বৎসর জেলে বন্দী ছিলেন।
- ৩। উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের কারা স্মৃতি নিয়ে লেখা *নির্বাসিতের আত্মকথা* যা ১৯২১ সালে প্রথম প্রকাশিত হয়। পরবর্তীতেও একাধিকবার প্রকাশিত হয়। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বইটির প্রশংসা করেছেন বলে লেখক উল্লেখ করেছেন। এটির ১৯৭৬ সালে নবম সংস্করণ হিসেবে ন্যাশনাল পাবলিকেশন হতে প্রকাশিত সংখ্যায় মুখবন্ধ লিখেন সৈয়দ মুজতবা আলী। সর্বশেষ ২০১৪ সালে র‍্যাডিক্যাল ইম্প্রেশন, কলকাতা থেকে এটি পুনঃমুদ্রণ করা হয়।
- ৪। ব্রিটিশ বিরোধী সশস্ত্র বিপ্লবের গুপ্ত দলসমূহের অন্যতম কলকাতার ‘অনুশীলন সমিতি’। ১৯০২ সালের ২৪ মার্চ সতীশ চন্দ্র বসু ও প্রমথনাথ মিত্রের প্রচেষ্টায় এটি গঠিত হয়। পরবর্তীতে ঢাকায়ও এটির বিস্তৃতি ঘটে।
- ৫। তিনি জাতিতে আইরিশ ও রোমান ক্যাথলিক। উচ্চতা পাঁচ ফুট ও তিন ফুট চওড়া এবং আন্দামানের জেলখানায় ত্রিশ বৎসর ধরে চাকুরী করেন।

গ্রন্থপঞ্জি

উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। *নির্বাসিতের আত্মকথা*। কলকাতা: র‍্যাডিক্যাল ইম্প্রেশন, ২০১৪।

Madhurima sen. *Prisons in Colonial Bengal (1838-1919)*, Kolkata: Satish Mukherjee Road, THEMA, 2007.

বীণা দাস। *শৃংখলা বাংকার*। কলকাতা: র‍্যাডিক্যাল ইম্প্রেশন, ২০০৫।

ছাপাই মাধ্যমের ক্রমবিকাশের ধারায় সৃজনশীল ছাপচিত্র (১৯৪৮-২০০০): পরিপ্রেক্ষিত বাংলাদেশ

নিত্যানন্দ গাইন*

প্রতিপাদ্যসার

১৯৪৮ খ্রিষ্টাব্দে ঢাকায় ‘গভ: ইনস্টিটিউট অব আর্টস’-এর দ্বারোৎঘাটনের মাধ্যমে বাংলাদেশে সৃজনশীল ‘ছাপচিত্র’ চর্চার আনুষ্ঠানিক সূত্রপাত। তারপূর্বে এখানে ছাপচিত্র চর্চার দৃশ্যপটটি ঠিক কেমন ছিল সে সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা পাওয়া না গেলেও একটি কথা বলা যায় যে, ঐচ্ছিক বিষয় হিসেবে সূচিত মাধ্যমটি আজ পরিণত হয়েছে মূলধারার একটি গুরুত্বপূর্ণ শিল্পমাধ্যমে। জন্ম হয়েছে অসংখ্য চর্চাকারীর, যারা এ দেশের দৃশ্যশিল্পের ভাণ্ডারে নিরন্তর যোগ করে চলেছেন নানামাত্রিক উৎকর্ষ। কিন্তু ছাপচিত্রের ধারাবাহিক এই উত্তরণগুলো চিহ্নিত করে মাধ্যমটি চর্চার কোনো প্রামাণ্য নথি সংগৃহীত হয়নি আজ পর্যন্ত। এ মাধ্যমের ইতিহাস আর উত্তরণগুলো (অধিকাংশ ক্ষেত্রে) প্রবীণ শিল্পীদের মুখে উপকথার মতো প্রচলিত এবং ব্যক্তিভেদে তথ্যও সাংঘর্ষিক। সেই সাথে কিছু কিছু প্রদর্শনীর স্মরণিকা এবং সংবাদ-সাময়িকীতে ছাপচিত্র সম্পর্কিত ছোট ছোট অনেক নিবন্ধের দেখাও পাওয়া যায়, যাতে কখনো কখনো নানা ধরনের তথ্য-বিভ্রাট মাধ্যমটির অতীতকে আরো বিভ্রান্তিকর করে তুলেছে। এইসব বিভ্রান্তি আর সন্দেহ দূর করে প্রামাণ্য তথ্যের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠাকালীন সময় হতে বিশ শতকের শেষ পর্যন্ত বাংলাদেশে সৃজনশীল ছাপচিত্র চর্চার ধারাবাহিক রূপরেখা সংক্ষিপ্ত ভাবে তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে আলোচ্য প্রবন্ধে।

সাম্প্রতিক সময়ে চর্চিত জনপ্রিয় শিল্প মাধ্যমগুলোর মধ্যে ছাপচিত্র অন্যতম একটি গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম বলে স্বীকৃত। নানামুখী পৃষ্ঠপোষকতা, সামষ্টিক ও ব্যক্তিগত উদ্যোগ এবং নিরবিচ্ছিন্ন চর্চা এই মাধ্যমকে শিল্পের বিশ্বপরিসরে গুরুত্বের আসনে আসীন করেছে। কিন্তু শিল্পমাধ্যম হিসেবে ছাপচিত্রের এই স্বীকৃতি একদিনের অর্জন নয়। এর

*সহযোগী অধ্যাপক, চারুকলা ইনস্টিটিউট, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়

পেছনে রয়েছে সুদীর্ঘ পথ-পরিভ্রমার ইতিহাস। বহু বছরের যাত্রায় একটু একটু করে পরিশীলিত হয়ে ছাপচিত্র আজকের অবস্থানে এসেছে। মূলত ছাপানো চিঠিপত্র এবং বইয়ের অলংকরণের প্রয়োজনে ছাপচিত্র বা প্রিন্টমেকিং এর প্রাথমিক বিকাশ সম্পন্ন হয়। পরবর্তীতে এই করণকৌশলটি চিত্রশিল্পীদের মাঝে জনপ্রিয়তা লাভ করে। আগে থেকে নকশা করা কোন ছাঁচ-এর উপর উপযুক্ত কালি লাগিয়ে এক টুকরো কাগজ বা অন্য কোন পৃষ্ঠতলে প্রতিরূপকে স্থানান্তরের মাধ্যমে ছাপ তৈরি হয়। তাই খুব সহজ করে বলা যায়, ছাপের মাধ্যমে অংকিত চিত্রই ‘ছাপচিত্র’ যা সংখ্যায় এক বা একাধিক হলেও মৌলিকতা অক্ষুণ্ণ থাকে (Griffiths Antony 1996, 9)। এক্ষেত্রে ছাঁচ তৈরির জন্য আলুর মত সস্তা সাধারণ জিনিস থেকে শুরু করে কাঠ, ধাতব পাত, পলিমার, পাথর, লিনোলিয়াম, সিল্কস্ক্রিন ইত্যাদি ব্যবহার করা হয়। ছাপচিত্র বাণিজ্যিক এবং চারুশিল্পের অংশ হিসেবে দুটি আলাদা গুরুত্ব বহন করে। ১৯৬৪ খ্রিষ্টাব্দের পূর্বের সকল (বাণিজ্যিক ও চারুশিল্পের প্রয়োজনে) ছাপা-ই গ্রাফিক আর্ট হিসেবে স্বীকৃত ছিল। পরবর্তীকালে ছাপের দুটি ধারার মধ্যে স্বাতন্ত্র্যসূচক বৈশিষ্ট্যানুযায়ী পার্থক্য সৃষ্টির নিমিত্তে ‘প্রিন্ট কাউন্সিল অব আমেরিকা’ ১৯৬৪ খ্রিষ্টাব্দে চারুশিল্পের অংশ হিসেবে চর্চিত ছাপের সংজ্ঞা নির্ধারণ করে দেয় এবং তখন থেকে ক্রমেই ‘ছাপচিত্র’ বা ‘প্রিন্টমেকিং’ শব্দটি গ্রহণযোগ্যতা লাভ করে (Amit Mukhopadhyay and Nirmalendu Das. 1985, 5)। সুতরাং বলা যায় যে, ছাপচিত্র শিল্পের একটি অন্যতম প্রাচীন মাধ্যম হলেও পৃথকভাবে সৃজনশীল শিল্পের মাধ্যম হিসেবে এর স্বীকৃতি খুব বেশী দিনের নয়।

বাংলাদেশের ক্ষেত্রেও সৃজনশীল ছাপচিত্রের ধারণা খুব বেশি পুরোনো না হলেও বাংলায় ছাপ বা মুদ্রণের নানা লোকজরীতির রয়েছে সুদীর্ঘ ইতিহাস। এমনকি যখন এই অঞ্চল *বঙ্গ* বা *বাংলা* নামে পরিচিতি লাভ করেনি, তখনো এই ভূখণ্ডের অধিবাসীদের ছাপের বিভিন্ন ধরনের পদ্ধতি সম্পর্কে ধারণা ছিল। ঢাকা কেন্দ্রিক পূর্ববঙ্গ যা আজকের বাংলাদেশ, তার অতীত অধিবাসীদের মধ্যেও ছিল কাপড় অলংকরণ, ছাপাঙ্কিত মুদ্রা, আলপনা, কড়ির ছাপ কিংবা সতী অথবা লক্ষ্মীর হাত ও পায়ের ছাপের মতো নানা ধরনের লোকজ ছাপরীতির প্রচলন। আবার শখের বশে মাটির-ফলকে, কাঠের-পাটায় অথবা ধাতব-পাতে নকশা আঁকা কিংবা ছবি খোদাই করার এবং কোন কোন ক্ষেত্রে তা থেকে ছাপ নেবার মত নমুনাও দুষ্প্রাপ্য নয়। বিশেষ করে, বস্ত্র অলংকরণের জন্য ব্লক এবং সিলমোহর যা এ দেশীয় সূত্রধর, কর্মকাররাই তৈরি করতেন। সাম্প্রতিক সময়ে বাংলার নিজস্ব রীতিতে নির্মিত ধাতু খোদাইয়ের দুটি নমুনার তথ্য পাওয়া যায়, এর একটি হলো পশ্চিমবঙ্গের সুন্দরবন অঞ্চলে প্রাপ্ত *বিষ্ণু এবং অবনত ভক্ত* (১১৯৬)-এর ধাতু খোদাই চিত্র। এবং অন্যটি *দামোদর* (১২০৬)-এর, বাংলাদেশের কুমিল্লা থেকে এটি উদ্ধার করা হয়েছে। করণকৌশলগত দিক থেকে এটিও সুন্দরবন অঞ্চলে প্রাপ্ত নমুনাটির মতোই (D. P. Ghosh 1975, 31)। এই দুটি প্রাচীন ধাতু খোদাই চিত্র বাংলাদেশ তথা বাংলার সামগ্রিক শিল্প-ইতিহাসের জন্য তো বটেই ছাপচিত্রের জন্যও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ নিদর্শন। কারণ, এ যাবৎকাল এ অঞ্চলের অধিবাসীদের ছবি ছাপার শিক্ষা ইউরোপীয়দের থেকে প্রাপ্ত বলে যে মত প্রচলিত ছিল, তা প্রশ্নের মুখে পড়ে উপর্যুক্ত নমুনা আবিষ্কারের মাধ্যমে। আবার এ কথাও সত্যি যে ছাপপদ্ধতির এরূপ নানা দেশীয় সংস্করণ প্রচলিত থাকার পরও, বাংলাদেশে মুদ্রিতবস্তু ব্যাপকতা লাভ করে উনিশ শতকের মাঝামাঝি কলকাতা থেকে আধুনিক মুদ্রণ-পদ্ধতি আগমনের পর। স্বল্পপরিসরে হলেও কলকাতার ধারাবাহিকতায় পূর্ববঙ্গের ঢাকায়ও মুদ্রণকেন্দ্রিক ছাপাই ছবির একটি বাজার গড়ে উঠেছিল। অনেকখানি কলকাতা নির্ভর এবং খুব শক্ত অবকাঠামোগত ভিত্তি না থাকলেও, পুস্তক মুদ্রণ ও অলংকরণের সঙ্গে জড়িত সীতানাথ বসাক কিংবা কেশবের

মত দু-একজন শিল্পীর অস্তিত্ব সম্পর্কেও জানা যায়। সীতানাথ বসাক উনিশ শতকের শেষের দিকে ঢাকার মুদ্রণ বাজারে লেখক, প্রকাশক এবং দক্ষ ছাপচিত্রী হিসেবে পরিচিত ছিলেন(Shaw G.W. 1991, 138)। আর বিশ শতকের শুরুর দিকে কেশব পুস্তক অলংকরণের সাথে জড়িত ছিলেন বলে প্রমাণ পাওয়া যায়। তবে সীতানাথ বসাক বা কেশবের মত শিল্পী এবং সামান্য কিছু অলংকরণের তথ্য থাকলেও অস্বীকার করা যাবে না যে, ভালো ছাপা ও অলংকরণের অবকাঠামোগত সুযোগ-সুবিধার অভাবও ছিল এখানে। উনিশ শতকের শেষ থেকে বিশ শতকের প্রথমার্ধ পর্যন্ত ঢাকা এবং পূর্ববঙ্গের বিভিন্নস্থান থেকে প্রকাশিত দু-একটি (হিন্দু) প্রকাশনায় সামান্য অলংকরণ লক্ষ করা যায়। তবে এ সময়কার ‘মুসলমানি’ প্রকাশনাগুলো খুব সাধারণ কিংবা কোন কোন ক্ষেত্রে নামপত্রে বা প্রচ্ছদে শুধুমাত্র লতাপাতার নকশাই দেখা যায়। ভেতরের দিকটা সাদা-মাঠা হরফেই ছাপা।

বস্তুত ভারতবর্ষে ইসলাম ধর্ম আগমনের পর থেকেই জীবজন্তুর ছবি আঁকা বা মূর্তি নির্মাণ এবং তার ব্যবহার ইসলামসিদ্ধ কিনা, তা নিয়ে বিতর্ক ছিল। তাতে নতুন মাত্রা যোগ হয় মুদ্রণশিল্পের সঙ্গে মুসলমান জনগোষ্ঠীর যুক্ত হওয়া এবং সাধারণ মুসলমানদের হাতে মুদ্রিত বস্তু পৌঁছানোর পর। কারণ, শুরু থেকেই ভারতীয় আলেম-ওলামাগণ এ বিষয়ে বিরোধিতা করে আসছিলেন। পত্রপত্রিকায় ছবি ছাপানোকে তারা হারাম বলে মনে করতেন। আর তখনকার সংস্কারপন্থী প্রগতিশীল মুসলমানদের অবস্থানও ছিল কোণঠাসা। যেমন- মুসলমান সমাজের রেনেসাঁ-ব্যক্তিত্ব দেলওয়ার হোসেন আহমদ (১৮৪০-১৯১৫) বলিষ্ঠ এবং পরিকল্পনামূলকভাবে ঘোষণা করেছিলেন যে, মুসলমানদের জাগতিক আইনকে ইসলামি ধর্মীয় বিধান থেকে সম্পূর্ণ পৃথক করাই হলো মুসলমান সমাজের অগ্রগতির পূর্বশর্ত। তাঁর বিশ্বাস ছিল, পরিবর্তনশীল সমাজের চাহিদা অপরিবর্তনশীল ধর্মীয় আইন বা বিধান দ্বারা পূরণ করা সম্ভব নয়(সালাহউদ্দীন আহমদ ২০১৫, ২)। কিন্তু দেলওয়ার হোসেনের অগ্রগামী চিন্তাধারা সমকালীন মুসলমান সমাজে জনপ্রিয়তা অর্জন করতে ব্যর্থ হয়। এমন সময়ে মুসলমান সমাজে কুসংস্কার ও সামাজিক রক্ষণশীলতার উর্ধ্বে উঠে সচিত্র বই-পুস্তক প্রকাশ করতে কেউ আগ্রহী হতেন না। এমনকি সচিত্র পত্রিকা প্রকাশের জন্য পৃষ্ঠপোষক পাওয়াও দুষ্কর ছিল বলে জানিয়েছেন সওগাত সম্পাদক মোহাম্মদ নাসিরউদ্দীন। তাঁর মতে, পৃষ্ঠপোষকদের ধারণা ছিল হিন্দুদের মত ছবি দিয়ে ও ধরনের কাগজ বের করার উৎসাহ দেওয়া গোনাহর কাজ (মোহাম্মদ নাসিরউদ্দীন ১৩৮২, ১১)। কিন্তু সামাজিক রক্ষণশীলতার উর্ধ্বে উঠে ১৩২৫ বঙ্গাব্দের অগ্রহায়ণ মাসে (১৯১৮ খ্রিষ্টাব্দের নভেম্বরে) সচিত্র হয়ে সওগাত-এর প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হলে বাংলার রক্ষণশীল মুসলমান সমাজে এর মারাত্মক প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়(মোহাম্মদ নাসিরউদ্দীন ১৩৮২, ২১)। এছাড়া ১৯২০ খ্রিষ্টাব্দে মাসিক নূর এর একটি সংখ্যা নিষিদ্ধ হয় প্রথম পৃষ্ঠায় ঘোড়সওয়ারের ছবি ছাপায় এবং মাসিক বঙ্গনূর একে ইসলামের লঙ্ঘন বলে সমালোচনা করে(Mustafa Nurul Islam 2003, 113)। একই বছর আল-এছলাম মানুষ এবং জীবিত কোনো কিছুর ছবি আঁকাকে ইসলাম-বিরুদ্ধ বলে রায় দেয়(এছলামাবাদী ১৩২৭, ২০৯)। নাচ, গান, ছবি আঁকা প্রভৃতি সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের চর্চাকে তারা হিন্দুয়ানি সংস্কৃতির অংশ বলে মনে করত। এমনকি ছবি তোলাকেও তারা গুনাহের কাজ বলে মনে করত। ১৯১৮ খ্রিষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে চট্টগ্রামে অনুষ্ঠিত সর্বদলীয় জাতীয় মুসলমান মহাসম্মেলনে আগত নেতাদের ছবি তুলতে গিয়ে আপত্তির মুখে পড়তে হয়। মওলানা আজাদ সোভানী ছবি তুলতে দিতে রাজি হননি এবং মওলানা আকরম খাঁ-ও প্রথমে প্রবল আপত্তি করে শেষপর্যন্ত রাজি হন। সওগাতের ১৯২৫ খ্রিষ্টাব্দের ফাল্গুন সংখ্যায় এই মুসলমান

সম্মেলনের ছবিসহ বিবরণ প্রকাশিত হয়। বাংলায় প্রথমবারের মতো মুসলমান সম্মেলনের ছবিসহ বিবরণ প্রকাশের ঘটনা সেটাই প্রথম।

এ ধরনের সংস্কারমূলক উদ্যোগ, চিন্তাশীল প্রগতিকামী মুসলমান সমাজ, বিশেষত তরুণ শিক্ষার্থীদের দ্বারা প্রবলভাবে আদৃত হলেও উগ্র ধর্মীয় প্রতিক্রিয়াশীলদের দ্বারা ধিকৃতও হয়। বিশ শতক একটু একটু করে আলোর বলকানি নিয়ে আসতে থাকলেও ছবি আঁকার সাথে ইসলামের বিরোধ নিয়ে বিতর্ক অব্যাহত থাকায় প্রগতিশীল ইসলামি সাহিত্যিক-খ্যাত মোহাম্মদ আকরম খাঁ ‘চিত্রকলা ও এছলাম’ শীর্ষক একটি প্রবন্ধ লেখেন মাসিক ‘মোহাম্মদী’তে (মোহাম্মদ আকরম খাঁ ১৩৩৭, [পৃষ্ঠা নং নেই])। মূলত, ‘চিত্রকলা ও এছলাম’ শীর্ষক রচনারটির মাধ্যমে তিনি ইসলামের সাথে শিল্পের বিরোধহীনতার কথা নানা তথ্য সহকারে প্রতিপাদন করেছেন। আর সেজন্য তৎকালীন মুসলমান সমাজে ব্যাপক সমালোচিতও হয়েছিলেন তিনি। তবে উনিশ শতকের শেষ ভাগ থেকে বাংলার মুসলমান জনগোষ্ঠী শিক্ষিত এবং মুক্তবুদ্ধি-সম্পন্ন প্রতিনিধিদের দ্বারা কুসংস্কার-মুক্ত হয়ে একটু একটু করে আলোর পথে যাত্রা শুরু করেন। ফলশ্রুতিতে সংস্কারপন্থী ও প্রগতিশীলদের উদ্যোগে বিশ শতকের গোড়া থেকে মুদ্রণের কলকাতা কেন্দ্রে নগণ্য মাত্রায় মুসলমানি গ্রন্থ সচিত্রকরণ শুরু হয় (সুকুমার সেন ২০০৮, ৪০)। তবে রাজধানীর বাইরে ঢাকার মতো প্রান্তিক নগরে পূর্বের অন-অলংকৃত মুসলমানি বইয়ের ধারাটিই প্রচলিত থাকে। মূলত, ধর্মীয় সংস্কারের কারণেই প্রথম দিকে আরবি-ফারসি পুঁথির আদলে নির্মিত কলকাতার অন-অলংকৃত পুঁথির ধারাটি অনুসৃত হলেও বেশ কিছু সচিত্র পুঁথিও মুদ্রিত হয়েছে পরবর্তীকালে। এরমধ্যে সোনভানের পুঁথি, ছায়েত নামা, সচিত্র বড় ছায়েত নামা, সচিত্র ছহি বড় সোনাভান এবং সচিত্র আদি ও আসল বড় সোনাভান উল্লেখযোগ্য। তবে কলকাতা কেন্দ্রের ছবিযুক্ত মুসলমানি পুঁথির তুলনায়, অনেক ক্ষেত্রে ঢাকা থেকে প্রকাশিত পুঁথির ছাপা ও কাঠ খোদাই ছবিগুলো ভীষণ ঝকঝকে। কখনো কখনো বিষয়ের ভীষণ সংবেদনশীল উপস্থাপন ঋদ্ধ। এসব পুঁথিতে প্রকাশনার কোন সময়কাল উল্লেখ না থাকলেও ধারণা করা যায় বিশ শতকের মধ্যভাগের কাছাকাছি সময়ে এগুলো প্রকাশিত। এসব প্রকাশনায় কিংবা ছবিতে শিল্পীর কোন নাম বা পরিচিতি না থাকায় এটা নির্ভুল নির্ণয় করা দুর্বল যে, এগুলো ঠিক কাদের এবং কখন আঁকা। তবে ছবিগুলো এ মাধ্যমে তাঁদের দক্ষতাকে প্রতিষ্ঠিত করে নিঃসন্দেহে। কিন্তু ঢাকা-কেন্দ্রিক পূর্ববঙ্গ বা আজকের বাংলাদেশের মূলধারার ছাপচিত্র চর্চার ক্ষেত্রে তাঁদের সেই দক্ষতা সরাসরি কোন ভূমিকা রাখতে পারেনি। কারণ বিশ শতকের মধ্যভাগের (১৯৪৮) আগে মূলধারার ছাপচিত্র বলতে আজ আমরা যা বুঝি, তার কোনো চর্চাই এদেশে ছিল না।

এদেশে ছাপচিত্র চর্চার সৃজনশীল তথা মূলধারার প্রবর্তন হয় ১৯৪৮ খ্রিষ্টাব্দে জয়নুল আবেদিন (১৯১৪-১৯৭৬) ও তাঁর সঙ্গীদের দ্বারা ঢাকায় আর্ট ইনস্টিটিউট স্থাপনের মাধ্যমে। উনিশ শতকের শেষ থেকে এখানকার মুদ্রণ সংস্কৃতি যেমন গড়ে উঠেছিল কলকাতা কেন্দ্রের প্রভাবে, তেমনি শিল্পশিক্ষার এই প্রতিষ্ঠানটিও স্থাপিত হয় কলকাতার ‘গভঃ স্কুল অব আর্ট’কে অনুসরণ করে। এ শিল্প শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার পেছনে যারা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন, সফিউদ্দিন আহমেদ (১৯২২-২০১২) নিঃসন্দেহে তাঁদের একজন। প্রতিষ্ঠাকালীন সময় থেকেই সফিউদ্দিন আহমেদকে দায়িত্ব দিয়ে শুরু থেকেই আর্ট ইনস্টিটিউটের পাঠ্যক্রমে ঐচ্ছিক বিষয় হিসেবে ছাপচিত্র অন্তর্ভুক্ত করা হয়। ফলে তাঁর হাত ধরেই মূলত যাত্রা শুরু করে এদেশের মূলধারার ছাপচিত্র চর্চা। সুচনালগ্নে জয়নুল আবেদিনের (১৯১৪-১৯৭৬) সহযোগিতা এবং সফিউদ্দিন আহমেদ ও হবিবুর রহমানের (১৯১২-?) মতো শিল্পী শিক্ষকদের যৌথ প্রচেষ্টা এদেশে মাধ্যমটির চর্চা ও বিস্তারে যথেষ্ট গতিসঞ্চার করে। শুরুর প্রায় সকল শিল্পী যেমন- জয়নুল আবেদিন, কামরুল হাসান (১৯২১-১৯৮৮), সফিউদ্দিন

আহমেদ, হবিবর রহমান প্রমুখরা চিত্রশিল্পের পাশাপাশি ছাপচিত্র নির্মাণেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছেন। এছাড়া খাজা শফিক আহমেদ (১৯২৫-?), হাবিবুল্লাহ খান (?), মুস্তফা আজিজ (?) প্রমুখ শিল্পীরাও কাঠ খোদাই, এঁচিং এবং লিথোগ্রাফ মাধ্যমে অনুশীলনধর্মী কিছু ছাপচিত্র নির্মাণ করেছিলেন। যা এদেশে ছাপচিত্র চর্চার প্রতিষ্ঠাকালীন ধাপে বেশ গুরুত্ববহ হয়।

ছাপচিত্র চর্চায় প্রথম প্রজন্মের এসমস্ত শিল্পীদের তারকাখ্যাতির সাথে পঞ্চাশের দশকের শুরুতেই ঢাকা আর্ট গ্রুপের দুটি প্রদর্শনীতে ছাপচিত্রের গুরুত্বপূর্ণ অবস্থান জনমানসে মাধ্যমটি নিয়ে আগ্রহের সঞ্চার করে। তবে প্রথমদিকে প্রয়োজনীয় উপকরণ ও যন্ত্রাদির অভাবে সাদা-কালো উডকাট ও উড-এনথ্রেভিং মাধ্যমে এদেশে ছাপাই ছবির মূলধারার যাত্রা শুরু হলেও, পঞ্চাশের দশকের প্রথমার্ধেই যোগ হয় লিথোগ্রাফি মাধ্যমের চর্চাও। শুরুতে ছাপচিত্র ঐচ্ছিক বিষয় হিসেবে চর্চিত হতো সুকুমার কলা এবং বাণিজ্যিক কলা বিভাগের ছাত্রদের দ্বারা। ফলশ্রুতিতে পঞ্চাশের দশকে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার গণ্ডি অতিক্রম করা রশিদ চৌধুরী (১৯৩২-১৯৮৬), আব্দুর রাজ্জাক (১৯৩২-২০০৫), মুর্তজা বশীর (১৯৩২), নিতুন কুদ্দু (১৯৩৫-২০০৬) প্রমুখ শিল্পীরাও ছাত্রাবস্থায় তো বটেই; বরং এ মাধ্যমে আগ্রহী হয়ে পরেও চর্চা করেছেন এবং সৃষ্টি করেছেন উল্লেখযোগ্য কিছু শিল্পকর্ম। একই দশকে আবার এঁদের সাথে যোগ হয়েছেন কলকাতায় শিক্ষালাভ করে আসা শিল্পী মোহাম্মদ কিবরিয়াও (১৯২৯-২০১১)। যা এদেশের সামগ্রিক শিল্পচর্চাকে তো বটেই ছাপচিত্র চর্চার ধারাকেও বেগবান করেছে নিঃসন্দেহে। এছাড়াও হামিদুর রাহমান (১৯২৮-১৯৮৮), আমিনুল ইসলাম (১৯৩১-২০১২), দেবদাস চক্রবর্তী (১৯৩৩-২০০৮), কাইয়ুম চৌধুরী (১৯৩৪-২০১৪) প্রমুখ শিল্পীরাও ছাপাই মাধ্যমে কিছু উল্লেখযোগ্য শিল্প সৃষ্টি করেছেন। তবে পঞ্চাশের দশকে একমাত্র সফিউদ্দিন আহমেদ ছাড়া আর কেউই ছাপচিত্র মাধ্যমে বলিষ্ঠভাবে নিজেকে নিয়োজিত রাখতে পারেননি।

ষাটের দশকের প্রথমার্ধে (১৯৬৩) ‘গভর্নমেন্ট ইনস্টিটিউট অব আর্টস’ পরিবর্তিত হয়ে এটি ‘ইন্সটিটিউট অব আর্টস এ্যান্ড ক্রাফটস’ নামে পরিপূর্ণ মহাবিদ্যালয়ে রূপান্তরিত হয়। এসময় (১৯৬৭) সরকারের নিকট হতে অনুদান হিসেবে আরো একটি লিথোগ্রাফিক প্রেস পাওয়া যায় (Shifa Farhana 1998, 24)। এই লিথোগ্রাফিক প্রেসের পাশাপাশি পঞ্চাশের দশকের শেষ নাগাদ সংগৃহীত এঁচিং ছাপার যন্ত্র নবীন শিক্ষার্থীদের মধ্যে নতুন আগ্রহ ও উদ্দীপনার সৃষ্টি করে। এ ছাড়াও ছাপচিত্র বিভাগের বিদেশ ফেরত দু-জন প্রতিভাবান শিক্ষক সফিউদ্দিন আহমেদ ও মো. কিবরিয়ার উপস্থিতিই ছাপচিত্রের প্রতি নবীন প্রজন্মের আগ্রহ বাড়িয়ে দেয় অনেকখানি। করণকৌশলগত দিক থেকেও এই দশক তাৎপর্যপূর্ণ। এসময় (১৯৬৭) নতুন মাধ্যম হিসেবে যোগ হয় ড্রাইপয়েন্ট (পূর্বেও বিচ্ছিন্নভাবে চর্চিত হয়ে থাকতে পারে)। আবার আলাদা আলাদা পাথর কিংবা কাঠ ব্যবহার করে বহুবর্ণিল লিথোগ্রাফ এবং উডকাটের প্রচলনও শুরু হয় এ দশকেই। ষাটের দশকের মধ্য ভাগ থেকেই মো. হুসনে জামাল (১৯৪২-২০১৭) আলাদা আলাদা কাঠ এবং রং ব্যবহার করে রঙিন কাঠ খোদাই ছবির প্রচলন শুরু করেন। আর মো. কিবরিয়া দেশে ফেরার অল্প কিছুকাল পর থেকেই রঙিন লিথোগ্রাফ ছাপাইও শুরু হয়। ফলে ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে ছাপচিত্র বলতে সাদা-কালো এবং একঘেঁয়ে বলে যে অবহেলা ছিল তাও অপসারিত হয়। বরং চিত্রকলার কাছাকাছি ফলাফল লাভের দরুণ ছাপচিত্র সম্পর্কে ছাত্রদের মনে বাড়তি আগ্রহ জন্ম নেয়। এছাড়া ষাটের দশকের শেষ নাগাদ (১৯৬৭) পশ্চিম পাকিস্তানে ইউসিস আয়োজিত বিখ্যাত মার্কিন ছাপচিত্রী মাইকেল পঙ্গ ডিলিয়নের একটি ছাপচিত্র কর্মশালায় পূর্ব-পাকিস্তানী শিল্পীদের (মাহমুদুল হক ও আবুল

বারক্ আলভী) অংশগ্রহণও একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা, যা এ মাধ্যমের প্রতি তরুণ প্রজন্মকে আরো আগ্রহী করে তোলে। কিন্তু ষাটের দশকে তরুণ প্রজন্মের আগ্রহ বাড়লেও ছাপচিত্র চর্চার সামগ্রিক ধারায় গতির সঞ্চরণ হয়েছিল স্বল্প। কারণ, সৃজনশীল শিল্পের ক্ষেত্রে ষাটের দশক খুব বেশি ফলদায়ক হয়নি নানামুখী আন্দোলন সংগ্রামে বাঙালির স্বাধিকার আন্দোলন দানা বেঁধে ওঠায়। এর প্রভাব ছাপচিত্র চর্চার সামগ্রিক ধারার উপরেও কার্যকর ছিল। তাছাড়া নানামুখী প্রতিকূলতায় পঞ্চাশ এবং ষাটের দশক জুড়ে সফিউদ্দিন আহমেদ এবং মো. কিবরিয়া ছাড়া আর কেউই বলিষ্ঠ ও নিরবচ্ছিন্ন ভাবে ছাপচিত্র চর্চায় নিজেকে নিয়োজিত রাখতে পারেননি। তবে এসময় মো. হুসনে জামাল, রঞ্জিত নিয়োগী (?), নাসির বিশ্বাস (১৯৩৮?) প্রমুখরা (ছাত্রাবস্থায়) এ মাধ্যমে উল্লেখযোগ্য অবদান রেখেছেন যা মাধ্যমটির উত্তরণে গুরুত্ববাহী হয়েছে। আঙ্গিকগত দিক থেকে তাঁদের অনেকেই নতুন কিছু সৃষ্টি করতে না পারলেও মাধ্যমের করণকৌশলগত উত্তরণে তাঁদের এই নিরলস শ্রম নিঃসন্দেহে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে সক্ষম হয়েছে। এছাড়াও হাশেম খান (১৯৪১), দেলোয়ার হুসেন (?), রহিত নন্দী (?), প্রফুল্ল রায় (?) প্রমুখরাও ছাপচিত্রে যথেষ্ট প্রতিশ্রুতিশীল ছিলেন। কিন্তু প্রচুর সম্ভাবনাময় এসব শিল্পীরা প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার গণ্ডি পেরোনোর পরে অনেকেই নানা সীমাবদ্ধতায় আর ছাপাই মাধ্যমে নিজেদের যুক্ত রাখতে পারেননি।

এই অবস্থার সামগ্রিক পরিবর্তন হয় সত্তরের দশকে। এ দশক থেকেই মূলত ছাপাই মাধ্যমের চর্চায় নিয়োজিত প্রকৃত পরবর্তী প্রজন্মের দেখা পাওয়া যায়। তবে সত্তরের দশকের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ঐতিহাসিক ঘটনা হলো স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয়। দীর্ঘ নয় মাসের রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের মধ্যদিয়ে পৃথিবীর মানচিত্রে জায়গা করে নেয় বাংলাদেশ। ঢাকার আর্ট কলেজ তখন স্বাধীন বাংলাদেশের প্রতিষ্ঠান। মুক্তিযুদ্ধোত্তর দেশে অন্য সব প্রতিষ্ঠানের মত এ শিল্পশিক্ষালয়টিও পুনর্গঠিত হয়। এর নাম হয় 'বাংলাদেশ চারু ও কারুকলা মহাবিদ্যালয়'। দশকের শুরুতে চট্টগ্রামের চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে চারুকলা বিভাগ (১৯৭০) এবং চট্টগ্রাম আর্ট কলেজ (১৯৭৩) স্থাপিত হয়। আবার দশকের শেষের দিকে (১৯৭৯) রাজশাহীতে শিল্পবিদ্যালয় (রাজশাহী চারু ও কারুকলা মহাবিদ্যালয়) স্থাপনের ফলে সারা দেশে ছাপচিত্র চর্চার পরিধি আরো খানিকটা বৃদ্ধি পায়। ১৯৭৪ খ্রিষ্টাব্দে বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির যাত্রা শুরু হয়। এদেশে ছাপাই ছবির বিকাশে তারাও নানা ধরনের পদক্ষেপ গ্রহণ করে। বিশেষত পুরো দশকজুড়ে দেশি এবং বিদেশি ছাপচিত্র প্রদর্শনী আয়োজন করে এ মাধ্যমের গ্রহণযোগ্যতা বৃদ্ধির ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে তারা। এ ছাড়াও ১৯৭৯ খ্রিষ্টাব্দে মনিরুল ইসলামের তত্ত্বাবধানে ছাপাই ছবির এক কর্মশালা ও প্রদর্শনীরও আয়োজন করে। যা সামগ্রিকভাবে ছাপচিত্রের প্রতি তরুণদের আরো আগ্রহী করে তোলে। অন্যদিকে ১৯৭৭ খ্রিষ্টাব্দ থেকে ছাপচিত্র মাধ্যমে স্বতন্ত্র বিএফএ এবং ১৯৭৮ খ্রিষ্টাব্দ থেকে এমএফএ ডিগ্রি (দুটি ক্ষেত্রেই পাঠ্যক্রম অনুমোদিত হয় ১৯৭৮ খ্রিষ্টাব্দে) চালুর সুবাদে নিয়মিতভাবে অপেক্ষাকৃত দীর্ঘ সময় ধরে মাধ্যমটি চর্চিত হবার সুযোগ তৈরি হয় (Shifa Farhana 1998 24: ১৯৮২-৮৩ সালের বার্ষিক প্রদর্শনীর ক্যাটালগে মুদ্রিত তথ্য)। ফলে পূর্বের চেয়ে বেশি সংখ্যক দক্ষ ছাপচিত্রী তৈরি হবার সুযোগ সৃষ্টি হয়। এসময় থেকে পাঠ্যক্রমভূক্ত নতুন মাধ্যম হিসেবে এটিং-অ্যাকোয়াটিন্ট চর্চিত হতে শুরু করে ছাত্রছাত্রীদের হাতে (পূর্বে বিচ্ছিন্ন ও ব্যক্তিগত উদ্যোগে চর্চিত হচ্ছিল)। আবার পাকিস্তানি শাসন ও শোষণ থেকে মুক্তিলাভের পর যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশ পুনর্গঠনে নানা ধরনের বৈদেশিক সাহায্য আসে, আসে অনেক বৈদেশিক ছাত্রবৃত্তির সুবিধাও। যা ছাপচিত্র মাধ্যমের সার্বিক বিকাশে বিশেষ গুরুত্ববাহী হয়। এই দশকের শিল্পীদের মধ্যে মনিরুল ইসলাম (১৯৪৩), রফিকুন নবী (১৯৪৩), মিজানুর রহিম (১৯৪৪), মাহমুদুল হক

ছাপাই মাধ্যমের ক্রমবিকাশের ধারায় সৃজনশীল ছাপচিত্র (১৯৪৮-২০০০): পরিপ্রেক্ষিত বাংলাদেশ

(১৯৪৫-২০২২), কালিদাস কর্মকার (১৯৪৬-২০১৯), শহীদ কবীর (১৯৪৭), আবদুস সাভার (১৯৪৮), আবুল বারক আলভী (১৯৪৯) ছাপচিত্রে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রেখেছেন। এছাড়াও আনসার আলী (?), হামিদুজ্জামান খান (১৯৪৬), হাসি চক্রবর্তী (১৯৪৮-২০১৪), স্বপন চৌধুরী (১৯৪৮), বীরেন সোম (১৯৪৮), মনসুরউল করিম (১৯৫০-২০২০), শাহাবুদ্দিন আহমেদ (১৯৫০), চন্দ্রশেখর দে (১৯৫২) প্রমুখরাও ছাপাই মাধ্যমে বেশ কিছু শিল্পকর্ম রচনা করেছেন।

চল্লিশের শেষলগ্নে শুরু হবার পর এদেশের ছাপচিত্রের ইতিহাসে আশির দশকই প্রথম প্রকৃত প্রস্তাবে কর্মমুখর এবং প্রাণচাঞ্চল্য লাভ করে। সত্তরের দশকের শিল্পী প্রজন্মের সাথে যোগ হয় আশির দশকের তরুণ প্রজন্মের ছাপচিত্রীদের কর্মতৎপরতা। এ দশক থেকে দেশে শিক্ষিত নিয়মিত ছাপচিত্রীর দেখা পাওয়া যায়। শুরু থেকে এসময় পর্যন্ত যাদেরকে ছাপচিত্রী হিসেবে চিহ্নিত করা হয় তাঁদের সবাই ছাপচিত্রে উচ্চশিক্ষা নিয়েছেন বিদেশে। কারণ, শুরু থেকেই মাধ্যমটি এদেশীয় ছাত্রশিল্পীদের হাতে চর্চিত হয়েছে নামমাত্র গুরুত্বে। পাঠ্যক্রম অনুযায়ী যে স্বল্পসংখ্যক ছাপচিত্রের ক্লাশ হতো তা দিয়ে এ মাধ্যমে উল্লেখযোগ্য শিল্পসৃষ্টি তো দূর, নানাবিধ সমস্যা সমাধান করে ঠিকঠাক ছাপ নিতে পারাটাই ছিল আসল। আশির দশকে এসে এই অবস্থার পরিবর্তন লক্ষ করা যায় ছাপচিত্রে বিশেষায়িত বিএফএ ও এমএফএ ডিগ্রি চালুর সুবাদে। আবার এ সময়ে বাংলাদেশে একাধিক আন্তর্জাতিক প্রদর্শনীতে ছাপচিত্র প্রদর্শিত হতে থাকে গুরুত্বের সাথে। দশকের প্রথমের (১৯৮১) শিল্পকলা একাডেমির আয়োজনে শুরু হয় এশিয়ান আর্ট বিয়েন্নাল যা এদেশীয় শিল্পীদের আন্তর্জাতিক পরিসরে ছাপাই ছবির তৎকালীন ধারা সম্পর্কে মোটামুটি একটি ধারণা দিতে সক্ষম হয়। এছাড়াও একাডেমির উদ্যোগে বাংলাদেশি শিল্পীদের ছাপচিত্র বিদেশে প্রদর্শন, আবার বিদেশীদের (জার্মান শিল্পীদের এবং পিকাসোর লিথোগ্রাফি) ছাপচিত্র এদেশে প্রদর্শনের নানা উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। এধরনের আন্তর্জাতিক সংযোগ বৃদ্ধি পাওয়ায় এসময় থেকেই মূলত ছাপচিত্রের বৈচিত্র্যময় বিকাশের সূত্রপাত হয়। আবার কয়েকজন শিল্পীর ছাপচিত্র মাধ্যমে আন্তর্জাতিক পুরস্কার লাভের ঘটনাও এদেশের ছাপচিত্র জগতে উদ্দীপনার সঞ্চার করে। এছাড়াও ঢাকা ও চট্টগ্রামে শিল্পকলা একাডেমি দীর্ঘ সময় ধরে আয়োজন করে দুটি ছাপচিত্র কর্মশালারও। যা সার্বিকভাবে ছাপচিত্র চর্চার তাৎপর্য সম্পর্কে আরো ভালো ধারণা প্রদান করে।

চিত্রকলা চর্চায় প্রথম থেকে দেখা গেলেও আশির দশক থেকে ছাপচিত্রীদের মধ্যেও দলগত চর্চার প্রচেষ্টা পরিলক্ষিত হয়। এছাড়া ১৯৮৩ খ্রিষ্টাব্দের ১ সেপ্টেম্বর আর্ট কলেজ ‘চারুকলা ইন্সটিটিউট’ নামে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্ভুক্ত হয়। যা শুধু ছাপচিত্র চর্চাই নয় সামগ্রিক শিল্পচর্চার ক্ষেত্রে নতুন মাত্রা সংযোজন করে। দশকের প্রথমার্ধেই (১৯৮৩) খুলনার শশীভূষণ পাল প্রতিষ্ঠিত শিল্পবিদ্যালয়টিকে খুলনা আর্ট কলেজে রূপান্তরের মাধ্যমে ঢাকার বাইরে ছাপচিত্রচর্চার ব্যাপ্তি আরও খানিকটা প্রসারিত হয়। এ দশকেও ছাপচিত্রে স্নাতক অনেক শিক্ষার্থী বিদেশে গিয়ে এ মাধ্যমে উচ্চতর ডিগ্রি নিতে আগ্রহী হয়ে ওঠেন। ফলে অন্যান্য দেশে ছাপচিত্রের চর্চা এবং এর করণকৌশলগত নানা দিক সম্পর্কে তাঁদের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা লাভ হয় যা পরবর্তীকালে তাঁদের নিজেদের শিল্প-আঙ্গিককে যেমন প্রভাবিত করেছে তেমনি এদেশের সমসাময়িক এবং পরবর্তী প্রজন্মকেও নিরীক্ষাপ্রবণ করে তুলেছে।

আশির দশকের শিল্পীদের মধ্যে একেএম আলমগীর হক (১৯৫৩), রতন মজুমদার (১৯৫৪), রোকেয়া সুলতানা (১৯৫৮), দিলারা বেগম জলি (১৯৬০), ওয়াকিলুর রহমান (১৯৬১), মুসলিম মিয়া (১৯৬১)

উল্লেখযোগ্য। এছাড়াও নাইমা হক (১৯৫৩), শাহাদাত হোসেন (১৯৫৫), কাজী রকিব (১৯৫৫), গোলাম ফারুক বেবুল (১৯৫৮), ঢালী আল মামুন (১৯৫৮), হাবিবুর রহমান (?), শিশির ভট্টাচার্য (১৯৬০), নিসার হোসেন (১৯৬১), ফারেহা জেবা (১৯৬১) প্রমুখরাও ছাপচিত্রে উল্লেখযোগ্য শিল্প নির্মাণ করেছেন।

পূর্ববর্তী দশকসমূহের সৃজন উদ্যমের সাথে নবীন ছাপচিত্রীদের কর্মোদ্যম মিলিত হয়ে ছাপচিত্রের সামগ্রিক মর্যাদাকে আরো উচ্চতায় উন্নীত করে নব্বইয়ের দশক। কয়েকজন তরুণ ছাপচিত্রীর বিভিন্ন আন্তর্জাতিক পুরস্কার অর্জন বিদেশে বাংলাদেশের ছাপচিত্রকে আরো মর্যাদায় এবং একই সঙ্গে স্বদেশেও এই মাধ্যমকে আরো গুরুত্বের আসনে প্রতিষ্ঠিত করে। দশকের মাঝামাঝি সময়ে (১৯৯৫) ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলা ইনস্টিটিউটের ছাপচিত্র বিভাগের স্টুডিওতে ব্যবহারের জন্য জাপানী অনুদান হিসেবে প্রাপ্ত বিশেষভাবে নির্মিত একটি আধুনিক লিথোগ্রাফ এবং একটি এচিং মুদ্রণযন্ত্র স্থাপিত হয়। শিক্ষার্থী শিল্পীদের জন্য উপকরণের এই নতুন সংযোজন সৃজনশীল নিরীক্ষা ও উন্নতমানের ছাপচিত্র সৃষ্টিতে বিশেষ সহায়কের ভূমিকা পালন করে (চানক্য বাউড়ে ১৪১৬, ৫১)।

পূর্বের ধারাবাহিকতায় এ দশকে অনেকেই ব্যক্তিগত ও গোষ্ঠীগত উদ্যোগে ছাপচিত্র স্টুডিও গড়ে তুলতে প্রয়াসী হন। আবার দলগত চর্চার নিমিত্তে ১৯৯২ খ্রিষ্টাব্দে কয়েকজন উদ্যমী তরুণ মিলে গঠন করেন ‘ঢাকা প্রিন্টমেকার্স’। যার সদস্যরা এদেশের সামগ্রিক ছাপচিত্র চর্চায় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন। এ দশকে নারায়ণগঞ্জ আর্ট কলেজ (১৯৯৪), বগুড়া আর্ট কলেজ (১৯৯৫) এবং রাজশাহী চারুকলা মহাবিদ্যালয় (১৯৯৮) এর যাত্রা শুরু হয় যা ছাপচিত্রচর্চার গণ্ডিকে আরো প্রসারিত করে তোলে। ১৯৯৪ খ্রিষ্টাব্দে রাজশাহী চারু ও চারুকলা মহাবিদ্যালয়টি রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলা বিভাগ হিসেবে অধিভুক্ত হয়। এর পাশাপাশি শিল্পকলা একাডেমি বিভিন্ন কর্মশালা ও কর্মসূচির মাধ্যমে ছাপচিত্র চর্চায় বিশেষ ভূমিকা পালন করে। আবার সরকারি নানা উদ্যোগের সাথে বেসরকারি বিভিন্ন উদ্যোগও ছাপচিত্রের বিকাশে গুরুত্ববাহী হয়। এসময়ে বেসরকারি উদ্যোগেও বেশ জোরালো ভাবেই ছাপচিত্র বিষয়ক নানা কর্মশালা আয়োজিত হতে থাকে। ফলে দেশি বিদেশি প্রশিক্ষকদের হাত ধরে নানামুখী উত্তরণ ঘটে ছাপচিত্রের ক্ষেত্রে।

এই দশকের প্রতিশ্রুতিশীল শিল্পীদের মধ্যে আমিরুল মোমেনিন চৌধুরী (১৯৬৪), আহমেদ নাজির (১৯৬৪), শায়লা শার্মিন (১৯৬৪), রফি হক (১৯৬৫), রশীদ আমিন (১৯৬৬), মোহাম্মদ জসীম উদ্দিন (১৯৬৬), আবদুস সোবহান হীরা (১৯৭০), আব্দুস সালাম (১৯৭১), আনিসুজ্জামান (১৯৭২) উল্লেখযোগ্য। এছাড়াও এ প্রজন্মের সাইদুল হক জুঁইস (১৯৬০), মোখলেসুর রহমান (১৯৬১), সেলিনা চৌধুরী মিলি (১৯৬২), অশোক বিশ্বাস (?), মোস্তফা জামান (১৯৬৮) প্রমুখ শিল্পীরাও ছাপচিত্র মাধ্যমে উল্লেখযোগ্য শিল্প রচনা করেছেন।

উপর্যুক্ত আলোচনা হতে প্রতীয়মান হয় যে, বাংলাদেশে ছাপচিত্রকলার চর্চা চল্লিশের দশকে শুরু হলেও নানা সীমাবদ্ধতায় ষাটের দশক পর্যন্ত ব্যাপকতা লাভ করতে পারেনি। কিন্তু সত্তরের দশকের প্রথমে স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের পর পরিবর্তিত সামাজিক রাজনৈতিক বাস্তবতায় এই মাধ্যমের প্রকৃত কর্মচাঞ্চল্য শুরু হয়। এসময় থেকে ধীরে ধীরে নানামাত্রিক পৃষ্ঠপোষকতার সাথে নিরবিচ্ছিন্ন চর্চা ছাপাই মাধ্যমকে এদেশের শিল্প-ইতিহাসে গুরুত্বের আসনে আসীন করে। আশি ও নব্বইয়ের দশকে এসে তা নানামুখী নিরীক্ষা ও চর্চায় নতুন নতুন আঙ্গিক-বৈশিষ্ট্যযুক্ত হয়ে প্রকৃত বৈচিত্র্য অর্জন করে। ফলশ্রুতিতে এদেশের ছাপাই ছবির উৎকর্ষ আন্তর্জাতিক পরিসরেও অর্জন করে গুরুত্বপূর্ণ মর্যাদা। শুরুতে শিল্পীদের ছাপাই ছবির বিষয় নির্বাচনে

রোমান্টিকতা প্রসূত প্রকৃতিবাদিতার সাথে যে দেশজতা ও সমাজকেন্দ্রিক বিষয়লগ্নতা আভাসিত হয়ে উঠেছিল, ধীরে ধীরে তা তিরোহিত হতে থাকে এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত মনস্তাত্ত্বিক অভিব্যক্তির জটিল প্রকাশক্ষেত্র হয়ে ওঠে (যদিও গুরুত্বপূর্ণ রোমান্টিক দৃষ্টিভঙ্গি অদ্যাবধি বর্তমান অনেকের আঙ্গিকে)। একই কথা প্রযোজ্য মাধ্যমের ধারাবাহিক উত্তরণের ক্ষেত্রেও। প্রথমদিকের শিল্পীদের মধ্যে মাধ্যমের বিশুদ্ধতার পক্ষে যে রক্ষণশীল মনোভাব ছিল পরবর্তী প্রজন্মের অনেকের হাতে তা আরো সরল ও স্বতঃস্ফূর্ত হয়ে উঠেছে। ছাপচিত্রকে শুধুমাত্র ছাপচিত্র হিসেবে বিবেচনা না করে বরং সামগ্রিক শিল্পকর্ম হিসেবে তাঁরা এর উপস্থাপন করেছেন। ফলে ধাতব পাত, কাঠ, পাথর, লিনোলিয়াম প্রভৃতি উপকরণ ছাড়িয়ে মুদ্রণ প্রযুক্তির অত্যাধুনিক বিভিন্ন কৌশলও ছাপাই ছবির মাধ্যম হয়ে উঠেছে। তেমনি কোন কোন ক্ষেত্রে পরিসর বা ছাঁচ নির্মাণ কিংবা মূল প্রতিকল্প নির্মাণের বাধ্যবাধকতাকে সরিয়ে ঐতিহাসিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ কোন পরিসর বা স্থাপনাও সরাসরি হয়ে উঠেছে (ছাপচিত্রের) ছাঁচ। সেখানে দ্বিমাত্রিক তলে পরিসর নির্মাণে করণকৌশলের মুনশিয়ানা ছেড়ে ছাপচিত্র মুক্তিলাভ করেছে যুক্তি ও ভাষ্যে। বর্তমান শতকেও এদেশের ছাপচিত্র চর্চার ধারায় যোগ হয়েছে নতুন নতুন মাত্রা। পূর্ববর্তী সময়ে অনেক বিচ্ছিন্ন প্রচেষ্টা দেখা গেলেও বর্তমান শতকে দেশে ছাপাই মেশিন তৈরির ক্ষেত্রে রীতিমত বৈপ্লবিক পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। ফলস্বরূপ ব্যক্তিগত ও বেসরকারি উদ্যোগেও অনেক ছাপচিত্র স্টুডিও গড়ে উঠেছে। কোন কোন স্টুডিও নিজস্ব উদ্যোগে আয়োজন করছে ছাপচিত্র মেলা, কর্মশালা, প্রদর্শনী। ফলে ছাপচিত্র সম্পর্কে শিল্পানুরাগী ও সাধারণ মানুষের ধারণারও ব্যাপক পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। যা সামগ্রিকভাবে ছাপচিত্রের জন্য শুভ ফলদায়ী। তাই একথা বলাই যায় যে, পূর্বের যে কোন সময়ের চেয়ে ছাপচিত্র চর্চার এই সামগ্রিক পরিবেশ নতুন নতুন চর্চাকারীদের আগ্রহ বৃদ্ধি ও এই মাধ্যমের চর্চার ক্ষেত্রকে আরো প্রসারিত করবে এবং প্রযুক্তি নির্ভর এই শিল্পমাধ্যম ভবিষ্যতে আরো উন্নত প্রযুক্তির আর্বিভাবে উত্তরোত্তর সমৃদ্ধ হবে।

তথ্যসূত্র

- এছলামাবাদী, ‘আলোচনা (সাহিত্যের গতি)’, *আল-এছলাম*, ৬ষ্ঠ ভাগ, ৪র্থ সংখ্যা, শ্রাবণ ১৩২৭।
সালাহউদ্দীন আহমদ, ‘বাঙালি সংস্কৃতিতে মানবতাবাদ’, *দৈনিক প্রথম আলো*, ২ অক্টোবর, ২০১৫।
মোহাম্মদ নাসিরউদ্দীন, ‘“সওগাত” এর ইতিবৃত্ত’, *সওগাত*, ৫৮ বর্ষ, ১ম সংখ্যা, অগ্রহায়ণ ১৩৮২।
মোহাম্মদ আকরম খাঁ, ‘চিত্রকলা ও এছলাম’, *মাসিক মোহাম্মদী*, ৩য় বর্ষ, অষ্টম সংখ্যা, ১৩৩৭।
সুকুমার সেন, *বটতলার ছাপা ও ছবি*, দ্বিতীয় পরিবর্ধিত সংস্করণ, কলকাতা: আনন্দ পাবলিশার্স, ২০০৮।
Antony Griffiths. *Prints and Printmaking An introduction to the history and techniques*. London: British Muesum Press, 1996.
D. P. Ghosh. ‘The copper-plate engravings of ancient Bengal and the source of south east Asian art’, in Enamul Haque edited, *Bangladesh Lalit Kala*, Vol. 1, No. 1, Dacca: Dacca Museum, January 1975.
G.W Shaw. ‘Printing and Publishing in Dhaka 1849-1900’, in Sharif Uddin Ahmed edited, *Dhaka Past Present Future*, Dhaka: Asiatic Society of Bangladesh, 1991.
Islam Mustafa Nurul. *Bengali Muslim Public Opinion as Reflected in The Bengali Press 1901-1930*, Dhaka: Bangla Academy, 2003.

The Chittagong University Journal of Arts and Humanities

Mukhopadhyay Amit and Das Nirmalendu, 'Graphic Art in India: 1850 to 1950 (A Brief Background and History)', *Graphic Art in India Since 1850*, New Delhi: Lalit Kala Akademi, September 1985.

Shifa Farhana. 'Print-making Department', Lala Rukh Selim (ed.), *Art*, Vol. 4, No. 2, October-December, 1998.

মহাভারতীয় প্রেমোপাখ্যানের নবরূপ “ভারত প্রেমকথা”

ড. শিপক কৃষ্ণ দেব নাথ*

প্রতিপাদ্যসার

মহাভারত প্রাচীন মহাকাব্য। এ মহাকাব্যে নানা কাহিনি, নানা উপাখ্যান, উপদেশ, অনুশাসন রয়েছে। যা একটি সামাজিক সাহিত্য হিসেবে পাশ্চাত্য পণ্ডিতব্যক্তিসহ সাহিত্যিকরা উল্লেখ করেছেন। এ মহাকাব্য ভারতবর্ষের শিক্ষা-সংস্কৃতি, সভ্যতা ও অধ্যাত্মচেতনার পাশাপাশি অজস্র প্রেম কাহিনির শ্রেষ্ঠ ঐশ্বর্য হিসেবে অন্যতম। সেই প্রেমকাহিনির উপাখ্যানগুলোকে আধুনিক আঙ্গিকে নিজের ভাষায় বিশ্লেষণের মাধ্যমে সুবোধ ঘোষ পাঠক সমাজে উপহার দিয়েছেন ‘ভারত প্রেমকথা’। বৈচিত্র্যের দিক থেকে মহাভারতীয় প্রেমোপাখ্যানগুলো বিস্ময়কর। উপাখ্যানগুলো প্রণয়তন্ত্রের মনোবিশ্লেষণেও অভিনব। সাবিত্রী-সত্যবান, নল-দময়ন্তী, দুশ্যন্ত-শকুন্তলা ইত্যাদি লোকসমাজের অতিপরিচিত উপাখ্যানগুলো ছাড়াও এমন আরও বহু উপাখ্যান মহাভারতে আছে, যেগুলো পাঠকসমাজে তেমন কোনো প্রচার লাভ করেনি। এসব অল্প-প্রচারিত উপাখ্যানও প্রেমের রহস্য বৈচিত্র্য ও মহত্বের এক একটি বিশেষ রূপের পরিচয়। ‘ভারত প্রেমকথা’র বিশিষ্ট গল্প এই রকমই বিশিষ্ট মহাভারতীয় প্রেমোপাখ্যানের পুনর্গঠিত রূপ। পুরাতনের পুনরাবৃত্তি ছাড়াই মহাভারতের ক্লাসিক রূপ ও ভাবের ভাণ্ডার থেকে আহৃত উপাদান নিয়ে রচিত এই নতুন গল্পগুলো আধুনিক সাহিত্যের মর্যাদা লাভ করেছে। উপাখ্যানের মূল বক্তব্য অক্ষুণ্ণ রেখে এবং মূল বক্তব্যকে স্পষ্টতর অভিব্যক্তি দান করার জন্যই মাঝে মাঝে নতুন ঘটনা কল্পিত হয়েছে। প্রতিটি কাহিনি লেখকের মনীষা ও শিল্পনির্মিতির পরিচয় বহন করেছে। বহন করেছে নর-নারীর প্রেম যে এক সুসহ রহস্য— এই চিরন্তন সত্যটি। মহাভারতের অজস্র কাহিনির মধ্যে আমাদের জানা-অজানা, পরিচিত-অপরিচিত কাহিনিগুলোর কেবল ব্যাখ্যা প্রদান নয় বরং পুরাণের প্রচলিত কাঠামো ভেঙে লিখেছেন ‘ভারত প্রেমকথা’। ফলে এটি কেবল পুনর্লিখন নয়, হয়ে উঠেছে পুনঃসৃষ্টি। মহাভারতীয়

*সহযোগী অধ্যাপক, সংস্কৃত বিভাগ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়

প্রেমোপাখ্যানের নবরূপ “ভারত প্রেমকথা” শীর্ষক গবেষণা প্রবন্ধে মহাভারতের কাহিনির সঙ্গে

তুলনামূলক আলোচনা করে প্রেম সম্পর্কে লেখকের আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গি তুলে ধরা হয়েছে।

সুবোধ ঘোষ (১৯০৯-১৯৮০) কল্লোল-উত্তর যুগের অন্যতম কথাসাহিত্যিক। ছোটগল্প দিয়ে বাংলা সাহিত্যে তাঁর পদচারণা শুরু হলেও তিনি উপন্যাস, নাটক ও প্রবন্ধ রচনায় সিদ্ধহস্ত ছিলেন। তবে শুধু সাহিত্য নয়, সামরিক বিদ্যা, পুরাতত্ত্ব কিংবা নৃবিদ্যাতেও তাঁর যথেষ্ট দক্ষতা ছিল। গভীর আর্থ - সামাজিক চেতনা, প্রখর বাস্তববোধ ও অভ্রান্তবোধ তাঁর রচনার অন্যতম বৈশিষ্ট্য। সুবোধ ঘোষ লিখেছেন ১৫৭টি গল্প, ৩০টি উপন্যাস। এছাড়া রচনা করেছেন নাটক, প্রবন্ধ, রম্যরচনা। তাঁর একটি জনপ্রিয় গ্রন্থের নাম- “ভারত প্রেমকথা”(১৩৬২)। মহাভারতের প্রেমকাহিনি অবলম্বনে গ্রন্থটি রচিত।

১৯৫৬ সালে প্রকাশিত ‘ভারত প্রেমকথা’ মহাভারতের কাহিনির পুনঃনির্মাণ, বলা যায় পুরাণের প্রচলিত বক্তব্যের নতুন ব্যাখ্যা। তবে বাংলা সাহিত্যে মহাভারতের প্রভাব মধ্যযুগ থেকে লক্ষ্য করা যায়।

ব্যক্তির ও সমাজের মন এবং সম্পর্কের যে-সব সমস্যা মহাভারতীয় উপাখ্যানগুলির মূল বিষয়, সে-সব সমস্যা বিংশ শতাব্দীর নরনারীর জীবন থেকেও অন্তর্হিত হয়নি। নরনারীর প্রণয় ও অনুরাগ, দাম্পত্যের বন্ধন বাৎসল্য ও সখ্য- শ্রদ্ধা ভক্তি ক্ষমা ও আত্মত্যাগ ইত্যাদি যে-সব সংস্কারের উপর সামাজিক কল্যাণ সৌষ্ঠব মূলত নির্ভর করে, তার এক-একটি আদর্শোচিত ব্যাখ্যা এইসব উপাখ্যানের নায়ক-নায়িকার জীবনের সমস্যার ভিতর দিয়ে বর্ণিত হয়েছে। শত শত ব্যক্তি ও ব্যক্তিত্বের যে-সব কাহিনী মহাভারতে বিবৃত হয়েছে তার মধ্যে এই বিংশ শতাব্দীর যে-কোনও মানুষ তাঁর নিজের জীবনেরও সমস্যার অথবা আত্মহের রূপ দেখতে পাবেন। এই কারণে শতক যুগের কবিদল মহাভারত থেকে তাঁদের রচনার আখ্যানবস্তু আহরণ করেছেন (সুবোধ ঘোষ ১৩৬২, মুখবন্ধ)।

সুবোধ ঘোষের ‘ভারত প্রেমকথা’ গ্রন্থের ২০টি প্রেমোপাখ্যান ব্যাসকৃত মহাভারতের যে পর্বের যে অধ্যায়ে উপাখ্যানগুলোর মূল পরিচয় উল্লিখিত আছে তা হলো-

পরীক্ষিৎ ও সুশোভনা (বনপর্ব, অধ্যায় ১৯২), সুমুখ ও গুণকেশী (উদযোগপর্ব, অধ্যায় ১০৪), অগস্ত্য ও লোপামুদ্রা (বনপর্ব, অধ্যায় ৯৬), অতিরথ ও পিঙ্গলা (শান্তিপর্ব, অধ্যায় ১৭৪), মন্দপাল ও লপিতা (আদিপর্ব, অধ্যায় ২২৯), উত্থা ও চান্দ্রেয়ী (অনুশাসনপর্ব, অধ্যায় ১৫৪), সংবরণ ও তপতী (আদিপর্ব, অধ্যায় ১৭১), ভাস্কর ও পৃথা (বনপর্ব, অধ্যায় ৩০৫), অগ্নি ও স্বাহা (বনপর্ব, অধ্যায় ২৪), বসুরাজ ও গিরিকা (আদিপর্ব, অধ্যায় ৬৯), গালব ও মাধবী (উদযোগপর্ব, অধ্যায় ১১৫), রুর ও প্রমদ্রা (আদিপর্ব ৯), অনল ও ভাস্বতী (সভাপর্ব, অধ্যায় ৩১), ভৃগু ও পুলোমা (আদিপর্ব, অধ্যায় ৫), চ্যবন ও সুকন্যা (বনপর্ব, অধ্যায় ১২২), জরৎকার ও অস্তিকা (আদিপর্ব, অধ্যায় ১৩), জনক ও সুলভা (শান্তিপর্ব, অধ্যায় ৩২১), দেবশর্মা ও রুচি (অনুশাসনপর্ব, অধ্যায় ৪০), অষ্টাবক্র ও সুপ্রভা (অনুশাসনপর্ব, অধ্যায় ১৯), ইন্দু ও শ্রাবাবতী (শল্যপর্ব, অধ্যায় ৪৯) (সুবোধ ঘোষ ১৩৬২, পরিশিষ্ট)।

‘ভারত প্রেমকথা’র প্রত্যেকটি কাহিনি বিশ্লেষণ করে সুবোধ ঘোষের মনীষার ও শিল্পকৌশলের পরিচয় দেওয়া যেতে পারে। সাহিত্যরত্ন শ্রীহরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় এক পত্রে লেখককে লিখেছিলেন ‘ভারত প্রেমকথা’ ‘এক বিস্ময়জনক সৃষ্টি’। এছাড়া তিনি মহাভারতের বৈশিষ্ট্য ও মহাকাব্যের প্রেম কাহিনি সম্পর্কে মতামত ব্যক্ত করেন।

মহাভারতীয় প্রেমোপাখ্যানের নবরূপ “ভারত প্রেমকথা”

মহাভারতের সবকিছুর মধ্যেই কাহিনি ও চরিত্রের সাক্ষাৎ লাভ করা যায়। এর নৈসর্গিক রহস্য ও মেরুজ্যোতির অভ্যন্তরে কাহিনি আছে, সমুদ্র বাড়বানলের অন্তরালে কাহিনি আছে, সপ্তাশ্বযোজিত রথে আসীন সূর্যের উদয়াচল থেকে গুরু ক’রে অন্তাচল পর্যন্ত অভিযানের সঙ্গে সঙ্গে কাহিনি আছে। মহাভারতীয় কাহিনির নায়ক-নায়িকার নাম হল ভারতের শত শত গিরি পর্বত নদ নদী ও হ্রদের নাম। ভারতীয় শিশুর নাম-পরিচয়ও মহাভারতীয় চরিত্রগুলির নামে নিম্পন্ন হয়। মহাভারতের এই জনপ্রিয়তার কথা সুবোধ ঘোষের গল্প বুননে প্রভাব ফেলেছিল। কারণ “ব্যক্তির ও সমাজের মন এবং সম্পর্কের যে-সব সমস্যা মহাভারতীয় উপাখ্যানগুলির মূল বিষয়, সে-সব সমস্যা বিংশ শতাব্দীর নরনারীর জীবন থেকেও অন্তর্হিত হয়নি” (সুবোধ ঘোষ ১৩৬২, মুখবন্ধ)। এজন্যই তিনি প্রাচীন কাহিনিকে আধুনিক মানুষের কাছে জনপ্রিয় করে তুলতে নবনির্মিত রূপে উপস্থাপন করেছেন।

পরীক্ষিৎ ও সুশোভনা

‘পরীক্ষিৎ ও সুশোভনা’র কাহিনিতে প্রতারক নারীর মনোজগতের পরিবর্তন ও প্রেম উন্মেষের রূপ চিত্রিত হয়েছে। মহাভারতে রয়েছে, পাণ্ডবেরা বনবাসকালে মার্কণ্ডেয়’র কাছে শুনেছিলেন পরীক্ষিৎ ও সুশোভনার কাহিনি। বিস্তৃত পরিসরের এই ঘটনাধারা থেকে উপাদান সংগ্রহ করে সুবোধ ঘোষ কাহিনিকে নতুন মোড়কে সাজিয়েছেন (কালীপ্রসন্ন সিংহ ১৯৮৩, ৪৯৭)।

প্রমথনাথ বিশী লিখেছেন—‘পরীক্ষিৎ ও সুশোভনা’ কাহিনীর সুশোভনার চেয়ে অধিকতর মডার্ণ উয়োম্যান তো বাংলা সাহিত্যে দেখি নাই।...প্যাশন-এর তড়িৎপূঞ্জচালিত সুশোভনা উল্কাপিণ্ডের ন্যায় মধ্যাহ্ন ভাস্করের ন্যায়, জ্বলন্ত বর্তিকার ন্যায় দুঃসহ। স্বাধীন, দুর্ধর্ষ, দুর্বীর, সহজ জীবনের তিরোভাবের সঙ্গে সঙ্গে হৃদয়াবেগের প্রবল উত্থানপতনও বোধ করি লোপ পাইয়াছে’ (সুবোধ ঘোষ ১৩৬২, ভূমিকা)।

সুমুখ ও গুণকেশী

নারী তার হৃদয়ের কাক্ষিত পুরুষকে লাভ করতে মৃত্যুকেও তুচ্ছ করতে পারে ‘সুমুখ ও গুণকেশী’র কাহিনিতে তারই চিত্রণ রয়েছে (কালীপ্রসন্ন সিংহ ১৯৮৩, ৭৮৫-৭৮৬)।

সুমুখ ছিলেন ঐরাবত নাগের বংশজাত চিকুরের পুত্র ও ইন্দ্রের সারথি মাতলির কন্যা গুণকেশীর পতি। গুণকেশীর জন্য যোগ্য পতি খুঁজতে মাতলি দেবর্ষি নারদকে নিয়ে নানান জায়গায় ঘুরেছিলেন। অবশেষে অনন্ত নাগ বাসুকির পুরীতে গিয়ে একটি সুদর্শন নাগকে দেখে তাঁর পছন্দ হলো। নারদের কাছে মাতলি জানলেন যে, সেই নাগটি হলো ঐরাবত নাগের বংশজাত আর্যকের পৌত্র সুমুখ। মাতলি যখন সুমুখের হস্তেই কন্যাকে সম্প্রদান করবেন ঠিক করলেন, তখন আর্যক বললেন যে, সুমুখের পিতা চিকুরকে গরুড় ভক্ষণ করেছে এবং এক মাস পরে সুমুখকেও গরুড় ভক্ষণ করবেন স্থির করেছে। একথা শুনে মাতলি সুমুখকে নিয়ে ইন্দ্রের কাছে গেলেন। বিষু সেখানে ছিলেন। সব শুনে তিনি ইন্দ্রকে বললেন সুমুখকে অমৃত পান করাতে। বলা হয় ইন্দ্র বর দিলেন সুমুখ দীর্ঘায়ু হবেন। তখন আশ্বস্ত হয়ে মাতলি গুণকেশীকে সুমুখ হস্তে সম্প্রদান করলেন। সুমুখ দীর্ঘায়ু পেয়েছেন জেনে গরুড় ক্রুদ্ধ হয়ে ইন্দ্রকে প্রশ্ন করলেন যে, ইন্দ্র গরুড়কে নাগভোজনের বর দিয়ে এখন তাতে বাদ সাধছেন কেন। গরুড়কে রুষ্ট দেখে ইন্দ্র বললেন যে, তিনি নন— বিষু সুমুখকে অভয় দিয়েছেন। উত্তর শুনে গরুড় আরও ক্রুদ্ধ হলেন। বিষু, যাঁর ভার গরুড় অতি সহজে বহন করেন, তিনি কী করে তাঁর ভোজনে বাধা দিতে পারেন! বিষুর সম্মুখে গিয়ে গরুড় নিজের বল নিয়ে আক্ষালন করতেই, বিষু তাঁর বাম বাহুর ভার গরুড়ের ওপর রাখলেন। সেই ভারে গরুড় হতচেতন হয়ে পড়লেন। চেতনা পেয়ে গরুড় বিষুর কাছে ক্ষমা

ভিক্ষা করলেন। বললেন, তিনি শুধু বিষণ্ণ ধবজবাসী পক্ষী মাত্র বিষণ্ণ যে অত বলশালী তিনি তা জানতেন না। বিষণ্ণ তখন সুমুখকে গরুড়ের বক্ষে নিষ্ক্ষেপ করলেন। গরুড়ের কাছে সুমুখের আর কোনও ভয় রইলো না। এই কাহিনিতে সুমুখ ও গুণকেশী কেবল স্বামী-স্ত্রী এবং নারদ ও ইন্দ্রের সমবেত প্রয়াস তাঁদের দাম্পত্য জীবনকে রক্ষা করে।

মহাভারতের এই কাহিনি থেকে উপকরণ নিয়ে সুবোধ ঘোষ সম্পর্কটিকে মানবিক আবেদনে সমৃদ্ধ করে তুলেছেন। সুমুখ ও গুণকেশীর দাম্পত্য জীবন নয়, কাহিনির মূল বিষয় প্রাক্‌বিবাহ কালীন নর-নারীর সম্পর্কে প্রণয় মহিমার অন্বেষণ।

অগস্ত্য ও লোপামুদ্রা

দাম্পত্য জীবনে বংশরক্ষার তাগিদে পুরুষ ভুলে যায় হৃদয়ের উত্তাপকে। কিন্তু নারী চায় পুরুষের প্রেম, তাকে হৃদয় দিয়ে উপলব্ধি করতে পারায় রয়েছে সম্পর্কের বাঁধন (কালীপ্রসন্ন সিংহ ১৯৮৩, ৪০২-৪০৩)।

‘অগস্ত্য ও লোপামুদ্রা’ এমনই এক কাহিনি, যেখানে ব্রতচারীর হৃদয়ের আড়াল থেকেও উদ্ঘাটিত হয় প্রেম। মহাভারতের বনপর্বে অগস্ত্য মুনির পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি বিখ্যাত মুনি। লোমশ মুনি পাণ্ডবদের সঙ্গে ভ্রমণ করতে করতে অগস্ত্যের আশ্রম মণিমতী পুরীতে এসে লোপামুদ্রার গল্প বলেছিলেন। লোপামুদ্রা ছিলেন বিদর্ভরাজের কন্যা। তিনিও একজন তপস্বিনী ছিলেন। তাঁদের পুত্রের নাম দৃঢ়সু (অপর নাম ইধ্ববাহ) এই পুত্র পরে মহাকবি ও বেদজ্ঞ হয়েছিলেন।

প্রমথনাথ বিশী লিখেছেন— ‘অগস্ত্য-পত্নী লোপামুদ্রার তপস্বিনী মূর্তিতেই আমরা অভ্যস্ত, কিন্তু তাহার চরিত্রেও যে আরও একটা দিক আছে সুবোধবাবু তাহা দেখাইয়াছেন। সে চিরন্তনী নারী। অলংকার-পরিত্যাগে সে কী দুঃখ। আবার অলংকার-লোভেই বা কী আগ্রহ। কিন্তু স্বামী যখন বহুবাঞ্ছিত অলংকাররাশি তাহার পায়ের কাছে আনিয়া স্তুপীকৃত করিল, তখন সেইগুলির দিকে ফিরিয়াও চাহিল না। চিরন্তনী ছলনাময়ীর এ কেমন চিরন্তন ছলনা। ঐ নীলাটুকু নারী-চরিত্রে আছে বলিয়াই বোধ করি মানুষের সংসারে নারীর প্রেম সুন্দর ও সুসহ এক রহস্য’ (সুবোধ ঘোষ ১৩৬২, ভূমিকা)।

অতিরথ ও পিঙ্গলা

ত্যাগ ও তিতিক্ষার মধ্য দিয়ে বাঞ্ছিতকে পাবার সুখ লাভ করতে চায় নারী, এমনই এক কাহিনির সন্ধান পাওয়া যায় ‘অতিরথ ও পিঙ্গলা’র কাহিনিতে। বহুগামিনী বারবণিতা এবং প্রেমময়ী নারীর মধ্যবর্তী ফাঁকটুকু সুবোধ ঘোষ যেন ভরাট করে দেন তাঁর কাহিনিতে (কালীপ্রসন্ন সিংহ ১৯৮৪, ৬৬১)।

অবস্তির এক গণিকা পিঙ্গলার পরিচয় পাওয়া যায় পুরাণে। ঋষভ মুনির প্রতি সশ্রদ্ধ আচরণের ফলে পরজন্মে রাজা চন্দ্রাঙ্গদের মেয়ে কীর্তিমালিনী হয়ে জন্মায় এবং ভদ্রায়ুর সঙ্গে বিয়ে হয়। পুরাণের এই গণিকা পিঙ্গলাকে নিয়ে সুবোধ ঘোষ এক কল্পিত কাহিনি রচনা করেছেন।

মন্দপাল ও লপিতা

প্রেম ও ব্যক্তিত্বের সংমিশ্রণে নারী স্বমহিমায় উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে ‘মন্দপাল ও লপিতা’ কাহিনিতে।

মহাভারত অনুসারে মন্দপাল এক তপস্বী, যিনি পুত্রহীন হওয়ায় মৃত্যুর পর পিতৃলোকে স্থান পাননি। যাতে শীঘ্র পুত্রলাভ হয় এজন্য তিনি শার্ঙ্গক পক্ষীর রূপধারণ করে খাণ্ডব বনে এসে জারিতা নাম্নী এক শার্ঙ্গিকার গর্ভে চারটি পুত্র উৎপাদন করেন। তারপর তরুণী পত্নী লপিতার কাছে ফিরে যান। জরিতা মহর্ষি কর্তৃক পরিত্যক্ত ঋষিপুত্রদের পরিত্যাগ করতে না পেরে প্রাণপণে তাঁদের পোষণ করে খাণ্ডব বনেই বাস করতে লাগলেন।

মহাভারতীয় প্রেমোপাখ্যানের নবরূপ “ভারত প্রেমকথা”

খাণ্ডবদাহনের সময়ে মন্দপাল লপিতাকে নিয়ে খাণ্ডব বনে বিচরণ করার সময়ে পুত্রসহ তাঁদের মধ্যে ভুল বোঝাবুঝির এক পর্যায়ে দুঃখ করলেন যে, পতিপরায়ণ স্বামীরাও পুত্রবতী হলে পতিদের প্রতি আর অনুরক্ত থাকে না। এই কথা শুনে মন্দপালের পুত্ররা পিতাকে তাঁদের পুত্রভক্তি প্রদর্শন করলেন। মন্দপাল জারিতাকে বললেন যে, সপত্নীর সঙ্গে বিবাদ করলে পরলোকের ক্ষতি হয়(কালীপ্রসন্ন সিংহ ১৯৮৩, ২২৫)।

উতথ্য ও চান্দ্র্যেয়ী

ঋষি উতথ্য অঙ্গিরার পুত্র। চন্দ্রের কন্যার সঙ্গে যখন উতথ্যের বিবাহ হলো, তখন বরুণ খুব দুঃখিত হয়েছিলেন। কারণ বরুণের বহুদিনের ইচ্ছা ছিল চান্দ্র্যেয়ীকে বিবাহ করার। একদিন চান্দ্র্যেয়ী যখন যমুনায় স্নান করছেন, তখন বরুণ সুযোগ পেয়ে চান্দ্র্যেয়ীকে জোর করে জলের ভেতরে তাঁর নিজের পুরীতে নিয়ে গেলেন। সেই অপূর্ব সুন্দর পুরীতে তিনি চান্দ্র্যেয়ীর সঙ্গে পরম সুখে দিন যাপন করতে লাগলেন। দেবর্ষি নারদ সেই খবর জেনে উতথ্যকে অপ্রিয় সংবাদটি দিলেন। উতথ্য নারদকে বললেন বরুণকে গিয়ে বলতে যে, বরুণ লোকপালক হয়ে এই অন্যায় কাজ কেন করেছেন। চান্দ্র্যেয়ী উতথ্যের ভাৰ্যা, তাঁকে অবিলম্বে উতথ্যকে প্রত্যর্পণ করতে। নারদ সঙ্গে সঙ্গে বরুণকে গিয়ে উতথ্যের কথাগুলি জানালেন। বরুণ নারদকে বললেন উতথ্যকে গিয়ে বলতে যে, সুন্দরী চান্দ্র্যেয়ী বরুণের প্রিয়া, তাঁকে বরুণ পরিত্যাগ করতে রাজি নন। নারদ ফিরে এসে উতথ্যকে বললেন যে, তিনি বরুণকে বোঝাবার অনেক চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু বরুণ উতথ্যের ভাৰ্যাকে প্রত্যর্পণ করতে রাজি নন। উতথ্য সেই শুনে অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে পৃথিবীর সমস্ত জল পান করতে শুরু করলেন। বরুণকে সুহৃদরা উপদেশ দিলেন চন্দ্রের কন্যাকে পরিত্যাগ করতে, কিন্তু বরুণ সম্মত হলেন না। কিন্তু উতথ্য যখন বরুণের পুরীর ভেতরের হৃদয়লোকেও জলশূন্য করতে শুরু করেছেন, তখন বরুণ ভীত হলেন। চান্দ্র্যেয়ীকে নিয়ে এসে উতথ্যকে দিয়ে ক্ষমা চাইলেন। কিন্তু উতথ্যের কাছে ফিরে যাবার ব্যাপারে চান্দ্র্যেয়ীর কী মত ছিল— মহাভারত রচয়িতা ব্যাসদেব সে বিষয়ে নীরব। মহাভারতীয় এই কাহিনি সুবোধ ঘোষের দৃষ্টিতে নতুন ব্যাখ্যা লাভ করেছে (কালীপ্রসন্ন সিংহ ১৯৮৪, ১০৪৩)।

সংবরণ ও তপতী

জনকল্যাণ এবং হিতব্রতের আদর্শের সঙ্গে ব্যক্তিগত প্রেমাকাজক্ষার এক দ্বন্দ্ব দেখানো হয়েছে ‘সংবরণ ও তপতী’র কাহিনিতে। মহাভারতের আদিপর্বে বর্ণিত রাজা সংবরণ সূর্যোপাসক ছিলেন। তিনি প্রতিদিন প্রাতঃকালে পরম শ্রদ্ধাসহকারে ধূপ, অর্ঘ্য মাল্যাদিসহ ভাস্করের আরাধনা করতেন। একদিন রাজা সংবরণ মৃগয়া করতে গিয়ে সূর্য কন্যা তপতীকে অবলোকন করেন এবং তাঁর অলৌকিক সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়ে তাঁর পাণি প্রার্থনা করলেন। তপতী সংবরণকে নিজ পিতা ভাস্করের নিকট তাঁর ইচ্ছা জ্ঞাপন করতে বললেন। তখন মহারাজ সংবরণ মহর্ষি বশিষ্ঠকে পৌরোহিত্যে বরণ করে, তাঁর দ্বারা নিজ মনাভিপ্রায় জ্ঞাপন করেন। বিবাহের পর অমাত্যদের কাছে রাজ্যভার দিয়ে তপতীসহ দ্বাদশবর্ষকাল ভোগ লালসা পরিতৃপ্ত করতে লাগলেন। রাজা সংবরণকে এরকম রাজ্যভার পরিত্যাগপূর্বক, ভোগমুখে মত্ত দেখে, দেবরাজ ইন্দ্র তাঁর রাজ্যে বর্ষণ করা থেকে বিরত হলেন। অনাবৃষ্টিতে প্রজাসাধারণ দুর্ভিক্ষ-পীড়িত ও ব্যাধিগ্রস্ত হয়ে, অকালে কালগ্রাসে নিপতিত হতে লাগল। তাই দেখে মহর্ষি বশিষ্ঠ সংবরণকে পরামর্শ দিয়ে পুনরায় স্বরাজ্যে আনয়ন করলেন। রাজা সংবরণ পুনরায় রাজ্যভার গ্রহণ করলে, পূর্বের মতো যথাযথ বারিবর্ষণ ও শস্য উৎপন্ন হতে লাগল। তখন মহারাজ সংবরণ সহধর্মিণী সমভিব্যাহারে দ্বাদশবর্ষব্যাপী এক যজ্ঞ সম্পাদন করলেন (কালীপ্রসন্ন সিংহ ১৯৮৩, ১৭৭-১৭৯)।

সুবোধবাবুর মনীষার প্রমাণ এই যে, মূল কাহিনীতে আরও পাঁচটা সম্ভাবনা থাকা সত্ত্বেও যুগোপযোগী সম্ভাবনাটিকে গ্রহণ করিয়াছেন, আর তাঁহার শিল্পদক্ষতার প্রমাণ এই যে (এখনও যদি প্রমাণের আবশ্যক করে), সেই সম্ভাবনাটিকে হৃদয়স্পর্শী কাহিনীতে পরিণত করিয়াছেন। কথাটি যুগপৎ যুগস্পর্শী ও হৃদয়স্পর্শী হইয়াছে (সুবোধ ঘোষ ১৩৬২, ভূমিকা)।

ভাস্কর ও পৃথা

নর-নারী সম্পর্কের নানা চিত্র অঙ্কনে সিদ্ধহস্ত সুবোধ ঘোষ মহাভারতীয় নির্মম কাহিনীকেও পরিবর্তিত রূপদান করেছেন, যার ফলে কাহিনীটি হয়ে উঠেছে হৃদয়গ্রাহী। ‘ভাস্কর ও পৃথা’ কাহিনী এমনই এক হৃদয়গ্রাহী কাহিনী। মহাভারতের আদিপর্বে পৃথার পরিচয় পাওয়া যায়, যদুশ্রেষ্ঠ শূরের কন্যা পৃথা পালিতা হয়েছেন নিঃসন্তান কুন্তি-ভোজের কাছে। কুন্তী এক পুত্র সন্তানের জন্ম দেন, বিষয়টি গোপন রাখতে নবজাতককে জলে ভাসিয়ে দেওয়া হয়।

মহাভারতে পুত্রকে ভাসিয়ে দিয়ে পৃথা লোকলজ্জা থেকে নিজেকে আড়াল করেছেন, সামাজিক অনুশাসনই সেখানে কেন্দ্রীয় সমস্যা। সুবোধ ঘোষের কাহিনীতে পুত্র বিসর্জনের সময়ও পৃথার দৃষ্টিতে ছড়িয়ে আছে অভিমানী প্রেমিকার করুণ আর্তি। অতলস্পর্শী গভীরচারী এক প্রেমিকা চিত্তের আকৃতি কাক্ষিত পুরুষের সঙ্গে মিলিত হতে চান, সমাজ সংসার তখন তাঁর কাছে মিথ্যে হয়ে যায়। শুধুমাত্র নারীর প্রেম বা পুরুষের প্রেম নয়, নারী-পুরুষ সম্পর্কের মূল তত্ত্বটিকে উপস্থাপন করেছেন ‘ভারত প্রেমকথা’র কাহিনীতে (কালীপ্রসন্ন সিংহ ১৯৮৩, ৬০৭-৬০৯)।

অগ্নি ও স্বাহা

বৈষ্ণবপদাবলীর রাধার মতই কাক্ষিত পুরুষকে পেতে সকল খ্যাতি অখ্যাতি বরণ করে নেন নারী, মানবইতিহাসে এ সত্য চিরকালীন। কলঙ্কের ডালি মাথায় নিয়ে কৃষ্ণ প্রেমে সুখ লাভ করেন রাধা। এরকম কাহিনীই মহাভারতকে সমৃদ্ধ করেছে।

মহাভারতের মতে, স্বাহা ছিলেন দক্ষের কন্যা। তিনি অগ্নিকে কামনা করে ব্যর্থ হন। অগ্নি এই সময় সপ্তর্ষিদের স্ত্রীদের দিকে তাকিয়ে অত্যন্ত কামার্ত হয়ে পড়েন। কিন্তু এই নারীদের পাবেন না বলে তিনি দুঃখে বনে যান। স্বাহা এই সংবাদ জেনে একে একে ছয়জন ঋষির স্ত্রীর রূপ ধারণ করে অগ্নির কাছে যান। সপ্তর্ষিদের স্ত্রীদের মধ্যে বশিষ্ঠ মুনির স্ত্রী অরুন্ধতী ছিলেন তীব্র তাপসিনী। এই কারণে স্বাহা অরুন্ধতীর রূপ ধরতে ব্যর্থ হয়েছিলেন। অগ্নির সাথে স্বাহা ছদ্মবেশে মিলিত হন। প্রতিবারের মিলনের পর অগ্নির স্থলিত বীর্য স্বাহা একটি কুণ্ডে নিক্ষেপ করেন। পরে এই কুণ্ড থেকে স্কন্দ (কার্তিকেয়)-এর জন্ম হয়। এই ঘটনার পর ঋষিরা তাঁদের স্ত্রীদের দুষ্টরিত্রা জ্ঞানে ত্যাগ করেন। স্বাহা পরে সব স্বীকার করে নিলে এবং স্কন্দের অনুরোধে ঋষিরা তাঁদের স্ত্রীদের গ্রহণ করেন। স্বাহা অগ্নির সাথে বাস করার জন্য স্কন্দের কাছে সাহায্য প্রার্থনা করলে, স্কন্দ বলেন যে-হোমাগ্নিতে আত্মত্যাগ প্রদানকালে স্বাহা অগ্নির সাথে থাকার ইচ্ছা প্রকাশ করলেই তাঁর অগ্নির সাথে থাকা সম্ভব হবে। অগ্নির ঔরসে স্বাহা তিনটি পুত্রসন্তানের জন্ম দেন। এরা ছিলেন- পাবক, পবমান ও শুচী। এ ছাড়া অগ্নিবেশ্য নামে আরও একটি পুত্রের কথা জানা যায় (কালীপ্রসন্ন সিংহ ১৯৮৩, ৫৩১-৫৩২)।

মহাভারতীয় প্রেমোপাখ্যানের নবরূপ “ভারত প্রেমকথা”

প্রমথনাথ বিশী লিখেছেন— ‘অগ্নির বহ্ননারী ও পরনারী স্বাদ পূরণের জন্য প্রেমিকা স্বাহার ছদ্মবেশে সে কী কপটাভিনয়! এ কাহিনীটি যেমন করণ তেমনি মনোরম, তেমনি নাট্যরসে গভীর’ (সুবোধ ঘোষ ১৩৬২, ভূমিকা)।

বসুরাজ ও গিরিকা

মহাভারতে বর্ণিত বসুরাজ চেদি দেশের পুরু বংশজাত রাজা। ইন্দ্র তাঁকে সখা গণ্য করে স্ফটিকময় বিমান, অম্লান পঙ্কজের বৈজয়ন্তী মালা এবং বংশনির্মিত যষ্টি দিয়েছিলেন। বিমানে চড়ে আকাশে বিচরণ করতেন বলে উপরিচর বসু নামেও পরিচিত ছিলেন। কোলাহল পর্বত ও শক্তিমতী নদীর কন্যা গিরিকা ছিলেন তাঁর মহিষী।

তাঁর রাজ্য চেদীর কাছে শক্তিমতী নামে একটি নদী ছিল। কোলাহল নামে এক সচেতন পর্বত কামান্ন হয়ে শক্তিমতীকে আক্রমণ করে। বসুরাজ পর্বতের এই অন্যায় ব্যবহারে ক্রুদ্ধ হয়ে পদাঘাতে সেই পর্বত বিদীর্ণ করলে শক্তিমতী সেই বিদীর্ণ পথ দিয়ে বহির্গত হন। কোলাহল পর্বতের সঙ্গমে এই নদীর গর্ভে এক পুত্র ও এক কন্যা জন্ম গ্রহণ করে। শক্তিমতী পুত্র-কন্যাকে বসুরাজের হস্তে অর্পণ করেন। বসুরাজ সেই পুত্রকে সেনাপতি ও কন্যা গিরিকাকে মহিষী করেন (কালীপ্রসন্ন সিংহ ১৯৮৩, ৭৩)।

গালব ও মাধবী

মহাভারতের উদ্যোগপর্বে গালব ও মাধবীর পরিচয় বর্ণিত হয়েছে। তাঁদের সম্পর্কের মূলে রয়েছে নিষ্ঠাবতী নারীর প্রেম। সংক্ষেপে মহাভারতীয় পুরাণ এরকম— গালব ছিলেন বিশ্বামিত্রের শিষ্য। বিশ্বামিত্র তাঁর কাছে গুরুদক্ষিণা হিসেবে আটশত অশ্ব চেয়েছিলেন যাদের কান্তি হবে চন্দ্র-শুভ্র আর একটি কর্ণ হবে শ্যামবর্ণ। সেই গুরুদক্ষিণা সংগ্রহের জন্য বিষ্মকে স্মরণ করলে বিষ্মুর বাহন গরুড় তাঁকে যযাতির কাছে নিয়ে যান। যযাতি তাঁর কন্যা মাধবীকে গালবের হাতে দিয়ে বলেন যে, মাধবীর শুক্লস্বরূপ গালব নিশ্চয় অন্য রাজাদের কাছ থেকে তাঁর অভীষ্ট আটশত অশ্ব জোগাড় করতে পারবেন। গালবকে সাহায্য করতে মাধবী একে একে অযোধ্যা-রাজ হর্ষশ্ব, কাশীরাজ দিবোদাস এবং ভোজরাজ উশীনরকে দেহদান করে তাঁদের তিন পুত্রের জন্ম দেন। এভাবে গালবের ছয়শত অশ্ব জোগাড় হয়। অবশিষ্ট অশ্ব জোগাড় না করতে পেরে গালব তার পরিবর্তে মাধবীকে বিশ্বামিত্রের হাতে সমর্পণ করেন। বিশ্বামিত্রের এক পুত্রের জন্ম দিয়ে মাধবী গালবের গুরুদক্ষিণা দেওয়া সম্পূর্ণ করেন। এরপর মাধবীকে যযাতির হাতে প্রত্যর্পণ করে গালব বনে তপস্যা করতে চলে যান। বহুদিন বাদে যযাতি যখন আত্মপ্রশংসা করার জন্য ইন্দ্রের আদেশে স্বর্গচ্যুত হয়ে অন্তরীক্ষে তাঁর চার দৌহিত্রের সঙ্গে ধর্মালাপ করছিলেন, তখন গালবও সেখানে উপস্থিত হন। নিজের তপস্যার পুণ্যফলের একাংশ দিয়ে তিনি যযাতিকে পুনর্বীর স্বর্গে যেতে সাহায্য করেন। কাহিনি অংশে মাধবীকে বিক্রিত পণ্য রূপে দেখা যায় (কালীপ্রসন্ন সিংহ ১৯৮৩, ৭৯২-৭৯৩)।

রুরুর ও প্রমদ্বরা

মহাভারতের আদিপর্বের দুটি চরিত্র রুরুর ও প্রমদ্বরা। রুরুর চ্যবন-পুত্র প্রমতির ঔরসে অঙ্গরা ঘৃতাচির গর্ভজাত পুত্র। রুরুর স্থূলকেশের পালিতা-কন্যা প্রমদ্বরাকে (ইনি আসলে গন্ধর্বরাজ বিশ্বাবসু ও অঙ্গরা মেনকার কন্যা) দেখে মোহিত হয়ে তাঁকে বিয়ে করতে চান। দুর্দৈবক্রমে বিয়ের কিছুদিন আগে সর্প-দংশনে প্রমদ্বরার মৃত্যু হলো। রুরুর কাতর বিলাপে কৃপা পরবশ হয়ে দেবতারা বলেন যে, রুরুর তাঁর নিজের আয়ুর অর্ধেক প্রমদ্বরাকে দিতে

রাজি থাকলে প্রমদ্বরা আবার জীবন ফিরে পেতে পারেন। রুপু তাতে রাজি হন। প্রমদ্বরা জীবন ফিরে পাওয়ার পর রুপু তাকে বিয়ে করেন(কালীপ্রসন্ন সিংহ ১৯৮৩, ২৬-২৭)।

অনল ও ভাস্বতী

‘মহাভারতে’র মাহিষ্মতীর অজেয়তা অংশে যে কাহিনি আছে তাকেই সুবোধ ঘোষ রূপান্তর করেছেন নিপুণ কৌশলে।

মাহিষ্মতী নগরীর রাজা নীল ও তাঁর কন্যা ভাস্বতীর কাহিনি লিপিবদ্ধ হয়েছে এই আখ্যানে। দিগ্বিজয়ে বের হয়ে সহদেব এই নগরী আক্রমণ করলে অনল প্রতিরোধ করে দাঁড়ান। এই অনলকে চোখে না দেখলেও ভাস্বতী পথমধ্যে উপাচার দিয়ে এসেছে (কালীপ্রসন্ন সিংহ ১৯৮৩, ২৫৬-২৫৮)।

ভৃগু ও পুলোমা

দাম্পত্য জীবনে প্রেমহীন ভালোবাসা কিংবা ভালোবাসাহীন প্রেমের মধ্যে সেতুবন্ধ রচনা করতে পারে সন্তান। সম্পর্কের এই গ্রন্থি সর্বকালে, সর্বযুগে সত্য। মহাভারতের কাহিনি অবলম্বনে তাকেই আরও একবার পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করেছেন সুবোধ ঘোষ। মহাভারতের ‘ভৃগু ও পুলোমা’র সম্পর্ক সেই ইঙ্গিত দিয়ে যায়, যা সুবোধ ঘোষের কাহিনিতে পরিপূর্ণ মূর্তিতে ধরা পড়ে।

মহাভারতের আদিপর্বে জানা যায়— এক রাক্ষস, পুলোমা নামক এক নারীকে বিবাহ করতে ইচ্ছা প্রকাশ করলে, পুলোমার পিতা তাতে সম্মত না হয়ে, মহর্ষি ভৃগুর হাতে কন্যাকে সম্প্রদান করেন। রাক্ষস এই কথা জানতে পেরে, পুলোমার সন্ধানে ভৃগুর কুটিরে আসেন। ভৃগু তখন সেখানে না থাকায়, অগ্নির কাছ থেকে পুলোমার পরিচয় জেনে নিয়ে রাক্ষস তাকে অপহরণ করেন। এই সময় চ্যবন ঋষি পুলোমার গর্ভে ছিলেন। তিনি গর্ভাচ্যুত হয়ে রাক্ষসকে দক্ষ করেন। ভৃগু গৃহে প্রত্যাবর্তনের পর অগ্নিকে ‘সর্বভুক হও’ অভিশাপ দেন। এরপর অগ্নি অগ্নিহোত্র যজ্ঞ থেকে নিজেকে প্রত্যাহার করেন। ফলে দেবতারা হব্য থেকে বঞ্চিত হতে থাকলে— ব্রহ্মা অগ্নিকে বলেন যে, কেবল গুহ্যদেশের শিখা ও ক্রব্যাদ (মাংসভক্ষক) শরীর সর্বভুক হবে এবং মুখে যে আহুতি দেওয়া হবে, তাই দেবগণের ভাগরূপে গৃহীত হবে (কালীপ্রসন্ন সিংহ ১৯৮৩, ২৩-২৫)।

চ্যবন ও সুকন্যা

পুরুষের প্রেম মুগ্ধতার আরো একটি কাহিনি হলো ‘চ্যবন ও সুকন্যা’র গল্প। মহাভারতের বনপর্বে আছে— চ্যবন ভৃগুর প্রিয় পুত্র। রাক্ষস যখন ভৃগুর স্ত্রী পুলোমাকে হরণ করছে, তখন দুরাত্মা রাক্ষসের সেই অন্যায় কাজ দেখে চ্যবন মাতৃ-গর্ভ দেখে বেরিয়ে আসেন। চ্যবনের তেজে রাক্ষস পুলোমার দেহ ভস্ম হয়ে যায়। চ্যবনের পুত্র (পত্নী আরুণীর গর্ভজাত) ঔর্বনাম হলেন ক্ষত্রিয় সংহারক পরশুরামের পিতামহ।

মহর্ষি চ্যবন নর্মদা নদীর নিকট বৈদূর্য পর্বতে দীর্ঘকাল ধরে তপস্যা করেছিলেন। এই সময়ে তাঁর চক্ষুদুটি ছাড়া সর্ব দেহ বল্লীক, পিপীলিকা ও লতায় আবৃত হয়ে যায়। রাজা শর্যাতি তাঁর রূপবতী কন্যা সুকন্যা ও পত্নীদের নিয়ে যখন ভ্রমণ করতে সেখানে আসেন, তখন সুকন্যা একটি বল্লীকস্তূপের মধ্যে চ্যবনের জ্বলন্ত চক্ষুদুটি দেখে কৌতূহলী হয়ে কাঁটা দিয়ে বিদ্ধ করলেন। চ্যবন তাতে জ্বলন্ত হয়ে যোগবলে রাজা শর্যাতির সৈন্যদের মলমূত্র রোধ করে দিলেন। শর্যাতি তার কারণ অনুসন্ধান করতে গিয়ে জানলেন যে, সুকন্যা বল্লীকস্তূপে অত্যাঙ্কল কোনও বস্তু বিদ্ধ করেছিলেন। শর্যাতি সঙ্গে সঙ্গে বল্লীকস্তূপের সম্মুখে কৃতাজ্জলি হয়ে চ্যবনকে প্রসন্ন করার চেষ্টা করলেন। চ্যবন বললেন যে, যদি শর্যাতি সুকন্যাকে দান করেন, তাহলেই তিনি ক্রোধ সম্বরণ করবেন। শর্যাতি বাধ্য হয়ে সুকন্যাকে চ্যবনের হাতে সম্প্রদান করলেন।

মহাভারতীয় প্রেমোপাখ্যানের নবরূপ “ভারত প্রেমকথা”

এর কিছুকাল পরে একদিন অশ্বিনীকুমারদ্বয় স্নানরতা সুকন্যাকে নগ্নাবস্থায় দেখে তাঁকে বৃদ্ধ চ্যবনকে পরিত্যাগ করে ওঁদের একজনকে বরণ করতে বললেন। সুকন্যা তাঁদের প্রত্যাখ্যান করে বললেন যে, তিনি চ্যবনের প্রতি অনুরক্ত। তখন অশ্বিনীকুমারদ্বয় প্রস্তাব করলেন যে, তাঁরা চ্যবনকে এক রূপবান যুবক করে দেবেন, কিন্তু সুকন্যাকে রাজি হতে হবে যে, যুবক চ্যবন ও অশ্বিনীকুমারদের মধ্যে একজনকে পতিত্বে বরণ করতে। সুকন্যা সে কথা আশ্রমে এসে চ্যবনকে জানাতেই তিনি তাতে সম্মতি দিলেন। তখন অশ্বিনীকুমারদ্বয় চ্যবনকে নিয়ে জলে প্রবেশ করে যখন সেখান থেকে আবার উঠলেন তখন তিন জনের রূপের মধ্যে কোনও আপাতপার্থক্য রইলো না। কিন্তু সুকন্যা চ্যবনকে চিনতে পেরে- তাঁকেই বরণ করলেন। যৌবন ও স্ত্রীকে পেয়ে চ্যবন প্রীত হয়ে অশ্বিনীকুমারদের বর দিলেন যে, দেবগণের চিকিৎসক হলেও এখন থেকে তাঁদেরও অন্য দেবতাদের মত সোমপানের অধিকার থাকবে(কালীপ্রসন্ন সিংহ ১৯৮৩, ৪২৫)।

জরৎকার ও অস্তিকা

‘জরৎকার ও অস্তিকা’ কাহিনিতে নারী তাঁর সঙ্কল্পে স্থির থেকে হৃদয়হীন, প্রেমহীন স্বামীকে তার সম্ভানের পিতা রূপে বরণ করে নিয়েছেন।

মহাভারতে বর্ণিত জরৎকার বিখ্যাত মুনি, যিনি পিতৃপুরুষের হিতার্থে নাগরাজ বাসুকির ভগিনী জরৎকারকে বিবাহ করেছিলেন। সূর্যাস্ত যাচ্ছে দেখে একদিন নিদ্রিত জরৎকারকে তাঁর পত্নী অস্তিকা জাগিয়ে দিলেন যাতে মহর্ষি সন্ধ্যাকৃত্য সময়মত করতে পারেন। কিন্তু জরৎকার তাতে পত্নীর প্রতি অসন্তুষ্ট হয়ে তাঁকে ত্যাগ করলেন। ব্রহ্মা ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন যে, বাসুকির ভগিনী জরৎকারের গর্ভে তপস্বী জরৎকারের যে পুত্র জন্মাবে তিনিই ধার্মিক সর্পগণকে রক্ষা করবেন। জরৎকার চলে যাবার কিছুদিন পরেই তাঁদের পুত্র আস্তিকের জন্ম হয়(কালীপ্রসন্ন সিংহ ১৯৮৩, ২৮-২৯)।

জনক ও সুলভা

‘জনক ও সুলভা’ কাহিনিতে সমাজ-সংসারের প্রসঙ্গ এসেছে নর-নারীর সম্পর্কে কেন্দ্র করে।

মহাভারতে বর্ণিত সন্ন্যাসিনী সুলভা মিথিলার রাজা জনকের (তাঁর অন্য নাম ধর্মধ্বজ) খ্যাতি শুনে তাঁকে পরীক্ষা করার জন্য মনোহর রূপধারণ করে তাঁর সভায় উপস্থিত হন। তারপর যোগবলে নিজের বুদ্ধি ও চক্ষু জনকের বুদ্ধি ও চক্ষুতে সন্নিবিষ্ট করলেন। জনক প্রথমে সুলভাকে তত্ত্বজ্ঞান বিষয়ে অনেক কিছু বললেন। তিনি যে, আসক্তি-মোহ ইত্যাদি ত্যাগ করতে পেরেছেন তা জানালেন। আরও জানালেন যে, তিনি সবাইকেই সমদৃষ্টিতে দেখেন এবং বিশ্বাস করেন যে, মোক্ষ লাভের সঙ্গে অর্থের কোনও যোগ নেই- শুধু জ্ঞান দ্বারাই মোক্ষ লাভ হয়। তারপর সুলভাকে প্রশ্ন করলেন, কেন সুলভা তাঁর হৃদয়ে প্রবেশ করছেন। জনক ক্ষত্রিয় আর সুলভা ব্রাহ্মণী। তিনি গৃহাশ্রমে আছেন আর সুলভা সন্ন্যাসিনী- তাঁদের দুজনের কখনও মিলন হতে পারে না। সুলভার যদি পতি থাকে, তাহলে তিনি জনকের অগম্য। অতএব তাঁকে ত্যাগ করে সুলভা যেন চলে যান। সুলভা তখন তাঁকে বললেন যে, জনক যদি সকলকেই সমান দৃষ্টিতে দেখেন তাহলে তাঁর এই কথাগুলো নিরর্থক। জনক যদি সত্যিই জীবনযুক্ত হন, তাহলে সুলভার স্পর্শে তাঁর কি অপকার হবে? তিনি পদ্মপত্রে জলের মতই নির্লিপ্তভাবে জনকের দেহে আছেন। সুলভা তাঁকে লিঙ্গপরিচয়ের উর্ধ্বে উঠে সাধনা করার পরামর্শ দিয়েছিলেন। সুলভা জনকের স্বজাতি, রাজর্ষি প্রধানের বংশে জন্মেছেন। যোগ্য পতি না পেয়ে মোক্ষ ধর্মের সন্ধানে তিনি সন্ন্যাসিনী হয়েছেন।

সেই ধর্ম জানবার জন্যই জনকের কাছে এসেছেন। তাঁর শরীরে এক রাত্রি শয়ন করে তিনি প্রস্থান করবেন। সুলভা রাজাকে মোক্ষধর্ম সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অজ্ঞ প্রমাণিত করেন(কালীপ্রসন্ন সিংহ ১৯৮৪, ৮০৯-৮১১)।

প্রমথনাথ বিশী লিখেছেন- ‘সেই যে সুলভা একবার আসিয়া জনকের আত্মজ্ঞানের পরীক্ষা করিয়া গেল! শান্ত সমুদ্রকে উদ্বেল করিয়া চন্দ্রমা যেমন নির্বিকারভাবে অন্তর্মিত হয়, তেমনি করিয়া সুলভা প্রস্থান করিল। জনক তাহাকে ভুলিতে পারে নাই, পাঠকও তাহাকে ভুলিবে এমন সম্ভাবনা দেখি না (সুবোধ ঘোষ ১৩৬২, ভূমিকা)।’

দেবশর্মা ও রুচি

মহাভারতের কাহিনিকে আশ্রয় করেই সুবোধ ঘোষ দাম্পত্য জীবনের প্রেম-অপ্রেমের ছবিও আঁকেছেন। মহাভারতের ‘দেবশর্মা ও রুচি’র কাহিনিকে প্রয়োজন অনুসারে পরিবর্তন করে নারীর তীব্র প্রেমাকাঙ্ক্ষার এক বিচিত্র রূপ অঙ্কন করেছেন।

দেবশর্মার স্ত্রী রুচির ওপর দেবরাজ ইন্দ্রের লোভ ছিল। রুচি বেশ রূপবতী মেয়ে। তার যে রূপের খ্যাতি আছে সেটা সে জানে। স্বামী দেবশর্মার মত একজন সামান্য পুরুষের পদপ্রাপ্তে নিজেকে অবনত করে রাখতে চায় না। সে মুক্তি চায়। দূরে পথ প্রাপ্তের দিকে কারও প্রতিক্ষায় তাকিয়ে থাকে সে। স্ত্রীর মনের কথা বোঝে না স্বামী দেবশর্মা ঋষি। এরই নাম ইন্দ্রমায়ী। অবশ্য দেবশর্মা নিজেও পত্নীর চরিত্র-দুর্বলতার কথা জানতেন। সেজন্য তিনি যজ্ঞ করতে যাবার সময়ে শিষ্য বিপুলের হাতে স্ত্রীকে রক্ষা করার ভার দিয়ে যান। দেবশর্মা চলে গেলে বিপুল যোগবলে গুরুপত্নী রুচির শরীরে মধ্যে প্রবেশ করে ইন্দ্রের লালসার হাত থেকে তাঁকে রক্ষা করে। রুচির ভেতর এক আমূল পরিবর্তন ঘটে তখন। সে বিপুলের প্রতি প্রণয়াসক্ত হয়ে পড়ে। বিপুলেরও মন আছে কিন্তু তাই বলে গুরুপত্নীর এই প্রণয় তার কাঙ্ক্ষিত নয়। তাই সে গুরুগৃহ ছেড়ে চলে যায়। তখন রুচি উপলব্ধি করে যে এই রূপ এবং যৌবন প্রমত্ত বসন্তের ছলনা ছাড়া আর কিছুই না(কালীপ্রসন্ন সিংহ ১৯৮৪, ৯২০-৯২১)।

অষ্টাবক্র ও সুপ্রভা

মহাভারতের এক একটি বিষয়, কাহিনি, চরিত্রকে উপাদান হিসেবে গ্রহণ করে সুবোধ ঘোষ মূলত নতুন তত্ত্বের উদ্ঘাটন করতে চেয়েছেন।

অষ্টাবক্র উদালক-কন্যা সুজাতা ও উদালক-শিষ্য কহোড়ের পুত্র। বদান্য ঋষির কন্যাকে দেখে মুগ্ধ হয়ে তাঁকে বিবাহ করতে চাইলে, বদান্য অষ্টাবক্রকে বললেন যে, উত্তর দিকে যাত্রা করে কুবের-ভবন অতিক্রম করে এক রমণীয় বনে পৌঁছে- সেখানে এক তপস্বিনীর সঙ্গে দেখা করে ফিরে এলে তারপর তিনি তাঁর কন্যাকে দান করবেন। অষ্টাবক্র বহু পথ অতিক্রম করে সেই বনে পৌঁছে এক দিব্য আশ্রমের কাঞ্চনময় ভবনে প্রবেশ করলেন। সেই ভবনে কয়েকটি সুন্দরী নারীর সঙ্গে এক বৃদ্ধা রমণী ছিলেন। সেখানে থাকাকালীন সেই বৃদ্ধা অষ্টাবক্রের শয্যায় এসে তাঁর সঙ্গে মিলিত হবার চেষ্টা করতেন। অষ্টাবক্রকে লোভ দেখাতেন যে, তাঁর কামনা পূর্ণ করলে তাঁর রমণীয় আশ্রম সমেত সব ধন অষ্টাবক্রের হবে। অষ্টাবক্রের কাছে প্রত্যাখ্যাত হবার পর এক রাত্রে তিনি পরম রূপবতী কন্যায় রূপান্তরিত হয়ে অষ্টাবক্রকে প্রলোভিত করার চেষ্টা করলেন। কিন্তু অষ্টাবক্র প্রলোভিত হলেন না। তখন সেই বৃদ্ধা নিজেকে উত্তরদিকের অধিষ্ঠাত্রী দেবী বলে পরিচয় দিয়ে বললেন যে, তিনি বদান্যের অনুরোধে অষ্টাবক্রকে পরীক্ষা করছিলেন। আরও বললেন যে, অষ্টাবক্র যেন মনে রাখেন যে, স্ত্রী জাতি

মহাভারতীয় প্রেমোপাখ্যানের নবরূপ “ভারত প্রেমকথা”

চপলা এবং স্থবিরী জীরও কামজুর হয়। পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে অষ্টাবক্র ফিরে এসে বদান্য-কন্যা সুপ্রভাকে বিবাহ করেন (কালীপ্রসন্ন সিংহ ১৯৮৪, ৮৯৮-৯০০)।

ইন্দু ও শ্রবাবতী

ব্যাসদেব রচিত মহাভারতের কিছু কিছু জায়গায় প্রেমকে প্রাধান্য দিয়ে একগামিতাকে বেছে নেওয়া হয়েছে যেমন- শল্যপর্বের ইন্দু ও শ্রবাবতী, আদিপর্বে ভৃগু ও পুলোমা, বনপর্বে পরীক্ষিৎ ও সুশোভনা এবং অগ্নি ও স্বাহা উপাখ্যান। ‘ইন্দু ও শ্রবাবতী’ কাহিনিতে শেষ পর্যন্ত নারীর প্রেম তপস্যায় পরিণত হয়েছে।

মহাভারতে আছে, ঘৃতাটীকে দেখে মহর্ষি ভরদ্বাজের বীর্যপাত হলে তা তিনি পত্রপুটে ধারণ করেন। এই বীর্যে জন্ম হয় একটি কন্যার, যার নাম শ্রবাবতী। ইন্দুকে বিয়ে করার জন্য তিনি দুষ্কর ব্রত নিয়ে তপস্যা করেছিলেন। একশ বছর তপস্যার পর ইন্দু সম্ভূষ্ট হয়ে পরীক্ষার জন্য বশিষ্ঠ সেজে আসেন। শ্রবাবতী তাঁর সাধ্যমত ঋষির সেবা করতে রাজি হন কিন্তু তাঁর স্ত্রী হতে পারবেন না জানান; কারণ তিনি ইন্দুকে চান। বশিষ্ঠরূপী ইন্দু তখন পাঁচটি কুল দিয়ে রান্না করতে বলেন এবং শীঘ্রই তাঁর বাসনা পূর্ণ হবে বলে যান। ইন্দু একটি তীর্থে এসে জপ করতে থাকেন যাতে কুল রান্নায় ব্যাঘাত হয়। এদিকে সারাদিনে রান্নার সমস্ত কাঠ শেষ হয়ে যায়, শ্রবাবতী তখন নিজের দুই পা উনুনের মধ্যে দিয়ে কুল সিদ্ধ করতে চেষ্টা করেন। ইন্দু সম্ভূষ্ট হয়ে নিজের বেশে এসে বর দেন দেহত্যাগ করে স্বর্গে গিয়ে ইন্দ্রের সঙ্গে মিলিত হবেন শ্রবাবতী (কালীপ্রসন্ন সিংহ ১৯৮৪, ৪২৬-৪২৭)।

মানবিক বন্ধনগুলোকে মহাভারতে নির্মমভাবে ভেঙে দেওয়া হয়েছে, সেখানে সম্পর্কের চেয়ে বড় হয়ে উঠেছে ধর্ম, ত্যাগ, নিষ্ঠা এবং সামাজিক অনুশাসন সেই সম্পর্কগুলোকে মূল্য দিয়ে সুবোধ ঘোষ কাহিনির পুনর্নির্মাণ করেছেন, এখানেই তাঁর নবনির্মাণের সার্থকতা। প্রেমের নিষ্ঠা যে স্বর্গসুখের চেয়ে অধিকতর শ্রেয় এই সত্য প্রমাণ করতেই তিনি এই কাহিনিটি থেকে উপকরণ সংগ্রহ করেন।

ভাষারীতি

‘ভারত প্রেমকথা’য় সুবোধ ঘোষের ভাষারীতি একেবারে ভিন্ন। গল্প-উপন্যাস কিংবা প্রবন্ধের বিষয় ভেদে ভিন্ন ভাষারীতি ব্যবহার করেছেন তিনি। তাঁর আধুনিক জীবনের গল্পগুলোর ভাষাও আলাদা। এখানে তাঁর ভাষাপ্রবাহ মহাভারতের দেশ-কালে বিস্তারিত, তাই তার জল গভীর, ধ্বনি গভীর এবং কলালবণ্যে উচ্ছ্রিত শীকরকণায় ইন্দ্রধনুর লীলা। এখানে তাঁর ভাষাপ্রবাহের নির্মল দর্পণে কোথাও বা হিমালয়ের ধ্বলিমার শুভ্র প্রতিবিম্ব, কোথাও বা প্রাচীন অরণ্যানীর শাখাজটিল অন্ধকারের গৃঢ় প্রতিচ্ছায়া, আর কোথাও বা ঐশ্বর্যসুখী রাজরাজন্যগণের বিচিত্রবর্ণ রত্নসৌধচূড়ার প্রতিচ্ছবি। অন্যদিকে প্রেমোপাখ্যানের বর্ণনায় যখন সংলাপ সৃষ্টি করেছেন তাতেও মহাভারতীয় পরিবেশ সৃজিত হয়েছে। এক্ষেত্রে শব্দ চয়নে তিনি তৎসমপন্থী।

উদ্ধৃতিসমূহ থেকে আমরা বুঝতে পারছি ভাষার নিজস্ব একটি মহিমা আছে, ভাষা কেবল ভাবের বাহন নয়। মহাভারতীয় পরিবেশ রচনা এ ভাষারীতি ছাড়া অসম্ভব। সুবোধ ঘোষ বাংলা সাহিত্যে যখনি ক্লাসিকাল রস সৃষ্টি করেছেন তখনই এই ভাষারীতিকে গ্রহণ করতে তিনি বাধ্য হয়েছেন। এমন বর্ণাঢ্য, রূপাঢ্য ধ্বনিসুন্দর ভাষা- বাংলা ভাষারই এক নতুন পরিচয় এবং বিপুল উৎকর্ষের সম্ভাবনাময় পথ দেখিয়ে দিয়েছে। আসলে মহাভারতীয় ঐতিহ্য বজায় রাখার জন্য ও কাহিনিকে অভিনব করে তুলতে তিনি যে সমস্ত ভাষা ব্যবহার করেছেন তা অবশ্যই পাঠক মনকে আলোড়িত করে।

উপসংহার

বস্তুত সুবোধ ঘোষের ‘ভারত প্রেমকথা’ গ্রন্থের কুড়িটি গল্প মহাভারতীয় প্রণয়কাহিনির পুনর্গঠিত বা নবনির্মিত রূপ। প্রতিটি কাহিনি লেখকের রূপান্তর প্রচেষ্টায় অনবদ্য হয়ে উঠেছে; যা লেখকের মনীষা ও শিল্পনির্মিতির পরিচয় বহন করছে। নর-নারীর প্রেমের চিরন্তন সত্য উন্মোচনে সুবোধ ঘোষ কুশলী ভাষা বিন্যাসে ও সংলাপ চয়নে আজো জনপ্রিয় কেবল ‘ভারত প্রেমকথা’ সৃষ্টির কারণে।

তথ্যসূত্র

কালীপ্রসন্ন সিংহ (অনূদিত)। বনপর্ব, মহাভারত ১ম খণ্ড। কলকাতা: তুলি-কলম, ১৯৮৩।
কালীপ্রসন্ন সিংহ (অনূদিত)। শান্তিপর্ব, মহাভারত ১ম খণ্ড। কলকাতা: তুলি-কলম, ১৯৮৪।
সুবোধ ঘোষ। ভারত প্রেমকথা। কলকাতা: আনন্দ পাবলিশার্স, ১৩৬২।

ইউরোপ ও দক্ষিণ এশিয়ার মধ্যে সভ্যতার মিথস্ক্রিয়া: ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট

ড. মুহাম্মদ শফিউল্লাহ কুতুবী*

প্রতিপাদ্যসার

প্রাচীনকাল থেকে অদ্যাবধি ইউরোপীয়রা দক্ষিণ এশিয়ায় তাদের অনুসন্ধিৎসু ভ্রমণ অব্যাহত রেখেছে। তারা দক্ষিণ এশিয়াকে সবসময় একটি সম্ভাবনাময় জনপদ হিসেবে বিবেচনা করেছে। এ ভূখণ্ডের বৈচিত্র্য, প্রাকৃতিক সম্পদের প্রাচুর্য ও সমৃদ্ধ সংস্কৃতি সর্বদা তাদেরকে আকৃষ্ট করেছে। রোমাঞ্চপ্রিয় ও সমৃদ্ধিপ্রেমীদের নিকট দক্ষিণ এশিয়া বরাবরের মতোই আকর্ষণের কেন্দ্রবিন্দু। এ-কথার প্রমাণ ইতিহাসের পাতায় ভরপুর। এখানে বিভিন্ন দুর্লভ উৎস থেকে প্রাপ্ত তথ্যানুযায়ী উভয় অঞ্চলের কালানুক্রমিক সভ্যতার সম্পর্ক চিহ্নিত করা হয়েছে। এ-প্রবন্ধে প্রাচীন মানবসভ্যতা থেকে নিয়ে অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ পর্যন্ত ইউরোপ ও দক্ষিণ এশিয়ার মধ্যে সভ্যতার মিথস্ক্রিয়া নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

ভূমিকা

প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মাঝে যোগাযোগ সম্পর্কের ইতিবাচক ও নেতিবাচক মিশ্র ধারা প্রাচীনকাল থেকে প্রবাহমান। পৃথিবীর দুইপ্রান্তের জনগোষ্ঠীর মাঝে চিন্তা, ভাব, রুচি ও রীতিনীতির বিনিময় যেমন ঘটেছে সামাজিক, সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিকভাবে পরস্পরের মাঝে বৈরিতা ও সংঘাতের চিত্রও দেখা গেছে। বিশেষ করে অষ্টাদশ শতকের শেষার্ধ থেকে দক্ষিণ এশিয়া ও ইউরোপের মাঝে সভ্যতার মিথস্ক্রিয়া ঘটতে থাকে। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য শব্দ দুটি যদিও মূলত, ভূখণ্ড বোঝায় কিন্তু প্রাচীনকাল থেকেই তা বিশেষ পরিভাষা হিসেবেও ব্যবহৃত হয়ে আসছে। এ প্রবন্ধের মৌলিক উদ্দেশ্য হলো, ইউরোপের সঙ্গে দক্ষিণ এশীয় সভ্যতার পারস্পরিক সম্পর্কের

* সহযোগী অধ্যাপক, আরবি বিভাগ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়

সূচনা, পরিচিতি ও প্রভাব সম্বন্ধে তথ্য-প্রমাণগুলোর ঐতিহাসিক দৃষ্টিকোণে যাচাই ও বিশ্লেষণ করা। এতদ্ব্যতীত সভ্যতার সূচনা থেকে আঠারো শতকের প্রথমার্ধ পর্যন্ত প্রাপ্ত ইতিহাসের উপাত্তগুলো নিয়ে প্রবন্ধে আলোচনা করা হয়েছে। দক্ষিণ এশিয়ায় নতুন সভ্যতা গড়ে ওঠার শুরু থেকে ভারতীয় সভ্যতার আগ পর্যন্ত ইউরোপ-সংযোগের তথ্যনির্ভর অনুসন্ধানের ওপর ভিত্তি করে আলোচনার বিস্তার ঘটেছে।

প্রাচ্যের ভাষা, সাহিত্য, দর্শন, সভ্যতা, তাহজিব-তামাদ্দুনের অধ্যয়ন প্রবন্ধের অন্তর্গত। এর ফলশ্রুতিতে সমকালীন পাশ্চাত্য গোষ্ঠী বা ইউরোপীয়দের একটি বিশেষ চিত্র তুলে ধরা হয়েছে। একসময় উভয় সভ্যতার মাঝে ফাটল এতই বিস্তৃত হয়েছে যে, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য তখন পরস্পরের প্রতিদ্বন্দ্বী বৈরী ও চিরশত্রু হিসেবে পরিগণিত হতে শুরু করে। বিশ শতকের গোড়ার দিকে প্রাচ্য সম্পর্কে ইউরোপীয়দের নেতিবাচক মনোভাবের প্রতিক্রিয়ায় এতদ্ব্যতীত স্পষ্ট বিরোধিতা পরিলক্ষিত হয়। অ্যাডওয়ার্ড সাঈদ (১৯৩৫-২০০৩) এই গভীর বিভাজনকে ওরিয়েন্টাল মুভমেন্টের (প্রাচ্য পরিচিতি আন্দোলন) অনিবার্য ফল সাব্যস্ত করেছেন। তাঁর ভাষায় যা সাম্রাজ্যবাদ ও পুঁজিবাদের হাতিয়ার হিসেবে উত্থিত হয়েছিলো। এ ধরনের বহুবিধ আন্দোলনের মাঝে বেশ দুর্বল ও ক্ষীণ আওয়াজে পাশ্চাত্য পরিচিতি (Occidentalism)-ও খানিকটা নিজের অস্তিত্ব জানান দেবার চেষ্টা করে। তবে এটি বলিষ্ঠ ও শক্তিশালী আন্দোলন হিসেবে দাঁড়াতে পারেনি। কারণ শুরু থেকেই এটাকে নেতিবাচক আন্দোলন হিসেবে চিত্রিত করার প্রবণতা ও বিরুদ্ধাচরণ অব্যাহত থাকে।

প্রাচীন যুগে ভারতবর্ষে ইউরোপীয়দের আগমন

১৪৯৮ খ্রিষ্টাব্দে ভারতবর্ষে পর্তুগালদের আগমনের অনেক আগে একদল ইউরোপীয় পর্যটক ও সরকারি প্রতিনিধি ভারতে আসেন এবং তাদের একটি ভ্রমণবৃত্তান্তও পাওয়া যায়। ইতিহাসে আলেকজান্ডার (খ্রিষ্টপূর্ব ৩২৩-৩৫৬) ছিলেন মহাপ্রতাপশালী প্রথম রাজা, যিনি খ্রিষ্টপূর্ব ৩২৬ সালে বিশাল বাহিনী নিয়ে ভারতে আগমন করেছিলেন। আলেকজান্ডারের ভারত আগমন প্রমাণ করে তারও পূর্বে গ্রিসের একটি পর্যটক দল ভারতে আগমন করেছিলো। হতে পারে তাদের দেওয়া তথ্যে প্রলুব্ধ হয়ে আলেকজান্ডার ভারত অভিযানের সিদ্ধান্ত নেন। আলেকজান্ডারের ভারত অভিযান স্বেচ্ছা সামরিক অভিযান ছিলো না বরং এর মধ্য দিয়ে প্রাচ্যের সঙ্গে পাশ্চাত্যের সংযোগ স্থাপনের ভিত্তিও রচিত হয়। গ্রিসে সেসময়ে রচিত *Indica* নামের গ্রন্থে এ সম্পর্কিত গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পাওয়া যায়। এর রচয়িতা বিখ্যাত ইতিহাসবিদ, ভ্রমণ কাহিনী লেখক ও চিন্তাবিদ ম্যাগাস্থিনিস (Megasthenes) যিনি গ্রিক পর্যটক হিসেবে খ্রিষ্টপূর্ব ২৯৮ সালে পাটনা, বিহার ও ভারতের কিছু অঞ্চল সফর করেন। কাছাকাছি যুগের বিভিন্ন লেখক তাদের বইপত্রে তার গ্রন্থ থেকে তথ্য উদ্ধৃত করেছেন। যাতে দেখা যায়, ম্যাগাস্থিনিস তার গ্রন্থে ভারতের ইতিহাস, ভৌগোলিক বিবরণ, উৎপন্ন ফসল, আর্থসামাজিক অবস্থা, দর্শন, রীতি-প্রথা প্রভৃতি বিষয়ের বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। এ গ্রন্থটি ইন্দো-ইউরোপ সম্পর্ক-সংযোগের দস্তাবেজ হিসেবে পরিগণিত হতে পারে (McCrinkle 1877, 35-36)।

ম্যাগাস্থিনিসের পরেও গ্রিক ও ইউরোপের বিভিন্ন দেশ থেকে কতিপয় পর্যটক, বণিক ও পরিব্রাজক ভারতে এসেছেন বলে ধারণা করা যায়। দক্ষিণ এশিয়া থেকেও একইভাবে বিভিন্ন সময় পর্যটকগণ ইউরোপ ভ্রমণ করেছেন মর্মে ধারণা পাওয়া যায়। তবে ইতিহাসে সেসব সফরের কথা পাওয়া যায় না। প্রায় এক সহস্রাব্দের পর ইংরেজ পর্যটক ইটালির নাগরিক মার্কো পোলো-ই [১৩২৪-১৪৫৪] (Marco Polo) প্রথম তার সফরনামা লিখেছেন। মার্কো পোলোকে অনুসরণ করে পঞ্চদশ শতকের মাঝামাঝি ইটালির আরেক ব্যবসায়ী

নিকোলো ডি কন্টি (Niccolo De Conti) সিরিয়া, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া ও ভারত সফর করেন। তিনি নিজের ভ্রমণবৃত্তান্ত ও অন্যান্য ইতিবৃত্ত গ্রন্থাকারে লিপিবদ্ধ করেছেন।

ডি কন্টির সবচেয়ে বড় কীর্তি হলো, তিনিই প্রথমবারের মতো ভারত ও আফ্রিকা থেকে ইউরোপ পর্যন্ত নৌপথের কথা উল্লেখ করেছেন যার আলোকে ইটালির ভূগোলবিদ ফ্রা-মাওরো (১৪০০-১৪৬৪) পুরো ইউরোপের সামগ্রিক নকশা তৈরি করেছেন। সমুদ্রপথে ডি কন্টি ভারতের গুজরাট, বিজয়নগর, চেন্নাই, বাংলাদেশের সোনারগাঁও ও চট্টগ্রামের মতো অঞ্চলগুলোতে সফর করেছেন। এরপর বার্মা, (মায়ানমার) ইন্দোনেশিয়ার জাভা ও ভিয়েতনাম হয়ে কোলকাতা এবং সেখান থেকে সমুদ্রপথে স্বদেশে ফিরে গেছেন। তার কেবল আরবি নয় মালয়ালাম ভাষাও জানা ছিলো। নিজের ভ্রমণবৃত্তান্তে তিনি প্রাচ্যের দেশগুলোর সংস্কৃতি, ঐতিহ্য, লোকাচার ও শৌর্যবীর্যের কথা তুলে ধরতে গিয়ে উল্লেখ করেন এসব দেশ সংস্কৃতি ও জীবনচাারে ইউরোপের অনেক দেশ বিশেষত, ইটালির চেয়ে উন্নত ও অগ্রসর। পরবর্তী সময়ে তার ভ্রমণবৃত্তান্ত বিশ্বের বহু ভাষায় অনূদিত হয়ে বিভিন্ন সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছে (Jones 1857, 40-41)। পর্যটক ভাস্কো ডি গামা (১৪৬০-১৫২৪) ১৪৯৮ সালে ভারত আগমন করেন। তিনি ডায়েরি আকারে ভ্রমণকাহিনী লিপিবদ্ধ করেছেন। এ ভ্রমণবৃত্তান্তে হিন্দু রাজাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ, মুসলমানদের ব্যাপারে ভীত হওয়া ও এড়িয়ে চলা এবং স্থানীয় অধিবাসীদের বিষয়ে খুঁটিনাটি বিষয়ে বৃহৎ কলেবরে বই লিখেছেন। যা ১৭৭৪ খ্রিষ্টাব্দে লন্ডন থেকে প্রকাশিত হয় (Vasco 1744, 1/ 30-40)।

ইউরোপীয়ান ও ভারতীয়দের পারস্পরিক যোগাযোগের প্রাথমিক অবস্থা সম্পর্কে ধারণা লাভের জন্য ভাস্কো ডি গামার বিখ্যাত বইটির অধ্যয়ন খুবই জরুরি (A new General Collection of Voyages and Travel :Consisting of the Most Esteemed Relations, Whiche have been Hitberto Published in Any Lenguage)। ভ্রমণবৃত্তান্তটির সবচেয়ে বড় সফলতা হলো, তার প্রথম সফরের মাত্র ৭ বছর পর ১৫০৫ খ্রিষ্টাব্দে ফ্রান্সিস্কো ডি আলমেদা (Francisco de Almeida, 1450-1510) ভারতে প্রথম পর্তুগালি গভর্নর হিসেবে দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। এ সফরের মাধ্যমে ভারতবর্ষে ইউরোপীয়দের জন্য যোগাযোগ ও পর্যটনের নতুন দ্বার উন্মুক্ত হয়। এরপর তারা এতদঞ্চলে নিজেদের আধিপত্য বিস্তার শুরু করে। এ সফরের বিবিধ উদ্দেশ্য আলোচিত হলেও সকল ইতিহাসবিদ এ বিষয়ে প্রায় একমত যে, মোটাদাগে ব্যবসা-বাণিজ্য ও ধর্মপ্রচার করাই ছিলো প্রধান উদ্দেশ্য। এর অব্যবহিত পরই ইউরোপীয়গণ নিজেদের জন্য নতুন সমুদ্রপথ ও অঞ্চলের সন্ধানে নেমে পড়ে। একদিকে খ্রিষ্টধর্মের প্রচার ও ‘বিধর্মীদেরকে’ স্বধর্মের বিশ্বাসে দীক্ষিত করা বিশেষত, নিজেদের পুরনো প্রতিদ্বন্দ্বী মুসলমানদেরকে জব্দ করার আকাঙ্ক্ষা এ সফরের নেপথ্যে কার্যকর ছিলো। অন্যদিকে স্বর্ণ-রৌপ্য, মূল্যবান পাথর, অস্ত্রশস্ত্র, কারুশিল্প, ঔষধ, রেশম সামগ্রী ও ক্রীতদাস সন্ধানের বাসনা তাদেরকে উপমহাদেশে টেনে আনে। বস্তুত, উসমানীয়রা রোমের বিভিন্ন প্রণালী দখলের পর ইউরোপীয়দের পুরনো বাণিজ্যপথ সংকীর্ণ হয়ে যায়। যেসব প্রণালী ইউরোপের সঙ্গে প্রাচ্যকে সংযুক্ত করেছিলো। অন্যদিকে মোঙ্গলদের সাম্রাজ্য ক্রমাগত বিস্তৃত হওয়ার ফলে ইংরেজ বণিকদের জন্য স্থলপথও আগের মতো নিরাপদ থাকেনি (Mitchell 2018, *Encyclopedia Britannica*)।

১৪১৯ খ্রিষ্টাব্দে পর্তুগিজ শাহজাদা হেনরির (১৩৯৪-১৪৬০) মাধ্যমে পর্তুগিজদের পৃথিবী পরিভ্রমণের এই দুঃসাহসিক অভিযানের সূচনা হয়। এ ধরনের অভিযানের কারণে তিনি হেনরি দ্য নেভিগেটর উপাধিতে পরিচিত হয়ে ওঠেন। তারও আগে পর্তুগিজ, ফরাসি, ইটালিয়ান জনগোষ্ঠী রোম প্রণালী ভ্রমণে অভ্যস্ত ছিলেন।

তবে সাধারণত এসব সফর উপকূলীয় এলাকার অদূরবর্তী অঞ্চলে সীমাবদ্ধ ছিলো। মানচিত্রের সাহায্যে হেনরি প্রথমবারের মতো দূর-দূরান্তের অভিযাত্রা শুরু করেন। কিছু নতুন উপদ্বীপের সন্ধান করার এক পর্যায়ে উত্তর আফ্রিকার সমুদ্র পথের খোঁজ পেয়ে যান তিনি। হেনরি ছিলেন ড্রুসেড যুদ্ধের সক্রিয় সৈনিক। তার আকাঙ্ক্ষা ছিলো এই নতুন সমুদ্রপথ ধরে উত্তর আফ্রিকা হয়ে আরব সাগরতীরের পেছন থেকে হামলার সক্ষমতা অর্জন। ১৪৪০ খ্রিষ্টাব্দে তিনি পর্তুগিজ অঞ্চল ও বর্তমান সেনেগাল পর্যন্ত পৌঁছে যান এবং ১৪৯০ সালে ক্যাপ অব গুড হোপ অঞ্চল অতিক্রম করেন। যে পথ ধরে ভাস্কো ডি গামা ১৪৯৮ খ্রিষ্টাব্দে ভারত পৌঁছেছিলেন। তিনিও সেই উদ্দেশ্যে যাত্রা শুরু করেছিলেন, যে উদ্দেশ্যে ক্রিস্টোফার কলম্বাস (১৪৫১-১৫০৬) আমেরিকা ‘আবিষ্কারে’ ছুটেছিলেন এবং মৃত্যুর আগ পর্যন্ত আমেরিকাকে তিনি ভারত বা চীনের একটি অঞ্চল বলে ধারণা করতেন। উল্লেখ্য যে, তিনি কুবলাই খানের দরবার পর্যন্ত পৌঁছার প্রাণান্তকর চেষ্টা চালিয়ে গেছেন। ষোড়শ শতকে একজন পর্তুগিজ পরিব্রাজক ডুয়ার্থে বার্বোসা (Duarte Barbosa 1480-1521) ভারতের দক্ষিণাত্য সফর করেন এবং এ সম্পর্কে একটি ভ্রমণকাহিনী লিখেন। বার্বোসা ভারতে পর্তুগিজ সরকারের কর্মকর্তা ও স্থানীয় মালায়াম ভাষার দোভাষী ছিলেন। তিনি সরকারি দায়িত্ব পালনের সময়ে দক্ষিণাত্য ছাড়াও বিভিন্ন দেশ ও শহর ভ্রমণ করেন। পর্তুগাল ফিরে যাওয়ার পর তিনি নিজের দেখা বিভিন্ন অভিজ্ঞতার আলোকে একটি ভ্রমণবৃত্তান্ত রচনা করেন (Dames 1918-1921, 2/75-76)।

ষোড়শ শতকে বার্বোসা ছাড়াও অনেক ইউরোপীয় পরিব্রাজক ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চলে আসা শুরু করে। তাদের মধ্যে কেউ কেউ চিকিৎসকও ছিলেন; যাদেরকে ভারতীয় শাসক ও আমলারা নিজেদের আত্মীয়-পরিজনের চিকিৎসার জন্য নিয়োজিত করেন এবং একসময় তারা এখানে স্থায়ীভাবে বসবাস করেন। তারা নিজেদের পেশাগত দক্ষতার কারণে সামাজিক প্রভাব ও প্রতিপত্তির মালিক হয়ে ওঠেন। ষোড়শ শতকে এমন চিত্র ব্যাপকভাবে পরিদৃষ্ট হতে থাকে। হাকিম সাইয়েদ মাহমুদ আহমদ বারাকাতী এরকম ৭০ জন ইংরেজ চিকিৎসকের কথা আলোচনা করেছেন। যারা ১৫০০ থেকে ১৮০০ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত সময়পর্বে ভারতে এসেছেন এবং স্থায়ী অধিবাস গড়ে তুলেছেন। এখানে তারা গ্রন্থ রচনা ও বুদ্ধিবৃত্তিক কাজকর্ম সম্পাদন এবং ভারতীয় ভাষা রপ্ত করেছেন। তাদের মধ্যে অনেকে চিকিৎসাশাস্ত্রে নিজেদের অর্জিত অভিজ্ঞতাকে প্রয়োগ করে নতুন নতুন ঔষধ তৈরি করেন। তাদের মধ্যে অনেকেই আগে থেকে প্রকৃতপক্ষে চিকিৎসক ছিলেন না বরং আন্দাজ ও ধারণামূলক চিকিৎসা করতেন। স্থানীয়ভাবে তাদের ক্ষেত্রে আতায়ী শব্দটি ব্যবহৃত হতো। যার একটি অর্থ উদ্ভাদ ছাড়া লব্ধ বিদ্যা (হাকীকী ২০০৮, ৯)।

তারা রাজদরবারের চিকিৎসক হিসেবে বিভিন্ন অঞ্চলের শাসকদের সঙ্গে সম্পৃক্ত ছিলেন। কেউ কেউ আবার রাজনৈতিক তৎপরতা, কারসাজি, গুপ্তচরবৃত্তিতে জড়িয়ে পড়েন। সপ্তদশ শতকের শুরু থেকেই অন্যান্য ইউরোপীয় অঞ্চলের লোকেরা ক্রমেই ভারতমুখী হতে দেখা যায়। যেমন ডেনিশ, ইংরেজ ও ওলন্দাজ। তারা বিভিন্ন ব্যবসা-বাণিজ্য ও কোম্পানি গড়ে তোলে; যার নাম দেওয়া হয়েছে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি। ১৬০০ খ্রিষ্টাব্দে গঠিত হয় ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি এবং ১৬০২ খ্রিষ্টাব্দে ওলন্দাজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি। উভয় কোম্পানি পর্তুগিজদের কজাকৃত সম্পদ দখলের চেষ্টা চালায়। এভাবে এ তিনটি ইউরোপীয় কোম্পানি পারস্পরিক স্বার্থের দ্বন্দ্ব জড়িয়ে পড়ে। সপ্তদশ শতকের শেষের দিকে ফ্রান্সও এ দ্বন্দ্ব জড়ায় তবে শেষ পর্যন্ত ইংরেজদের পাল্লাই ভারি থাকে। এভাবে তারা ভারত কজা করতে সমর্থ হয় (Rawlinson 1920, 82-84)।

মোঘল আমলে ভারতের সঙ্গে ইউরোপের সম্পর্কোন্নতি

ভারত ও ইউরোপের বিভিন্ন জাতি-সম্প্রদায়ের মাঝে যোগাযোগ-সম্পর্ক যদিও পুরনো কিন্তু পারস্পরিক জ্ঞান-বিজ্ঞান, কারিগরি, প্রযুক্তি ইত্যাদির সুবিন্যস্ত বিনিময় ব্যবস্থাপনা দৃঢ় ভিত্তির ওপর দাঁড়িয়েছে জালালুদ্দিন আকবরের (১৫৪২-১৬০৬) আমলে। কমবেশি প্রত্যেক মোঘল শাসকের আমলে এর ধারাবাহিকতা ভালোভাবে দৃশ্যমান হয়েছে। আকবর তার সরকারের বহু আমির, গভর্নর ও কর্মকর্তাকে ল্যাটিন ও পর্তুগিজ ভাষাসহ বিদেশি ভাষা শেখা ও সেসব ভাষার গ্রন্থাবলি ফার্সিতে ভাষান্তরের নির্দেশ দেন। আকবর 'আন্তঃধর্মীয় সমন্বয়ের প্রবক্তা' ছিলেন। তিনি রাজধানীতে বিভিন্ন ধর্মের পণ্ডিতদেরকে একত্র করেন। ১৫৭৯ খ্রিস্টাব্দে এক আর্মেনীয় খ্রিস্টান (Domingo Pires) কে— যিনি পর্তুগিজ ভাষা জানতেন— সরকারি এক প্রতিনিধি দলের সঙ্গে গোয়া প্রেরণ করেন। সেখানকার Jesuit ধর্মাবলম্বী পাদ্রীদেরকে রাজদরবারে এসে তাদের ধর্ম সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনার নির্দেশ প্রদান করেন। সেইসঙ্গে তাদের ধর্মীয় বিধানসম্বলিত গ্রন্থ সঙ্গে আনার আহ্বান জানান (আল হাসানী ১৯৯৯, ২১; সেলিম ২০১৫, ৩১)। তাঁর আহ্বানে সাড়া দিয়ে Jesuit লাহোর পৌঁছেন। বাদশাহর পৃষ্ঠপোষকতায় সেখানে একটি স্কুল প্রতিষ্ঠা করা হয়। যে স্কুলে সরকারি কর্মকর্তাদের সন্তানরা ল্যাটিন ও পর্তুগিজ ভাষা শিখতো। একইভাবে চিঠিপত্র আদান-প্রদান হতো এতদঞ্চলের প্রশাসকদের সঙ্গে। কাজেই নির্বাচিত কতিপয় আমলাকে আকবর খ্রিস্টানদের ভাষা শেখার নির্দেশ দেন। ওদের সঙ্গে মেলামেশার সুবাদে অল্প সময়েই তারা এ ভাষা আয়ত্ত্ব করতে সক্ষম হন (MacLagan 1932, 50)।

সম্রাট আকবরের দরবারে বিখ্যাত ইতিহাসবিদ আবুল কাসেম ফেরেশতা (১৫৬০-১৬২০)-এর পুত্র আবদুস সাত্তার পর্তুগিজ ও ল্যাটিন ভাষা শিখেছিলেন এবং অনেক গ্রন্থ অনুবাদ করেন। আকবর আবদুস সাত্তারকে ইউরোপীয় ভাষা শেখা ও সে ভাষার গ্রন্থাবলি ফার্সিতে অনুবাদের নির্দেশ দেন। এতদুদ্দেশ্যে আবদুস সাত্তার পাদ্রী জের্নিম জেভিয়ারের (১৫৪৯-১৬১৭) শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। ল্যাটিন ও পর্তুগিজ ভাষা শেখার পর গুরুতর তত্ত্বাবধানে খ্রিস্টান ধর্মের কতিপয় গ্রন্থ অনুবাদ করেন। এর পাশাপাশি তার শিক্ষাগুরু জেভিয়ারের অভিরুচি, দৃষ্টিভঙ্গি ও দর্শনের প্রভাবে ১৬০৩ খ্রিস্টাব্দে পাশ্চাত্য দর্শনসম্বলিত *সামারাতুল ফালাসাফা* গ্রন্থটি রচনা করেন। এটি *আহওয়ালে ফিরিঙ্গিস্তান* নামেও পরিচিত। এ গ্রন্থে রোম ও গ্রিক শাসকদের উপাখ্যান ছাড়াও ইংরেজ ও ভারতীয়দের মধ্যকার সম্পর্কের দূরত্বের কারণ হিসেবে ভৌগোলিক বিভাজন ও ভাষাগত ভিন্নতা বলে অভিমত প্রকাশ করা হয়। পারস্পরিক যোগাযোগ স্থাপিত হবার জন্য উভয়ভাষার মানুষের চিন্তা, রুচি, দৃষ্টিভঙ্গি ও জীবনাচার সম্বলিত গ্রন্থাদি অনুবাদ করার মতো পর্যাপ্ত লোক ছিলো না বলে একে অপরকে জানতে দীর্ঘ সময় লেগেছে। ব্রিটিশ লাইব্রেরি, লন্ডন ও মাওলানা আজাদ লাইব্রেরি আলীগড়ে এর লিখিত কপি সংরক্ষিত আছে (Khan 1998, 40, 66)।

দক্ষিণ এশিয়ার শিক্ষিত মহলে ইউরোপীয়দের প্রভাব

সম্রাট জাহাঙ্গীরের (মৃ. ১৬২৭) আমল থেকে মোঘল রাজদরবারে ইংরেজ প্রতিনিধিদের যাতায়াত বৃদ্ধি পায়। ২৪ আগস্ট ১৬০৮ খ্রিস্টাব্দে গুজরাটের সমুদ্র বন্দর সুরাটে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির প্রথম নৌ জাহাজ হেষ্টির নোঙ্গর করেছিলো। এ জাহাজে করে এসেছিলো ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির প্রথম প্রতিনিধি দল; যাদের প্রধান ছিলেন, উইলিয়াম হকিংস (১৫৬০-১৬১৩) (Hawkins 2007, 59-75) সমুদ্রপথে ষোলো মাস সফরের পর তিনি ইংল্যান্ডের জেমস প্রথম (Jems 1 : ১৫৬০-১৬১৩) এর বার্তা নিয়ে মোঘল বাদশাহ আকবরের কাছে পৌঁছেন।

চিঠি পৌঁছার তিন বছর আগেই আকবরের মৃত্যু হয়। তখন তাঁর পুত্র জাহাঙ্গীর ক্ষমতাসীন ছিলেন। জাহাঙ্গীর জ্ঞানের প্রতি অনুরাগ ও অনুসন্ধিৎসার গুণ পিতার কাছ থেকে উত্তরাধিকারসূত্রে পেয়েছিলেন। আকবরের মতো তিনিও পর্তুগিজসহ ইউরোপীয় জনগোষ্ঠীর সঙ্গে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক ও বোঝাপড়ার নীতি অনুসরণ করেন।

উইলিয়াম হকিংস তার সফরনামায় সুরাট থেকে আত্মা পর্যন্ত সফরের ধকল, পর্তুগিজদের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বীতা, মুকাররব খানের দুর্ব্যবহার, মোঘল দরবারের আর্শিবাদ প্রাপ্তি ও নিজের মিশন সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেন। তিনি সম্রাট জাহাঙ্গীরের শাসনামলে বাংলার সুবেদার ছিলেন। গ্রন্থটি স্যামুয়েল পার্সেজ (১৫৭৭-১৬২৬) কর্তৃক সম্পাদিত তৃতীয় গ্রন্থ *Hakluytus Posthumus or, Purchase his Pilgrimes* (প্রথম সংস্করণ ১৬২৬) এর তৃতীয় খণ্ডে অন্তর্ভুক্ত হয়ে প্রকাশিত হয় (Hawkins 2007, 59-75)।

এ ছাড়াও কোম্পানির ডিরেক্টরদের কাছে প্রেরিত বিস্তারিত প্রতিবেদনেও তিনি জাহাঙ্গীরের শাসনামলে রাজনৈতিক, সামাজিক ও বিশেষভাবে অর্থনৈতিক ও সামরিক অবস্থার কথা তুলে ধরেন। এই প্রতিবেদনটি ইতিহাসের একটি গুরুত্বপূর্ণ দলিল হিসেবে পরিগণিত হয়। কারণ এখানে ভারতের সম্পদ, ঐশ্বর্য, সমৃদ্ধি, শাসকদের ন্যায়পরায়ণতা, জনহিতৈষণা, রাষ্ট্রের ব্যবস্থাপনার তথ্য-উপাত্ত ও প্রতিচ্ছবি পাওয়া যায়। এই রিপোর্টের মূলকপি ব্রিটিশ মিউজিয়ামে সংরক্ষিত আছে (Foster 1921, 391)।

জেমস প্রথম জাহাঙ্গীরের নামে মৈত্রী ও বন্ধুত্বের প্রস্তাবসহ বার্তা প্রেরণ করেন। যেখানে সরকারের সাফল্য ও তার সুস্বাস্থ্য কামনা করেন। সেই পত্রে উপকূলীয় এলাকায় বাণিজ্যিক কুঠি নির্মাণের অনুমতি চাওয়া হয়। সমকালীন একাধিক গ্রন্থে এই অনুমতিপত্রের কথা উল্লেখ রয়েছে। যেমন, হকিংসের পর মোঘল দরবারে প্রতিনিধি হিসেবে আসা স্যার টমাস রো (১৫৮১-১৬৪৪) এর ডায়েরিতে হকিংসের আত্মা আগমন ও জেমস প্রথম এর পত্র পৌঁছানোর প্রসঙ্গ উল্লেখ করা হয়েছে। উইলিয়াম হকিংস জাহাঙ্গীরের কাছ থেকে বাণিজ্যিক কুঠি স্থাপনের জন্য অনুমোদন লাভের প্রাণপণ চেষ্টা করেন তবে তাঁর মন্ত্রিবর্গের বোঝানো এবং এর পরিণতি সম্পর্কে সতর্ক করার ফলে তিনি অনেকটা সম্মতি দিয়েও পরে তা প্রত্যাহার করেন এবং হকিংসকে হতাশ হয়ে ফিরে যেতে হয়। তিনি ব্যর্থ হওয়ার পর কোম্পানির আবেদনের প্রেক্ষিতে জেমস প্রথম আরেকজন সরকারি প্রতিনিধি থমাস রো-কে ভারতে প্রেরণ করেন। স্যার থমাস রো হকিংসের চেয়ে উর্ধ্বতন কর্মকর্তা ছিলেন। তিনি বিভিন্ন দেশে কূটনীতিক হিসেবে দায়িত্ব পালন করলেও ফার্সি ও তুর্কি ভাষা না জানার কারণে তাকে দোভাষী হিসেবে লোক নিয়োগ করতে হয়। এ কারণে ভারতের মোঘল সম্রাটদের দরবার ও এ অঞ্চলের সংস্কৃতি ও জীবনচার সম্পর্কে সঠিক চিত্র তুলে ধরতে সক্ষম ছিলেন না। তিনি খানিকটা অহঙ্কার ও আত্মগরিমাসম্পন্ন ছিলেন। ফলে তার ডায়েরির তথ্যগুলো বিভ্রান্তিকর ও অসম্পূর্ণ সাব্যস্ত হয় (Foster 1921, 391)।

তা সত্ত্বেও এটা নিশ্চিতভাবে বলা যায়, তিনি ইউরোপীয়দের সংশ্লিষ্ট ও কাজকর্মের ফলে ভারতে পশ্চিমাদের আগ্রহ ও ইতিবাচক ধারণা ক্রমাগত বেড়েছে। যেমন, মোঘল বাদশাহ শাহজাহান (১৫৯২-১৬৬৬) ও আলমগীর (১৬১৮-১৭০৭) এর দরবারের সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ রাখতেন এমন একজন প্রশাসক দানিশমন্দ খাঁ সম্পর্কে তথ্য পাওয়া যায় যে, তিনি পাশ্চাত্যের জ্ঞান-বিজ্ঞান সম্পর্কে বিশেষ আগ্রহ পোষণ করতেন। তাঁর প্রকৃত নাম মোল্লা শফিয়ায়ী ইয়াজদী ছিলো বলে জানা যায়। দীর্ঘদিন ইরানে শিক্ষা অর্জনের পর তিনি ভারত আসেন। রাজদরবারের পদোন্নতির এক পর্যায়ে দানিশমন্দ উপাধিতে ভূষিত হন। তিনি ভূগোল, জ্যোতির্বিদ্যা ও চিকিৎসাশাস্ত্রে পণ্ডিত ছিলেন(খান ১৯৬৯, ২৯-৩১)। বিখ্যাত ফরাসি পরিব্রাজক ফ্রান্সিস

ব্রেনিয়ার (১৬৮৮-১৬২০) সম্পর্কে বিভিন্ন উৎসগ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে, তিনি পশ্চিমা জ্ঞান-বিজ্ঞান সম্পর্কে খুবই আগ্রহী ছিলেন। ভূগোল, জ্যোতির্বিদ্যা ও চিকিৎসাবিজ্ঞানে পারদর্শী ছিলেন তিনি। ফরাসি অনেক গবেষক যেমন ডি-কার্ট ডিসকার্টেজ (১৫৯৬-১৬৫০) ও বিখ্যাত ইংরেজি চিকিৎসক উইলিয়াম হার্ভে (১৫৭৮-১৬৫৭) সম্পর্কে তাঁর ভালো জানাশোনা ছিলো। তিনি দানিশমন্দ খাঁর জন্য এ বিষয়ক গ্রন্থ অনুবাদ করেছেন (Bernier 1916, 61-65)।

বাদশাহ আলমগীরের আমলে দক্ষিণাত্যের দেওয়ান ও আমির মুহাম্মদ কোব্রাদ বেগ ইউরোপ সফর করেন এবং গ্রিক ও ল্যাটিন ভাষা শিখেন। ইতিহাসবিদ ও পরিব্রাজক আবু তালেব লন্ডনী (১৭৫২-১৮০৬) তার ডায়েরি *খোলাসাতুল আফকার*-এ মির্জা মুহাম্মদ বেগের আলোচনা করতে গিয়ে বিষয়টি উল্লেখ করেন। মির্জা আবু তালেব ইস্পাহানি অধিক লন্ডন সফরের কারণে লন্ডনী নামেও পরিচিত হয়ে ওঠেন। তিনি লক্ষ্ণৌ শহরের ইরানি বংশোদ্ভূত এক সম্ভ্রান্ত পরিবারে জন্ম গ্রহণ করেন। তিনি সুপরিচিত সাহিত্যিক ও গ্রন্থকার ছিলেন; তাঁর বিখ্যাত ভ্রমণবৃত্তান্ত *মাসিরে তালেবী*।

ইউরোপের সঙ্গে দক্ষিণ এশিয়ার সংযোগের প্রাথমিক স্মারক

ভ্রমণকাহিনী ও সফরনামা মুসলমানদের ঐতিহ্যের অংশ ছিলো শুরু থেকেই। ড. কুদসিয়া কুরাইশি তার গ্রন্থে দশজন মুসলিম পরিব্রাজকের নাম লিখেছেন; যারা খ্রিস্টীয় নবম শতক (হিজরি তৃতীয় শতক) থেকে ষোড়শ শতক পর্যন্ত ভারতবর্ষে আগমন করেছেন এবং ভ্রমণবৃত্তান্ত লিখেছেন (কুরাইশি ১৯৮৭, ৩৩-৩৯)। বার্নার্ড লুইস (১৯১৬-২০১৮) কয়েকজন উসমানি-তুর্কি ও আরব মুসলমানের সফরনামা ও অন্যান্য কতিপয় রচনার কথা উল্লেখ করেছেন যেখানে তারা সমগ্র ইউরোপ অঞ্চল সম্পর্কে তাদের অভিজ্ঞতা ব্যক্ত করেছেন (Lewise 2001, 135-139)। ভারতীয় মুসলমানরা এ ব্যাপারে কারও চাইতে পিছিয়ে ছিলো না। স্বদেশি হিন্দুদের মতো তারা সমুদ্র পাড়ি দেওয়াকে ধর্মভ্রষ্টতার কারণ মনে করতো না। ধর্মীয় ইবাদত ও আচার-অনুষ্ঠান, হজ-ওমরা জ্ঞানার্জনের জন্য পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্ত ভ্রমণ তাদের ধর্মবিশ্বাসেরই অংশ। যুগেযুগে এ দুটি উদ্দেশ্যে তারা দেশ-দেশান্তর সফর করেছে। ভারতীয় মুসলমানদের এসব ভ্রমণকাহিনীর গ্রন্থাবলি ইংল্যান্ড, জার্মানি ও ফ্রান্সের বিখ্যাত লাইব্রেরিগুলোতে সংরক্ষিত আছে। যেমন: ব্রিটিশ লাইব্রেরিতে আবদুল করিম কাজী ইবন মাহমুদ কাজী ইবন নুরুদ্দিন মুহাম্মদ কাজীর –যিনি কাজী এখতিয়ার উপাধিতে পরিচিত ছিলেন– রচনা *আওয়ালিমুল আসরার ফি গারায়িবিল আসফার* এর (হাতে লেখা) পাণ্ডুলিপির কথা সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। যে গ্রন্থে মাওয়ারাউন নাহার, খোরাসান ও কাবুলের সফরবৃত্তান্তের চমকপ্রদ বর্ণনা পাওয়া যায়। গ্রন্থটির রচনা শুরু হয় ১৬০১ খ্রিষ্টাব্দে। বোখারার সেসময়ের বিখ্যাত ব্যক্তিত্ব, মনীষী ও কবি-সাহিত্যিকদের আলোচনা রয়েছে এ গ্রন্থে (Ethe 1937, 1/313-318)।

ভারতীয় মুসলমানদের পাশ্চাত্যমুখী সফরের সূচনা যদিও ষোড়শ শতকের গোড়ার দিকেই হয়। কিন্তু ভারতবর্ষের ইতিহাসলেখক ও স্কলাররা ভ্রমণবৃত্তান্ত লেখা শুরু করেন এ শতকের শেষ দিকে। পরোক্ষসূত্রে প্রাপ্ত এসব তথ্যের অধিকাংশ অসম্পূর্ণ উপাত্ত হলেও অন্তত ভারতে ইউরোপীয়দের বিষয়ে প্রাথমিক চিত্র মিলেছে এখানে। পাশ্চাত্য প্রভাবের পূর্বে ভারতীয় লেখকদের ভ্রমণবৃত্তান্ত লিপিবদ্ধ করার পছন্দি ছিলো বিচিত্র ধারার। প্রাথমিক যুগের লেখকরা সাধারণত, তাদের রচনায় ঐতিহাসিক ও ভৌগোলিক অবস্থাকে বেশি প্রাধান্য দিতেন। আর্থসামাজিক অবস্থা বস্তুত আনুশঙ্গিক তথ্য ও গৌণ হিসেবে ওঠে এসেছে। আবার জীবনী লিখতে গিয়ে

ভ্রমণবৃত্তান্তও তাতে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। ব্রিটিশ লাইব্রেরিতে এ ধরনের কিছু পাণ্ডুলিপি দেখা যায়, যাতে জীবনবৃত্তান্তের সঙ্গে ভ্রমণকাহিনীরও স্বাদ-রঙ পাওয়া যায়।

ইউরোপীয়দের বিষয়ে অভিজ্ঞতালব্ধ বিভিন্ন বর্ণনার প্রাচীনতম গ্রন্থ *তুহফাতুল মুজাহিদীন*-এর লেখক শায়খ জায়নুদ্দিন মালাবারি (মৃত্যু: ১৫৮৩ খ্রি.)। এটি যদিও ভ্রমণকাহিনী নয় তবে এ লেখকের সঙ্গে কোনো না কোনো ইউরোপীয় জনগোষ্ঠীর সম্পর্ক ছিলো; যা তার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার আলাপ, লেখালেখি, বিবিধ বর্ণনা-বক্তব্য থেকে ফুটে ওঠেছে। তবে তার সঙ্গে কেবল পর্তুগিজদের সম্পর্ক থাকলেও তার রচনায় অন্যান্য ইউরোপীয় অঞ্চলের অধিবাসীর কথাও ওঠে এসেছে। পর্তুগিজ যুগের (ভারতে) মালাবারে তার জন্ম। এ গ্রন্থে তিনি মালাবারের স্থানীয় জনগণের পর্তুগিজদের বিভিন্ন বাড়াবাড়ি, প্রতিবাদ-বিক্ষোভের কথাও উল্লেখ করেন। এ গ্রন্থে তিনি প্রথমবারের মতো মালাবারে ইসলামের আগমনের ইতিহাস বর্ণনা করেন। এরপর পর্তুগিজদের আগমন ও স্থানীয় প্রশাসকদের বিরোধিতার কথাও উল্লেখ করেন। শুরু দিকে পর্তুগিজদের ব্যবসা-বাণিজ্য করার উদ্দেশ্য থাকলেও শক্তিশালী হয়ে ওঠার পর তারা জনসাধারণকে জবরদস্তিমূলকভাবে ধর্মান্তর করতে শুরু করে। খ্রিস্টধর্ম গ্রহণকারীদের জন্য অর্থসহ নানাবিধ সুযোগ-সুবিধার দরোজা উন্মুক্ত করে দেওয়া হয়। অন্যদিকে নিজেদের ধর্মে অবিচল থাকা লোকজনের জানমাল নানাভাবে হুমকির মুখে পড়ে। অন্যান্য ধর্মাবলম্বীদের তুলনায় মুসলমানরা তাদের ধর্মবিশ্বাসে অনড় ছিলো বেশি। ফলে তাদেরকে পর্তুগিজ শাসকদের সমধিক নির্যাতন-নিপীড়নের শিকার হতে হয় (মালাবারি তা.বি, ৭৫)।

সপ্তদশ শতকের গোড়ার দিকে প্রকাশিত হয় *সামারাতুল ফালাসাফা* বা *আহওয়ালে ফিরিস্তান* নামের গ্রন্থটি (১৬০৩) যা ইতোপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে। সমসাময়িককালে *রওজাতুত তাহেরীন* নামে একই বিষয়ে আরেকটি গ্রন্থের সন্ধান পাওয়া যায়; এর লেখক বাঙালি বংশোদ্ভূত তাহের মুহাম্মদ সাবজাওয়ারি। তিনি মোঘল রাজদরবারের দূত হিসেবে গোয়া প্রেরিত হয়েছিলেন। এ গ্রন্থে ইউরোপীয়দের বিষয়ে বিশেষভাবে বর্ণনা না থাকলেও ইউরোপের ইতিহাস বিষয়ে কিছু জরুরি তথ্য রয়েছে। অক্সফোর্ড ও ব্রিটিশ লাইব্রেরিতে এ গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি সংরক্ষিত আছে (সাবজাওয়ারি তা.বি. ২০০-২০২)। এইচ. এম. এলিয়েট (H.M Elliot) ও জন ডাউসন (Jhon Dowson) তাদের ইতিহাসগ্রন্থে (Elliot 1827, 195-201) *সামারাতুল ফালাসাফার* সারসংক্ষেপ উল্লেখ করেছেন। তবে মুজাফফর আলম গ্রন্থটির কিছু তথ্য বিভ্রান্তিকর বলে অভিমত দিয়েছেন। সঞ্জয় সুব্রামিয়ামও তার প্রবন্ধে এ গ্রন্থের কথা উল্লেখ করেন (Subrahmayam 2005, 69-100)।

উক্ত গ্রন্থে ঐতিহাসিক ও ভৌগোলিক অবস্থার বর্ণনা ছাড়াও অনেক বিস্ময়কর ঘটনার বিবরণী রয়েছে। লেখক পর্তুগিজদের জাহাজ চালনা ও নৌযুদ্ধে দক্ষতা ও বিজয়ের কথা স্বীকার করলেও পাশাপাশি একথাও উল্লেখ করেছেন যে, স্থলযুদ্ধে তারা অনেক দুর্বল ছিলো। কোথাও পর্তুগিজ বনাম মালাবার সৈন্যের মাঝে স্থল যুদ্ধ বাঁধলে একশ' জন মালাবারি সৈন্যের বিপরীতে দশ হাজার পর্তুগিজ সৈন্য দাঁড়াতে পারতো না। এছাড়াও লেখকের অভিমত হলো, অন্য ইউরোপীয়রা মাছ শিকারের পেশার কারণে পর্তুগিজদেরকে ঢালাওভাবে জেলে সম্প্রদায় ভাবতো। এ গ্রন্থে তিনি উল্লেখ করেন দাক্ষিণাত্যের রাজাকে পর্তুগিজদের পক্ষ থেকে বহুমূল্য উপহার-উপটোকন দিয়ে বশ করার মাধ্যমে ভারতের কিছু দ্বীপাঞ্চলে নিজেদের দখল প্রতিষ্ঠা করে। উল্লেখ্য যে, আরবি ভাষায় লিখিত *আজাইবুল বুলদান* নামে পঞ্চদশ শতকে আরও একটি গ্রন্থের সন্ধান মেলে; যার পুরো নাম *খরিতাতুল আজাইব ওয়া ফরিদাতুল গারাইব*, যুক্তরাষ্ট্রের প্রিন্সটন ইউনিভার্সিটিতে এর পাণ্ডুলিপি সংরক্ষিত আছে।

এর লেখক সিরাজুদ্দিন ইবনুল ওয়ারদি (মৃত্যু: ৮৫২ হি./১৪৪৭ খ্রি.)। গ্রন্থটির পুনর্বিদ্যাস ও সম্পাদনা করেন গবেষক মাহমুদ জানানী। গ্রন্থটি পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের ভৌগোলিক ইতিহাস ও তথ্য-উপাত্তের ওপর ভিত্তি করে রচিত (Subrahmayam 2005, 69-100)।

মুহাম্মদ শাহীর আমলের আরও দুটি গ্রন্থ মুজাফফর আলম ও সুব্রামিয়াম তাদের রচনা *Indo-Perisan travel in the Age of Discoveries, 1400-1800* উদ্ধৃত করেন। একটি খাজা আবদুল করিমের *বয়ানে ওয়াকেরী*, দ্বিতীয়টি খাজা আবদুল কাদেরের *ওয়াকিয়ায়ে মানাযেলে রোম*, মূলত গ্রন্থ দুটি পাশ্চাত্যের সফরনামা। লেখকদের দাবি এ দুটি বই উপাখ্যান বর্ণনামূলক ও সফরবৃত্তান্তের প্রাচীন রীতিতে রচিত; যা পাশ্চাত্যের প্রভাবমুক্ত (Muzaffar and Subrahmayam 2007, 244)। খাজা আবদুল কাদের কর্তৃক রচিত *ওয়াকিয়ায়ে মানাযেলে রোম* ভ্রমণবৃত্তান্ত। খাজা আবদুল কাদের টিপু সুলতানের পক্ষ থেকে কনস্টান্টিনোপলে প্রেরিত প্রতিনিধিদলের (১৭৮৬-১৭৮৯) সচিব হিসেবে দায়িত্বপ্রাপ্ত ছিলেন। দৃশ্যত, এ সফরের উদ্দেশ্য ছিলো দুইটি : প্রথমত, তুর্কি অঞ্চলে শিল্প-কারখানা স্থাপন দ্বিতীয়ত, কেন্দ্রীয় শাসকের পক্ষ থেকে নিজের স্বীকৃতিপ্রদ আদায়। কিন্তু ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির আশংকা ছিলো, এটা তাদের মোকাবেলা করার জন্য সাহায্য চাওয়ার প্রয়াস। এ প্রতিনিধিদলে গোলাম আলী খান, নুরুল্লাহ খান, লুতফুল্লাহ খান ও জাফর আলী খান शामिल ছিলেন। আবদুল কাদের ছাড়াও সাইয়েদ জাফরও সচিব হিসেবে প্রতিনিধি দলের মধ্যে ছিলেন (Yuruk, Emre, <http://iasir.net/AIJRHASSpapers/AIJRHASS18-418.pdf>.)। আবদুল কাদের এ ভ্রমণের প্রতিবেদনে অন্যান্য অবস্থার পাশাপাশি প্রতিনিধিদলের সদস্যদের মাঝে মতপার্থক্য ও দ্বন্দ্বের কথা তুলে ধরেন। উল্লেখ করেন, আর্থসামাজিক অবস্থা, পারিপার্শ্বিকতা যেমন: বসরায় মুহাররমের জুলুস, মরসিয়া, মাতম, তলোয়ার নিয়ে রক্ত শোক উদযাপন ইত্যাদির বিস্তারিত বর্ণনা। এ সফরনামায় ভারতে উসমানী খলিফার মর্যাদা, শৌর্যবীর্য ও ইংরেজদের সঙ্গে যুদ্ধ-বিগ্রহের বিবরণ প্রকাশিত হয়েছে। *বয়ানে ওয়াকেরী* গ্রন্থে ইউরোপীয়দের সঙ্গে মেলামেশা, কাজ-কারবার ও আদানপ্রদানের বর্ণনা ও প্রতিক্রিয়া বেশ পরিষ্কারভাবে ফুটে ওঠেছে। গ্রন্থ দুটি সমসাময়িককালের ভারতের সামগ্রিক অবস্থা ও পশ্চিম এশিয়ার দেশগুলোর ইতিহাসকে কেন্দ্র করে রচিত (কাদের ১৯৬৮, ৫০-৫৭)।

উপসংহার

উপর্যুক্ত আলোচনাকে সামনে রেখে এ সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় যে, অন্তত অষ্টাদশ শতকের প্রথমার্ধ পর্যন্ত ইউরোপীয়দের ব্যাপারে সাধারণভাবে দক্ষিণ এশিয়ার অধিবাসী এবং বিশেষভাবে মুসলমানদের চিন্তাধারায় শত্রুতা, ঘৃণা কিংবা হঠকারিতার মতো নেতিবাচক মনোভাব ছিলো না। বরং তাদেরকে খুবই মর্যাদা ও সম্মানের চোখে দেখা হতো। সাধারণ-বিশেষ সকলেই তাদের জ্ঞান-গরিমা, যোগ্যতা, গুণাবলির প্রশংসায় ছিলো অকুপণ। রাজা-বাদশাহদের দরবারে স্বীকৃত ছিলো তাদের বিশেষ কদর ও উচ্চমর্যাদা। ব্যবসা-বাণিজ্যে সকল সুবিধাদির দ্বার অব্যাহত ছিলো তাদের জন্য। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার জনসাধারণ পশ্চিমাদের ধর্ম ও সংস্কৃতি সম্পর্কে ব্যাপক জানার কৌতুহল ও আগ্রহ পোষণ করতো। ইউরোপের চিকিৎসক, খ্রিস্টীয় ধর্মযাজক ও ব্যবসায়ীরা ভাগ্যের সন্ধানে ভারতবর্ষে সচরাচর আসা-যাওয়া করতো। এখানে তাদের মেধা ও শ্রমের ন্যায্য বিনিময় পাওয়া যেতো। একথা সত্য যে, মোঘল সম্রাট আকবর থেকে

আওরঙ্গজেব আলমগীর পর্যন্ত প্রতাপশালী শাসকেরা ইউরোপীয়দেরকে সেসব সুবিধা দেওয়ার ব্যাপারে সতর্ক ছিলেন যা তাদেরকে রাজনৈতিক উচ্চাভিলাষ পূরণ, রাজনীতিতে হস্তক্ষেপ ও প্রভাব বিস্তারের সুযোগ করে দেবে। এ কারণে আলমগীরের মৃত্যু পর্যন্ত ইংরেজরা ভারতবর্ষে দখলদারি বিস্তারের চক্রান্তে সফল হয়নি।

তার মৃত্যুর পর ইউরোপীয়রা বাংলা, বিহার উড়িষ্যাসহ অন্যান্য প্রদেশে চক্রান্তের জাল বিস্তারে সক্ষম হয়। যা পরবর্তী সময়ে সমগ্র ভারতে দখলদারি প্রতিষ্ঠার রাস্তা সুগম করে দেয়। এ কারণেই সর্বস্তর ও সকল শ্রেণীর ভারতীয় শাসকদের অন্তরে তাদের ব্যাপারে ক্ষোভ, ঘৃণা ও আক্রোশ তৈরি হতে থাকে। যা এক পর্যায়ে লড়াই পর্যন্ত গড়িয়েছে। ইতিহাস পর্যালোচনায় প্রাচীনকাল থেকে দক্ষিণ এশিয়ার সঙ্গে ইউরোপের পারস্পরিক যোগাযোগ-সম্পর্কের একটি মিথস্ক্রিয়া পরিলক্ষিত হয়। বিচ্ছিন্ন কিছু ব্যতিক্রম ছাড়া ইতিহাসের আয়না দেখলে উভয় জনগোষ্ঠীর মাঝে ঘৃণা ও বৈরিতার সম্পর্ক ছিলো না। এটি শুরু হয়েছে সাম্রাজ্যবাদী শাসন প্রতিষ্ঠার পর থেকে। এর কারণ একদিকে আত্মসনমূলক দখলদারি অন্যদিকে রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ এবং জনসাধারণের সঙ্গে প্রভুসুলভ অসদাচরণের অনিবার্য প্রতিক্রিয়া।

তথ্যসূত্র

আবদুল হাই ইবন ফখরুদ্দিন আল-হাসানী। *নুজহাতুল খাওয়াতির*। বৈরুত : দারু ইবন্ হাযাম, ১৯৯৯।

আবদুল কাদের। *ওয়াকেয়ায়ে মানায়েলে রোম*, সম্পা. মুহিবুল হাসান। লন্ডন: এশিয়া পাবলিশিং হাউস, ১৯৬৮।

কুদসিয়া কুরাইশি। *উর্দু সফরনামা উনিসভী সদী মে*। দিল্লি : মাকতাবায়ে জামিয়া, ১৯৮৭।

সামাসামুদ্দৌলা শাহ নেওয়াজ খান। *মাআসিরুল উমারা*, অনুবাদ : মুহাম্মদ আইয়ুব কাদেরী। লাহোর : মারকাজী উর্দু বোর্ড, ১৯৬৯।

শায়খ জায়নুদ্দিন মালাবারি। *তুহফাতুল মুজাহিদ্দীন*, সম্পাদক, হাকিম সাইয়েদ শামসুল্লাহ কাদেরী। হায়দারাবাদ: হিস্টোরিক্যাল সোসাইটি অব হায়দারাবাদ, তা.বি।

সাইয়েদ মুহাম্মদ সেলিম। *মাগরিবী জবানুঁ কা মাহের ওলামা*। লাহোর: মজলিসে তরক্বিয়ে আদাব, ২০১৫।

তাহের মুহাম্মদ সাবজাওয়ারি। *রওজাতুত তাহেরীন*। লন্ডন: অক্সফোর্ড ব্রিটিশ লাইব্রেরি, তা.বি.।

শানুল হক হাকীকী। *ফরহাঙ্গে তালাফফুজ*। ইসলামাবাদ : মুকতাদারায়ে কওমি যবান, ২০০৮।

Muzaffar Alam and Subrahmanyam Sanjoy. *Indo-Persian Travels in the Age of Discoveries 1400-1800*. Cambridge: Cambridge University Press, 2007.

ইউরোপ ও দক্ষিণ এশিয়ার মধ্যে সভ্যতার মিথস্ক্রিয়া: ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট

- Bernier, Francois. *Travels in the Mughal Empire A. D. 1656-1688*, trans. Archibald, Constable. London : Oxford University Press, 1916.
- DeGama, Vasco. *A new General Collection of Voyages and Travels : Consisting of the Most Esteemed Relations, Which have been Hitberto Published in Any Language*. London : Thomas Astley, 1744.
- Dames, Mansel Longworth. *The Book of Duarte Barbosa : An Account of the Countries on the Indian Ocean and Their Inhabitants*. London : Hakluyt, Society, 1918-1921.
- Ethe, Hermann. *Cataloge of Persian Manuscripts in India Office Library*. Oxford : The Indian Office 1937.
- Elliot, H.M., Dowson johon. *The History of Inidan ad Told by its Own Historians The Muhammad Period* London : 1827, Reprint Delhi : 1990.
- Foster, William, ed. *Early Travels in India*. 1583-1619. London : Oxford University Press, 1921.
- H.G. Rawlinson, *British, Beginnigns in Western India, 1579, An Account of the Early Days of the Britsh Factory of Surat*. Oxford : Clarendon Press, 1920.
- Hawkins ,William, ``West and North India , 1608-13, `` in *Visions of Mughal India : An Anthology of European Travel Writing*, ed. Michael H. Fisher , London/New York : I. B Tauris, 2007.
- Jones, J. W. *The Travels of Niccolo Conti in the East, itn the early Part of the Fifteenth Century* London : Haklyt Society, 1857.
- Gulfishan Khan. *The Indian Muslims' Perception of the West During the Eighteenth Century*, Karachi : Oxford University Press, 1998.
- Lewis, Bernard. *The Muslim Discovery of Europe*, New Yourk : W.W. Norton & Company, 2001.
- McCrindle, J. W. *Ancient India as Described by Megasthenes and Arrian*. London : Trubner & Co, 1877.
- Mitchell, Jean Brown, ``European Exploration``, *Encyclopedia Britannica*,
<https://www.britannica.com/topic/European-exploration>, accessed April 12, 2018.
- Maclagan, Edward, *The Jesaits and the Great Mogal*, London : Burns Oates and Washbourne, 1932.
- Muzaffar Alam and Sanay Subrahmayam. *Indo-Persian Tarvel in the Age of Dsicoveries, 1400-1800*. Cambridge University Press, 2007.
- Rawlinason, H.G., *British, Beginnings in Western India, 1579-1657 : An Account of the Early Days of the Britsh Factory of Surat*. Oxford : Clarendon Press, 1920.

The Chittagong University Journal of Arts and Humanities

Subrahmayam, Sanjay. ``Taking Stock of the Franks : South Asian Views of Euroeans and Europe, 1500-1800)'' *The Indian Economic and Social Hisrory Review*, 2005.

Yuruk, Emre. `` Seeking an Ally aganist British Expansion in India : Tipu Sultan's Mission to the Ottoman Empire''. *American International Journal of Research in, Humanities, Art and Social Sciences*. Online edition avalble at: [http://: iasir.net/AIJRHASSpapers/AIJRHASS18-418.pdf](http://iasir.net/AIJRHASSpapers/AIJRHASS18-418.pdf).

তুলনামূলক শিক্ষা: একটি পর্যালোচনা

কাজল বরণ নাথ*

প্রতিপাদ্যসার

পৃথিবীর সব দেশেই শিক্ষার অন্যতম লক্ষ্য হলো নাগরিকদের দৈহিক ও মানসিক ক্ষমতার বিকাশ সাধনে সহায়তা করা যাতে সমাজ ও দেশের সর্বোত্তম সমৃদ্ধি অর্জনে তারা অবদান রাখতে পারে। লক্ষ্যের দিক থেকে তেমন কোনো পার্থক্য না থাকলেও শিক্ষার কাঠামো ও ব্যবস্থার দিক থেকে দেশে দেশে যথেষ্ট পার্থক্য বিদ্যমান রয়েছে। প্রত্যেক দেশ নিজ নিজ উদ্দেশ্য ও প্রয়োজনের নিরিখেই সবচেয়ে উপযোগী শিক্ষাব্যবস্থা প্রবর্তনের ও বিকাশের উপর গুরুত্ব আরোপ করে। ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট, আর্থ-সামাজিক অবস্থা ও দৃষ্টিভঙ্গিগত পার্থক্যের কারণে একদেশের শিক্ষাব্যবস্থা অন্য দেশের পক্ষে হুবহু গ্রহণ করা সম্ভব নয়। তবে বিভিন্ন দেশের শিক্ষাব্যবস্থা উন্নয়নের পিছনে যে নিরন্তর প্রচেষ্টা, ব্যর্থতা ও সাফল্যের ইতিহাস রয়েছে তা যথাযথ চর্চার মাধ্যমে শিক্ষক, শিক্ষার্থী ও শিক্ষাপ্রশাসকগণ নিজ নিজ দেশের শিক্ষাব্যবস্থা বৈশিষ্ট্যাবলি ও গুণাগুণ আরও ভালোভাবে উপলব্ধি করতে সক্ষম হবেন। আলোচ্য প্রবন্ধে চারটি দেশ অর্থাৎ বাংলাদেশ, ভারত, শ্রীলঙ্কা ও ইংল্যান্ডের শিক্ষাব্যবস্থার স্বরূপ ও বৈশিষ্ট্য তুলে ধরা হয়েছে। এই তুলনামূলক আলোচনার মাধ্যমে আমাদের দেশের জন্য ইতিবাচক ও সুবিধাজনক বৈশিষ্ট্যগুলো সনাক্তকরণের মাধ্যমে শিক্ষাক্ষেত্রে অগ্রগতিকে ত্বরান্বিত করা সম্ভব।

ভূমিকা

আলোচ্য প্রবন্ধে গবেষণার তথ্যভিত্তিক পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়েছে। তবে মাঝে মাঝে তথ্য-উপাত্ত ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে বিশ্লেষণাত্মক পদ্ধতিও ব্যবহার করা হয়েছে। প্রাথমিক ও মাধ্যমিক উৎস যেমন তুলনামূলক শিক্ষার উপর বিভিন্ন লেখকের বই, প্রবন্ধ এবং আলোচনা থেকে তথ্য সংগৃহীত হয়েছে। প্রবন্ধটির উদ্দেশ্য হচ্ছে কয়েকটি

*সহকারী অধ্যাপক, ইনস্টিটিউট অব এডুকেশন এন্ড রিসার্চ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়

দেশের শিক্ষা ব্যবস্থা তুলনামূলক আলোচনার মাধ্যমে আমাদের দেশের শিক্ষা ব্যবস্থার স্বরূপ উন্মোচন করা এবং অপেক্ষাকৃত উন্নত দেশগুলোতে অনুসৃত শিক্ষা-পদ্ধতির সফল প্রবর্তনের মাধ্যমে আমাদের শিক্ষার মান উন্নয়নে দেশের শিক্ষার মান উন্নত করা। সার্কভুক্ত তিনটি দেশ, যথা- বাংলাদেশ, ভারত ও শ্রীলঙ্কার শিক্ষাব্যবস্থা ইংল্যান্ডের শিক্ষাব্যবস্থা থেকে পশ্চাৎপদ। শেখন-শেখানো পদ্ধতি, শ্রেণিকক্ষ মিথস্ক্রিয়া, শিক্ষকের আচরণগত উন্নয়ন ইত্যাদি বিষয়ে প্রচুর গবেষণার ফলে ইংল্যান্ডের শিক্ষাব্যবস্থার উন্নয়ন সম্ভব হয়েছে। কাজেই, অন্যান্য দেশের পরীক্ষালব্ধ জ্ঞান ও অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়ে দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলো বিশেষ করে বাংলাদেশ শিক্ষাক্ষেত্রে এগিয়ে যেতে পারে।

একটি দেশের শিক্ষার উন্নয়নে নির্দিষ্ট কিছু factor বা নিয়ামক দ্বারা প্রভাবিত হয়। ফ্যাক্টরগুলো হলো:

The Geographical Factor, The Economic Factor, The Racial Factor, The linguistic Factor, The Philosophical Factor, The Moral Factor, The religious Factor, The Factor of Socialism, The Factor of Humanism, The Factor of Nationalism, The Democratic Factor (Chaube, S.P 1998, 3-11).

কোনো দেশের সংস্কৃতি ও সভ্যতা ও ভৌগোলিক নিয়ামক দ্বারা প্রভাবিত হয়। আবার শিক্ষার সাথে সংস্কৃতি ও সভ্যতা গভীরভাবে সম্পর্কিত। একটি দেশের শিক্ষাব্যবস্থা অর্থনৈতিক অবস্থার উপর নির্ভরশীল। অর্থনৈতিক অবস্থা বিবেচনা করে শিক্ষার লক্ষ্য ও কারিকুলাম নির্বাচন করা হয়। জাতিগত ফ্যাক্টর বিবেচনা করে ও শিক্ষার কারিকুলাম নির্বাচন করা হয়। মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষা দিতে পারলে শিক্ষার্থীরা দ্রুত আয়ত্ত্ব করতে পারে এবং জাতীয় বৈশিষ্ট্যের উন্নয়ন হয়। তাই শিক্ষাব্যবস্থায় মাতৃভাষাটি একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক। দার্শনিক ভাবনা শিক্ষাকে প্রভাবিত করে। উদাহরণ হিসেবে ভারত ও গ্রিসে এর যথেষ্ট প্রভাব দেখা যায়। গণতন্ত্র চর্চার একমাত্র উপায় নৈতিকতা। কাজেই নৈতিকতা ফ্যাক্টর শিক্ষার জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। অনুরূপভাবে, জীবনের সাথে সম্পর্কিত ধর্মীয় প্রভাব শিক্ষাকে প্রভাবিত করে এবং একে বাদ দিয়ে শিক্ষা দেওয়া যায় না। পৃথিবীর অনেক দেশে সমাজতন্ত্রবাদ প্রচলিত। কাজেই সে দেশের শিক্ষাব্যবস্থা সমাজতন্ত্র দ্বারা প্রভাবিত। পৃথিবীর সব দেশে মানবিকতা বোধ আছে। মানবিকতাকে আধুনিক শিক্ষাব্যবস্থার সবার উপরে স্থান দিতে হবে। জাতীয়তা শিক্ষার লক্ষ্যকে ত্বরান্বিত করে। শিক্ষাব্যবস্থায় এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এছাড়া, গণতন্ত্র শিক্ষার জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ ফ্যাক্টর (Shriyastava S.K 2005, 14)।

তুলনামূলক শিক্ষার অন্যতম জনক স্যার মাইকেল স্যাডলার সর্বপ্রথম তুলনামূলক শিক্ষার সংজ্ঞা ও ধারণা প্রসার ঘটান। পরবর্তীকালে ক্যাডেল, ম্যালিসন, হানস প্রমুখ শিক্ষাবিদগণ তুলনামূলক শিক্ষার সংজ্ঞা প্রদানের চেষ্টা করেন। স্যাডলার তুলনামূলক শিক্ষার স্বরূপ বিশ্লেষণ করতে যেয়ে উল্লেখ করেন:

In studying foreign systems of education we should not forget that the things outside the schools matter even more than the things inside the schools --- A national system of education is living thing, the outcome of forgotten struggles and difficulties and of battles long ago. It has in it some of the secret workings of national life (ইসলাম ২০১৪, ২).

তুলনামূলক শিক্ষা: একটি পর্যালোচনা

ক্যাভেলের ভাষায়, "The purpose of comparative education, as of comparative law, comparative literature or comparative anatomy, is to discover the differences in the forces and causes that produce differences in educational systems" (ইসলাম ২০১৪, ৩).

সুতরাং, ক্যাভেলের মতে যে সকল কারণ, শক্তি ও উপাদান কোনো সমাজের কৃষ্টিকে রূপদান করে এবং যে সকল শক্তি পরোক্ষভাবে সমাজের শিক্ষাব্যবস্থাকে নিয়ন্ত্রণ করে তাদের অধ্যয়নই তুলনামূলক শিক্ষাতত্ত্ব।

লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

বিভিন্ন দেশের শিক্ষার তুলনামূলক অধ্যয়নের মাধ্যমে শিক্ষার মানোন্নয়ন ও আধুনিকীকরণের লক্ষ্যে শিক্ষা সংস্কারের পরিকল্পনা গ্রহণ করা সম্ভব। শিক্ষা ও সমাজ সম্পর্কে প্রয়োজনীয় তথ্য সরবরাহ করে উন্নয়ন ও সংস্কারের গতিধারার দিক নির্দেশনা দেয়ার ক্ষেত্রে তুলনামূলক শিক্ষার অবদান অনস্বীকার্য। তুলনামূলক শিক্ষার মূল লক্ষ্য হলো বিভিন্ন দেশের শিক্ষাব্যবস্থার অভিজ্ঞতার আলোকে নিজ দেশের শিক্ষাব্যবস্থাকে গভীরভাবে উপলব্ধি করা, শিক্ষার ত্রুটি ও ভাষা দিক নির্ধারণ করা প্রয়োজনীয় সংস্কার ও উন্নয়নের লক্ষ্যে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য সংগ্রহ ও যথাযথ প্রয়োগ হয়। এই মূল লক্ষ্যে পৌঁছানোর জন্য তুলনামূলক শিক্ষার মাধ্যমে কয়েকটি বিশেষ উদ্দেশ্য অর্জন করা প্রয়োজন। যেমন-

বুদ্ধিবৃত্তিমূলক উদ্দেশ্য

এটি একটি পাণ্ডিত্যপূর্ণ জ্ঞানচর্চার কেন্দ্র। অন্য দেশের শিক্ষাব্যবস্থা সম্পর্কে বুদ্ধিদীপ্ত অনুসন্ধান ও আলোচনা ব্যক্তির নিজ জ্ঞান ও উপলব্ধিকে পরিপূর্ণ ও উন্নত করে এবং তার অন্তর্দৃষ্টি এমনভাবে বিকশিত করে যে সে অন্যান্য দেশের জনগণের প্রেক্ষিতে নিজেকে সম্যক উপলব্ধি করার সুযোগ সৃষ্টি হয়। এর ফলে শিক্ষা বিজ্ঞান ও সামাজিক বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে নতুন জ্ঞানের বিকাশ ও প্রয়োগের দ্বার উন্মোচিত হয়।

পরিকল্পনামূলক উদ্দেশ্য

পৃথিবীর সব দেশই আজ সমৃদ্ধির লক্ষ্যে উন্নয়ন পরিকল্পনা করে চলছে। শিক্ষা ক্ষেত্রেও প্রতিটি দেশে নতুন নতুন নীতি ও কর্মসূচি নিয়ে এগিয়ে চলছে। এসব নীতি ও কর্মসূচি প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে কোনরূপ দুর্বলতা বা শৈথিল্য প্রদর্শনের সামান্য অবকাশ নেই। কারণ এর সাথে লক্ষ লক্ষ নাগরিকের ভালো-মন্দ ও ভবিষ্যৎ জড়িত। অতএব, এসব বিষয়ে সিদ্ধান্ত একটি ত্রুটিমুক্ত ও পরিপক্ব হতে হবে। এক্ষেত্রে তুলনামূলক শিক্ষা সুসংগঠিত ও সুপ্রতিষ্ঠিত তথ্য প্রদানে সহায়ক হতে পারে। এ প্রসঙ্গে জোনস বলেন, "Comparative education, with its rapidly increasing resources and its hopes for better methods, admirable suited to provide a more rational basis for planning" (ইসলাম ২০১৪, ৬).

উপযোগিতামূলক উদ্দেশ্য

শিক্ষার অর্থনৈতিক মূল্য আজ প্রতিষ্ঠিত সত্য। চীন, জাপান, কোরিয়ার মত কিছু কিছু দেশ কর্ম অভিজ্ঞতা অর্জনকে শিক্ষার একটি অত্যাৱশ্যকীয় অঙ্গ বলে মনে করে এবং এ নীতির প্রতিফলন ঘটিয়ে এসব দেশের অর্থনৈতিক অগ্রগতি সাধিত হয়েছে। পক্ষান্তরে ভারত ও বাংলাদেশের মতো অনেক দেশই শিক্ষাকে দেশের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির উপায় হিসাবে গুরুত্ব না দিয়ে শিক্ষার প্রসার, বিশেষ করে উচ্চ শিক্ষার প্রসার এমনভাবে ঘটিয়েছে যে বেকার সমস্যা আরও প্রকট হয়ে উঠেছে। এর সাথে যুক্ত হয়েছে যেন ব্রেন ড্রেন (Brain drain) সমস্যা। এসব সমস্যার সমাধান পেতে হলে তুলনামূলক শিক্ষার আলোকে শিক্ষার প্রয়োগশীলতা ও উপযোগিতার বিষয়টি ভাবতে হবে।

উদ্ভাবনামূলক উদ্দেশ্য

তুলনামূলক শিক্ষা পরিচর্চার মধ্যে দিয়ে উন্নত দেশসমূহে বিশেষ করে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র শিখন-শেখানো পদ্ধতি, শ্রেণিকক্ষে মিথস্ক্রিয়া, শিক্ষকের আচরণগত উন্নয়ন ইত্যাদি বিষয়ে এক গবেষণা পরিচালিত হয়েছে যে, এসব সম্পর্কে অনুন্নত ও উন্নয়নশীল দেশসমূহ যথাযথ জ্ঞানও ধারণা পেতে ব্যর্থ হলে এসব দেশের শিক্ষাব্যবস্থা কালক্রমে সেকেলে ও ব্যর্থ বলে পরিগণিত হবে। কাজেই অনেক সময় পরীক্ষা ও ভ্রান্তি নিরসন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে সরাসরি নতুন অভিজ্ঞতা অর্জনের চেয়ে অন্য দেশের পরীক্ষা নিরীক্ষালব্ধ জ্ঞান ও অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগানোই শ্রেয়।

তুলনামূলক শিক্ষার পদ্ধতি

এই পদ্ধতিই কোনো দেশের শিক্ষায় অগ্রগতি অথবা ব্যর্থতা সঠিকভাবে পরিমাপ করে দেবে এবং সেই পরিমাপের ভিত্তিতেই শিক্ষা সংস্কারের কাজে উদ্যোগী হওয়া যেতে পারে। তাই শিক্ষাব্রতীগণ তুলনামূলক শিক্ষার বিভিন্ন পদ্ধতি উদ্ভাবন করেছেন। নীচে কতিপয় বিষয় আলোচনা করা হলো:

বর্ণনামূলক পদ্ধতি

এই পদ্ধতিতে কোনো দেশের শিক্ষা ব্যবস্থা সম্পর্কে সাধারণ বর্ণনা প্রদান করা হয়ে থাকে। তারপর প্রয়োজনমত অন্য দেশের শিক্ষার সঙ্গে তুলনামূলক আলোচনা করা হয়।

উৎকর্ষ-অপকর্ষ পদ্ধতি

এ পদ্ধতি অনুসারে, বিভিন্ন দেশের শিক্ষাব্যবস্থার অভ্যন্তরীণ গুণগত সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্যের উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়। কোনো কোনো ক্ষেত্রে আবার সংখ্যাগত তারতম্যও আলোচিত হয়। এই আলোচনা কোন দেশে শিক্ষার ক্ষেত্রে ব্যাপকতা নির্ধারণে যথেষ্ট সহায়তা করে। এই পদ্ধতিকে পরিসংখ্যান পদ্ধতি বলা যায়। পরিসংখ্যান পদ্ধতি সার্থক হবে তখন, যখন উপাত্ত সংগ্রহের ক্ষেত্রে বিশ্বব্যাপী একই ধরনের পদ্ধতি অনুসরণ করা হবে” (ইসলাম ২০১৪, ৯)।

ঐতিহাসিক পদ্ধতি

সুদূর অতীত থেকে আরম্ভ করে নানা প্রতিবন্ধকতা ও নানা পর্যায় অতিক্রম করে শিক্ষা আধুনিক স্তরে এসে পৌঁছেছে। শিক্ষা চেতনার ক্রমবিকাশের এই পর্যায়গুলোর তুলনামূলক বিশ্লেষণই ঐতিহাসিক পদ্ধতি। তুলনামূলক শিক্ষার ক্ষেত্রে এই পদ্ধতির উল্লেখযোগ্য অবদান অনস্বীকার্য। এই পদ্ধতির দ্বারাই আমরা জানতে পেরেছি কোনো দেশের শিক্ষা-চিন্তার বিবর্তনের ক্ষেত্রে কোন কোন উপাদানগুলো বিশেষভাবে কার্যকরী থাকে।

সমাজ বিজ্ঞানভিত্তিক পদ্ধতি

এই পদ্ধতি অনুসারে, কেবলমাত্র সামাজিক উপাদানগুলোর ভিত্তিতেই তুলনামূলক শিক্ষার চর্চা করা হয়। মাইকেল স্যাডলার হলেন এই পদ্ধতির অন্যতম প্রবক্তা। ১৯০২ খ্রি. তিনি লিখেছিলেন, “ইংল্যান্ডের শিক্ষাব্যবস্থার পর্যালোচনা বিচ্ছিন্নভাবে করা সম্ভব নয়। এই পর্যালোচনার জন্য যেমন প্রয়োজন ইংল্যান্ডের সামাজিক পরিমণ্ডলের বিশ্লেষণ, তেমনি প্রয়োজন জার্মানি, আমেরিকা, ফ্রান্স এবং অন্যান্য দেশের শিক্ষার সঙ্গে সামাজিক পটভূমিকার বিশ্লেষণও” (ইসলাম ২০১৪, ১০)।

তুলনামূলক শিক্ষা: একটি পর্যালোচনা

বিশ্লেষণাত্মক পদ্ধতি

এই পদ্ধতি অনুসারে, সর্বপ্রথম কোন একটি দেশের শিক্ষা ব্যবস্থা সম্পর্কে বিভিন্ন তথ্য সংগ্রহ করা হয়। তারপর সংগৃহীত তথ্যগুলোকে তুলনামূলকভাবে বিবেচনা করা হয়। এর পর তথ্যগুলোকে কতকগুলো শ্রেণিতে বিনাস করা হয় এবং এই শ্রেণিবিন্যাসের পরিপ্রেক্ষিতে যে ফলশ্রুতি লব্ধ হবে তাকেই সিদ্ধান্ত হিসাবে গ্রহণ করা হবে।

সংশ্লেষণ পদ্ধতি: বিশ্লেষণাত্মক পদ্ধতির ঠিক বিপরীত রূপই হলো সংশ্লেষণ পদ্ধতি। এডমন্ড জে কিং হলেন এর প্রধান প্রবক্তা। ১৯৬২খ্রি. তিনি তাঁর 'World Perspective in Education' নামের বইটিতে এই পদ্ধতি নিয়ে আলোচনা করেছেন। তিনি বলেছেন, “শিক্ষার দিক থেকে সমগ্র পৃথিবীকে একটি একক হিসাবে গ্রহণ করতে হবে। কোনো একটি দেশের শিক্ষাব্যবস্থা সেই বিশ্ব শিক্ষা ব্যবহার নিরিখে বিচার করে দেখতে হবে” (ইসলাম ২০১৪, ১১)।

এশিয়ার কয়েকটি দেশে বিশেষ করে বাংলাদেশ, ভারত, শ্রীলংকা এবং ইউরোপের ইংল্যান্ড এর শিক্ষাব্যবস্থা নিয়ে আলোচনা করা হলো:

বাংলাদেশ

স্বাধীনতার অব্যবহিত পরেই ১৯৭২ সনে রচিত সংবিধানে সুস্পষ্টভাবে বৈষম্যহীন, গণমুখী ও সর্বজনীন শিক্ষাব্যবস্থার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। প্রাথমিক শিক্ষা হবে প্রতিটি শিশুর জন্য বাধ্যতামূলক ও অবৈতনিক। বাংলাদেশে শিক্ষাব্যবস্থায় সাধারণ শিক্ষা ধারার পাশাপাশি মাদ্রাসা শিক্ষা, এছাড়া কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষাদানের জন্য ভোকেশনাল শিক্ষা ধারা ও বর্তমান রয়েছে। সাধারণ শিক্ষা ধারার ক্ষেত্রে তিনটি স্তর রয়েছে, যথা প্রাথমিক শিক্ষা, মাধ্যমিক শিক্ষা এবং উচ্চ শিক্ষা। বর্তমানে প্রাথমিক শিক্ষা ৫ বছর মেয়াদী (১ম - ৫ম শ্রেণি পর্যন্ত) সম্প্রতি নতুন শিক্ষানীতি অনুযায়ী প্রা-প্রাথমিক থেকে ৮ম শ্রেণি পর্যন্ত প্রাথমিক শিক্ষার অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পাশাপাশি নানা ধরনের বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় রয়েছে, যথা- রেজিস্টার্ড ও ননরেজিস্টার্ড প্রাথমিক বিদ্যালয়, মাধ্যমিক বিদ্যালয় সংযুক্ত প্রাথমিক বিদ্যালয়, স্যাটেলাইট স্কুল, কমিউনিটি স্কুল, কিন্ডার গার্টেন স্কুল এবং পরীক্ষামূলক স্কুল। মাদ্রাসা শিক্ষা ধারায় প্রাথমিক স্তরের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হচ্ছে এবতেদায়ী মাদ্রাসা। প্রাথমিক স্তরের শিক্ষা ও বিশ্ববিদ্যালয়ের স্তরের শিক্ষার মধ্যবর্তী শিক্ষান্তরটি মাধ্যমিক শিক্ষা নামে পরিচিত। ৬ষ্ঠ থেকে ৮ম শ্রেণি পর্যন্ত নিম্নমাধ্যমিক, নবম দশম শ্রেণি মাধ্যমিক এবং একাদশ দ্বাদশ শ্রেণি উচ্চ মাধ্যমিক। প্রায় ৯৭% হাইস্কুল এবং সব জুনিয়র স্কুল/নিম্নমাধ্যমিক স্কুল বেসরকারি শিক্ষ প্রতিষ্ঠান। উচ্চ মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষাকে এখনো ঐতিহ্যগতভাবে কলেজ শিক্ষার অংশ হিসাবে দেখা হয়, মাধ্যমিক স্কুলের নয়। তাই এই স্তরের শিক্ষা বা প্রতিষ্ঠান সাধারণত উচ্চ মাধ্যমিক কলেজ নামে পরিচিত। উচ্চমাধ্যমিক কলেজে একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণিতে পাঠদান করা হয়। প্রায় ৯৮% উত্তর মাধ্যমিক কলেজই বেসরকারী এমপিওভুক্ত। একাদশ-দ্বাদশ শ্রেণির শিক্ষা উচ্চমাধ্যমিক কলেজ ছাড়াও দুই ধরনের প্রতিষ্ঠানে প্রদান করা হয়। স্কুল এন্ড কলেজ অর্থাৎ মাধ্যমিক এর সঙ্গে একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণিভুক্ত প্রতিষ্ঠান, ডিগ্রি কলেজ প্রায় সব ডিগ্রি কলেজেই উচ্চ মাধ্যমিক শাখা রয়েছে। উচ্চ শিক্ষা সাধারণত পাঁচ বছর মেয়াদী, অর্থাৎ (৩ বছর স্নাতক পাশ + ২ বছর মাস্টার্স ডিগ্রি) অথবা (৪ বছর স্নাতক সম্মান + ১ বছর মাস্টার্স ডিগ্রি)। এ ছাড়াও এম ফিল বা পিএইচডি ডিগ্রির জন্য অতিরিক্ত ন্যূনতম যথাক্রমে ২ বছর এবং ৩ বছর প্রয়োজন হয়। উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হচ্ছে ডিগ্রি কলেজ যা জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে এবং সরকারী/বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়। সাধারণ

The Chittagong University Journal of Arts and Humanities

শিক্ষা ধারার বিশ্ববিদ্যালয়ের পাশাপাশি মেডিক্যাল, প্রকৌশল, কৃষি, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি এবং উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় রয়েছে। মাদ্রাসা শিক্ষায় পাঁচটি স্তর রয়েছে। পাঁচ বছর মেয়াদী এবতেদায়ী, পাঁচ বছর মেয়াদী দাখিল, দুই বছর মেয়াদী আলিম, দুই বছর মেয়াদী ফাজিল এবং দুই বছর মেয়াদী কামিল যা যথাক্রমে প্রাথমিক, মাধ্যমিক, উচ্চমাধ্যমিক স্নাতক (পাশ) ও স্নাতকোত্তর সমমানের। কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষার তিনটি স্তর রয়েছে। এক বা দুই বছর মেয়াদী সার্টিফিকেট কোর্স (৮ম শ্রেণি উত্তীর্ণরা ভর্তির জন্য যোগ্য), তিন বছর মেয়াদী ডিপ্লোমা কোর্স (মাধ্যমিক স্কুল পরীক্ষায় উত্তীর্ণরা ভর্তির জন্য যোগ্য), চার বছর মেয়াদী ডিগ্রি কোর্স (উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণরা ভর্তির জন্য যোগ্য)

২২+	১৬	মাস্টার্স/এম.ফিল//পিএইচ.ডি	উচ্চশিক্ষা
১৮-২১	১৩-১৫	স্নাতক(সম্মান/পাস)	উচ্চশিক্ষা
১৭	১২	উচ্চ মাধ্যমিক	
১৬	১১		
১৫	১০	মাধ্যমিক	
১৪	৯		
১৩	৮	নিম্ন মাধ্যমিক	
১২	৭		
১১	৬		
১০	৫	প্রাথমিক	
৯	৪		
৮	৩		
৭	২		
৬	১		
৫		প্রাক প্রাথমিক	
৪			
৩			
২			
বয়স	শ্রেণি		

তুলনামূলক শিক্ষা: একটি পর্যালোচনা

উৎস: হায়ার সেকেন্ডারি এডুকেশন প্রজেক্ট, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, শিক্ষার ইতিহাস ও তুলনামূলক শিক্ষা,
ঢাকা, ১৯৯৪।

চিত্র: বাংলাদেশের শিক্ষার কাঠামোগত বিন্যাস

বাংলাদেশের জাতীয় শিক্ষাব্যবস্থার সঠিক প্রশাসন ও পরিচালনার সর্বোচ্চ ক্ষমতা ও দায়িত্ব শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের উপর ন্যস্ত। মন্ত্রী মন্ত্রণালয়ের নির্বাহী প্রধান ও তবে অর্থ সংক্রান্ত বিষয়সমূহের নির্বাহী প্রধান মন্ত্রণালয়ের সচিব। সমস্ত নীতিবিষয়ক সিদ্ধান্ত মন্ত্রণালয়ের গৃহীত হয়। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সাথে সংশ্লিষ্ট যাবতীয় আন্তঃমন্ত্রণালয়ের বিষয়াবলীর সুরাহা করে থাকে। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের একটি পরিকল্পনা কোষ অন্তর্ভুক্ত রয়েছে যা মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন সংস্থাসমূহের পেশকৃত প্রকল্পসমূহের পরিবীক্ষণ করে এবং পরিকল্পনা মন্ত্রণালয় ও পরিকল্পনা কমিশনের সাথে যোগাযোগ সাধন করে। প্রশাসনিক সুবিধার জন্য সমগ্র শিক্ষাব্যবস্থাকে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় এবং শিক্ষা মন্ত্রণালয় দুই ভাগে বিভক্ত করা হয়। প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক গৃহীত প্রাথমিক শিক্ষা সংক্রান্ত নীতিমালা কার্যকর করে থাকে প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর। এই অধিদপ্তর জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিস, থানা শিক্ষা অফিসগুলোতে কর্মরত কর্মকর্তা, কর্মচারী ও প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক সম্পর্কিত প্রশাসন, ব্যবস্থাপনা ও পরিদর্শন করে থাকে। প্রাথমিক শিক্ষার বাজেট বাজেট প্রণয়ন ও বরাদ্দকৃত অর্থের সদ্ব্যবহার নিশ্চিতকরণসহ যাবতীয় কাজে প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর করে থাকে। মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা প্রশাসন এবং তদারকির জন্য শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের দায়ী থাকে। এই অধিদপ্তর বিভাগীয় অফিস, জেলা অফিস, মহাবিদ্যালয়, উচ্চ বিদ্যালয় এবং মাদ্রাসাসমূহের সহযোগিতায় প্রশাসনিক কার্যাবলি পরিচালনা করে থাকে। এই অধিদপ্তরের কাজগুলো হলো সরকারী স্কুল, কলেজ ও মাদ্রাসাসমূহ পরিচালনা করা।

ভারত

ভারত ২২টি অঙ্গরাজ্য ও ৯টি কেন্দ্র শাসিত ইউনিয়ন টেরিটরি নিয়ে গঠিত বিশাল একটি রাষ্ট্র। শিক্ষার মূল দায়িত্ব অঙ্গরাজ্যগুলোর উপর ন্যস্ত। কেন্দ্রীয় সরকার অবশ্য শিক্ষার লক্ষ্য, প্রকৃতি ও কাঠামো নির্ধারণে গুরুত্বপূর্ণ নীতি প্রণয়ন ও দিক নির্দেশনা প্রদান করে। এজন্য দেশের সর্বত্র প্রায় একই ধরনের শিক্ষাব্যবস্থা কার্যকর রয়েছে। বহু পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর শিক্ষা কাঠামো বর্তমানে যেভাবে বিদ্যমান রয়েছে তার বিবরণ নিম্নে দেয়া হল: প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা

এই শিক্ষাস্তর ১ থেকে ৩ বৎসর মেয়াদী। এ শিক্ষা বাধ্যতামূলক নয়, তবে এ জন্য সরকারী উৎসাহ ও সাহায্য দেওয়া হয়।

প্রাথমিক শিক্ষা

পুরো ছয় বছর বয়সে নিয়মিত স্কুলের শিক্ষা আরম্ভ হয়। প্রাথমিক শিক্ষার স্তর একটানা ৭ কিংবা ৮ বছর মেয়াদী। শিক্ষাক্রম ও শিক্ষা পদ্ধতি ভেদে এই স্তরটিকে সুবিধার জন্য দু'ভাগে ভাগ করা হয়েছে: (ক) ১ম শ্রেণি হতে চতুর্থ বা পঞ্চম শ্রেণি পর্যন্ত নিম্ন প্রাথমিক স্তর এবং (খ) ৫ম শ্রেণি হতে সপ্তম শ্রেণি পর্যন্ত কিংবা ৬ষ্ঠ শ্রেণি হতে ৮ম শ্রেণি পর্যন্ত উচ্চ প্রাথমিক স্তর। ১৯৬৮ এর শিক্ষা কমিশন রিপোর্ট অনুসারে সম্পূর্ণ প্রাথমিক স্তরের শিক্ষা অবৈতনিক, বাধ্যতামূলক এবং সর্বজনীন হতে হবে।

নিম্ন মাধ্যমিক শিক্ষা

এই স্তরের শিক্ষার মেয়াদ ২-৩ বছর। যে সকল শিক্ষার্থী নিম্ন প্রাথমিক স্তর ৭ বছরে শেষ করবে তাদের জন্য নিম্নমাধ্যমিক শিক্ষার মেয়াদ হবে ৩ বছর (৮ম থেকে ১০ম শ্রেণি পর্যন্ত)। আর যে সকল শিক্ষার্থী উচ্চ প্রাথমিক স্তর ৮ বছরে শেষ করবে তাদের জন্য নিম্নমাধ্যমিক শিক্ষার মেয়াদ হবে ২ বছর (৯ম শ্রেণি হতে ১০ম শ্রেণি পর্যন্ত)। নিম্ন মাধ্যমিক স্তরের শেষ প্রাপ্তে অর্থাৎ ১০ বছরের শিক্ষার শেষে অনুষ্ঠিত হবে প্রথম সাধারণ পরীক্ষা (সেকেভারি স্কুল সার্টিফিকেট পরীক্ষা)। দশ বছরব্যাপী এই শিক্ষা হবে সাধারণ শিক্ষা, কোনো বিশেষীকরণ থাকবে না।

উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা

বিদ্যালয়ের শেষ স্তরে রয়েছে দুই বছরের উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা। অর্থাৎ এখানে শিক্ষার্থীরা একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণি পর্যন্ত অধ্যয়ন করে। এ স্তরে বিশেষ পাঠের সূচনা করা হলেও চরম বিশেষীকরণ হয় না। উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা শেষে হায়ার সেকেভারি স্কুল সার্টিফিকেট পরীক্ষা গ্রহণ করা হয়। উচ্চ শিক্ষা বা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার স্তর। এ স্তরে রয়েছে তিন বা ততোধিক বছরের প্রথম ডিগ্রি স্তর (ব্যাচেলর ডিগ্রি-স্তর) এবং তদুর্ধ্বের ২ বছরের ২য় ডিগ্রি-স্তর বা মাস্টার ডিগ্রি স্তর। এই স্তরে সাধারণ শিক্ষা ছাড়াও নানা ধরনের পূর্ণ সময় কিংবা আংশিক সময়ের শিক্ষা করেছে। উচ্চস্তরের শিক্ষা পর্যায়ে ৪টি উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় এবং ৪৫টি অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয় বিভিন্ন ধরনের প্রায় ১০০টি ডিপ্লোমা কোর্স পরিচালনা করে থাকে। ১৯৮৬ সালে দিল্লীতে স্থানীয় পর্যায়ে স্থাপিত Indira Gandhi National Open University (IGNOU) প্রায় ১৫০ টি পদ্ধতিতে বিভিন্ন বিষয়ে ডিপ্লোমা ডিগ্রি কোর্স পরিচালনা করে থাকে।

কারিগরি শিক্ষা

রাজ্যে কারিগরি শিক্ষা বোর্ড সার্টিফিকেট, ডিপ্লোমা ও ডিগ্রি পর্যায়ের বিভিন্ন ধরনের কারিগরি শিক্ষা কোর্স পরিচালনা করে। শিল্প ট্রেনিং বোর্ড, পলিটেকনিক ও রুরাল ইনস্টিটিউটগুলো বহু ধরনের ট্রেড এবং সেক্রেটারিয়াল কোর্স পরিচালনা করে। দশ বছরের স্কুল কোর্স শেষে এই কোর্সগুলোতে ভর্তি হওয়া যায়।

ওপেন স্কুল

১৯৭৯ সালে সেন্ট্রাল বোর্ড অব সেকেভারি এডুকেশন কর্তৃক “উন্মুক্ত বিদ্যালয়” প্রবর্তন করা হয়। ১৯৯০ সালে ভারত সরকার একটি রেজুলেশনের মাধ্যমে জাতীয় উন্মুক্ত স্কুলকে মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক পর্যায়ে কোর্স, পরীক্ষা গ্রহণ ও সার্টিফিকেট প্রদানের ক্ষমতা প্রদান করে। ১৯৯২-৯৩ শিক্ষাবর্ষে সারা ভারতে ২.৫ লক্ষেরও অধিক শিক্ষার্থী এই স্কুলের বিভিন্ন কোর্সে ভর্তি হয়।

উচ্চ শিক্ষা	দ্বাদশ শ্রেণির উর্দ্ধ শ্রেণি	স্নাতক ও স্নাতকোত্তর
মাধ্যমিক শিক্ষা	একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণি	উচ্চ মাধ্যমিক
	নবম শ্রেণি-দশম শ্রেণি অষ্টম শ্রেণি-দশম শ্রেণি	নিম্ন মাধ্যমিক
প্রাথমিক শিক্ষা	ষষ্ঠ শ্রেণি থেকে অষ্টম শ্রেণি ৫ম শ্রেণি থেকে সপ্তম শ্রেণি	উচ্চ প্রাথমিক স্তর

তুলনামূলক শিক্ষা: একটি পর্যালোচনা

১ম থেকে ৫ম শ্রেণি ১ম শ্রেণি থেকে ৪র্থ শ্রেণি	নিম্ন প্রাথমিক স্তর
---	---------------------

উৎস: দত্ত, উপমাকান্ত, তুলনামূলক শিক্ষা, কলিকাতা: এডুকেশনাল বুক করপোরেশন, ১৯৭৪

চিত্র: ভারতের শিক্ষার কাঠামোগত বিন্যাস

শিক্ষা প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনা

রাষ্ট্রীয় দায়িত্ব পালিত হয় কেন্দ্রীয়, রাজ্য ও স্থানীয় স্তরে, এই ত্রিশক্তির অংশীদারিত্বে। কেন্দ্রীয় সরকারের শিক্ষা বিষয়ক দায়-দায়িত্ব সম্পাদনের জন্য রয়েছে শিক্ষা মন্ত্রণালয়। শিক্ষামন্ত্রী এই মন্ত্রণালয়ের প্রধান। মন্ত্রীকে সাহায্য করার জন্য রয়েছেন একজন সচিব, একজন অতিরিক্ত সচিব এবং কিছু সংখ্যক যুগ্মসচিব, উপসচিব ও সহকারী সচিব।

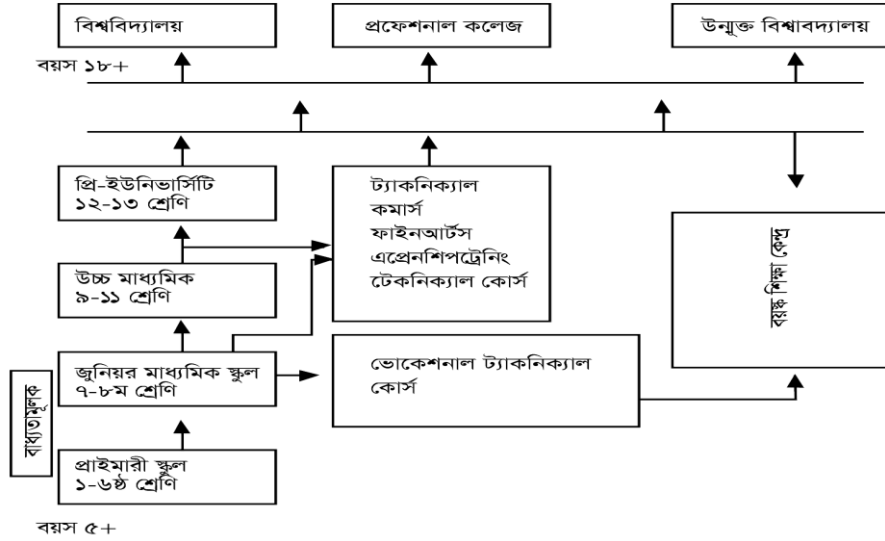
রাজ্য সরকারের দায়িত্ব

সাংবিধানিক অর্থে শিক্ষার দায়িত্ব রাজ্য সরকারের। রাজ্য সরকারের একটি রাজ্য শিক্ষা মন্ত্রণালয় রয়েছে, যার প্রধান রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী কর্তৃক নিয়োগপ্রাপ্ত শিক্ষামন্ত্রী। তিনি তাঁর দায়-দায়িত্বের জবাবদিহিতার জন্য পার্লামেন্টের নিকট দায়ী। প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষার সর্বাধিক বিষয়ে শিক্ষামন্ত্রীর প্রায় সর্বময় ক্ষমতা রয়েছে। এছাড়া নারীশিক্ষা, বয়স্ক শিক্ষা, কারিগরি শিক্ষা বৃত্তিমূলক শিক্ষা সম্পর্কেও রাজ্য সরকারের প্রত্যক্ষ দায়িত্ব রয়েছে। মাধ্যমিক শিক্ষার জন্য রয়েছে আধা সরকারী শিক্ষাবোর্ড।

শ্রীলংকা

দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোর মধ্যে শ্রীলংকা শিক্ষার ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ সাফল্য অর্জন করতে সক্ষম হয়েছে। ১৯৪৮ সালে স্বাধীনতা লাভের পর নতুন এবং পরিবর্তিত সমাজ গঠনের লক্ষ্যে শিক্ষাব্যবস্থার পুনর্গঠন শুরু করা হয়। শিক্ষাকে অবৈতনিক এবং মাতৃভাষাকে শিক্ষার মাধ্যম হিসাবে চালু করা হয়। ১৪ বছর বয়স পর্যন্ত শিক্ষা বাধ্যতামূলক। শিক্ষার যাবতীয় ব্যয় কেন্দ্রীয় সরকারের তহবিল থেকে নির্বাহ করা হয়। শ্রীলংকার কিন্ডারগার্টেন থেকে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত শিক্ষা অবৈতনিক। ১৯৬০ সালের পর থেকে স্কুলগুলো সরকার কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত হয়ে আসছে এবং বেশির ভাগ স্কুলেই কো-এডুকেশন চালু হয়েছে। ১৯৭৮ সালের শিক্ষা-সংস্কারের ফলে সাধারণ শিক্ষার সময় কাল ১৩ বছর করা হয় এবং প্রাথমিক স্তরে শিক্ষার্থীর ভর্তির বয়স ৫ বছর স্থির করা হয়। ১৯৮৫ সালে শিক্ষা কাঠামোকে নিম্নরূপ স্তরে ভাগ করা হয় : প্রাথমিক স্তর (১ম-৬ষ্ঠ শ্রেণি), জুনিয়র বা নিম্নমাধ্যমিক স্তর (৭ম- ৮ম শ্রেণি), উচ্চ মাধ্যমিক স্তর (৯ম-১১শ শ্রেণি), মাধ্যমিক উত্তর বা প্রি-ইউনিভার্সিটি স্তর (১১শ-১৩ শ্রেণি) শিক্ষার্থীদের প্রাথমিক ও নিম্নমাধ্যমিক স্তরের শিক্ষা বাধ্যতামূলক। স্কুল পরিত্যাগের বয়স ১৪ বছর নির্ধারণ করা হয়েছে। নবম হতে দ্বাদশ শ্রেণির অধ্যয়নের শেষে Srilankan GCE O Level বহিঃপরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে। এই পরীক্ষায় ৮টি বিষয়ের মধ্যে ৬ টি বিষয়ে কৃতকার্য হওয়া আবশ্যিক। ছয়টি বিষয়ের মধ্যে গণিত এবং সিনহালা বা তামিল ভাষা রয়েছে। মাধ্যমিক উত্তর কোর্সটি সমাপনান্তে Srilankan GCE A Level পরীক্ষায় অংশ গ্রহণ করা যায়। ১৯৮৬ সাল থেকে National Certificate in English (NCE) নামে ইংরেজি ভাষার উপর নতুন জাতীয় পরীক্ষা প্রবর্তন করা হয়।

শ্রীলংকায় ছয়টি স্বায়ত্বশাসিত বিশ্ববিদ্যালয় রয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর একাডেমিক, প্রশাসনিক ও আর্থিক বিষয়ের সমন্বিত নীতি প্রণয়ন ও দিক নির্দেশনার দায়িত্ব UGC এর উপর ন্যস্ত। GCE A Level পরীক্ষায় কৃতকার্য হওয়ার পর উচ্চশিক্ষার জন্য এই সকল বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হওয়া যায়। ব্যাচেলর জেনারেল ডিগ্রির জন্য তিন বছরে তিনটি বিষয় অধ্যয়ন করতে হয়। সফলতার সাথে দু'বছরের কোর্স শেষে মাস্টার্স ডিগ্রি লাভ করা যায়। ব্রিটিশ মডেল অনুসারে ১৯৮০ সালে শ্রীলংকায় উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করা হয়। আটটি পলিটেকনিক্যাল ইনস্টিটিউট এবং চৌদ্দটি জুনিয়র টেকনিক্যাল ইনস্টিটিউট ইঞ্জিনিয়ারিং, কমার্স এবং বিজনেস ও ক্রাফটস্ এই তিন ধরনের কোর্স পরিকল্পনা করে। সার্টিফিকেট কোর্সগুলো দু'বছরের এবং ন্যাশনাল ডিপ্লোমা কোর্সগুলো দুই থেকে তিন বছরের। শিক্ষার কার্যক্রম বাস্তবায়নের প্রকৃত দায়িত্ব বিভিন্ন রিজিওনাল শিক্ষা বিভাগের। ২৪টি প্রশাসনিক ডিস্ট্রিক্ট এ ২৪টি ডিপার্টমেন্ট রয়েছে। প্রতিটি রিজিওনাল ডিপার্টমেন্ট এ একজন রিজিওনাল ডাইরেক্টর অব এডুকেশন (RDE) দ্বারা পরিচালিত।



উৎস: ইউনেস্কো

চিত্র: শ্রীলঙ্কার শিক্ষার কাঠামোগত বিন্যাস

তুলনামূলক শিক্ষা: একটি পর্যালোচনা

ইংল্যান্ড

অষ্টাদশ শতাব্দী পর্যন্ত সমাজ বৈষম্যই ইংল্যান্ডের শিক্ষাব্যবস্থাকে নিয়ন্ত্রণ করেছে। অভিজাত সমাজের জন্য ইংল্যান্ডে ছিল 'গ্রামার স্কুল', অক্সফোর্ড ও ক্যামব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়। দরিদ্রদের জন্য ছিল 'ডেল স্কুল', 'কমন ডে স্কুল' চার্চ পরিচালিত অবৈতনিক চ্যারিটি বিদ্যালয়। সাধারণের শিক্ষা ছিল নিম্ন পর্যায়ের এলিমেন্টারি স্কুলের মধ্যে সীমাবদ্ধ। শিক্ষাক্ষেত্রে রাষ্ট্রের পর্দাপণ ঘটে ১৮৩২ সালে শিক্ষার জন্য বার্ষিক রাষ্ট্রীয় বরাদ্দ প্রবর্তনের মধ্য দিয়ে। ১৮৭০ সালে পার্লামেন্টে পাশ হয় প্রাথমিক শিক্ষা আইন। ১৮৯১ সনে প্রাথমিক শিক্ষা অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক করা হয়। ১৮৯৪ সনে ব্রাইস কমিশন এর সুপারিশ আংশিক বাস্তবায়ন করে স্থানীয় স্বায়ত্বশাসন প্রতিষ্ঠানের শিক্ষা কমিটি LEA (Local Educational Authority) এর হাতে প্রাথমিক, মাধ্যমিক, নিম্ন কারিগরি প্রভৃতি সবারকমের শিক্ষার দায়িত্ব দেয়া হল। ১৯০২ সালের আইনের মাধ্যমে মাধ্যমিক শিক্ষাক্ষেত্রে সরকারী উদ্যোগের সূচনা হয়। এর ফলে মধ্যবিত্ত ও নিম্নমধ্যবিত্ত শ্রেণি উপকৃত হল। ১৯১৭ সনে ফিসার আইন, ১৯২৬ সালে হ্যাডো কমিটি, ১৯৩৮ সালে স্পেন্স কমিটি, ১৯৪১ সালে সিরিল নরউড কমিটি, ১৯৪২-৪৪ 'ম্যাকনেয়ার কমিটি' এবং ১৯৪২-৪৪ ফ্লেমিং কমিশন এর রিপোর্টের ফলশ্রুতিতে হলো ১৯৪৪ সনের শিক্ষা আইন। ইতিহাসে এটি বাটলার আইন বলে পরিচিত। এ আইন ইংল্যান্ডের সামগ্রিক শিক্ষার ক্ষেত্রে ব্যাপক এবং সুদূর প্রসারী পরিবর্তন এনেছে। এ জন্য এই আইনের গুরুত্ব তুলে ধরার জন্য মন্তব্য করা হয়- "The Education Act of 1944 constitutes the most important single progressive step ever taken in Education history," (Cramer J.F 1965, 212)

১৯৪৪ সনের শিক্ষা আইন এবং তৎপরে গৃহীত কয়েকটি সংযোজনী কিংবা সংশোধনী আইনের ভিত্তিতে ইংল্যান্ডের বর্তমানে শিক্ষা কাঠামো নিম্নরূপ:

২-৪ বছর পূর্ণ হওয়া পর্যন্ত - নার্সারি বিদ্যালয়/ প্রাথমিক সহকারী বিদ্যালয়ের নার্সারী শ্রেণি/ গৃহশিক্ষা

৫-৬ বছর পূর্ণ হওয়া পর্যন্ত - শিশু শিক্ষা (Infant Class)

৭-১০ উর্ধ্ব বছর পর্যন্ত : ১ম স্তর প্রাথমিক শিক্ষা

১১-১৫/১৬ পর্যন্ত : ২য় স্তর মাধ্যমিক শিক্ষা

১৬ এর উর্ধ্ব : ৩য় স্তর: অধিকতর শিক্ষা (Further Education) এবং উচ্চ শিক্ষা অর্থৎ টেকনিক্যাল কলেজ, শিক্ষক-শিক্ষণ বিশ্ববিদ্যালয় প্রভৃতি শিক্ষা।



উৎস: ড. শরিফা খাতুন, তুলনামূলক শিক্ষাতত্ত্ব, খণ্ড ২

চিত্র: ইংল্যান্ডের শিক্ষার কাঠামোগত বিন্যাস।

প্রাথমিক শিক্ষা

৫-৭ বছরের পূর্ব পর্যন্ত শিশু শিক্ষা প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা স্তরের অন্তর্ভুক্ত। প্রাথমিক স্তরের ৭-১১ বছর পর্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা জুনিয়র স্কুলগুলোতে দেওয়া হয়ে থাকে। প্রাথমিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক ও অবৈতনিক এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রে সহশিক্ষামূলক। এ স্তরের শিক্ষা অত্যন্ত সুপরিকল্পিত এবং আধুনিক শিখন শেখানো পদ্ধতি ও কলাকৌশলের উপর প্রতিষ্ঠিত।

মাধ্যমিক শিক্ষা

ইংল্যান্ডের মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলোকে প্রশাসনিক বৈশিষ্ট্য ভেদে নিম্নোক্ত তিন শ্রেণিতে বিভক্ত করা যায়:

১. কাউন্টি বা আঞ্চলিক বিদ্যালয়: LEA কর্তৃক পরিচালিত এইসব বিদ্যালয়ের দ্বার সবার জন্য উন্মুক্ত। বিদ্যালয় পরিচালনা, শিক্ষক নিয়োগ বা বরখাস্ত, উচ্চতর পদে উন্নীত করা ইত্যাদি যাবতীয় কাজ LEA করে থাকে।
২. ভলান্টারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়: এসব বিদ্যালয় LEA কর্তৃক পরিচালিত হয় না এবং এগুলো তিন ধরনের হয়ে থাকে যথা:

- ক. নিয়ন্ত্রিত বিদ্যালয় (Controlled Schools)
- খ. সাহায্য প্রাপ্ত বিদ্যালয় (Aided Schools)
- গ. বিশেষ ঐকমত্যের বিদ্যালয় (Special Agreement Schools)

LEA নিয়ন্ত্রিত বিদ্যালয়গুলোর ক্ষেত্রে মোট ব্যয়ের অর্ধেকেরও বেশি এবং সাহায্যে প্রাপ্ত বিদ্যালয়ের ক্ষেত্রে অর্ধেক দায়ভার গ্রহণ করে। এই জন্য LEA উভয় শ্রেণির বিদ্যালয়ে যথাক্রমে দুই তৃতীয়াংশ ও এক তৃতীয়াংশ পরিচালকমণ্ডলীর সদস্য নিয়োগের অধিকার রাখে। বিশেষ ঐকমত্যের বিদ্যালয়গুলো আর্থিকভাবে সম্পূর্ণ স্বাবলম্বী। তাই এগুলোর ক্ষেত্রে বাইরের হস্তক্ষেপের সুযোগ সীমিত। বিদ্যালয়ের ন্যূনতম মান বজায় রাখার স্বার্থে LEA কিছুটা প্রভাব বিস্তার করে।

৩. স্বাধীন মাধ্যমিক বিদ্যালয়: উইনচেস্টার, ইটন, শ্রুসবারি হ্যারো ইত্যাদি নয়টি পাবলিক স্কুলের জনপ্রিয়তা অপরিসীম। পারিপার্শ্বিকতার আনুকূল্যে ও আভিজাত্যের আড়ম্বরে এসব বিদ্যালয় একটি নিজস্ব ঐতিহ্য গড়ে তুলেছে। নিকোলাস হানসের মতে, "An Original English Educational Practice." অধিকাংশ স্কুলই হলো আবাসিক এবং এসব স্কুলের শিক্ষা অত্যন্ত ব্যয়বহুল। স্কুলগুলোর সুনাম অর্জনের পিছনে উন্নতমানের প্রশাসন, উপযুক্ত শিক্ষক, ভালো শিক্ষার্থী-শিক্ষক সম্পর্ক ও মেধাবী শিক্ষার্থী ভর্তি ইত্যাদি কারণ উল্লেখ করা যেতে পারে। খেলাধুলার প্রতি এসব স্কুল খুবই গুরুত্ব প্রদান করে থাকে।

প্রশাসনিক দিক ছাড়াও শিক্ষাগত (academic) দিক থেকে মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলোকে তিনটি প্রধান ভাগে ভাগ করা যায়। যথা- গ্রামার স্কুল, মডার্ন স্কুল ও টেকনিক্যাল স্কুল।

গ্রামার স্কুল

গভীর জ্ঞান অর্জন, বুদ্ধিমত্তা এবং নেতৃত্বের গুণ বিকাশে শিক্ষার্থীদের সহায়তা করাই এই স্কুলের লক্ষ্য। এসব স্কুলে ৭ বৎসর (১১-১৮ বৎসর বয়স অবধি শিক্ষাকাল। ১৬ বৎসরের পরে যে সকল শিক্ষার্থী এসব স্কুলে থাকে তারা সর্বোচ্চ "Sixth form" এ ১৬ বৎসর অতিবাহিত করে কোনো বিষয়ে বিশেষজ্ঞ হবার মানসে।

মডার্ন স্কুল

এগুলো মূলত পরীক্ষামূলক বিদ্যালয়। আধুনিক অর্থনৈতিক ও শ্রমজীবনের সংগে সংগতি রেখে এই স্কুলগুলো তাদের কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে। মিল, দোকান, ব্যবসা প্রতিষ্ঠান, যানবাহন খামার প্রভৃতির জন্য মধ্যম স্তরের শ্রমদক্ষতা উপযোগী শিক্ষামান স্কুলগুলোতে দেওয়া হয়।

তুলনামূলক শিক্ষা: একটি পর্যালোচনা

টেকনিক্যাল স্কুল

এখানে ২-৩ বৎসরব্যাপী কারিগরী শিক্ষা দেওয়া হয়। এসব স্কুলের পাঠ্যক্রম হলো বিশেষ শিল্প-নির্ভর অংক ও বিজ্ঞান। তাছাড়া ইংরেজি, ইতিহাস, ভূগোল ইত্যাদি পড়ানো হয়। সকল ছাত্রের সামর্থ্য ও অভিরুচি আরও কয়েক ধরনের স্কুল আছে।

কম্পিউটার স্কুল

ইংল্যান্ডের ন্যায় গণতান্ত্রিক সমাজ হতে বৈষম্য দূর করার লক্ষ্যে শ্রমিক দলীয় মন্ত্রীসভা ২য় বিশ্বযুদ্ধ শেষে সর্বপ্রথম এই ধরনের স্কুল প্রতিষ্ঠা করেন।

বাইল্যাটারেল স্কুল

গ্রামার, মডার্ন ও টেকনিক্যাল এই তিন ধরনের বিদ্যালয়ের যে-কোনো দুইটিকে একই বিদ্যালয়ের আওতায় আনয়নকে বাইল্যাটারেল স্কুল বলে।

মাল্টিলেটারেল স্কুল

বিভিন্ন প্রকৃতির মাধ্যমিক শিক্ষাকে একই বিদ্যালয়ের আওতায় মান আনয়নকেই মাল্টিলেটারেল স্কুল বলে।

অধিকতর শিক্ষা (Further Education) এবং উচ্চ শিক্ষা

ইংল্যান্ডের furthur education কথাটি ব্যাপক অর্থে ব্যবহার করা হয়। মাধ্যমিক যাবতীয় শিক্ষাকেই এই স্তরের পর্যায়েভুক্ত করা হয়। শিক্ষা আংশিক বা পূর্ণ সময়ের, বৃত্তিমূলক বা সাধারণ যাই হোক না কেন, এমনকি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা ও এই স্তরের অন্তর্ভুক্ত।

উপসংহার

পরিশেষে বলতে পারি, বিভিন্ন দেশের শিক্ষা-কাঠামো ও শিক্ষাপ্রশাসন ব্যবস্থাপনা পর্যালোচনা করলে নিজ দেশের শিক্ষাব্যবস্থার কাঠামো ও শিক্ষা প্রশাসন ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে বাস্তব ধারণা পাওয়া যায়। শিক্ষার মানোন্নয়ন ও অগ্রগতির নিশ্চয়তা বিধানের ক্ষেত্রে তুলনামূলক শিক্ষার বিশেষ অবদান রয়েছে। তুলনামূলক শিক্ষার মাধ্যমে অন্য দেশের শিক্ষার বৈশিষ্ট্য, কাঠামো, প্রশাসনিক ব্যবস্থা ও গুণগতমান সম্পর্কে সম্যক ধারণা লাভ করা সম্ভব। শিক্ষা-সংস্কারের বা উন্নয়নের ক্ষেত্রে অন্য দেশের শিক্ষাব্যবস্থা বিশ্লেষণ, পরীক্ষণ ও পর্যালোচনার মাধ্যমে নিজ দেশের শিক্ষাব্যবস্থা আন্তর্জাতিক মানের কোন পর্যায়ে আছে তা পরিমাপ করা যায়। তাছাড়া শিক্ষাক্ষেত্রে নতুন চিন্তাধারা ও দৃষ্টিভঙ্গি সন্নিবেশিত করে নিজ দেশের আর্থসামাজিক উন্নতি সাধন করাও সম্ভব হয়।

তথ্যসূত্র

অজয় রায়। *শিক্ষায় নবযুগ*। কলিকাতা: পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ ১৯৮৬।

উপযোক্ত দত্ত। *তুলনামূলক শিক্ষা*। কলিকাতা: এডুকেশনাল বুক করপোরেশন, ১৯৭৪

জ্যোতিপ্রসাদ বন্দোপাধ্যায়। *ভারতীয় শিক্ষার ইতিহাস ও সাম্প্রতিক সমস্যা*। কলিকাতা: শিক্ষা প্রকাশনী, ১৯৭৭।

মো তবারক উল ইসলাম। *তুলনামূলক শিক্ষা*। এম এড প্রোথাম, স্কুল অব এডুকেশন EDM-1106, বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়, ২০১৪।

The Chittagong University Journal of Arts and Humanities

- হায়ার সেকেন্ডারি এডুকেশন প্রজেক্ট। *শিক্ষার ইতিহাস ও তুলনামূলক শিক্ষা*। ঢাকা: শিক্ষা মন্ত্রণালয়, ১৯৯৪।
- হায়ার সেকেন্ডারি এডুকেশন প্রজেক্ট। *শিক্ষানীতি ও শিক্ষাব্যবস্থাপনা*। শিক্ষা মন্ত্রণালয়, ঢাকা, ১৯৯৯।
- Aggarwal, J. C. *National Policy on Education*. New Delhi: Arya Book Depot, 1979.
- Chaube, S.P. and A. Shaube. *Comparative Education*. Second Revised & Enlarged Edition, New Delhi: Vikas Publishing House Pvt. Ltd., taag 1998.
- Cramer, J. F. and Browne, G.S., *contemporary Education*. New York: Harcourt, Brace & World, Inc., 1965.
- Joshi, R.N. *Education Elsewhere & Here*. Bombay: Bharatiya Vidya Bhavan, 1979.
- Shriyastva, S.K. *Comparative Education*. New Delhi: Anmol Publications pvt. Ltd. 2005.
- Sodhi, T.S. *A Textbook of contemporary Education*. Dhaka: Associated Business Corporation, 1998.

বাংলাদেশের নাটকে অ্যাবসার্ড চেতনার প্রভাব

ফাহিমদা সুলতানা তানজী*

প্রতিপাদ্যসার

বক্ষ্যমাণ গবেষণাটি বাংলাদেশের নাটকে অ্যাবসার্ড চেতনার প্রভাবকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে। প্রচলিত অর্থে অ্যাবসার্ড শব্দটির অর্থ হচ্ছে ঐক্যহীন, অসঙ্গত, নিরবোধ, বোকা প্রভৃতি। শিল্প সাহিত্যে শব্দটি প্রথমে ফ্রান্স নিয়ে আসে। শব্দটি প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময়কার হলেও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর জ্য পল সারত (১৯০৫-১৯৮০) ও আলবেয়ার কামু (১৯১৩- ১৯৬০) ধারাটি নিয়ে গবেষণা করেছেন। উভয়েই মানুষের বিপন্ন জীবনকে দেখিয়েছেন। জীবনের কোন অর্থ নেই, উদ্দেশ্য নেই। শূন্য থেকে শুরু, শূন্যতে শেষ। জীবন কোন সমস্যার সমাধান দেয় না কিংবা, কোন উদ্দেশ্যের কথা বলে না। মানুষের এই মানসিক অবস্থাটাই অ্যাবসার্ড। বাংলাদেশের পরিপ্রেক্ষিতে এই ধারাটি নিয়ে কাজ করার প্রয়াস চালিয়েছেন সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ (১৯২২- ১৯৭১) ও সাঈদ আহমদ (১৯৩১-২০১০)। তবে নাট্যকার সাঈদের বাংলা নাট্যে ধারাটি সফলতা পায়। বক্ষ্যমাণ প্রবন্ধে তাঁদের নাটকের সহায়তা নিয়ে মূল সত্যকে উন্মোচনের প্রয়াস চালানো হবে। আর এক্ষেত্রে জানা উপাত্তকে ব্যবহার ও জ্ঞাত জ্ঞানকে প্রয়োগ করে অনাবিক্ত সত্যকে উন্মোচন করার প্রয়াস চালানো হবে।

ভূমিকা

অ্যাবসার্ড শব্দটি ল্যাটিন *absurdus* থেকে উৎপত্তি হয়েছে। যার ব্যবচ্ছেদ করলে দাঁড়ায় ঐক্যহীন, অসঙ্গতিপূর্ণ, রূপকভাবে, অসঙ্গত, অনুভূতিহীন, নিরবোধ, বোকা। ফ্রান্স শিল্প সাহিত্যে অ্যাবসার্ড ধারণাটি নিয়ে বাক্যের অসঙ্গতি আসে। শব্দটিকে ব্যবচ্ছেদ করলে দাঁড়ায় হাস্যকর, অযৌক্তিক, পৌনঃপুনিক, অসঙ্গতিপূর্ণ প্রভৃতি। এতে মানব জীবনের যৌক্তিক অনুপাত বা সম্পর্কের সুবিন্যস্ত রূপ থাকে না। শব্দটির অন্তর্নিহিত দর্শন প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তী সময়ে ইউরোপে ব্যবহার হওয়া শুরু হলেও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তী সময়ে ফ্রান্সের নোবেল বিজয়ী অস্তিত্ববাদী দার্শনিক জ্য পল সার্ত (১৯০৫-১৯৮০) ও আলবেয়ার কামু (১৯১৩-১৯৬০) এর রচনায় এটি

*সহকারী অধ্যাপক, নাট্যকলা বিভাগ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়

প্রস্তুতি হয়। উভয়ে তাদের রচনায় দেখিয়েছেন নির্বাকব বৈরী পরিবেশে বিচ্ছিন্ন, বিপন্ন জীবন। এই জীবনের কোন অর্থ, উদ্দেশ্য নেই। শূণ্য থেকে শুরু, শূন্যতে শেষ। প্রায়োগিক দিক থেকে অ্যাবসার্ড শব্দটিকে ব্যবচ্ছেদ করলে দাঁড়ায় সুনির্দিষ্ট প্লট, চরিত্রায়নের অভাব; আদি-মধ্য- অন্তের অনির্দিষ্ট রূপ; অব্যক্ত থিম; অপ্রাসঙ্গিকতা; পৌনঃপুনিকতা; হাস্যকর; সংলাপের অদ্ভুত, উদ্ভট পরিস্থিতির উপস্থিতি। আর তাই তো বলা হয়ে থাকে life is absurd (westphal, J. & Cherry, C. 1990, 199), অন্যান্য অস্তিত্ববাদীদের মতই থমাস নাগেল (১৯৩৭) একথা বিশ্বাস করেন। অ্যাবসার্ড পরিস্থিতিকে নাগেল ব্যাখ্যা করেছেন বাস্তবতা ও আকাঙ্ক্ষার মধ্যে অসঙ্গতি হিসেবে। ডেনমার্কের দার্শনিক সোরেন ক্যিরেকোর্গার্ড (১৮১৩- ১৮৫৫) এবং আলবেরার কামু এর অ্যাবসার্ড ধারণা প্রায় এক, যদিও কামু তাঁর *The Myth of Sisyphus* (1942) এ দার্শনিক আত্মহত্যা নামক অধ্যায়টিতে ক্যিরেকোর্গার্ড এর অ্যাবসার্ড ধারণার বিরুদ্ধে বলেছেন। আদতে অ্যাবসার্ড ধারণাটি জীবনের অর্থ কিংবা উদ্দেশ্যের কথা বলে না অথবা সমস্যার কোনো সমাধান দেয় না। It is true that they start from a shared perception of the forlornness of the human situation (Berthold, D. 2013, 137)। প্রতিটি মানুষ জীবনের যাত্রাপথে বাকের মুখে দাঁড়িয়ে থাকে। তারা প্রত্যেকে সময়ের অংশ এবং প্রত্যেকের মানসিক অবস্থা এতটা ভীতিকর থাকে যে সবচেয়ে দুর্বলতম শত্রুটিকে চিনতে তাদের কষ্ট হয় না। তারা অনাগতের জন্য হন্যে হয়ে অপেক্ষা করতে থাকে, যাতে আতঙ্কগুলোকে বেড়ে ফেলে দিতে পারে। মানুষের এই মানসিক অবস্থাটাই হচ্ছে অ্যাবসার্ড। পঞ্চাশ থেকে ষাটের দশকের মধ্যে ইউরোপীয় এবং আমেরিকান অস্তিত্ববাদী প্রবক্তাগণ আলবেরার কামু এর *The Myth of Sisyphus* এ বর্ণিত অ্যাবসার্ড বিষয়ক ধারণার সাথে একমত পোষণ করেন। ফ্রান্সের আলফ্রেড জারি (১৮৭৩-১৯০৭) *Ubu roi* নাটকটির মাধ্যমে অ্যাবসার্ড এর জগতে অগ্রদূত হিসেবে পা রাখেন। নাট্যসাহিত্যে হাঙ্গেরির বংশোদ্ভূত ব্রিটিশ প্রযোজক, নাট্যকার, সাংবাদিক, অনুবাদক, ক্রিটিক ও নাটকের অধ্যাপক মারটিন এসলিন (১৯১৮-২০০২) পাঠকের সাথে ধারাটির পরিচয় ঘটান তাঁর *The theatre of the Absurd* গ্রন্থটির মাধ্যমে। তৎকালীন সময়ের মধ্যে এ ধারণাটি সাহিত্যের সাথে সাথে নাটকের সাথেও মিশে যায়। ইউরোপে যারা এ ধারাটি নিয়ে কাজ করেছেন, তাদের মাঝে পর্তুগালের ফ্রান্স কাফকা (১৮৮৩-১৯২৪) এর মেটামরফসিস (১৯১৫), ট্রায়াল (১৯২৫)। আমেরিকান নাট্যকার এডওয়ার্ড আলবি (১৯২৮-২০১৬) এর *The Zoo Story* (1958), *Who's Afraid of Virginia Woolf?* (1962), *Three Tall Women* (1994); আইরিশ ঔপন্যাসিক, নাট্যকার, ছোটগল্পের রচয়িতা, নাট্যনির্দেশক, কবি, অনুবাদক স্যামুয়েল বেকেট (১৯০৬-১৯৮৯) এর *Waiting for Godot* (1948-1949), *Endgame* (1955-1957), *Happy days* (1961) প্রভৃতি; রোমানিয়ান-ফ্রান্সের নাট্যকার ইউজিন আয়নেস্কো (১৯০৯-১৯৯৪) এর *The Lesson* (1951), *Salutations* (1950), *The Chairs* (1952), *The Leader* (1953) প্রভৃতি; ব্রিটিশ নাট্যকার, নির্দেশক, অভিনেতা হ্যারল্ড পিন্টার (১৯৩০-২০০৮) এর *No Man's Land* (1975), *Betrayal* (1978), *The Birthday Party* (1957), *The Room* (1957) এর কাজ উল্লেখযোগ্য। পরবর্তীতে পাশ্চাত্যের মতো, বাংলা নাট্যসাহিত্যেও এর প্রভাব পড়তে থাকে। বাঙালি নাট্যকারগণের মাঝে মূলত সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ (১৯২২-১৯৭১), বাদল সরকার (১৯২৫-২০১১) এবং সাঈদ আহমদ (১৯৩১-২০১০) অ্যাবসার্ড ধারণাটি নিয়ে কাজ করেছেন। বাংলাদেশের নাট্যকারগণ কীরূপে পাশ্চাত্যের এই ধারাটিকে স্থায়ী নাটকের সাথে একীভূত করেছেন এবং এর প্রভাব কীরূপ তা বর্তমান প্রবন্ধে অনুসন্ধান চালানো হবে।

অধ্যয়ন পদ্ধতি

বক্ষ্যমাণ গবেষণাটিকে সুনির্দিষ্টভাবে উপস্থাপনের লক্ষ্যে সুনির্দিষ্ট পদ্ধতি অনুসরণের প্রয়াস চালানো হয়েছে। মূলত: সত্যকে অনুসন্ধান করা বক্ষ্যমাণ গবেষণার উদ্দেশ্য। প্রবন্ধে জানা উপাত্তকে ব্যবহার এবং জ্ঞাত জ্ঞানকে প্রয়োগ করে অনাবিকৃত তথ্য ও সত্যকে তুলে ধরা হবে। এক্ষেত্রে নির্ভুল তথ্যের সমাহার, বস্তুনিষ্ঠ জ্ঞানের সম্মিলন এবং নিরপেক্ষ ও সূক্ষ্মতর বিশ্লেষণ গবেষণাকে গ্রহণযোগ্য করে তোলে (সামাদী, স., সাইফুজ্জামান, গ. ম., & হাসান, ম. ম. ২০১৭, ১৫)। বক্ষ্যমাণ গবেষণাটি বাংলাদেশের নাটকে অ্যাবসার্ড চেতনার প্রভাবকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে। অর্থাৎ গবেষণাটি সম্পূর্ণ টেক্সট নির্ভর।

Dramatic text has the strange fate of being claimed by two fields of art and it is ascribed a variety of functions, possibilities and ways of existence according to type of arguments (and sometimes good will to solve problems not incidental to the field itself (Prochazka, M. (n. d.).

বক্ষ্যমাণ প্রবন্ধের কেন্দ্রে যে দু'জন নাট্যকার আছেন (সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ, সাঈদ আহমদ) তারা দু'জনই অত্যন্ত প্রতিভাধর। স্বীয় লেখনীসূত্রে তাদের নাটকগুলো হয়েছে অনন্য। তাই বাংলা ভাষায় তাদের নাটক নিয়ে গবেষণা হওয়া জরুরি। অতীতেও তাদের নিয়ে বহু গবেষণা হয়েছে। সেই সকল গবেষণার সূত্র ধরে নতুন সত্যকে উন্মোচন করা বক্ষ্যমাণ প্রবন্ধকারের উদ্দেশ্য। এর পরিপ্রেক্ষিতে অ্যাবসার্ড চেতনার সূচনা থেকে শুরু করে কিরূপে বাংলাদেশের নাটকে প্রভাব বিস্তার করেছে তুলনামূলক (comparative) উপায়ে বিশ্লেষণ করার প্রয়াস চালানো হয়েছে। গবেষণার কাজে সুস্পষ্ট অগ্রগতির জন্য বাংলাদেশের দুজন খ্যাতনামা নাট্যকারের নাটকের সহায়তা নিয়ে প্রমাণ করা হয়েছে, এদেশের নাটক কোন অংশেই বিশ্বখ্যাত নাটকের মানদণ্ডের তুলনায় হীন নয়, বরং এদেশীয় এ ধারাটি অত্যন্ত সমৃদ্ধ, নিজ রসে, স্বীয় সাহিত্যের রীতিতে। অর্থাৎ ইউরোপীয় প্রভাব থাকলেও এদেশীয় নাট্যকারগণ জাতিগত রুচিকে ভুলে যাননি আবার মানদণ্ডের বিষয়েও লক্ষ্য রেখেছেন বিশেষভাবে। তাই ভিন্নরীতির প্রভাব থাকলেও এদেশীয় নাটক হয়েছে স্বীয় আলোয় আলোকিত।

অ্যাবসার্ডিজম

Absurd is that which has no purpose, or goal, or objective. (Esslin. M. 1960, 4)। আক্ষরিকভাবে Absurd শব্দটিকে ব্যবচ্ছেদ করলে দাঁড়ায় অর্থহীনতা, উদ্ভট, অসঙ্গতিপূর্ণ, হাস্যকর, অদ্ভুত প্রভৃতি। পৃথিবীতে মানুষ সবকিছুর অর্থ বের করার চেষ্টা করে, আদতে ফলাফল হয় শূন্য। মানুষ পৃথিবীতে সমাজবদ্ধভাবে বসবাস করে, যেখানে কার্যকর যোগাযোগ ঘটানো সম্ভব হয় না। মার্টিন এসলিন (১৯১৮-২০০২) এ বিষয়ে নেলসন (১৯০৬-১৯৯৮) এর উদ্ধৃতি থেকে এভাবে বলেছেন,

Absurd is a kind of drama that presents a view of the absurdity of the human condition by the abandoning of usual or rational devices and by the use of nonrealistic from... Conceived in perplexity and spiritual anguish, the theatre of the absurd portrays not a series of connected incidents telling a story but a

pattern of images presenting people and bewildered beings in an incomprehensible universe (Ullah, Iqbal and Rahman, A., 2016, 48).

১৯১৬ নাগাদ ডাডাইজমের সময় একদল শরণার্থী শিল্পী যখন সুইজারল্যান্ডে একত্রিত হয়েছিলেন তখন অ্যাবসার্ডিজমের শৈল্পিক দিক উন্মোচন হয়েছিল। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময়কালীন ডাডাইজম ছিল অপ্রতিরোধ্য সমাজের শিল্পীদের সচেতনতার ফসল। যা বিশ শতকের অযৌক্তিক অভিজ্ঞতাকে ন্যায্যতা দিতে চেয়েছিল এবং এই যৌক্তিক ন্যায্যতাকে তারা ব্যবহার করেছিল। In fact, they reflected the absurdity of rational principles and ideals of society, and highlighted artistic expression with independence of rational control (exir and Anushiravani, 2020, 136), অন্যদিকে Theatre of the absurd and existentialism share common themes' (exir and Anushiravani, 2020, 137)। Dorczak এর মতে, অস্তিত্ববাদ অ্যাবসার্ডিজমের রাজ্যে সবচেয়ে উর্বর দর্শন হিসেবে আবির্ভূত হয়েছিল। she adds that absurdism, relying on philosophical sources, was welcomed in the domain of the theatre in the----- (exir and Anushiravani, 2020, p.137)। Absurd শব্দটিকে নাট্যসাহিত্যের সাথে সর্বপ্রথম পরিচয় করালেন মার্টিন এসলিন (১৯১৮-২০০২) তাঁর *theatre of the absurd* (1961) বইয়ের মাধ্যমে। Esslin এর মতে, the Theatre of the Absurd merely communicates on poet's most intimate and personal intuition of the human situation, his own sense of being, his individual vision of the world.

(<https://sites.udel.edu>britlitwiki>) বইটিতে এসলিন দার্শনিক আলবেয়ার কামু এর *The myth of sisyphus* (1942) দ্বারা অ্যাবসার্ড কে ব্যাখ্যা করেছেন। অ্যাবসার্ড তত্ত্বটিকে এরপর বিভিন্ন তাত্ত্বিক বিভিন্নভাবে ব্যাখ্যা করেছেন। আইনস্কে এর মতে, cut off from his religious, metaphysical, and transcendental roots, man is lost, all his actions become senseless, absurd, useless (exir and Anushiravani, 2020, 137)। কামু মনে করে মানব মন সহজাতভাবেই সুখ ও প্রজ্ঞার অনুসন্ধান করতে থাকে। মহাবিশ্বে মানুষ হঠাৎ নিজেকে অবাঞ্ছিত ও অসামঞ্জস্য বলে মনে করে। নিজেকে তার অপরিচিত বলে বোধ হয়। কোনোরকম প্রতিকার ছাড়াই সে নিজেকে নির্বাসনে দিয়ে দেয়। এই মানুষ ও তার জীবনের মধ্যকার যে অনুভূতির উদ্বেগ ঘটে, সেখানেই অ্যাবসার্ডিজমের জন্ম।

উপরিউক্ত আলোচনা থেকে এভাবে বলা যায়, অ্যাবসার্ড অবস্থায় মানুষ বোধহীন হয়ে যায়, নিজেকে হারিয়ে ফেলে এবং বিচ্ছিন্ন করে ফেলার প্রবণতা থাকে। এখানে চূড়ান্ত কোন সমাধান পাওয়া যায় না এবং শেষাবধি নিজেকে ধ্বংসের দিকে নিয়ে যায়। অ্যাবসার্ডিজমে মৃত্যুকে সবচেয়ে প্রতিক্ষীত বিষয় বলে মনে করা হয়। এটি (মৃত্যু) অবশ্যই যে কোন মানুষের জীবনে একটা গুরুত্বপূর্ণ অংশ। তাই এই দিনটির জন্য মানুষ প্রতীক্ষা করে এবং কীভাবে দিনটি উদযাপিত হবে তা নিয়ে একধরনের পরিকল্পনা করে থাকে। এখন প্রশ্ন আসে, মৃত্যুর ভয়াবহতার কথা জেনেও একে সাদরে অভ্যর্থনা দিয়ে গৃহে প্রবেশ করিয়ে দিনটি উদযাপনের কারণ বিষয়ে। এর একধরনের উত্তর হতে পারে এভাবে, কিছু মানুষ জীবন থেকে পালিয়ে যেতে চায়। অ্যাবসার্ডিজম হচ্ছে মানুষের জীবনের হতাশা, যেখানে মানুষ বাধ্য হয় প্রতিকার খুঁজতে। এই পথে সে মৃত্যুকে আফিমের ন্যায় নিজের দিকে টানতে থাকে। কারণ মৃত্যুই এই হতাশাজনক অবস্থা থেকে তাকে রক্ষা করতে পারে। বাংলাদেশের পরিপ্রেক্ষিতে অ্যাবসার্ড শব্দটি শূন্যতা, অর্থহীনতা, উদ্ভট প্রভৃতি শব্দের সমার্থবোধক শব্দরূপে পরিচিত হয়েছে। তবে দেশ, কাল, জাতি, রুচি প্রভৃতির কারণে এই ধারাটি খুব একটা জনপ্রিয় হয়ে উঠতে পারেনি। পৃথিবীতে

৫.৭ মিলিয়ন হোমো সেপিয়েন্স-এর মাঝে এক পঞ্চমাংশ হচ্ছে দক্ষিণ এশিয়ার অধিবাসী। বাংলাদেশের অধিবাসীগণ দক্ষিণ এশিয়ার অন্তর্গত। বৃটিশ শাসনের বহুশত বছর পূর্ব থেকেই এদেশের জনগণ ঔপনিবেশিক শাসনে শোষিত হয়ে আসছিল। এতকিছুর মাঝে থেমে থাকেনি বাঙালির সংস্কৃতি চর্চা। পালাগান, কবিগান প্রভৃতির মাঝে টিকে ছিল এদেশীয় জনগণের বিনোদন। বাংলাদেশ পৃথিবীর বৃহত্তম ব-দ্বীপ হওয়াতে এদেশকে বারবার প্রাকৃতিক দুর্যোগের সম্মুখীন হতে হয়েছিল। কিন্তু আশাবাদী মানুষের মাঝে শূন্যতা, অর্থহীনতা অতোটা দানা বাঁধতে পারেনি, যতোটা পেরেছিল বন্যা, সাইক্লোনের মত প্রাকৃতিক দুর্যোগের ভীতি। তারপরও বাঙালি আশাহীন নয়। শত দুঃখের মাঝে সে রচনা করেছে মিলনের অপূর্ব গাথা। এরমধ্যে কিছুটা ব্যতিক্রমধর্মী প্রয়াস যাদের মাঝে লক্ষ্য করা যায়, এবং যারা বাংলাদেশে অ্যাবসার্ড তত্ত্বটিকে কেন্দ্র করে সাহিত্য রচনা করেছেন, তাদের মাঝে অন্যতম সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ (১৯২২-১৯৭১) ও সাঈদ আহমদ (১৯৩১-২০১০)। বক্ষ্যমাণ প্রবন্ধে তাদের নাটকগুলো বিশ্লেষণ করে বাংলাদেশের নাটকে অ্যাবসার্ড চেতনার প্রভাব নিরীক্ষণ করা হয়েছে।

সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ এবং তাঁর নাটকে অ্যাবসার্ডিটি

সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ বাংলা নাট্যসাহিত্যের এক উজ্জ্বল নক্ষত্র। তিনি সমকালীন চেতনাকে সাহিত্যে ধারণ করতে পেরেছিলেন। ফলে তিনি সাহিত্য নির্মিতির মধ্যদিয়ে যুগোত্তর হয়েছেন। তাঁর রচনামূল্যের অনন্যতার কদর পাঠকসমাজ বুঝে ওঠার আগেই তিনি জীবন মরণের সীমানা ছাড়িয়ে গেছেন। সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ মাত্র চারটি নাটক রচনা করেছেন। এগুলো হলো- *বহিপীর*, *উজানে মৃত্যু*, *তরঙ্গভঙ্গ*, *সুড়ঙ্গ*। এছাড়াও তিনি উপন্যাস, কবিতা, গল্প, প্রবন্ধ প্রভৃতি রচনা করেছেন। শিল্পভাবনার বলয় থেকে তিনি নাট্যরচনার অনুসন্ধানে ব্যাপ্ত ছিলেন। বক্ষ্যমাণ প্রবন্ধের অনুসন্ধান যেহেতু বাংলাদেশের নাটকে অ্যাবসার্ড চেতনার প্রভাব আর এই অনুসন্ধানের সূত্রসমূহ ওয়ালীউল্লাহের *উজানে মৃত্যু* নাটকে পাওয়া যায়, সেহেতু *উজানে মৃত্যু* নাটকটি প্রথমে বিশ্লেষণ করার প্রয়াস চালানো হবে। নাটকটি পাঠান্তে যে বিষয়টি দৃষ্টিগোচর হয় সেটি হলো এতে ইউরোপীয়রীতির প্রয়োগ এবং এটি নাট্যকারের লেখনীর মোহন বৈচিত্র্যে হয়ে উঠেছে বাংলাসাহিত্যের এক নবদিক। নাটকটিতে তিনি দেখিয়েছেন, শূন্যতার মাঝে নৌকাবাহক এবং সাদা পোশাকধারী ও কালো পোশাকধারীর সত্যসংক্রান্ত প্যারাডাইম। যা পাঠককে ক্ষুদ্র থেকে বৃহত্তর বলয়ে নিয়ে গেছে। ফলে নাট্যকার নাটক রচনায় নিজস্ব রীতি সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছেন।

হোমারের ওডিসিতে উল্লেখ করা হয়েছে যে, করিছে রাজা ইয়োলাসের পুত্র সিসিফাস নরকে এক বিশাল প্রস্তরখণ্ড পাহাড়ের ওপরে নেয়ার জন্য আদিষ্ট হয়। রক্ত, ঘামে সে যতোবার পাথরটি ওপরে তোলে ততোবারই নিচে পড়ে যায়। চলতে থাকে সিসিফাসের ব্যর্থ প্রয়াস। আলবেয়ার কামু তাঁর *The Myth of Sisyphus* গ্রন্থে অ্যাবসার্ড নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে বইয়ের নামের শিরোনামে একটি অধ্যায় রচনা করেন। সেখানে তিনি দেখিয়েছেন হোমারের এই সিসিফাসের একই কাজ বারবার করার কারণ। ওয়ালীউল্লাহের *উজানে মৃত্যু* নাটকেও নৌকাবাহকের দিকে দৃষ্টিপাত করলে দেখা যায় সে নাটকের শুরু থেকে শেষাবধি কখনো নিরলসভাবে আবার কখনোওবা ক্লাস্ত ভঙ্গিতে নৌকা টেনে নিয়ে যাচ্ছে। এতেই যেন তার মুক্তি। হঠাৎ উদ্ভূত

বালিহাঁস তার দৃষ্টিগোচর হয়। ক্লান্ত দেহে বালিহাঁসকে তার মনে হয় সোনালী বালু। এ যেন হঠাৎ মৃত্যুকে দেখতে পাওয়ার সামিল। এখান থেকেই নাটকটির যাত্রা। সূর্য মাথার ওপর ওঠা থেকে শুরু করে সন্ধ্যার আগের সময়ের মধ্যে অনন্য কুশলতায় বিক্ষিপ্ত কিছু ঘটনার সমন্বয়ে নাটকটির প্লট সাজানো হয়েছে, যা সাধারণের চোখে মনে হতে পারে অর্থহীন বিক্ষিপ্ত কিছু ঘটনা। অ্যাবসার্ড শব্দটি বিশ্লেষণে প্রবন্ধের প্রারম্ভে এই অর্থহীনতার কথাই বলা হয়েছে। সুস্পষ্ট কোনো গল্পের সূত্র নাটকটিতে পাওয়া যাবে না। কিন্তু নৌকাবাক সামনে এগিয়ে চলছে who has to search for the meaning (Ullah Irfan, Iqbal Liaqat & Rehman 2016)। জীবনের খরশোতা নদী যেখানে তুঙ্গতরঙ্গে ছুটে চলছে, সেখানে মৃত্যুর আগমনী বার্তা মৃদঙ্গের মৃদু শব্দে নিষ্পন্দ করে তোলার প্রয়াস চালিয়ে থাকে। অ্যাবসার্ডিটিতে মৃত্যু একটা অতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। যাকে আলিঙ্গন করতে চায় মানুষ।

ভ্লাডিমির: ...এবার কি করবো আমরা?

এস্ট্রাগন: অপেক্ষা করবো।

ভ্লাডিমির: হ্যাঁ, কিন্তু অপেক্ষা করে থাকার সময়টুকুতে।

গলায় ফাঁস দিলে কেমন হয়?... এসো, এক্ষুণি ফাঁস লাগিয়ে বুলে পড়ি। (বেকেট, স., ২০০৬, পৃ. ৩৩)

কারণ চলার পথের প্রশ্নগুলোর যথার্থ উত্তর না পেয়ে সে শূন্যতায় নিমজ্জিত হয়ে হতাশায় জর্জরিত হতে থাকে। নৌকাবাহক ও সাদাপোশাকধারীর সম্বন্ধহীন কথায় জানা যায়, সূর্য মধ্য আকাশে। তাই নৌকাবাহকের বিশ্রাম জরুরি। কিন্তু তার হাতে বিশেষ সময় নেই। সাদা পোশাকধারীর বিপরীতে কালো মেঘের ঘনঘটার ন্যায় আবির্ভাব ঘটে কালো পোশাকধারীর। সাদার বিপরীতে কিছু কথাপুচ্ছ দাঁড় করায় কালো পোশাকধারী। নৌকাবাহকের চলনের সাথে বিষছন্দ ঘণ্টা বাজাতে থাকে সে। এমতাবস্থায়, জীবনের ধ্রুব সত্যকে বাতিল করে দিয়ে, এমনকি অস্তিত্বের বিষয়টিও বাতিল করে মৃত্যুর মধ্যদিয়ে বাস্তবতা থেকে রেহাই পাওয়ার বিষয়টি নৌকাবাহকের জন্য গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠার যুক্তিসংগত ব্যাখ্যা প্রয়োজন। একটু একটু করে জমা প্রতিদিনের ধূসরতা নৌকাবাহককে টেনে নিয়ে চলে। তার সময়কে বহন করে নিয়ে যেতে হচ্ছে। সে বেঁচে ছিলো ভবিষ্যতের ওপর ভর করে। নদীর ওপারে সে পৌঁছাবে এমন ভাবনাকে সে আঁকড়ে ধরে আছে। এই ভাবনাটি বিস্ময়কর, কারণ তার যাত্রাপথে মৃত্যু জড়িয়ে আছে। সে সময়ের সাথে নিজেকে জুড়ে নেয়, সময়ের মাঝখানে নিজেকে স্থাপন করে। সে মেনে নেয় যে, তার যাত্রাপথের শেষাবধি পৌঁছানোর সময় একটা বাঁকের মুখে দাঁড়িয়ে রয়েছে। সে হয়ে পড়েছে সময়ের অংশ। আতঙ্কিত হয়ে পড়ে সে। কারণ সে তার দুর্বলতম শত্রুকে চিহ্নিত করতে সক্ষম হয়েছে। নদীর বিপরীত তীরের জন্য ব্যাকুল আত্মহে অপেক্ষা করছে সে, যাতে মনের আতঙ্কগুলো ঝেড়ে ফেলতে পারে। কিন্তু সে a conspicuous discrepancy between pretention or aspiration and reality লক্ষ্য করে (Velleman, J. D. 2013, 89)। যেখানে অস্বাভাবিকতা বিরাজ করছে, সেখানে সে লক্ষ্য করে যে, পৃথিবীটা স্থূল। মানুষের ওপর অ্যাবসার্ড ততোটাই নির্ভরশীল যতোটা নির্ভরশীল সে পৃথিবীর ওপর। এই বিশেষ সময়টাতে তারা এক সূতায় গাঁথা থাকে। মন যখন তার গণ্ডিকে পেরিয়ে যায় তখন অবশ্যই স্বীয় বিচার বুদ্ধি প্রয়োগ করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হয়। এটাই তার মৃত্যুকে বরণ করে নেওয়ার ক্ষেত্র। পূর্বের অভিজ্ঞতাগুলো তার মনে পড়লেও সে কিছুই বর্জন করতে পারে না। পূর্বের অভিজ্ঞতার প্রভাব সে বুঝতে গিয়ে যুক্তিহীনতার মাঝে পড়ে যায়। নৌকাবাহক পরিণত হয় একজন ব্যর্থ শ্রমিক হিসেবে। তার সমস্ত শ্রম, কেন্দ্রহীন গতিময়তা পথের সাথে জড়িয়ে যায়, ধেয়ে আসে মৃত্যু। এভাবে সর্বদিক বিবেচনা করলে দেখা যায়, জীবনের হতাশা এবং

স্থবিরক্রিয়ার বিপরীতে নৌকাবাহক বাধ্য হয়েছিলো প্রতিকার খুঁজতে এবং মৃত্যুর দিকে আকর্ষিত হয়েছিলো যথার্থ প্রশ্নের উত্তর না পেয়ে। এখানে নাট্যকার এক ধরনের শূন্যতার সৃষ্টি করেছেন। সবশেষে সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহের বিষয়ে বলা যায়, তিনি উজানে মৃত্যু নাটকে দেখিয়েছেন গৃহহীন, শ্রীহীন, অর্থহীন, একাকিত্বকে। বস্তুত তিনি ছিলেন theist existentialist। নৌকাবাহকের যাত্রা তীব্র যন্ত্রণা দিয়ে শুরু ও শেষ হলেও নাটকের শেষাংশে একধরনের আশাবাদ লক্ষ্য করা যায়। সাদা পোশাকধারী অনবরত তাকে ডেকে যায় সামনে যাওয়ার জন্য। এখানেই আশারবাণী।

সাইদ আহমদ ও তাঁর নাটকে অ্যাবসার্ডিটি

বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী সাইদ আহমদ (১৯৩১-২০৩১) সাংস্কৃতিক অঙ্গনের এক অনন্য ব্যক্তিত্ব। সংস্কৃতির বিভিন্ন শাখায় তাঁর বিচরণ ছিলো। কোনোটি পর্যবেক্ষণ করেছেন বিশ্লেষণের নিবিষ্টতায় আবার কোনোটিতে বিচরণ করেছেন সৃষ্টির আনন্দে। প্রবন্ধে বর্তমান অংশের আলোচ্য বিষয় তাঁর নাটকের অ্যাবসার্ড চেতনার প্রভাব। নাট্যকার সাইদ সর্বমোট পাঁচটি নাটক রচনা করেছেন। এগুলো হলো - কালবেলা, মাইলপোস্ট, তৃষ্ণায়, একদিন প্রতিদিন, শেষ নবাব। পাশ্চাত্য ধারায় প্রভাবিত তাঁর লেখনীর মাঝে কালবেলা ও মাইলপোস্ট নাটক দুটোর মাঝে অ্যাবসার্ড চেতনার প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। আর্থার অ্যাডামস, স্যামুয়েল বেকেক্ট, জ্য জেনে, ইউজিন আইনস্কো, এ্যাডওয়ার্ড এ্যালবি, জাঁ তারদু প্রমুখ ছিলেন অ্যাবসার্ড নাটকের পথিকৃৎ। পাশ্চাত্য ভাবনা দ্বারা প্রভাবিত নাট্যকার সাইদ আহমদ দেশীয় নাটকে পাশ্চাত্যের রীতির সংমিশ্রণ অত্যন্ত সূক্ষ্মভাবে সম্পন্ন করেছেন। বিষয় উপস্থাপনার অভিনবত্বে সাইদ আহমদ ছিলেন ব্যতিক্রমী। বিষয়বস্তুতে গতানুগতিকতার লক্ষণ সাইদ আহমদের নেই।

কেউ কেউ বলতে পারেন তিনি স্যামুয়েল বেকেক্ট, আয়েনস্কো প্রমুখ বিশ্ববরেণ্য নাট্যকারের কাছ থেকে অনেক কিছু গ্রহণ করেছেন। কিন্তু আমি বলি, গ্রহীতা যদি হন প্রতিভাবান তাহলে সেই ঋণ সুদাসলে খাটিয়ে তিনি নিজে লাভবান তো হনই উপরন্তু যে ব্যবসায়ে তিনি নিয়োজিত তাকেও জ্বলজ্বলে করে তোলেন' (আহমদ, স. ১৩৯৫, ১০)।

তাঁর নাটকে মানুষের পাশাপাশি চরিত্র হিসেবে এসেছে বন্যা, মাইলপোস্ট, তুফান, প্রাণী প্রভৃতি। তার ইংরেজি ভাষায় লেখা NOT I নাটকের মাধ্যমে তিনি অ্যাবসার্ডের সুর কণ্ঠে ধারণ করেন। নাট্যকার সাইদ আহমদ কালবেলা নাটকটি ১৯৬২ সালে বাংলাদেশের নাট্যসাহিত্যে এক বিপ্লব এনে দিয়েছিলো। ১৯৬১ সালে চট্টগ্রাম অঞ্চলে প্রচণ্ড ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাস সংঘটিত হয়। এতে প্রচুর ক্ষয়ক্ষতি সাধিত হয়। বহু মানুষ মারাও যায়। কালবেলার প্রেক্ষাপট সেই ভয়াবহ প্রাকৃতিক দুর্যোগের ভয়াবহতাকে কেন্দ্র করে। কালবেলা নাটকে প্রচলিত নাট্যকাঠামো অনুসারে আদি, মধ্য ও অন্ত নেই। ঘূর্ণিঝড়ের জন্য দ্বীপবাসীর প্রতীক্ষা। নাটকটিতে দেখানো হয়েছে। Waiting is a process for them- a process of becoming through which they seem to realize that they exist. (sharma, A., 1993, 278)। একসময় ঝড় আসে ও সবকিছু ভাসিয়ে নিয়ে যায়। নাটকের

পাত্র-পাত্রী দুবে থাকে ভবিষ্যতের অনিশ্চয়তায়, অন্তহীন প্রতিক্ষায়। ১৯৬১ সালে রচিত এই নাটকে স্পষ্টতই নৈরাশ্য ও পরাজয় প্রতিফলিত হয়। নাটকটির উনেন চরিত্রটির মাঝে বেকের ওয়েটিং ফর গোডো নাটকের বালক চরিত্রটির প্রতিফলন লক্ষ্য করা যায়। যে পুরোহিতের বার্তা নিয়ে আসে। যে বার্তার জন্য অধির অপেক্ষায় বসে আছে মোড়ল ও আহাম্মদ। নাটকটির পুরোহিতকে Godot এর সাথে তুলনা করলে দেখা যাবে, বেকেরের নাটকে গোডো আসে না, তার জন্য অপেক্ষা করে ভাদিমির ও এস্টাগন। কিন্তু কালবেলা-য় পুরোহিত উপেং আসে। তার কাছ থেকেই মূলত ঘূর্ণিঝড়ের বার্তা আসে। আর এই ঘূর্ণিঝড়ও কোনো না কোনো পরাক্রমশালীর সৃষ্টি। যে নিজে না আসলেও ঝড়ের মাধ্যমে জানান দিয়ে গেছেন তার অস্তিত্বের কথা। এদিক থেকে দার্শনিক বিচারে নাট্যকার সাঈদকে বিচার করলে তাঁকে অস্তিত্ববাদী বলতে হবে। সাঈদের কালবেলা নাটকের চরিত্রদের মুক্তি ঘটে না। প্রথম অঙ্কে মেয়েটি (নিবেদিতা) রহস্যময় বার্তা দেয় সবাইকে। মেয়েটি হঠাৎ বলে ওঠে, আসছে, ঐ যে আসছে। ঐ যে আসছে। আমি তোমাদের বলবো। ভবিষ্যতের কথা বলবো। সব বলবো। মানবতার ভবিষ্যতের কথা। (সম্পা- হ. আ., হাই. ২০১২, ১৫)। দ্বিতীয় অঙ্কে ঘূর্ণিঝড় সবাইকে নিশ্চিহ্ন করে নিয়ে যায়। নিবেদিতা হাসে আবার কাঁদে। সে বর্তমানের আধারে ভবিষ্যতের বাণী বহন করে। আবার সে বলে, কে ডাকে আমায়... আমি আসব... আর কক্ষনো দেরি করব না আমি... ওরা সবাই এমন কাহিনি বলে যে তোমার কণ্ঠ ডুবে যায় ওতে। ... কক্ষনো দেরি করব না আমি ... এখনই রথ ছেড়ে দিবো না, না, ... না ... দিয়ো না ...। (সম্পা-হ., আ., হাই, ২০১২, ২৩)। রহস্যময় ও অলঙ্ঘনীয় প্রাকৃতিক শক্তিমত্তার কাছে মানবতার পরাজয়ের রূপায়ন নাট্যকার সাঈদ একেছেন চর আলেকজান্ডার-এ (২০২২, জানুয়ারী ২৯) ঘটে যাওয়া এক সাইক্লোনের মাধ্যমে, যার সাথে নিত্য পরিচয় আছে বাংলাদেশের মানুষের। নাটকটির মাঝে দেখা যায় অস্তিত্ববাচক ধারণার প্রভাব। নাট্যকার তাঁর চরিত্রগুলোর অস্তিত্বের মাঝে হতাশা, নিরাশা, শূন্যতাকে স্পষ্টরূপে একেছেন। যদি নাটকটির নাম সম্বন্ধে প্রশ্ন উত্থাপন করা হয়, দেখা যাবে নাটকটির নামের মাঝে আছে বিষাদের সুরছন্দ। কালবেলায় নাট্যকার কোন কাল কিংবা কোন বেলার কথা বলছেন তা কেউ নিশ্চিত নয়। যে বেলায় দ্বীপের অধিবাসীরা অপেক্ষা করে আছে তার অর্থ উদ্দেশ্য নাটকটিতে ব্যক্ত হয়েছে, আদতে যা অর্থহীন বলে বোধ হয়। নাটকটির কাল শব্দটি যদি আলাদাভাবে বিশেষায়িত করা হয়। তবে দেখা যাবে, বেলা শব্দটি গাণিতিক দৃষ্টিতে তিনটি। অর্থাৎ এটি বিজোড় সংখ্যা। এই বেলা যিনি সৃষ্টি করেছেন তিনিও বিজোড় এবং একা। দ্বীপের সবাই সম্মিলিতভাবে অপেক্ষা করে থাকলেও তাদের মাঝে অদ্ভুতভাব, বন্ধ্যাতা, একাকিত্ব লক্ষ্য করা যায়। যা সমগ্র দ্বীপের পরিবেশকে আশাহত অবস্থানের দিকে টেনে নিয়ে গেছে। দ্বীপ সমগ্র ভূখণ্ড থেকে বিচ্ছিন্ন অবস্থায় থাকে, সেখানকার মানুষজন সমগ্র দেশ থেকে স্বাভাবিকভাবেই বিচ্ছিন্ন। এমতাবস্থায় ঝড়ের আগমনী বার্তায় তাদের অপেক্ষা করা ছাড়া আর কোন উপায় নেই।

এখানেই নাটকটিতে শূন্যতা, বিষাদের ছায়া সৃষ্টি হয়েছে, সেখানে মৃত্যুই হতে পারে কাঙ্ক্ষিত, সবচেয়ে গুরুত্ববহ বিষয়। তবু দ্বীপবাসী বেঁচে থাকার নির্মল বাণী শুনতে চায় নিবেদিতার কাছ থেকে। কিন্তু সে গুনগুন করে গান করা ছাড়া আর কিছুই করে না। প্রত্যেকে ভবিষ্যতের বাণী শোনার আগ্রহে এক সময়ে নিস্তব্ধ হয়ে যায়। শুকনো পাতা বাতাসে ভেসে বেড়ায়। কারো কিছুই করার থাকে না। ঢুলী বলে, আমার কাজ বুঝি এবার সাজ হলো। আর ... ঘোষণা করার নেই কিছু। (সম্পা-হ., আ., হাই, ২০১২, ৩১)। এক সময় সব লীন হয়ে যায়। নাটকটির মূল বিষয় অপেক্ষা। চরিত্রগুলো সাহায্য পাওয়ার আশায় শেষাবধি অপেক্ষা করতে থাকে, যদিও অপেক্ষার পর তারা মৃত্যুকেই পায়। নিরন্তর অপেক্ষা চরিত্রগুলোকে হতাশ করে ফেললেও শেষাবধি আশা থাকে

বঁচে থাকার। সেখানে ব্যর্থ হয়ে নেমে আসে হতাশা, তারপর নীরবতা। অপেক্ষাতে শুরু অপেক্ষাতেই শেষ নাটকটির। অর্থাৎ নাটকটির গঠন বৃত্তাকার যা পূর্ণ অ্যাবসার্ডরীতির নাটককে সমর্থন করে।

১৯৬৫ সালে বাস্তব ও থিয়েটার উভয়ক্ষেত্রেই যখন শ্রেণিশোষণের বিরুদ্ধে যেকোন প্রতিরোধের রূপায়ন থেকে বিচ্ছিন্নতায় ভুগছে, ঠিক সেই সময়ে সাঈদ আহমদের মাইলপোস্ট নাটকটি বাংলা একাডেমিতে মঞ্চস্থ হয়। সৈয়দ জামিল আহমদের মতে, সাঈদ মার্ক্সবাদী বয়ান পরিহার করে বাচনের এমন এক নকশাকে তার নাটকের ভেতরে বুনেছেন যা বেকেটিয় ধমনী থেকে আসা এক অ্যাবসার্ড ভিশন বা রূপকল্প (মৈশান, শ. ২০১৩)। বাংলা একাডেমি থেকে ১৯৭৯ সালে মাইলপোস্ট নাটকটি ইংরেজিতে প্রকাশিত হয়। নাটকটির মূল বক্তব্য হচ্ছে, জনগণ যদিওবা তাদের জীবন উৎসর্গ করার জন্য প্রস্তুত থাকে তবু এতে স্যালভেশন বা পরিদ্রাণ পাওয়া সম্ভব কি-না এরকম সংশয়ে ভোগে নাটকটি। মাইপোস্টের রচনাকাল ১৯৬২-১৯৬৪। নাটকে দুর্ভিক্ষের সময়ে কয়েকটি চরিত্রের সংলাপের এবং ন্যূনতম ঘটনার ভিত্তিতে দুর্ভিক্ষের কারণ চিত্র আঁকা হয়েছে। সেইসাথে দার্শনিক মাত্রা হিসেবে দুর্ভিক্ষকে মানুষের আত্মার পতন হিসেবে দেখানো হয়েছে। দুর্ভিক্ষ যে শুধু নিরন্তর হাহাকার নয়, মানবাত্মার সঙ্কটের তীব্র আত্ননাদও (সম্পা - হ., আ., হাই, ২০১২, ৩৬)। আদতে শিল্পের নিগূঢ় লক্ষ্য হলো বাস্তব কী তার অবধারণ। অ্যাবসার্ডবাদীরা বাস্তবকে যা ভাবতেন সেই বিষয়ে ডেমোক্রিটাসের একটা উক্তি বেকেট উদ্ধৃত করে যা বলতেন তার অর্থ করলে দাঁড়ায় সবচেয়ে বেশি বাস্তবতা পাওয়া যায় না শব্দটিকে। ফলে প্রথমে না শব্দটির মাধ্যমে অবধারণের এই পদ্ধতিটি মহাজগতের বাস্তবকে পাঠের এক বিশেষ পদ্ধতি। আলোচ্য মাইলপোস্ট একটি একাক্ষিকা, যা তিনটি দৃশ্যে বিভাজিত। রাজপথের শূন্যতার মাঝে একজন বয়স্ক চৌকিদার একটি মাইলপোস্ট নিয়ে ঢোকে। সূর্যাস্তের আগে গোধূলির আলোর বন্যায় দর্শককে পেছন করে সে প্রবেশ করে। যুক্তিরহিত পরিস্থিতির দিকে দর্শককে সে আমন্ত্রণ জানায়। চৌকিদার বলে, মনে হচ্ছে সবকিছুই ঠিকঠাক আছে, কোথাও কোন কিছুই ব্যতিক্রম নেই। বাঁশিতে ফুঁ দিই, একটা সুর বেরিয়ে আসে। মাইলপোস্টে আঘাত করি, তার শব্দ এসে কানে লাগে (সম্পা-হ. আ. হাই, ২০১২, ৩২)। প্রয়োজন ও পৃথিবীর অযৌক্তিক নৈঃশব্দের সংঘাতে অ্যাবসার্ডের উদ্ভব। মানুষ তার জীবনের প্রয়োজন মাফিক পরিপূর্ণতা খোঁজে। উপরিউক্ত সংলাপকে আবার যদি আলবেয়ার কামুদৃষ্টিভঙ্গি থেকে বিশ্লেষণ করা যায় তাহলে দেখা যাবে, জগৎটা মানুষের বোধগম্যতাকে প্রতিহত করে বলেই এটিকে চেনা সংলাপ থেকে ভিন্ন বলে মনে হচ্ছে। এই চেনা ও অচেনার দ্বন্দের ভেতর দিয়ে নাট্যকার সাঈদের মাইলপোস্ট নাটকটি যে অ্যাবসার্ডরীতির তা প্রাথমিক অবস্থায় দর্শককে তা স্মরণ করিয়ে দেয়। আলবেয়ার কামু এর মতে, সত্যি যদি কোনো অ্যাবসার্ড থাকে, তবে তা আছে মানুষের ব্যক্তিগত জগতে (কামু, আ., ২০১৮)। আবার জগতের কাছে মানুষের প্রত্যাশা এবং মানুষের প্রতি জগতের নিস্পৃহতা এই সম্বন্ধসূত্রেও অ্যাবসার্ডরীতির জন্ম হওয়া অস্বাভাবিক নয়। রাজপথের চৌকিদার যেন মানুষের গন্তব্যের বিষয়ে সন্ধিসংসার প্রতীকী প্রশ্ন ছুঁছেন, যা প্রাত্যহিক কিন্তু একধরনের সংগীতকুশলতা বিশিষ্ট, সংলাপের অর্থ তাৎপর্যে দার্শনিকতার ছাপ লক্ষ্য করা যায়। যদি কোনো স্থানে কখনো কেউ না আসে কিংবা সেই স্থানে থেকে কখনো কেউ না যায়- তবে এই মধ্যবর্তী জায়গা অনুধাবনের উপায় সম্বন্ধে প্রশ্ন জাগে। আদতে এই

পরিস্থিতি মানব দশার জন্য হাস্যকর ও অযৌক্তিক। আলবেয়ার কামু এর বক্তব্যের প্রতিধ্বনি করে চৌকিদার বলতে থাকে, হ্যা আমরা দু'জনই অজানার অন্ধকারে ডুবে রইলাম, তুমি কবর খুঁড়ে লাশ শুইয়ে দাও, আমি রাজপথে পাহারা দিই আর মাইলপোস্ট নাড়াচাড়া করি। আমরা কেউ কাউকে চিনি না। অনন্তকাল ধরে আমরা অর্থহীন। এ-ই আমাদের সবচেয়ে বড় মিল। আমরা মূর্খ (সম্পা-হ., আ., হাই, ২০১২, ৩৬)। আলবেয়ার কামু জগতের নৈশব্দকে সমর্থন করেছেন। তাঁর মনে হয়েছে জগৎটাকে প্রাঞ্জলতা ও পরিচয়তার মধ্যে নিয়ে আসা মানুষের ঐকান্তিক প্রয়াস আদতে জগৎটাকে মানুষের মাপে নামিয়ে আনার সামিল। বরং এরচেয়ে জগৎকে ইন্দ্র দিয়ে অনুভব করা শ্রেয়। যেহেতু আমরা পৃথিবীর মধ্যে স্থিতবস্ত্র ছুঁয়ে দেখতে পারি; মাটি, জল, বায়ু অনুভব করতে পারি সেহেতু পৃথিবীর অস্তিত্ব আছে। আদতে মানুষের এইটুকুই জ্ঞান, বাকি সব নির্মাণ। ব্যক্তির অস্তিত্ব ও বস্ত্র জগতের বাইরের জ্ঞান মানুষের আয়ত্বে থাকে না। এখান থেকেই *নিহিলিজমের* সূত্রপাত। যদিও আলবেয়ার কামু এক্ষেত্রে নিহিলিজমকে স্বীকার করেননি তবু তিনি এখান থেকে দেকার্তের systematic doubt এর সাথে নিজের ধারণার সাযুজ্য লক্ষ্য করেছেন। মাইলপোস্ট নাটকটিতে নাট্যকার সাঈদ সংশয়কে অবলম্বন করে পথ খুঁজেছেন। এক অলঙ্ঘনীয় নিয়তির ছকে বাঁধা জীবনের অর্থহীনতা উন্মোচিত হয় নাটকটিতে। নাটকের ক্রীড়ক হলো দুর্ভিক্ষ। দুর্ভিক্ষের ক্রীড়ক হলো মানুষ। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধভোর সামাজিক, সাংস্কৃতিক, মনস্তাত্ত্বিক শর্তাবলি এমন অ্যাবসার্ড ভাবধারার প্রকাশকে স্ফূর্তি দিয়েছে, তেমনি বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে দুর্ভিক্ষ ও খাদ্যাভাবের সামাজিক ইতিহাসের যাত্রাটিকে অ্যাবসার্ড ভাবধারার সাথে মিশিয়েছেন। চৌকিদারের সংলাপ থেকে জানা যায়, দুর্ভিক্ষ ঘাসের কচি শিষি পর্যন্ত খেয়ে নিঃশেষ করেছে। গায়ের চামড়া টানটান হয়ে ঢোলের মতো হয়ে গিয়েছে। ফোসকা পড়া গরমে সব পুড়ে দগদগে ঘায়ের জন্ম দিয়েছে। এ অবস্থার মধ্যে মানুষ আর মানুষ থাকতে পারেনা (সম্পা-হ., আ., হাই, ২০১২, ৩৮)। নাটকটিতে প্রথমদিকে নঞর্থকতার উন্মোচনকে আরো তীব্র করতে সাইকেল চালিয়ে ডাকপিয়নের আবির্ভাব ঘটে। এখানে চৌকিদার সত্তাতাত্ত্বিক ontological প্রশ্নটি করে -তুমি কে (সম্পা-হ., আ., হাই, ২০১২, ৩৭)। উদ্ভট মানব দশায় পতিত মানুষের এই প্রশ্নটিও অবান্তর। এমতাবস্থায় কামু সত্য ও মূল্যবোধকে আঁকড়ে ধরে নিষ্ঠুর গণিতকে এড়িয়ে যাবার কথা বলেছেন। পরিচয়ের গোলকধাঁধায় পড়ে গোরখোদক যেন আলবেয়ার কামু কে সমর্থন করে বলেন, কী আশ্চর্য প্রশ্ন! পোশাক দেখে বুঝতে পারছো না ও একজন ডাকপিয়ন (সম্পা-হ., আ., হাই, ২০১২, ৩৭)। কিয়ের্কেগার্ড অ্যাবসার্ডকে ভিত্তি করে অন্য একটা জগতের মানদণ্ড খুঁজে নেন।, তার কাছে ঈশ্বর ছাড়া সবই শূন্য ও উদ্বেগের বিষয়। পক্ষান্তরে আলবেয়ার কামু এই উদ্বেগকে গোপন করে মানুষের আধ্যাত্মিকতার অবস্থার কথা বলেছেন। আমরা সবাই মৌলিক, আমাদের স্থান অপূরণীয় (সম্পা-হ., আ., হাই, ২০১২, ৩৭)। একসময় তারা প্রত্যেককে আবিষ্কার করে তারা কেউ মৌলিক নয়। নাটকটির শেষদৃশ্যে আরও তিনটি চরিত্রের আবির্ভাব ঘটে। মা ঠেলাগাড়িতে বসা ও সাথে তার বড় ও ছোট ছেলে। এরা দুর্ভিক্ষের তাড়া খাওয়া মানুষ। মায়ের কাছ থেকে মরা মানুষের গল্পের বদলে জীবিত মানুষের গল্প বলার প্রত্যয় শোনা যায়। যারা এখনও মৃত্যুর স্বাদ কিংবা সুযোগ পায়নি। নাটকটির দ্বিতীয় দৃশ্যে মাইলপোস্ট কিছুটা সরে গেছে, তার সাথে যুক্ত হয়েছে সাইকেল। এভাবেই নাট্যকার সাঈদ তাঁর *মাইলপোস্ট* নাটকটিতে নিয়তির শাসনকে মানবদশার জরাজীর্ণ অবস্থার সাথে মিশিয়ে বেকেটিয় অ্যাবসার্ড রূপকল্প থেকে সরে এসেছেন। অ্যাবসার্ডের পূর্ণতার চেয়ে তার কাছে মূল্য ছিলো নাটকের স্থানীয়করণ। নাটককে প্রাথমিকভাবে বেকেটিয় ধমনী আসা অ্যাবসার্ড ভীষণ বলা যেতে পারে। তবে সমগ্র নাটকটি একধরনের সংশয়ে ভোগে। সৈয়দ জামিল আহমদ (১৯৫৫) এই নাটকটিকে ১৯৬৯ সালের পটভূমিতে একান্তই ভুল রূপায়ণ বলেছেন। পাকিস্তান

জন্মের পর সর্বস্তরের মানুষ ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের মাধ্যমে আইয়ুব শাহীর (মৈশান, শ. ২০১৩) পতন ঘটিয়েছিল। ফলে নাটক ও বাস্তবতার রসায়নের প্রেক্ষাপটে মাইলপোস্ট নাটকটিতে দেখা যায় ১৯৬৯ এর গণঅভ্যুত্থানের বাস্তবতা ও এর ফলাফলের নিরিখ সত্য নয়। বরং দেখা যায়, জীবনের বিনিময়ে রাজনৈতিক পরিত্রাণ আসে (মৈশান, শ. ২০১৩)। এক্ষেত্রে নাট্যকার সাঈদের মাইলপোস্ট নাটকের নাটকীয়তা বিষয়ক প্রশ্ন আসে। যেকোনো সৃষ্টির বড় লক্ষণ হলো সময়ের নিরিখে এর নিহিত প্যারাদক্স। কারণ শিল্প একইসাথে আজকের এবং আজকের নয়। বৈশ্বিক এত সহিংসতার পরও মানুষের বেঁচে থাকার মর্মার্থ বিষয়ক প্রশ্ন আসে। বক্ষ্যমাণ গবেষণায় নাটকে আলোচ্য পরিত্রাণের বিষয়টি তদন্তযোগ্য বিষয়। নাটকটিতে দুর্ভিক্ষের করুণচিত্র আঁকা হয়েছে। হাসনাত আবদুল হাই বলেছেন, এটি অ্যাবসার্ড নাটক নয় যদিও সংলাপে কখনো কখনো আভাস পাওয়া যায়। একে বলা যায়, আধুনিক মনস্তাত্ত্বিক নাটক (মৈশান, শ. ২০১৩)। আবার নাট্যজন আতাউর রহমান বলেছেন, সাঈদ আহমদের নাটকের বিষয়বস্তু আন্তর্জাতিক বা বিশ্বজনীন কিছু নয়। তার নাটক বাংলাদেশের নিত্যসহচর তুফান, বন্যা ইত্যাদিকে নিয়েই। তবে তার উপস্থাপনা পদ্ধতি এবং বিষয়বস্তু থেকে নিয়ে নাটকীয় চরিত্রসমূহের ট্রিটমেন্ট ইত্যাদি সব ট্র্যাডিশনাল অর্থে প্রাচ্যের বা বাংলাদেশের নয় (মৈশান, শ. ২০১৩)। সৈয়দ জামিল আহমদ প্রাচ্যরীতির নাটকের গঠন বিষয়ে বলেছেন:

The action of all text (independent or cycle) are structured on a principle which begins with the birth of desire and ends with fulfilment but the journey from the beginning to the end passes through a series of three successive staged a number of times. These three stages may be termed as (i) Effort, (ii) Possibility of Attainment and (iii) Suppression of Success (Ahmed, S.J., 2000, 339).

১৯৯৩ সালের ২০ এপ্রিল সপ্তাহিক পত্রিকায় এই শতকের নাটক নামক প্রবন্ধে সাঈদ আহমদের ওয়ালীউল্লাহ সম্পর্কিত একটি বয়ান হলো, আধুনিক শিল্পচেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে তিনি সম্পূর্ণ নতুন কায়দায় এই ধরনের নিরীক্ষামূলী নাটক লিখতে শুরু করলেন (মৈশান, শ. ২০১৩)। তাঁর উজানে মৃত্যু নাটকের বাচনভঙ্গির সক্রিয়তা, চিন্তার জটিলতা, জীবনবোধের অসংলগ্নতা দর্শককে অন্য দ্রাঘিমায় অবতারণা করায়, যা নাট্যকার সাঈদ সবচেয়ে গুরুত্ব দিয়েছেন। আবার ২০০৫ সালে *The New Age* পত্রিকা মারফত জানা যায়, ড. মারফি আইনেক্সকে বলেছিলেন, অ্যাবসার্ড নাটকের আধুনিক আঙ্গিকের রচনায় সে (সাঈদ) বাংলার মেটাফর নিয়ে কাজ করে (মৈশান, শ. ২০১৩)। নাট্যকার সাঈদ নাট্যকার ওয়ালীউল্লাহ এর অনুসারী হলেও ওয়ালীউল্লাহ স্বীয় নাটকে অস্তিত্ববাদী চেতনার সংযোজন ঘটিয়েছিলেন, যা উজানে মৃত্যু নাটকটি বিশ্লেষণে বক্ষ্যমাণ প্রবন্ধে প্রমাণ হয়েছে। অন্যদিকে সাঈদ আহমদের *কালবেলা*র নায়ক সাইক্লোন আর মাইলপোস্টের নায়ক দুর্ভিক্ষ। একথা সত্য বাস্তব অবস্থার প্রতিবাদ স্বরূপ নাটক রচনা করেছিলেন। In absurdity, no meaning exists in this universe for man, but it is man himself who has to search for meaning (Ullah, I., Iqbal, L. & Rahman, A., 2016, 48)। যেহেতু অস্তিত্ববাদের সাথে অ্যাবসার্ডের কিছু সাদৃশ্য আছে সেহেতু এসলিন স্পষ্ট করে বলেছেন anti-

realistic post-war drama (Ullah, I., Iqbal, L. & Rahman, A. 2016, 48)। অর্থাৎ যেখানে মানবদশার অর্থহীনতার অর্থ অন্বেষণ করা হয়। এসলিন একে হাস্যকরও বলেছেন। আবার *Camus The myth of Sisyphus* অ্যাবসার্ড দশাকে বিশ্বাস ভেঙ্গে চুরমার হয়ে যাওয়া এক পৃথিবীর মানব পরিস্থিতি যাচাই করতে ব্যবহার করেছেন। মানুষ ও জীবনের মধ্যকার বিচ্ছেদের মাধ্যমে মানবদশায় অ্যাবসার্ড পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়। এসলিন মনে করেন, অ্যাবসার্ড কেবল যুক্তিরহিত বিশ্বাসের দিকে টানে না, বরং মানুষ যে পৃথিবীতে বেঁচে আছে, সেই পৃথিবীর বাস্তবতাকে সম্যকভাবে বুঝতে সাহায্য করে। কিন্তু বাস্তবতার প্রকৃত স্বভাব তর্কমূলক দার্শনিক ভাষা ও যুক্তি দিয়ে ব্যাখ্যা করা সম্ভব নয়। এদিক থেকে বলা যায়, মাইলপোস্ট নাটকের শেষাংশে নাট্যকার বেকেটিয় ধর্মনী থেকে সরে এসেছেন। অ্যাবসার্ড শৈলীর চেয়ে তাঁর কাছে নাটকের স্থানীয়করণ বেশি গুরুত্বপূর্ণ ছিল। তাঁর চরিত্রগুলো নির্দিষ্টতার শর্ত উপেক্ষা করে সোনালী ইতিহাসের আশাবাদ ব্যক্ত করে। অন্যদিকে কালবেলায় উপেক্ষা পুরোহিত যেন Godot! কালবেলায় চরিত্রগুলোর মুক্তি ঘটে না, তবে বিলয় ঘটে। তৎকালীন পাকিস্তানের শাসন - দমন যেন সাইক্লোন হয়ে চর আলেকজান্ডারে ধেয়ে এসেছিল। নাট্যকার সাঈদ ছিলেন theist existentialist। তাইতো তার উপেক্ষা এসেছিল। নাটকটি মানব অস্তিত্বের সমস্যা ও দ্বন্দ্ব পরিপূর্ণ। অপেক্ষাতে শুরু, অপেক্ষাতে শেষ। একধরনের বৃত্তাকার কাঠামো নাটকটিতে বিরাজ করে যা অ্যাবসার্ডরীতির পরিপূরক। সর্বদিক বিবেচনায়, নাট্যকার সাঈদ আহমদ *কালবেলা* নাটকটিতে দেশীয় মেটাফর গ্রহণ করলেও বেকেটিয় ধর্মনী থেকে সরে আসেননি। অতএব, বক্ষ্যমাণ প্রবন্ধটিতে গবেষক সামগ্রিক তত্ত্ব ও তথ্যের বিশ্লেষণে আশা যায় যে, বাংলা নাট্যসাহিত্যে নাট্যকার সাঈদের *কালবেলা* নাটকটি শেষাবধি অ্যাবসার্ডরীতির শর্তসমূহ পালন করেছে। যদিও তাতে মিশে আছে এদেশীয় স্রাণ। আলোচ্য প্রবন্ধে সৈয়দ জামিল আহমদের বাংলা নাটক রীতি ও গঠন সংক্রান্ত বয়ানকে মেনে নিলে *কালবেলা* ছাড়া আর কোন নাটক অ্যাবসার্ডরীতিকে সমর্থন করে না।

বাংলাদেশের নাটকে অ্যাবসার্ড চেতনার প্রভাব

বাংলাদেশ তো বটে, পৃথিবীর যেকোন দেশের প্রেক্ষাপটে প্রতিদিনের ধূসরতা মানুষকে টেনে নিয়ে চলে। মানুষ বাঁচে ভবিষ্যতের ওপর ভর করে। আগামীকাল, পরে, যখন তুমি পথ খুঁজে পাবে, যখন অনেকটা বয়স হবে- প্রভৃতি শব্দের ওপর ভিত্তি করে আমাদের ভাবনা বয়ে চলে। কিন্তু এই কথাগুলো বিস্ময়কর। কারণ এর সাথে মৃত্যু জড়িয়ে আছে। মানুষ একটা সময় যাত্রাপথের শেষ পর্যন্ত পৌঁছানোর কালে বাঁকে মুখে দাঁড়িয়ে থাকে। সে হয়ে পড়ে সময়ের অংশ। অনাগতের জন্য ব্যাকুলভাবে অপেক্ষা করে সে। যাতে সে আতঙ্কগুলো ঝেড়ে ফেলে দিতে পারে। আবার একধাপ নিচে নেমে সে বুঝতে পারে পৃথিবীটা স্থল। ক্ষণিকের জন্য সে হয়ে বোধ শক্তিরহিত। সে সময় মানুষ কৌশল প্রয়োগের ক্ষমতা হারিয়ে ফেলে। সে বুঝতে পারে পৃথিবীটা তার থেকে অনেক দূরে সরে গেছে। তখন পূর্বকার স্মৃতি মনে পড়ে। তখন সেটা করেছিলাম/তাকে খুব মনে পড়ে প্রভৃতি কথা। নিবিড়তা ও অস্বাভাবিকতার মাঝেই অ্যাবসার্ডের জন্ম। অথবা অনুভূতটাকে এভাবে ব্যাখ্যা করা যায়- সুবোধ্যতার জন্য মানুষের আদিম আকাঙ্ক্ষার সাথে পারস্পরিক সংঘাত। মানুষের ওপর অ্যাবসার্ড এতোটাই নির্ভরশীল, যতোটা নির্ভরশীল পৃথিবীর ওপর (কামু, আ., ২০১৮, ৪৫)। তারা একই সূতায় গাঁথা। প্রাজ্ঞতা, প্রত্যাখ্যান ও হালকা রসিকতার মধ্যদিয়ে এর প্রকাশ। একটা সময় মানুষের মনে হয়, পৃথিবীটা যুক্তিহীনতায় ভরা। মন তখন নিজের গণ্ডি পেরিয়ে যায়, সিদ্ধান্ত নেয়। তৈরি হয় আত্মহত্যার ক্ষেত্র। অন্তত এভাবেই মন তার প্রতিক্রিয়া জানায়। এখানেই বর্তমান করোনাকালের বাংলাদেশের প্রশ্ন-কেন মানুষ পৃথিবী ছেড়ে চলে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য হচ্ছে। আত্মহত্যা মূলত মনের বিদ্রোহটাকে অনুসরণ করে। বিবিএস ২০২১ সালের প্রথম ১০

মাসে দেশের মোট মৃত্যুর কিছু কারণ অনুসন্ধান করে ১০ মাসে যখন করোনা ভাইরাসের সংক্রমণে ৫ হাজার ২০০ মানুষের মৃত্যু হয়েছে, তখন ১১ হাজারের বেশি মানুষ আত্মহত্যা করেছে (বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো)। সম্প্রতি মনে রাখতে হবে, মনের যে বিদ্রোহ তার যৌক্তিক পরিণতি আত্মহত্যা নয়। আত্মহত্যা নিজের চূড়ান্ত স্বীকৃতি। মৃত্যুর মধ্যদিয়ে সে আপ্যায়ন করে অ্যাবসার্ডকে। যেহেতু নাটক জীবন থেকে নেওয়া ঘটনার সাজানো বিন্যাস তাই বাংলাদেশের বর্তমান প্রেক্ষাপট অ্যাবসার্ড চেতনাটি নিয়ে কাজ করার যথেষ্ট সুযোগ ও সম্ভাবনা রয়েছে। সম্প্রতি বাংলাদেশের প্রথিতযশা নির্দেশকেরাও সময়ের চাহিদা মেটাতে অ্যাবসার্ড ধারাটি নিয়ে কাজ করেছেন। গত ২১-২৬ মার্চ ২০২২-এ ১৫ তম কেন্দ্রীয় বার্ষিক নাট্যোৎসব ২০২১ এ ড. ইসরাফিল শাহীনের নির্দেশনায় (অনুবাদ- আসাদুল ইসলাম) মঞ্চায়িত হয়েছে ওয়েটিং ফর গডো। চট্টগ্রামের খ্যাতনামা নাট্য নির্দেশক অসীম দাস একই নাটক নির্দেশনা দিয়েছেন ১২ নভেম্বর, ২০২১। পৃথিবীতে মানুষ ক্ষমতাহীন ও বিদ্রোহী। তবে বর্তমান সময়ের মানুষ ইডিপাসের মতো কেবল নিয়তির অনুগামী নয়। যেহেতু সুখ আর অ্যাবসার্ড একই পৃথিবীর দুই সন্তান (কামু, আ., ২০১৮, ১২৯)। অ্যাবসার্ড অনুভূতিতে মানুষ যখন তার কষ্টের কথা ভাবে তখন তার উপাস্য দেবতার যাতায়াতকে সে স্তব্ধ করে দেয়। মানুষ যখন নিজেই সব ক্ষমতার আধার হয়ে যায়, ঈশ্বর সেখানে মৃত। সূক্ষ্মতম মুহূর্তে মানুষ জীবনের পেছনে ফিরে তাকাই। কেন্দ্রহীন গতিময়তায় সে তার পূর্বের স্মৃতি মনে করে, যা তার মৃত্যুর মধ্যে চাপা পড়ে যায়। সিসিফাস যেমন তার পাথরটি নিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে, বর্তমান সময়ের প্রায় প্রতিটি মানুষই তাই করছে। সিসিফাস আমাদের শেখায় আনুগত্য, কাজের প্রতি বিশ্বস্ততা। পৃথিবীটা নিষ্ফল ও নিরর্থক নয়। সিসিফাসের কর্মকাণ্ডকে ব্যর্থতার প্রতীক না ধরে ধনাত্মকরূপে অন্তরে ধারণা করলে নিজেকে সুখী মানুষ হিসেবে গণ্য করাটা কষ্টসাধ্য কাজ হবে না। আর এ কাজটি এদেশীয় নাটকের প্লট গঠনের উপাদান হিসেবে গ্রহণ করলে হতাশায় নিমজ্জিত বর্তমান বাংলাদেশে মিলবে আলোর সুস্পষ্ট রূপরেখা।

উপসংহার

দেশীয় উপাদান ভিত্তিক নাটকে ইউরোপীয় চেতনা যে কতটা সমৃদ্ধ হতে পারে তার প্রমাণ সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ ও সাঈদ আহমদের নাটক পাঠান্তে অনুধাবন করা যায়। যেখানে সৃষ্টিশীলতা বিদ্যমান, সেখানে নতুন শৈলীর উদ্ভাবন অবাস্তব নয়। বর্তমানে সমগ্র বিশ্বে যে আশাহীনতা, ধূসরতা, নিশ্চয়তার একচ্ছত্র আধিপত্য চলছে, তা অতীতে ছিল না তা নয়। অতীত সেজেছিল অতীতের রূপে। বর্তমানে অতীতের লেখনীসূত্র ধরে বর্তমানকে যাচাই করার সুযোগ রয়েছে। বক্ষ্যমাণ দুই নাট্যকারের আলোচ্য নাট্যদ্রব্য পাঠান্তে। হয়তো সেখান থেকে তারা নব দিগন্তের পথ দেখিয়েছেন, আবার হয়তো তারা একই ঘটনার কেন্দ্রে ঘুরপাক খেয়েছেন, কোনো সিদ্ধান্ত না নিতে পেরে। নাটকগুলোর থিম আজও সমসাময়িক। বাংলাদেশের নাটকে চেতনার প্রভাবকে বক্ষ্যমাণ প্রবন্ধকার অত্যন্ত যুক্তিযুক্ত মনে করছে। অনেক মহৎ কাজের অতীত অভিজ্ঞতা আমাদের জাতিগত ইতিহাসে আছে। শেষাবধি মহাশূন্য পরিক্রমায় আমরা একা। অথবা তারা আছে আমাদের সাথে, যারা শেষাবধি ধ্বংসের মাঝে পায়, এগিয়ে যাবার মানসিক শক্তি। আর তা রসিক বাঙালি শিখেছে নাট্যকার ওয়ালীউল্লাহ ও সাঈদ আহমদের

হাত ধরে। হয়তো তাঁরা আশায় বুক বেঁধে মূল সুর থেকে সরে এসেছেন কিছুটা, তবু বর্তমান বিবেচনায় বাংলাদেশের নাটকে এ্যাবসার্ড চেতনার প্রভাব অনস্বীকার্য।

তথ্যসূত্র

আহমদ, স.। শেষ নবাব (প্রথম প্রকাশ)। ঢাকা: মুক্তধারা, ১৩৯৫।

কামু, আ.। দ্য মিথ অব সিসিফাস (উ. বর্মা, Trans) (প্রথম সংস্করণ, বৈশাখ ১৪২৫) এবং মুশায়েরা, ঢাকা: ২০১৮।

বেকেট, স.। স্যামুয়েল বেকেটের পনেরোটি নাটক (ক. চৌধুরী এণ্ড শ. কবির, Trans)। (প্রথম সংস্করণ)। বিদ্যা প্রকাশন, ঢাকা: ২০০৬। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো। Retrieved May 29, 2022, from <http://www.bbs.gov.bd>

মৈশান, শ. (n.d.) সাঈদ আহমদের নাটকে নিরীক্ষা: এ্যাবসার্ড রূপকল্প, বাংলার মেটাফর উদারনৈতিক মানবতাবাদ ও জাতীয়তাবাদের অশ্বয় www.theatrewala.com. Retrieved May 11, 2022.

সামাদী, স., সাইফুজ্জামান, গ.ম., এণ্ড হাসান, ম.ম.। সাহিত্য গবেষণা বিষয় ও কৌশল (৩য় সংস্করণ)। ঢাকা: সাহিত্য ভবন, ২০১৭।

হাই, আ.। সাঈদ আহমদ রচনাবলি, (1st ed.)। ঢাকা: বাংলা একাডেমি, ২০১২।

Ahmed, S. J. *Acinpacki Infinity*. (1sted). Dhaka: The Dhaka University Press, 2000.

Berthold, D. *Kierkegaard and Camus: either/or?* *International Journal for Philosophy of Religion*, 2013. 73(2), <http://www.jstor.org/stable/24709214>.

Esslin, M. *The Theatre of the Absurd*. *The Tulane Drama Review*. 4(4), 1960.

<http://doi.org/10.2307/1124873> Prochazka, M. (n.d.), *On the Nature of Dramatic Text*, <https://slovoasmysl.ff.cuni.cz>. Retrieved May 27, 2022. (২০২২, জানুয়ারি ২৯)। চর আলেকজান্ডার ইউনিয়ন, রামগতি। bpy.m.wikipedia.org. Retrieved May 27, 2022.

Sharma, A. “WAITING FOR GODOT”: *A Beckettian Counterfoil to Kierkegaardian Existentialism*. *Samuel* 1993. *Beckett Today/ Aujourd, hui*, 2 <http://www.jstor.org/stable/25781175>

Ullah, I., Iqbal, L., & Rahman, A. *A study of Absurdity in Samuel Beckett's play Waiting for Godot and Albert Camus Novel The Outsider*. *Global Language*. 2016. Review (GLR), 1(2016). Doi- 10.31703/gir.2016 (1-1). 04.

Velleman, J.D. *Life Absurd?: Don't Be Ridiculous*. In *Foundations for Moral relativism*(1st ed.) , Open Book publishers. 2013. <http://doi.org/10.2307/j.ctt.svjtsm>

Wesrphal, J., & Cherry, C. *Is Life Absurd?* *Philosophy*. 1990. 65(252). <http://www.jstor.org/stable/3759388>

ভারতীয় দর্শনে কর্মের ধারণা

রীতা রানী ধর*

প্রতিপাদ্যসার

ভারতীয় দর্শন বলতে ভারতবর্ষের সমগ্র তত্ত্বচিন্তাকেই বুঝায়। ভারতীয় দর্শন দু'শ্রেণিতে বিভক্ত। আন্তিক্যবাদী এবং নাস্তিক্যবাদী দর্শন। সাংখ্য, যোগ, ন্যায়, বৈশেষিক, মীমাংসা এবং বেদান্ত এই ছয়টি আন্তিক দর্শন আর বৌদ্ধ, জৈন, চার্বাক, এই তিনটি নাস্তিক দর্শন। এই আন্তিক এবং নাস্তিক মিলে সমগ্র ভারতবর্ষের সর্বশ্রেণির চিন্তাবিদদের বিভিন্ন দার্শনিক সমস্যা সম্পর্কে সমস্ত মতবাদই ভারতীয় দর্শন। এই দর্শনগুলোতে বিভিন্ন আলোচনা, সমালোচনা এবং মতবাদ ভারতীয় দার্শনিকদের উদার ও ব্যাপক দৃষ্টিভঙ্গী তাঁদের অপূর্ব সত্যানুসন্ধান এবং বিচারনিষ্ঠার পরিচয় বহন করে। অতি প্রাচীন ভারতীয় হিন্দু দার্শনিক মাধবাচার্যের “সর্বদর্শন সংগ্রহ” নামক এক সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থে ভারতের বিভিন্ন সম্প্রদায়ভুক্ত দার্শনিকদের মতবাদ দেখতে পাওয়া যায়। তিনি একজন বেদবিশ্বাসী দার্শনিক ছিলেন। ভারতের প্রতিটি দার্শনিক সম্প্রদায় আলোচনা পর্যালোচনার ভিত্তিতে প্রকাশপূর্বক পূর্ণাঙ্গ আলোচনা করে তারপরেই কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হতেন। কোন দার্শনিক নিজ মতবাদ প্রতিষ্ঠা করার পূর্বে তার পূর্বের দার্শনিকের যুক্তিখণ্ডন করতেন এবং সবশেষে তিনি নিজস্ব যুক্তিতর্কের সাহায্যে তাঁর নিজ মতের প্রতিষ্ঠা করতেন। এভাবে ভারতীয় দার্শনিক সম্প্রদায়ের পারস্পরিক আলোচনার দ্বারাই ভারতের প্রতিটি দর্শনশাখা সমৃদ্ধ হয়ে উঠেছে। এ কারণেই ভারতীয় দর্শন এত উদার এবং ব্যাপক। চার্বাক ব্যতীত প্রত্যেকটি ভারতীয় দর্শনে কর্মবাদ স্বীকৃত হয়েছে। কর্মের ফলভোগ করতেই হবে। কর্মফল কখনই নষ্ট হয় না। শুভ, অশুভ, পাপ, পুণ্য—সবই কর্মফলের মধ্য দিয়ে সংরক্ষিত থাকে। কর্মবাদকে তাই নৈতিক মূল্যের সংরক্ষণ নিয়ম বলা হয়ে থাকে। আলোচ্য প্রবন্ধে “ভারতীয় দর্শনে কর্মের ধারণা” সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে।

*সহকারী অধ্যাপক, সংস্কৃত বিভাগ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়

কর্মের স্বরূপ বা সংজ্ঞা

কর্ম শব্দটি ‘কৃ’ ধাতু থেকে উৎপন্ন। ‘কৃ’ ধাতুর অর্থ কার্য করা, শারীরিক এবং মানসিক সব রকম কার্যই কর্ম। প্রত্যেক কর্মই নিজ নিজ ফল উৎপাদন করে। সব কর্মের ফল তিন প্রকার-ভাল, মন্দ এবং মিশ্র; কর্ম যে প্রকার, তার ফলও এর অনুরূপ হবে। জীব তার কর্মানুযায়ী ফল ভোগ করে। সৎকর্মের ফল পুণ্য এবং সুখ; অসৎ কর্মের ফল পাপ এবং দুঃখ। কর্মবাদকে বলা যেতে পারে নৈতিক কার্যকারণবাদ, কারণ থাকলেই যেমন কার্য, তেমন কর্ম থাকলেই কর্মফলভোগ। কোন জীবের পক্ষেই কর্মফলভোগকে এড়ান সম্ভব নয়। পুরুষ ও প্রকৃতি মিলে এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি। এই সৃষ্টিতে পুরুষ কখনও পরিবর্তন হয় না। আর প্রকৃতি কখনও পরিবর্তনরহিত হয় না। যখন এই পুরুষ প্রকৃতির সঙ্গে সম্বন্ধ স্থাপন করে তখন প্রকৃতির ক্রিয়া পুরুষের ‘কর্ম’ হয়ে দাঁড়ায় কারণ প্রকৃতির সঙ্গে সম্বন্ধ স্বীকার করলে তাদাত্ম্য নিবিড় ঐক্য ও অভেদ ঘটে যায়। তাদাত্ম্য হয়ে গেলে যেসব প্রাকৃতিক বস্তুসমূহ পাওয়া যায় তাতে মমত্ব এসে যায় এবং সেই মমতার দরুন অপ্রাপ্ত বস্তুরও কামনা জাগে। এইভাবে যতদিন পর্যন্ত কামনা, মমতা ও তাদাত্ম্য থাকে, ততদিন যা কিছু পরিবর্তনস্বরূপ ক্রিয়া ঘটতে থাকে, সেগুলোর নাম ‘কর্ম’।

ভারতীয় দর্শনে কর্মবাদ বা কর্ম নিয়ম বিধি

ভারতীয় দর্শন ও জীবন কর্মবাদের দ্বারা পরিচালিত। ভারতীয় দার্শনিকেরা কর্ম-নিয়মে এক বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে আছে। এখন প্রশ্ন দর্শনে কর্ম-নিয়ম বলতে কী? এই নিয়মের সহজ অর্থ হল, যে যেমন কর্ম করে, সে তেমন ফল পায় এবং কর্মকর্তাকে তার ভালো-মন্দ সব কর্মের ফল ভোগ করতে হয়। কোন জীবের পক্ষেই কর্মফল ভোগ থেকে অব্যাহতি লাভ সম্ভব নয়। কর্মবাদ বা কর্ম-নিয়মকে নৈতিক কার্যক্রম বলা যেতে পারে। কারণ থাকলেই যেমন কার্য থাকে, তেমনি কর্ম থাকলেই কর্মফল ভোগ থাকবে। ভারতীয় দার্শনিকদের মতে যে সনাতন নৈতিক নিয়ম গ্রহ, নক্ষত্র, দেবতা, মনুষ্য প্রভৃতি বিশ্বের সমস্ত বস্তুকে পরিচালিত করে, সেই নিয়মে সাধারণভাবে ‘কর্মবাদ’ গড়ে উঠেছে। আদি যুগ থেকেই ভারতীয় মনীষীরা কর্ম-নিয়মের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেছেন। ঋকবেদের ঋষি যে অখণ্ড নিয়মে কল্পনা করে ঋত নাম রেখেছিলেন, সেই ঋতই পরবর্তী কালের কর্মনিয়ম। অনিবার্য কার্যকরণ নিয়মের যেমন ব্যতিক্রম নেই এই কর্ম নিয়মেরও তেমনি ব্যতিক্রম নেই। কর্মনিয়মে বিশ্বাস ছাড়া মানুষের বিভিন্ন সুখ-দুঃখ ভোগের এবং প্রতিভা লাভের বৈষম্যকে সন্তোষজনকভাবে ব্যাখ্যা করা যায় না। একই অবস্থায় জন্মগ্রহণ করে এবং একই পরিবেশে লালিত-পালিত হয়েও বিভিন্ন ব্যক্তির মধ্যে কেউ সুখী, কেউ দুঃখী, কেউ প্রতিভাবান, আবার কেউ প্রতিভাহীন হয় কেন? এর ব্যাখ্যা একমাত্র ‘কর্ম-নিয়মই’ দিতে পারে। কর্ম-নিয়ম অনুসারে সৎকর্ম সুফল প্রদান করে, আর অসৎকর্ম কুফল প্রদান করে। আমাদের মনে করতে হবে, সুখী ব্যক্তির সুখ ভোগ তাঁর সৎকর্মের ফল, আর দুঃখী ব্যক্তির দুঃখ ভোগ তাঁর অসৎ কর্মেরই ফল। মানুষের সৎ এবং অসৎ উভয় প্রকার কর্মই এক অদৃশ্য শক্তি উৎপন্ন করে। এই শক্তি মানবের শুভ বা অশুভ কর্ম অনুসারে তাদের সুখ বা দুঃখ আনয়ন করে।

কর্মের প্রকারভেদ

জগতে প্রতি নিয়তই মানুষ কর্ম করছে। কর্ম দুভাগে বিভক্ত, যথা-সকাম কর্ম এবং নিকাম কর্ম। ফল ভোগের আকাঙ্ক্ষা নিয়ে যে কর্ম করা হয়, তা সকাম কর্ম আর ফল ভোগের আকাঙ্ক্ষা ত্যাগ করে যে কর্ম করা হয় তা নিকাম কর্ম। সকাম কর্ম আনে মানুষের দুঃখ-কষ্ট ও বন্ধন, আর নিকাম কর্ম আনে মানুষের মুক্তি। মানুষের কর্মকে তিনভাগে ভাগ করা যায়। যথা- সঞ্চিৎ, আরদ্ধ বা প্রারদ্ধ এবং সঞ্চিৎমান কর্ম। যে কর্ম অতীতে

ভারতীয় দর্শনে কর্মের ধারণা

সম্পাদিত হয়েছে, কিন্তু এখনও ফল প্রসব করে নাই, সেই কর্মকে সঞ্চিত কর্ম বলা হয়। যে কর্ম ফল প্রসব করতে আরম্ভ করে সেই কর্মকে আরম্ভ বা প্রারম্ভ কর্ম বলা হয়। আর যে কর্ম বর্তমানে করা হয়েছে, কিন্তু ফল প্রসব করে নাই, সে কর্ম ‘সঞ্চিয়মান’ কর্ম। মানুষের বর্তমান দেহ ও সুখ-দুঃখ তার প্রারম্ভ কর্মেরই ফল। তাই অনেকের মতে, আমাদের জন্ম বর্তমান পরিস্থিতি এবং সুখ-দুঃখ সবই আমাদের কর্মের উপর নির্ভর করে।

কৃতকর্মের কর্মফল প্রদান

জৈন, ন্যায়, বৈশেষিক এবং মীমাংসা দার্শনিকদের মতে, কৃতকর্ম থেকে একপ্রকার শক্তি উৎপন্ন হয় এবং এই শক্তিই কর্মফল প্রদান করে। জৈন মতে, জীবের কৃতকর্ম থেকে যে শক্তি উৎপন্ন হয়, সেই শক্তি প্রথমে ভাব কর্মরূপে আত্মায় প্রবৃত্তি বা কষায় উৎপন্ন করে এবং পরে দ্রব্য কর্মরূপে সূক্ষ্ম পুদ্গল পরমাণু সৃষ্টি করে জীবের কামনা শরীর গঠন করে। ন্যায়-বৈশেষিক মতে, জীবের পাপ-পুণ্য যার মধ্যে সঞ্চিত থাকে তার নামই অদৃষ্ট। এই অদৃষ্টশক্তি অচেতন, এর নিজের কোন নিয়ন্ত্রণক্ষমতা নেই। সর্বজ্ঞ ও সর্বশক্তিমান ঈশ্বর এই অদৃষ্টশক্তিকে নিয়ন্ত্রণ করে, জীবের পাপ-পুণ্যের বিচার করে তার ফল প্রাপ্তির ব্যবস্থা করেন। মীমাংসকদের মতে, বেদবিহিত কর্মই সংকর্ম ও বেদনিষিদ্ধ কর্ম অসংকর্ম। বেদবিহিত যাগযজ্ঞের অনুষ্ঠান কর্তব্য কর্ম। ইহলোকে যাগযজ্ঞ অনুষ্ঠিত হলে পরলোকে স্বর্গপ্রাপ্তি কীভাবে ঘটে? মীমাংসকদের মতে যাগযজ্ঞ অনুষ্ঠিত হলে ‘আত্মার একটি অদৃশ্য শক্তি উৎপন্ন হয় যার নাম “অপূর্ব” এবং এই শক্তি যথাসময়ে ফল প্রদান করে। যাগযজ্ঞ এবং তার ফলের মধ্যে যোগসূত্র হিসেবে অপূর্বকে স্বীকার করতে মীমাংসকরা বাধ্য হয়েছেন। যাগযজ্ঞ কতকগুলি অনুষ্ঠান ছাড়া কিছুই নয়। ফল উৎপন্ন হওয়া পর্যন্ত তারা স্থায়ী হয় না। অপূর্বকে স্বীকার করে না নিলে এই অনুষ্ঠান ও তার ফলের মধ্যে কার্যকরণ সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হয় না। কুমারিলের মতে, যজমান যে কর্মের অনুষ্ঠান করেন তাঁর বলেই তাঁর নিত্য আত্মায় ‘অপূর্ব’ উৎপন্ন হয় এবং যতদিন পর্যন্ত না তিনি সেই অনুষ্ঠিত কর্মগুলির ফলভোগ করতে আরম্ভ করেন ততদিন পর্যন্ত এই ‘অপূর্ব’ স্থায়ী হয়। ‘যজ্ঞ হল একটি কর্ম বা কর্ম পরম্পরা মাত্র’। যজ্ঞের ফল যে স্বর্গ, সেই স্বর্গ ফলের উৎপাদনকালে পর্যন্ত এ স্থায়ী হয় না। অন্যান্য দার্শনিকেরা কর্মবাদের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে ‘সংস্কারের’ উল্লেখ করেছেন। বৌদ্ধ দার্শনিকদের মতে পূর্ব বা অতীত জীবনের যেসব কর্ম সম্পাদিত হয় সেইসব কর্ম একপ্রকার শক্তি উৎপন্ন করে যাকে বলা হয় সংস্কার। সংস্কার হলো অতীত জীবনের অভিজ্ঞতার ছাপ। এই সংস্কারের জন্য জীবের পুনর্জন্ম হয়ে থাকে।

নিষ্কাম কর্মের গুরুত্ব

সর্ব কর্মবাদী দার্শনিকেরা মোক্ষলাভের জন্য নিষ্কাম কর্ম সম্পাদনের উপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন। সকাম কর্মই বিষয়ানুরাগ এবং বন্ধন সৃষ্টি করে যার ফলে জীবের পুনর্জন্ম ঘটে। নিষ্কাম কর্ম সম্পাদনে বিষয়ানুরাগের কোন সম্ভাবনা থাকে না এবং এর ফলে পুনর্জন্মেরও কোন সম্ভাবনা থাকে না। কোন কোন বৌদ্ধ দার্শনিকের মতে নির্বাণ নিষ্ক্রিয় অবস্থা নয় এবং নির্বাণ লাভের পর যদি অনাসক্তভাবে কর্ম-সম্পাদন করা যায়। তাহলে বন্ধনের কোন সম্ভাবনা থাকে না। মীমাংসা দার্শনিকদের মতে, কর্মের জন্যই কর্ম করতে হয়, কোন ফললাভের আশায় নয়। নিষ্কামভাবে বেদবিহিত নিত্যকর্ম সম্পাদনে স্বর্গসুখভোগ ঘটে। শঙ্কর কর্মবাদকে স্বীকার করে নিয়েছেন। ফল-কামনায় যে সব কর্ম করা হয় তারা কর্মবাদের নীতি অনুসারে ফলদান করে। অবিদ্যা থেকে কর্ম, কর্ম থেকে ব্যাপ্তি জীবের সৃষ্টি। আমরা ক্রিয়া অনুরূপ কার্যের ফললাভ করি। যতদিন পর্যন্ত পূর্ণজ্ঞান না হয় জন্মান্তর ধরে এ চলেতে থাকে।

শঙ্করের মত

কর্মদ্বারা মোক্ষ লাভ হয়, শঙ্কর এই মত স্বীকার করেন না। মোক্ষ কর্মের প্রত্যক্ষ ফল নয়। কর্মফল অনিত্য, মোক্ষ নিত্য। কর্ম জ্ঞানলাভের পথ প্রশস্ত করে। জ্ঞানলাভের পথে বা অন্তরায় তা দূর করতে কর্ম সাহায্য করে। পূর্ণজ্ঞান লাভ হলে কর্মের বীজ ধ্বংস হয় এবং পুনর্জন্মের রোধ হয়। জীবের লক্ষ্য কর্মের অধীনতা থেকে মুক্তি লাভ করা। অবিদ্যা থেকে মুক্তি পেলে কর্ম থেকে মুক্তি লাভ করা যায়। আসক্তি বর্জন করে এবং কর্মফল ঈশ্বরে উৎসর্গ করে যেসব কর্ম করা হয় সেগুলি চিত্তশুদ্ধির কারণ হয়। কৈবলাদ্বৈতবাদী শঙ্করের মতে, যাগযজ্ঞাদি অনুষ্ঠানের মাধ্যমে ভেদজ্ঞানের সৃষ্টি হয়। ভেদজ্ঞান বন্ধনের কারণ। কেবলমাত্র ব্রহ্মই সত্য এবং জীবাত্মা ও বৃক্ষের অভেদত্ব জ্ঞানই মুক্তি আনয়ন করতে পারে।

রামানুজের মত

রামানুজের মতে, কর্মফলভোগ হেতু জীবের বদ্ধদশা। নিজ নিজ কর্মানুযায়ী প্রতিটি জীব একটি জড়দেহধারণ করে। আত্মার বদ্ধদশা মানেই হল আত্মার দেহধারণ করে। অবিদ্যাপ্রসূত কর্মই বদ্ধদশার কারণ। আত্মার অনাত্মার সঙ্গে একাত্ববোধের নাম অহঙ্কার। এই অহঙ্কারই অবিদ্যা। বেদান্ত পাঠের দ্বারা অবিদ্যা দূরীভূত হয়। তখন জীব উপলব্ধি করে যে, আত্মা দেহ থেকে ভিন্ন এবং আত্মা ব্রহ্ম বা ঈশ্বরের অংশ। কর্ম ও জ্ঞানের সংযোগেই মোক্ষলাভ সম্ভব। কর্ম অর্থ নিষ্কামভাবে বেদবিহিত কর্ম সম্পাদন এবং বেদান্ত পাঠের মাধ্যমে তত্ত্বজ্ঞান লাভ। বেদান্ত পাঠের মাধ্যমে মুমূক্ষু ব্যক্তি উপলব্ধি করে যে, ব্রহ্মই সৃষ্টি-স্থিতি-লয়কর্তা এবং জীবাত্মা ও দেহ অভিন্ন নয়। ঈশ্বরের প্রতি ভক্তিই জীবের মুক্তির হেতু। ঈশ্বরের করুণা ছাড়া মোক্ষ লাভ সম্ভব নয়।

কর্মবাদ ও জন্মান্তরবাদ

কর্মবাদের সঙ্গে জন্মান্তরবাদ জড়িত। জন্মান্তরবাদ অনুসারে মৃত্যুর পরে আত্মার পুনর্জন্ম হয়, আত্মা তখন নতুন একটি দেহধারণ করে। কর্ম এবং তার ফলভোগের মধ্যে কার্যকারণ সম্পর্ক আছে। বর্তমান জীবনের কৃতকর্মের ফলভোগ যদি বর্তমান জীবন না হয়, তাহলে স্বীকার করতেই হবে যে, কর্মফল ভোগের জন্য আত্মাকে আবার দেহধারণ করে সংসারে আসতে হবে। কেননা কর্মের ফল বিনষ্ট হয় না এবং কর্মফলের নৈতিক মূল্য, তা শুভ বা অশুভ যাই হোক না কেন, সংরক্ষিত থাকে। কৃতকর্মের ফলভোগ করার জন্য জন্মের পর জন্ম হতে থাকে। একমাত্র সকাম কর্মের ফলভোগের জন্যই পুনর্জন্মের প্রয়োজন হয়। নিষ্কাম কর্ম করলে পুনর্জন্ম হয় না, যদি অবশ্যই ইতোমধ্যে পূর্বকৃত কর্মের ফলভোগ হয়ে থাকে। নিষ্কাম কর্ম এই সংসার যন্ত্রণা থেকে মুক্তির উপায়। সকাম কর্ম মানুষকে বেঁধে রাখে, কিন্তু নিষ্কাম কর্ম মানুষকে মুক্তি দেয়। ধার্মিক ব্যক্তিকেও অনেক সময় দুঃখভোগ করতে দেখা যায়, আবার পাপীকে দেখা যায় সুখভোগ করতে। এসব ব্যক্তির বর্তমান জীবনের কর্মাদির দ্বারা এদের এরূপ ফলভোগের ব্যাখ্যা করা যায় না। তাই এসব ঘটনার ব্যাখ্যা করতে হলে জন্মান্তরবাদ অবশ্যস্বীকার্য। ধার্মিক ব্যক্তি যদি এ জীবনে দুঃখভোগ করেন তবে তিনি পূর্বজন্মের কর্মফল ভোগ করেছেন। পাপী সম্পর্কেও একই কথা প্রযোজ্য। কর্মবাদের সাহায্যে ভারতীয় দার্শনিকগণ অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎকে একসূত্রে গ্রথিত করেছেন। অতীত বর্তমানের গোড়াপত্তন করেছে এবং বর্তমান ভবিষ্যৎকে নিয়ন্ত্রণ করেছে। ভগবদ্গীতায় জন্মান্তরকে নতুন বস্ত্র পরিধানের সাথে তুলনা করা হয়েছে। মানুষ যেমন জীর্ণ বস্ত্র পরিত্যাগ করে নতুন বস্ত্র পরিধান করে, আত্মাও তেমন পুরাতন দেহ পরিত্যাগ করে নতুন দেহ আশ্রয় করে। এই হল জন্মান্তর। সংসার মানে জন্ম-জন্মান্তর। বৌদ্ধ দর্শনে একেই বলা হয়েছে ভবচক্র। বৌদ্ধদর্শন কোন সনাতন আত্মার অস্তিত্ব স্বীকার না করলেও বৌদ্ধ দর্শন কর্মবাদ বিশ্বাস করে এবং কর্মফল ভোগের জন্য জীবকে পুনর্জন্ম গ্রহণ করতে

ভারতীয় দর্শনে কর্মের ধারণা

হয়— একথাও বৌদ্ধ দর্শনে স্বীকৃত। বেদান্ত দর্শনও কর্মবাদে বিশ্বাসী অবশ্য বেদান্তমতে কর্মবাদের যথাযথ ব্যাখ্যা দেওয়ার জন্য নিত্য ও সনাতন আত্মার অস্তিত্ব অবশ্য স্বীকার্য। জড়বাদী চার্বাক দর্শন কর্মবাদে কিংবা জন্মান্তরবাদে বিশ্বাসী নয়। চার্বাক দর্শন ছাড়া অন্যান্য সব নাস্তিক ও আস্তিক দর্শনে কর্মবাদ ও জন্মান্তরবাদ অর্থাৎ পুনর্জন্মবাদ স্বীকৃত হয়েছে। তবে প্রত্যেক কর্মই যদি পূর্বের কৃতকর্মের ফল হয় তবে প্রথম কর্মকে কীভাবে ব্যাখ্যা করা যায়, এর উত্তরে ভারতীয় দার্শনিকগণ বলেন যে প্রত্যেক ব্যক্তির কর্ম পূর্বকর্মের জন্য এবং এই প্রক্রিয়া অনাদি। তবে মোক্ষলাভ হলে এর সমাপ্তি ঘটে। কর্ম বলতে অনারদ্ধ কর্ম অর্থাৎ যে কর্ম এখনও ফল প্রসব করেনি এবং আরদ্ধ বা প্রারদ্ধ কর্ম অর্থাৎ যে কর্ম ফলপ্রসব করতে শুরু করেছে, উভয়কেই বোঝায়। অনারদ্ধ কর্মকে আবার দু'ভাগে ভাগ করা যায়— প্রাক্তন বা সঞ্চিত কর্ম অর্থাৎ অতীত জীবনসংক্রান্ত কর্ম এবং ক্রিয়মাণ বা সঞ্চিত কর্ম অর্থাৎ যে কর্ম বর্তমান জীবনে সঞ্চিত হচ্ছে। আমরা যে দেহ ইন্দ্রিয়াদি লাভ করেছি তা প্রারদ্ধ কর্মের ফল। সঞ্চিত কর্ম যেন অপক্ক ফল, এখনও তা ভোগের যোগ্য হয়নি। প্রারদ্ধ কর্ম পরিপক্ক ফল, তা ভোগের উপযুক্ত হয়েছে। ইহজন্মের যা প্রারদ্ধ কর্ম তা ভোগ করতেই হবে। ভোগ ভিন্ন তার ক্ষয় হবে না। অপরপক্ষে, ক্রিয়মাণ যে কর্ম তাকে বর্তমান কর্ম বলা হয়। মানুষ ইহজন্মে অনেক কর্ম করেছে। বহুসংখ্যক ভাবনা, বাসনা, চেষ্টার সে কর্তা। এ সবই তার ক্রিয়মাণ পূর্বজন্ম, সেসব জন্মেও আমরা নানা কর্মের অনুষ্ঠান করেছি। সেই আমরাই আবার ইহজন্মে কর্ম করছি। অতএব যে জীব ক্রিয়মাণ কর্মের কর্তা সেই জীবই ওইসব পূর্ব জন্মকৃত কর্ম অর্থাৎ প্রাক্তন কর্মের কর্তা। আমাদের পূর্বজন্মে কৃত কিংবা ইহজন্মে ক্রিয়মাণ কর্ম হয় শুভ, না হয় অশুভ। কর্ম করলেই তার ফলভোগ করতেই হবে। এক জন্ম কেন, বহু জন্ম বয়ে গেলেও যতক্ষণ না কৃতকর্মের ফলভোগ হচ্ছে ততক্ষণ সেই কর্মের ক্ষয় নেই। যে জন্মে যে কর্ম করা হয়েছে তার অল্প অংশই সেই জন্মে ভোগের দ্বারা ক্ষয় হয়। অধিকাংশ কর্মই পরজন্মে ভোগের জন্য 'সঞ্চিত' হয়ে থাকে। এই অভুক্ত প্রাক্তন কর্মকে সঞ্চিত কর্ম বলে।

ষড় দর্শন মতে কর্ম

কর্ম-নিয়ম স্বাধীন, না ঈশ্বরাস্বাধীন, এই প্রশ্ন নিয়ে ভারতীয় দার্শনিকদের মধ্যে মতভেদ আছে। ন্যায় এবং বৈশেষিক দার্শনিকগণ কর্ম-নিয়মকে ঈশ্বরাস্বাধীন বলেছেন; তাঁদের মতে, জীবের অদৃষ্ট হলো তার কর্মের শুভাশুভ ফলের সমষ্টি অর্থাৎ শুভাশুভ ফলের ভাগ্যরথানা। ভাগ্যরথানায় যেমন ভাগ্যরী দরকার, তেমনি এই জড় ও অচেতন অদৃষ্টকে পরিচালনার জন্য এক সচেতন সত্তাই হলেন ঈশ্বর। সর্বশক্তিমান ঈশ্বরই জীবের অদৃষ্টে শুভাশুভ কর্মফল যেভাবে একের পর এক সঞ্চিত হয়েছে সেভাবে জীবকে পর্যায়ক্রমে প্রদান করেন। অপরপক্ষে, সাংখ্য, মীমাংসা, জৈন ও বৌদ্ধ দার্শনিকগণ কর্মনিয়মকে স্বাধীন, ঈশ্বর নিরপেক্ষ ও স্বতন্ত্র বলে প্রকাশ করেছেন। তাঁদের মতে এই নিয়ম ঈশ্বরের সহায়তা ছাড়াই স্বাধীন, স্বয়ংক্রিয়াশীল ও অন্যান্যনিরপেক্ষ শক্তিরূপে জাগতিক সমগ্র ব্যাপারকেই নিয়ন্ত্রিত করতে পারে। জৈন ও বৌদ্ধ দার্শনিকগণ ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাস করেন না। কিন্তু এই কর্ম নিয়মের অনুশাসনকে মানেন। ঈশ্বরে বিশ্বাস না করে এই কর্ম-নিয়মের উপর ভিত্তি করেই জৈন ও বৌদ্ধ ধর্ম প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে। কর্ম-নিয়ম স্বাধীন বা ঈশ্বরাস্বাধীন যাই হোক না কেন, এই নিয়মের গণ্ডি (কার্যকারিতা) যে সকাম কর্মের মধ্যে সীমাবদ্ধ, এতে ভারতীয় দার্শনিকগণের মধ্যে কোনো মতভেদ নেই।

ন্যায় মতে কর্ম

ন্যায় দর্শনের প্রতিষ্ঠাতা হলেন মহর্ষি গৌতম। তাঁর আর এক নাম ছিল অক্ষপাদ। তাই ন্যায় দর্শনকে অক্ষপাদ দর্শন বলা হয়। ন্যায় মতে আত্মা হলো দ্রব্য এবং এই দ্রব্যকে আশ্রয় করেই চেতনা থাকে। আত্মা হলো জ্ঞাতা, কর্তা এবং ভোক্তা। দেহ, ইন্দ্রিয়, মন সবগুলিই আত্মার কারণ। যেগুলি আত্মার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। আত্মা দেহ, বুদ্ধি-ইন্দ্রিয় এবং মনের অতিরিক্ত এক স্বতন্ত্র সত্তা। চৈতন্য আত্মার স্বাভাবিক বা অবিচ্ছেদ্য গুণ নয়। আত্মা স্বরূপত অচেতন ও নিষ্ক্রিয়। আত্মা যখন মনের সঙ্গে, মন ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে এবং ইন্দ্রিয় বাহ্যবস্তুর সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত হয়, তখন আত্মার চেতনার আবির্ভাব ঘটে। নিষ্ক্রিয় ও নির্গুণ আত্মা তখনই সগুণ ও সক্রিয় হয়ে ওঠে এবং আত্মা জ্ঞাতা, ভোক্তা ও কর্তারূপে সব কিছু জানে, সকল কর্ম সম্পাদন করে এবং সকল কিছু ভোগ করে। আত্মা স্বরূপত অচেতন দ্রব্য এবং মোক্ষ অবস্থায় আত্মা নিজ স্বরূপে অবস্থান করে। ন্যায় ও বৈশেষিক দর্শনমতে, জীবের কর্মজাত পাপ-পুণ্য সম্বন্ধে থাকে অদৃষ্টের মধ্যে। এই অদৃষ্টশক্তি অচেতন। সেজন্য সর্বজ্ঞ সর্বশক্তিমান ঈশ্বর এই অদৃষ্টকে নিয়ন্ত্রণ করেন এবং অদৃষ্টানুযায়ী জীবকে যথাসময়ে তার কর্মফল দান করেন। কিন্তু ন্যায়বৈশেষিক ও অন্যান্য দর্শনের মতে ঈশ্বর কর্মবাদের নিয়ন্তা। ঈশ্বর অবশ্য আপন খেয়ালখুশিতে কোন কিছু সৃষ্টি করতে পারেন না। তিনি কর্মবাদ অনুসারে এমন একটি জগৎ সৃষ্টি করেন যেখানে জীব আপন কর্ম অনুযায়ী ফলভোগ করতে পারে। ন্যায়বৈশেষিকের মতে ‘অদৃষ্ট’ হচ্ছে একটি অদৃষ্ট নিয়ম এবং তা ঈশ্বরের নিয়ন্ত্রণ ছাড়া যথাপযুক্ত ফলদান করতে পারে না। বেদেও বরুণকে ‘ঋত’র প্রভু বলা হয়েছে। যে নিয়মে বিশ্ব পরিচালিত হয় তার মধ্যে ঈশ্বরের ইচ্ছা ও শক্তিই কাজ করে। ‘ঋত’ ঈশ্বরের স্বরূপের প্রকাশক। কর্মবাদের ভিত্তিতে ভারতীয় দার্শনিকগণ এই জগতকে এক বিরাট নৈতিক রঙ্গমঞ্চ রূপে এবং বিভিন্ন জীবকে অভিনেতা-অভিনেত্রী রূপে কল্পনা করেছেন। অভিনেতা যেমন তার যোগ্যতা অনুযায়ী একটি-ভূমিকা লাভ করে এবং সেই ভূমিকায় যথাযোগ্য অভিনয় করে প্রশংসা অর্জন করে কিংবা খারাপ অভিনয় করে নিন্দার ভাগী হয়, জীবও সেরকম পূর্বজন্মের কর্ম-ফলানুযায়ী দেহধারণ করে যথাযোগ্য পরিবেশে জন্মগ্রহণ করে নিজ কর্তব্য সম্পাদন করে এবং কৃতকর্মানুযায়ী সুখ বা দুঃখ ভোগ করে। এই জীবনে সুকৃতির ফলে জীবের উর্ধ্বগতি হয়, কুকাজের ফলে অধোগতি। সুতরাং জীব নিজেই তার ভাগ্যনিয়ন্তা। মানুষ তার স্বাধীন ইচ্ছা ব্যবহার করে নিক্রাম কর্মসম্পাদনের মাধ্যমে মুক্তিলাভ করতে পারে। জীবের ভবিষ্যৎ জীবেরই অধীন। ভারতীয় দর্শনে যেভাবে কর্মবাদ ব্যাখ্যাত হয়েছে তাতে পুরুষকারের প্রচুর অবকাশ রয়েছে এবং মানুষের স্বাধীন ইচ্ছাকেও স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে। বর্তমান জন্মে মানুষ স্বেচ্ছায় সৎকর্মে নিযুক্ত হয়ে ভাবী জীবনের উন্নতিবিধান সুনিশ্চিত করতে পারে। দৈব (fate) তো কৃতকর্মের ফলমাত্র। আপন কর্মশক্তির অতিরিক্ত কোন শক্তিকে দৈব বলা যায় না। কাজেই কর্মবাদের মধ্যে পুরুষকার ও দৈবের সামঞ্জস্য বিধান করা হয়েছে। কর্মবাদ নিয়ন্ত্রণবাদ বা অদৃষ্টবাদ নয়। কর্মবাদ হল স্বনিয়ন্ত্রণ। শুধু স্বনিয়ন্ত্রণ নয়, কর্মবাদ একদিকে যেমন অনিয়ন্ত্রণবাদের বিরোধী, অপরদিকে তেমনি ব্যক্তিগত স্বাধীন ইচ্ছাকে স্বীকার করে নেওয়ার ফলে জীবের নৈতিক দায়িত্বও খণ্ডিত হয়নি। মানুষের জীবনে ও আচরণে কর্মবাদের মতো এত গুরুত্বপূর্ণ ও মূল্যবান জিনিস আর নেই। ইহজন্মে আমাদের জীবনে যা কিছু ঘটে তা বিনশ্রুতার সাথে গ্রহণ করা বিধেয়, কেননা এগুলো আমাদেরই অতীত কর্মের ফল। তবু ভবিষ্যৎ আমাদের অধীন এবং আমরা আশা ও বিশ্বাস নিয়ে কাজ করতে পারি। কর্মবাদ ভবিষ্যতের জন্য আশাবাদ এবং অতীতের কাজে বিনতি স্বীকারে

ভারতীয় দর্শনে কর্মের ধারণা

প্রণোদিত করে। কর্মবাদের জন্যই মানুষ অনুভব করতে পারে যে, জাগতিক জিনিস, জগতের ঐশ্বর্য ও বঞ্চনা কোন কিছুই মানুষের আত্মাকে স্পর্শ করতে পারে না।

বৈশেষিক মতে কর্ম

বৈশেষিক দর্শনের প্রতিষ্ঠাতা হলেন মহর্ষি কণাদ। মহর্ষি কণাদের প্রকৃত নাম ছিল উলুক। কথিত আছে যে, এই মহান ঋষি শস্যকণার দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করতেন তাই তিনি কণাদ নামে অভিহিত হয়েছেন। বৈশেষিক দর্শনের মূল গ্রন্থের নাম ‘বৈশেষিক সূত্র’ বৈশেষিক মতাবলম্বীদের মতে, আত্মা সম্পর্কীয় ধারণা নৈয়ায়িকদেওর ধারণার অনুরূপ। আত্মা হলো এক শাস্ত্র এবং সর্বব্যাপী দ্রব্য। আত্মা হলো জ্ঞান বা চেতনার আশ্রয়। আত্মা বিভূ হলোও শরীর-ভেদ ভিন্ন ভিন্ন। আত্মা নিত্য, আত্মার কোন বিনাশ নেই। মহর্ষি কণাদ কর্মের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেছেন, কর্ম হলো, যা দ্রব্য অবস্থান করে, অথচ গুণ নয়, এবং যা দ্রব্যের সংযোগ ও বিভাগের প্রত্যক্ষ করেন। আবার সর্বপ্রকার দ্রব্যের কর্মকে প্রত্যক্ষ করা যায় না। যেমন, মনের কর্মকে প্রত্যক্ষ করা যায় না। কারণ হলো মন প্রত্যক্ষ-গ্রাহ্য নয়। সুতরাং যে সকল দ্রব্যকে প্রত্যক্ষ করা যায়, তাদের কর্মকেও প্রত্যক্ষ করা যায়। যেমন: ক্ষিতি, অপ, তেজ প্রভৃতি দ্রব্যের কর্মকে বিভিন্ন ইন্দ্রিয়ের দ্বারা প্রত্যক্ষ করা সম্ভব। আত্মা অচেতন, কিন্তু দেহের সংস্পর্শে এসেই আত্মা চেতনা লাভ করে। যেহেতু আত্মা স্বরূপতঃ নির্গুণ ও নিষ্ক্রিয়, সেই কারণে চেতন্য আত্মার স্বাভাবিক গুণ নয়, আগন্তুক গুণ। বৈদান্তিকদের মতে আত্মা এক। ন্যায়-বৈশেষিক দর্শন মতে জীবাত্মা বহু, কেননা যদি জীবাত্মা এক হত তাহলে একের সুখে সকলেই সুখ এবং একের দুঃখে সকলেই দুঃখ বোধ করত।

মীমাংসাকদের কর্মকাণ্ডের ব্যাখ্যা

মহর্ষি ‘জৈমিনি’ মীমাংসা দর্শনের প্রতিষ্ঠাতা। প্রতিষ্ঠাতার নাম অনুসারে এই দর্শনের আর এক নাম ‘জৈমিনি দর্শন’। মীমাংসা দার্শনিকগণ বেদের কর্মকাণ্ডের যে ব্যাখ্যা দিয়েছেন তার কিছু বিশেষত্ব আছে। প্রাচীন মীমাংসাকদের মতে স্বর্গ লাভই জীবের পরমার্থ। স্বর্গ অনন্ত সুখের আলায়। বেদবিহিত যাগযজ্ঞ অনুষ্ঠানের মাধ্যমে স্বর্গ ও অমৃতত্ব লাভ হয়। যাগযজ্ঞ অনুষ্ঠানই জীবের একমাত্র ধর্ম, কারণ তাই হলো বেদের আজ্ঞা। বেদ নিত্য, স্বতঃপ্রমাণ এবং অপৌরুষেয়-‘কর্ম’ তার বাহ্য অভিব্যক্তি, কর্ম তার একমাত্র প্রতিপাদ্য বিষয়। বেদবিহিত কর্মই জীবের একমাত্র লক্ষ্য। পূর্ব-মীমাংসা বিশ্বাস করে যে, কর্ম সর্বশক্তিমান এবং কেউ কর্মের শক্তিতে হস্তক্ষেপ করতে পারে না। কর্ম-অনুষ্ঠানের পশ্চাতে যে উদ্দেশ্য নিহিত থাকে তাই কর্মের স্বরূপ নির্ধারণ করে-সেই-কর্ম হিংসাত্মক বা অহিংসাত্মক যাই হোক না কেন। এই কারণে বেদবিহিতযজ্ঞে পশুবধ হিংসাত্মককার্য হলে ও অধর্ম বিবেচিত হয়না। কারণ, যজ্ঞ হলো পুরুষার্থ এবং পশুটিকে যজ্ঞেই উৎসর্গ করা হচ্ছে। মীমাংসা মতে কর্ম বেদবিহিত, কোন ঈশ্বরের আদেশ নয়। বৈদিক বিধি অনুযায়ী কর্ম করাই ধর্ম এবং তাই হলো জীবের পক্ষে সৎ কর্ম এবং কর্তব্য কর্ম। মীমাংসা শাস্ত্রে কোথাও ঈশ্বরের প্রসঙ্গ নেই। দেবতাকে স্বীকার করা হলেও দেবতা ‘মন্ত্ৰাত্মক’। দেবতাদের উদ্দেশ্যে যজ্ঞে আহুতি দেওয়া হয় মাত্র। মীমাংসাকদের মতে যাগযজ্ঞ বেদবিহিত-এই মনে করেই যাগযজ্ঞ করতে হবে কোন ব্যক্তিগত স্বার্থসিদ্ধি বা পুরস্কারের লোভে নয়।

সাংখ্য মতে কর্ম

সাংখ্য দর্শনের প্রবর্তক এবং প্রতিষ্ঠাতা হলেন ‘মহর্ষি কপিল’। ভারতীয় দর্শনগুলোর মধ্যে সাংখ্য দর্শনই প্রাচীনতম। ঋগ্বেদ, স্মৃতি, পুরাণ প্রভৃতি প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্যে সাংখ্য দর্শনের প্রাচীনত্ব সম্বন্ধে জানা যায়। সাংখ্য দর্শনের আদি গ্রন্থ মহর্ষি কপিল প্রণীত “তত্ত্বসমাস” এই গ্রন্থে সাংখ্য দর্শনের সংক্ষিপ্ত পরিচয় পাওয়া

যায়। সাংখ্য মতে মূলতত্ত্ব এক ব্রহ্ম নয়, মূলতত্ত্ব দুটি-পুরুষ ও প্রকৃতি। পুরুষ ও প্রকৃতি উভয়ই অনাদি ও নিত্য। প্রকৃতি জড়, ত্রিগুণময়ী, পরিণামী, বিকারশীল, প্রসবধর্মিণী বা সৃষ্টিক্ষম। পুরুষ চেতন, নির্গুণ, অপরিণামী, অসঙ্গ, অকর্তা, উদাসীন সাক্ষী মাত্র। প্রকৃতি দৃশ্য, পুরুষ প্রকৃতির সংযোগই সৃষ্টি। এই সংসার দুঃখময়। সাংখ্য মতে পুরুষ প্রকৃতির অবিবেক, অর্থাৎ অভেদ জ্ঞানই জীবের বন্ধনের কারণ। বিবেকখ্যাতি অর্থাৎ প্রকৃতি পুরুষের পার্থক্য জ্ঞানই মুক্তি। এই জ্ঞানই দুঃখ নিবৃত্তির একমাত্র উপায়। বিবেকজ্ঞান লাভ করার একটি উপায় হলো তত্ত্বাভ্যাস। এই তত্ত্বাভ্যাসের ফলে ‘আমি পুরুষ’, আমি পরিণামীই, আমার কর্তৃত্ব নেই’, ‘আমার স্বামিত্ব নেই’,- এই বিশুদ্ধ কেবলতত্ত্বজ্ঞান উৎপন্ন হয়। কাজেই বিবেকখ্যাতি দুঃখ হ্রাসের এবং কৈবল্য লাভের উপায়। আত্মা বা শুদ্ধ চৈতন্য সত্তা, দেহ মন-বুদ্ধি অহঙ্কার থেকে পৃথক-এই প্রখ্যাত জ্ঞানই বিবেকখ্যাতি। সাংখ্য মতে পুরুষ ও প্রকৃতির সংযোগ বিনষ্ট হলে, পুরুষ স্বরূপে অবস্থান করলে প্রকৃতির ক্রিয়া বন্ধ হয়। সাংখ্য মতে মোক্ষ অর্থে কর্মের শেষ। সাংখ্য দর্শন মতে, কর্মবাদ একটি স্বাধীন ও নৈর্ব্যক্তিক নিয়ম, যা ঈশ্বরের সাহায্য ব্যতিরেকেই জীবের কর্মানুসারে ফলদান করে, এবং বাহ্য জগৎকে নৈতিক জগতের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ করে। সাংখ্য দর্শন মতে, ঈশ্বর কর্মবাদের নিয়ন্তা। ঈশ্বর আপন খেয়ালখুশিতে কোন কিছু সৃষ্টি করতে পারেন না। তিনি কর্মবাদ অনুসারে এমন একটি জগৎ সৃষ্টি করেন, যেখানে জীব আপন কর্মানুযায়ী ফলভোগ করতে পারে।

যোগদর্শন মতে কর্ম

মহর্ষি পতঞ্জলি ‘যোগ দর্শনের’, প্রবর্তক এবং প্রতিষ্ঠাতা। ‘পতঞ্জলির নামানুসারে যোগ দর্শনের আদি গ্রন্থ হলো যোগসূত্র বা পতঞ্জলি সূত্র। যোগদর্শন মতে পুরুষের আত্মস্বরূপে অবস্থানই কৈবল্য। যোগ দর্শনমতে, বিবেক খ্যাতিই দুঃখ হানির এবং কৈবল্য লাভের উপায়। বিবেক খ্যাতির অর্থ হলো আত্মা যে শুদ্ধ চৈতন্য সত্তা এবং আত্মা যে দেহ, মন, বুদ্ধি এবং অহঙ্কার থেকে পৃথক এই প্রখ্যাত জ্ঞান লাভ করা যায় না। অষ্টাঙ্গ যোগের অনুষ্ঠানে চিত্তশুদ্ধি ঘটে এবং বিবেকখ্যাতি জাগে, যার ফলে কৈবল্য লাভ ঘটে। এই অষ্ট অঙ্গ হলো-যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধারণা, ধ্যান ও সমাধি। অদ্বৈত বেদান্তমতে মোক্ষাবস্থা এক আনন্দঘন অবস্থা। কর্মবাদে কর্মতত্ত্ব বিষয়ক আলোচনা করেছেন ভাষ্যকার স্বামী ভগবানন্দ। এতে সৃষ্টি প্রক্রিয়ায় জন্ম-মৃত্যুও এসে গেছে। কর্ম, কর্মফল, তার জন্য পুরুষের জন্ম, তার আয়ুষ্কাল ও তার ভোগও আলোচিত। তিনি বলছেন, চিত্তভূমিতে অবিদ্যাদি ক্লেশকর্ম থাকা জনিত যে কর্মফল, সেই কর্মফলের জন্য পুরুষের জন্ম, তার আয়ুষ্কাল ও তার ভোগও নির্ধারিত। এই তিনের কারণই হলো, পুরুষের পূর্ব জন্মার্জিত কর্মশয় বা কর্মসংস্কার ও বর্তমান কর্মশয়। কারণ না থাকলে কোন কার্য ঘটে না। সুতরাং কর্মজনিত সংস্কারই জন্ম, আয়ু ও ভোগের কারণ।

কর্ম সম্পর্কে অদ্বৈত বেদান্ত মত

ষড়দর্শনের মধ্যে মীমাংসা দর্শন (পূর্ব-মীমাংসা) কর্মবাদী, অন্যান্যগুলি জ্ঞানবাদী। অদ্বৈতবেদান্ত মতে আত্মা বিশুদ্ধ চৈতন্যস্বরূপ এবং আনন্দস্বরূপ। আত্মা এক ও অদ্বিতীয়। তবে ব্যবহারিক দৃষ্টিতে আত্মা বহু, কিন্তু পারমাণবিক দৃষ্টিতে আত্মার বহুত্ব স্বীকৃত নয়; আত্মা এক ও অদ্বিতীয়। অদ্বৈতবেদান্ত মতে আত্মার কোনো অংশ নাই, আত্মা নিরবয়ব। অদ্বৈতবেদান্ত দার্শনিকেরা আত্মাকেই ব্রহ্ম বলেছেন এবং তাদের মতে এই ব্রহ্ম সত্য, আর সবই মিথ্যা। আত্মা নিত্য, নির্বিশেষ, অনাদি ও অনন্ত।

শঙ্কর বলেন, আপাতদৃষ্টিতে মনে হয় মানুষ দেহ ও আত্মার সমষ্টি। কিন্তু আসলে তা নয়। মানুষের দেহ অন্যান্য জড়বস্তুর ন্যায় মিথ্যা। কেবল আত্মাই সৎবস্তু, দেহ সৎবস্তু নয়। শঙ্করের মতে, উপনিষদের “তত্ত্বমসি” বাক্যের

ভারতীয় দর্শনে কর্মের ধারণা

অর্থ তাই। ‘তৎ’ অর্থাৎ ‘সেই’ শব্দের দ্বারা ব্রহ্মকেই বুঝায় এবং ‘তুমি’ অর্থাৎ ‘তুমি’ শব্দের দ্বারা মানুষের অন্তর্নিহিত আত্মাকেই বুঝায়। সুতরাং আত্মা এবং ব্রহ্ম এক।

বৌদ্ধ মতে কর্ম

বৌদ্ধ ধর্মের, প্রতিষ্ঠাতা গৌতম বুদ্ধের বাণী ও উপদেশের উপর ভিত্তি করে জগত ও জীবন সম্পর্কে যে মতবাদ গড়ে উঠেছে সেই মতবাদই বৌদ্ধ দর্শন বা বৌদ্ধ ধর্ম। অভিজ্ঞতাবাদী বৌদ্ধ দার্শনিকগণও কোন শাস্ত্র বা চিরন্তন আত্মার অস্তিত্ব স্বীকার করেন না। কোন এক মুহূর্তে আমাদের মধ্যে আমরা যেসব মানসিক কোন শাস্ত্র বা চিরন্তন সত্তার অস্তিত্ব থাকে না। মানুষের মধ্যে কোন অপরিবর্তনীয় সত্তার অস্তিত্ব না থাকলেও, মানুষের জীবনের বিভিন্ন অবস্থার মধ্যে একটা ধারাবাহিকতা আছে, তারই দ্বারা ব্যক্তি-অভিন্নতা ব্যাখ্যা এবং তাঁর মতে, জন্মান্তর অর্থে কোন চিরন্তন আত্মার নতুন দেহ পরিগ্রহণ হয়। জন্মান্তর অর্থে বর্তমান জীবন থেকে পরবর্তী জীবনের উদ্ভব। জীব হলো মানসিক প্রক্রিয়ার প্রবাহ। এই মানসিক প্রক্রিয়াই এক জন্ম থেকে আর এক জন্মে প্রবাহিত হয়। মানুষ পঞ্চস্কন্ধের সমষ্টি। এই পঞ্চস্কন্ধ হল-রূপ, বেদনা, সংজ্ঞা, সংস্কার এবং বিজ্ঞান। বুদ্ধদেবের মতে, যারা শাস্ত্র অথবা আত্মার কথা বলেন তাঁরা মূলতঃ পঞ্চস্কন্ধের একত্রে বা কোন একটিকে প্রত্যক্ষ করে শাস্ত্র আত্মার কথা বলে থাকেন। বৌদ্ধ দর্শন কোন সনাতন আত্মার অস্তিত্ব স্বীকার না করলেও বৌদ্ধ দর্শন কর্মবাদে বিশ্বাস করে। কর্মফল ভোগের জন্য প্রত্যেক জীবকে পুনরায় জন্মগ্রহণ করতে হয়— একথাও বৌদ্ধ দর্শনে স্বীকৃত। তাই বৌদ্ধ দর্শন কর্মবাদে বিশ্বাসী।

জৈন দর্শনে কর্মবাদ

জৈন দর্শন অতি প্রাচীন দর্শন। জৈন শব্দের উৎপত্তি ‘জিন’ শব্দ থেকে। এই ‘জিন’ শব্দের অর্থ হল ‘জয়ী’। জৈন তীর্থঙ্করগণকে ‘জিন’ নামে অভিহিত করা হয়। কারণ তাঁরা রাগ, দ্বেষ প্রভৃতি রিপুগুলিকে জয় করেছিলেন। চব্বিশজন তীর্থঙ্কর (শাস্ত্রকার) জৈন দর্শনের প্রচারক। জৈন দর্শনেও কর্মবাদের আলোচনা দেখা যায়। জৈন দর্শন মতেও সকাম কর্মের জন্য আত্মার দেহধারণ এবং কর্মফল ভোগের জন্যই জীবের পুনর্জন্মগ্রহণ। কামনা, বাসনা ও ভোগ-লালসার বিরতি ঘটলেই জীব মুক্তিলাভ করে। জৈনগণের মতে কর্মই বন্ধনের কারণ। কর্ম আট প্রকার— (১) জ্ঞানাবরণীয় কর্ম, অর্থাৎ যে কর্ম আত্মার যথার্থ জ্ঞানকে আবৃত করে। (২) দর্শনাবরণীয় কর্ম, —যে কর্ম সম্যক দৃষ্টিকে ব্যাহত করে। (৩) মোহনীয় কর্ম—যে কর্ম মোহের সৃষ্টি করে জীবকে অশুভ কর্মসাধনে প্রযুক্ত করে। (৪) বেদনীয় কর্ম—যে কর্ম সুখ-দুঃখের অনুভূতি সৃষ্টি নির্ভর করে। (৫) নাম কর্ম—যে কর্মের উপর দেহ অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদিও সৃষ্টি নির্ভর করে। (৬) অন্তরায় কর্ম অর্থাৎ যে কর্ম অন্তরায় সৃষ্টি করে জীবের শুভকর্ম সম্পাদনে বাধা প্রদান করে। (৭) গোত্র কর্ম অর্থাৎ যে কর্ম বংশ নিরূপণ করে। (৮) আয়ুষ কর্ম অর্থাৎ যে কর্ম জীবের আয়ুষ্কাল নির্ধারণ করে। জৈন মতে কর্ম দুপ্রকার-ভাব কর্ম ও দ্রব্য কর্ম। ভাবকর্ম হল কুভাবনা, দ্রব্য কর্ম হল যা পুদগলের পরমাণুগুলিকে আত্মার দিকে আকর্ষণ করে আত্মার কার্মন শরীর গঠন করে। আত্মার আবরণ কর্ম, কর্মের আবরণ দেহ।

চার্বাক মতে কর্ম

জড়বাদী চার্বাক দার্শনিকরা দেহাতিরিক্ত কোন আত্মার অস্তিত্ব স্বীকার করে না। চার্বাকদের মতে চৈতন্যবিশিষ্ট দেহই আত্মা। ‘আমি রূপ’, ‘আমি অন্ধ’, ‘আমি স্থূল’, প্রভৃতি উক্তিই স্পষ্ট প্রমাণ করে যে, দেহ ও আত্মা সমার্থক। চার্বাক মতে, চৈতন্য কোন অতিমানস সনাতন আত্মার গুণ নয়, চৈতন্য দেহেরই গুণ। ক্ষিতি, অপ্,

তেজঃ, মরুৎ, ও ব্যোম এই পাঁচটি মহাভূতের বিশেষ সংমিশ্রণে যখন জীবদেহের উৎপত্তি ঘটে, তখন সেই দেহে চৈতন্যের আবির্ভাব ঘটে। প্রশ্ন হল, যে পাঁচটি মহাভূতের দ্বারা জীবদেহ ঘটিত, তাদের কোনটিই যখন চৈতন্য ধর্ম বিশিষ্ট নয়, তখন তাদের সংমিশ্রণে জীবদেহের চৈতন্যের আবির্ভাব কীভাবে ঘটতে পারে? এর উত্তরে চার্বাকরা বলেন যে-পান, চুন ও সুপারি -এই তিনটির কোনটির মধ্যেই কোন লাল আভা নেই, তবু এদের একত্রে চর্ষণ করলে একটি লাল আভা দেখা যায়। অনুরূপভাবে পাঁচটি মহাভূতের কোনটিই চৈতন্যধর্মবিশিষ্ট না হলেও এগুলোর বিশেষ সংমিশ্রণে চৈতন্যের আবির্ভাব ঘটতে পারে। চৈতন্য জড়ের উপবস্ত্ত। যেহেতু দেহাতিরিক্ত কোন চৈতন্যের অস্তিত্ব নেই, সেহেতু আত্মার বিনাশের প্রশ্ন অবাস্তব। দেহের বিনাশেই জীবনের পরিসমাপ্তি। আত্মার অমরতা, কর্ম-ফলভোগ, জন্মান্তর, বন্ধন, মুক্তি সবই অর্থহীন। চার্বাক মতে, প্রত্যক্ষই একমাত্র প্রমাণ এবং প্রত্যক্ষের মাধ্যমে কোন অজড় নিত্য চৈতন্যবিশিষ্ট আত্মার অস্তিত্ব প্রমাণ করা যেতে পারে না।

উপসংহার

ভারতীয় দর্শন নৈতিক কর্মবিমুখতার দর্শন নয়। যদিও ভারতীয় দর্শন অবিদ্যা ও অজ্ঞানতাকেই সর্বপ্রকার দুঃখের মূল বলে স্বীকার করে এবং যথার্থ জ্ঞানকেই মোক্ষলাভের পরিপূরক মনে করে, তবু প্রায় সকল ভারতীয় দর্শনেই নৈতিক ও সামাজিক কর্ম-সম্পাদনের উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। চিন্তের শুদ্ধতা, ইন্দ্রিয় সংযম, সৎকর্ম সম্পাদন, সত্যনিষ্ঠা, অহিংসা, ভোগ বিমুখতা-সংক্ষেপে নৈতিক জীবন-যাপনের উপরই জীবের মোক্ষলাভ একান্তভাবে নির্ভর। যদিও মোক্ষই ভারতীয় দর্শনে পুরুষার্থ, তবু চতুর্বর্গের অপর তিনটি-ধর্ম, অর্থ ও কামকে ভারতীয় দর্শন উপেক্ষা করেনি। দার্শনিক রাধাকৃষ্ণণের মতে, ভারতীয় দর্শনে ধর্মের ধারণা সবচেয়ে প্রয়োজনীয় ধারণা। নৈতিক পূর্ণতা ঈশ্বরের জ্ঞানের প্রথম স্তর। কর্মমাত্রই দোষযুক্ত বা বন্ধনের কারণ। কর্মফলে দেহধারণ, আবার দেহধারণ হলেই কর্ম। এই জন্ম-কর্মচক্রের নিবৃত্তি নেই। কাজেই কীভাবে জীব এই কর্মচক্র থেকে মুক্তি লাভ করতে পারে? জ্ঞানবাদীরা বলেন, আত্মজ্ঞান ভিন্ন কর্মবন্ধন থেকেই মুক্তিলাভ করা যায় না। কেউ কেউ আত্ম-অনাত্মা বিচার দ্বারা আত্মসাক্ষাৎকারের কথা বলেন। অনেকের মতে মোক্ষলাভের জন্য যে সব পথ স্বীকৃত তার মধ্যে জ্ঞানের পথ সবচেয়ে কঠিন। বস্তুতঃ অন্যান্য পথগুলি অতিক্রম করে এলেই মুমুক্শু ব্যক্তি এই পথ অনুসরণের সামর্থ্য অর্জন করে। তবে এর থেকে এই সিদ্ধান্ত করলে ভুল হবে যে, অন্যান্য মোক্ষমার্গের সঙ্গে জ্ঞানমার্গের বিরোধিতা বর্তমান। বরং একথা বলা যেতে পারে যে, এই পথ সকলের জন্য নয়, সীমিত স্বল্প সংখ্যক ব্যক্তির জন্য যারা জ্ঞান ও বুদ্ধির এক উচ্চস্তরে উন্নীত। কিন্তু এর জন্য প্রয়োজন কিছুদিনের জন্য ধ্যানমার্গ, কর্মমার্গ ও ভক্তিমার্গের অনুসরণ করা। এই কারণেই বলা হয় জ্ঞানমার্গ সব মার্গের শ্রেষ্ঠ মার্গ এবং সমস্ত কর্মের পরিসমাপ্তি জ্ঞানে।

তথ্যসূত্র

অর্জুন বিকাশ চৌধুরী। ভারতীয় দর্শন। কলকাতা: ২০১৩-২০১৪।
জগদীশ্বর সান্যাল। ভারতীয় দর্শন। কলকাতা: ২০০৭।
প্রমোদবন্ধু সেনগুপ্ত। ভারতীয় দর্শন। কলকাতা: ২০০৩-২০০৪।
স্বামী ভগবানন্দ। পাতঞ্জল যোগদর্শন। কলকাতা: ২০১৫।
স্বামী রামসুখদাস। কর্ম রহস্য। কলকাতা।

আমির খসরু দেহলভি: কাব্য ও কবিমানস

আলতাফ হোসেন*

প্রতিপাদ্যসার

সুলতানি আমলের ভারতীয় কবিদের মধ্যে সর্বাধিক জনপ্রিয় এবং সর্বশ্রেষ্ঠ কবি হলেন আমির খসরু দেহলভি। তিনি একাধারে সমসাময়িককালের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি, সাহিত্যিক, দার্শনিক, ইতিহাসবিদ ও সঙ্গীতজ্ঞ ছিলেন। তিনি আরবি, ফারসি, উর্দু, তুর্কি, হিন্দি, সংস্কৃত প্রভৃতি ভাষা ছাড়াও ব্যাকরণ, ফিকাহ, তাফসির, কুরআন ও জ্যোতির্বিদ্যায় সুপণ্ডিত ছিলেন। তবে কাব্য সাধনাই ছিল তাঁর একমাত্র লক্ষ্য। তিনি ফারসি ভাষার বিখ্যাত কবি খাকানি শিরওয়ানি, আবুল কাসেম ফেরদৌসি, আনওয়ারি, নিজামি গাঞ্জুবি, হাকিম সানাই, শেখ সাদি শিরাজি প্রমুখ ইরানি কবির কবিতা অনুকরণে কবিতা রচনা করেছেন। তাঁর রচিত উল্লেখযোগ্য কাব্যগ্রন্থ হল- *ক্লেয়ানুস সাদাইন*, *মেফতাহুল ফুতুহ*, *দেভল রানী খিজির খান*, *তুঘলক নামা*, *গুররাতুল কামাল*, *নেহায়াতুল কামাল*, *মাতলাউল আনওয়ার*, *শিরিন ওয়া খসরু*, *মজনুন ওয়া লাইলি*, *আইনে সিকান্দারি*, *নুহে সেপেহের*, *তুহফাতুস সিগার*, *ওয়াসাতুল হায়াত*, *বাকিয়ে নাকিয়ে*, *হাশত বেহেশত* প্রমুখ। তাঁর কাব্যে ভারতবর্ষের ত্রয়োদশ ও চতুর্দশ শতকের গোড়ার দিকের ইতিহাস তুলে ধরা হয়েছে। এর পাশাপাশি সমগ্র ভারতের সমাজ-সংস্কৃতি, ধর্ম, প্রকৃতি এবং সাধারণ মানুষের জীবন আচরণ সুস্পষ্টভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে। এছাড়াও তিনি ছিলেন একজন প্রসিদ্ধ সঙ্গীতজ্ঞ। ভারতীয় সংগীত জগতে তাঁকে গুরু বা স্মাট বলা হয়। তিনি সংগীতে বহু রাগ-রাগিনী ও তাল সৃষ্টি করেছেন এবং একাধিক বাদ্যযন্ত্র উদ্ভাবন করেছেন। সুকণ্ঠের অধিকারী হওয়ায় তাঁকে ‘তুতিয়ে হেন্দ’ বা ভারতের তোতাপাখি উপাধিতে ভূষিত করা হয়। আমির খসরু দেহলভি কাব্য ও সংগীত প্রতিভায় আজ অবধি ভারতবর্ষের শ্রেষ্ঠ ফারসি কবি। আলোচ্য প্রবন্ধে আমির খসরু দেহলভি’র জীবনী ও তাঁর ফারসি কাব্য ও কবিমানস সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে।

*সহকারী অধ্যাপক, ফারসি ভাষা ও সাহিত্য বিভাগ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়

ভূমিকা

ভারতবর্ষে ফারসি ভাষার ইতিহাস সাতশত বছরের পুরনো। খলিফা হারুনুর রশিদের আমলে ইরানি মুসলমান বণিক ও আরবগণ পবিত্র ইসলাম ধর্ম প্রচারের জন্য এ ভূখণ্ডে আগমন করেন। এতদ্ব্যতীত মুসলমানদের শাসনকালে ইরান ও মধ্য এশিয়া হতে অসংখ্য কবি ও আলেম আগমন করেন। তাঁরা ফারসি ভাষার প্রচার, প্রসার ও বিকাশে ভূমিকা পালন করেন। যাঁদের সাহিত্যচর্চার মধ্য দিয়ে ফারসি ভাষা ও সাহিত্য সমৃদ্ধ হয়েছে তাঁদের মধ্যে ভারতবর্ষের আমির খসরু দেহলভি অন্যতম (আব্দুস সাত্তার ১৯৮৭, ৫৭)। ভারতবর্ষের ফারসি সাহিত্যের ইতিহাসে তিনি এক উজ্জ্বল নক্ষত্র। ফারসি সাহিত্যের অগ্রযাত্রাকে এগিয়ে নিতে তিনি তাঁর কর্ম প্রচেষ্টাকে অব্যাহত রেখেছিলেন। আমির খসরু দেহলভি সম্পর্কে তানভীর আহমেদ বলেছেন,

“Amir khusraw was a versatile genius, whose colourful personality has contributed a lot to the development of Indo-persian literature” (Tanwir Ahmed 1991, 186).

আমির খসরু দেহলভি'র জীবন পরিচয়

ভারতবর্ষের বিখ্যাত কবি আমির খসরু দেহলভি ৬৫১ হিজরি মোতাবেক ১২৫৩ খ্রিষ্টাব্দে ভারতের উত্তর প্রদেশের অন্তর্গত একটি জেলার পাতিয়ালাতে জন্মগ্রহণ করেন (ইসলামী বিশ্বকোষ ২০০৫, ২৫২)। তাঁর পিতার নাম আমির সাইফুদ্দিন মাহমুদ দেহলভি। তিনি তুর্কিস্তানের ‘কুশ’ শহরের অধিবাসী ছিলেন। মঙ্গলীয় আক্রমণের সময় দেশ ছেড়ে এসে ইলতুতমিশনের সেনাবাহিনীতে অফিসার পদে চাকরি গ্রহণ করেন (বেগ, তারিখবিহীন : ৪৮৫)। আমির খসরু দেহলভির পিতা তুর্কিদের লাচিন উপজাতি প্রধান ছিলেন (হামাদানী ১০২৩, ৮১)। সম্রাজ্যের অন্যতম প্রভাবশালী ব্যক্তি ইমাদুল মুলকের কন্যা ছিলেন তাঁর মাতা। মাত্র আট বছর বয়সে তাঁর পিতা মারা যান। এরপর তাঁর নানা ইমাদুল মুলকের আশ্রয়ে লালিত-পালিত হয়ে শৈশবকাল অতিবাহিত করেন (আব্দুল মওদুদ ২০০৫, ১৯৬)। আমির খসরু দেহলভি আরবি, ফারসি, তুর্কি, হিন্দি ও সংস্কৃত প্রভৃতি ভাষায় শিক্ষা গ্রহণ করেন (আব্দুল মওদুদ, ২০০৫ : ২১৪)। শৈশবে তাঁর পিতা তাঁকে ক্যালিগ্রাফি চর্চার জন্য মজুবে প্রেরণ করেছিলেন। কিন্তু তাঁর কাছে ক্যালিগ্রাফি শিক্ষা পছন্দনীয় ছিল না। কাব্য সাধনা ছিল তাঁর একমাত্র লক্ষ্য (রহমান ১৯৯৭, ১৩)। ফলে তিনি আবুল কাসেম ফেরদৌসি, আনওয়ারি, নিজামি গাঞ্জুবি, হাকিম সানাই প্রমুখ ইরানি কবিদের কবিতা পাঠ করেন এবং তাঁদের অনুকরণে কবিতা রচনা শুরু করেন। তাঁর কাব্যে মিস্তি ভাষা ও কথা-কারণার্থের কারণে তাঁকে ভারতবর্ষের সাদি উপাধীতে ভূষিত করা হয়েছে (তামীমদারী ২০০৭, ৫৫)। এ ছাড়াও তাঁর ব্যাকরণ, ফিকাহ, তাফসির, কুরআন, জ্যোতির্বিদ্যা ও দর্শনশাস্ত্রেও বেশ দখল ছিল (আব্দুল মওদুদ ২০০৫, ১১৪)। ভারতবর্ষে সুলতানি শাসনামল তথা ত্রয়োদশ ও চতুর্দশ শতকের গোড়ার দিকের ইতিহাস, দিল্লি তথা সমগ্র ভারতের সমাজ-সংস্কৃতি, ধর্ম ও প্রকৃতি এবং সাধারণ মানুষের জীবন আচরণ উঠে এসেছে তাঁর কাব্য ও অন্যান্য রচনায়। তাঁর রচনার মাধ্যমে মধ্যযুগীয় ভারতীয় মুসলিম সভ্যতার ছবি সুস্পষ্টভাবে প্রতিভাত হয়। তিনি ত্রয়োদশ ও চতুর্দশ শতাব্দীর ভারতীয় মুসলিম সভ্যতা, ধর্ম, নীতিশাস্ত্র, কলাশাস্ত্রের ধারা এবং সমৃদ্ধশালী মুসলমানদের দরবারি তালিম এমন সার্থকভাবে বর্ণনা করেছেন যা তৎকালীন ভারত ও পারস্য সাহিত্যের অন্য কারো পক্ষে সম্ভব হয়নি (ইসলামী বিশ্বকোষ ২০০৫, ৪৬৭)।

আমির খসরু দেহলভি'র কাব্য প্রতিভার ন্যায় সংগীত প্রতিভাও ছিল অসামান্য। তাঁকে সুর সম্রাট উপাধিতে ভূষিত করা হয়। ভারতীয় সংগীত জগতে তিনি ছিলেন গুরু বা সম্রাট (সবুর খান ২০২১, ২১৮)। তিনি সংগীতে বহু রাগ ও তাল সৃষ্টি করেন এবং একাধিক বাদ্যযন্ত্র উদ্ভাবন করেন। তিনি পারস্য সংগীতের সাথে ভারতীয়

আমির খসরু দেহলভি: কাব্য ও কবিমানস

সংগীতের মিতালী ঘটিয়ে নতুন গীতরীতি প্রবর্তন করেন (রহমান ১৯৯৭, ৫০)। আমির খসরু দেহলভি পারস্য সুর মিশ্রণে ১২ টি রাগ সৃষ্টি করেছেন (সবুর খান ২০২১, ২১৮)। সুলতান মুহাম্মদ তুঘলক সিংহাসনে আরোহণের কয়েক মাস পর আমির খসরু দেহলভি ১৩২৪ খ্রিষ্টাব্দে ইন্তেকাল করেন। তাঁকে প্রখ্যাত সুফি সাধক নিজাম উদ্দিন আউলিয়ার মাজারের কাছে গিয়াসপুরে সমাহিত করা হয় (আব্দুস সাত্তার ১৯৮৭, ৫৭)।

সমকালীন রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট

কবি আমির খসরু দেহলভি গিয়াস উদ্দিন বলবনের (১২৬৬-৮৭ খ্রি.) রাজদরবারের সভাকবি নিযুক্ত ছিলেন (সবুর খান ২০২১, ২৭)। সুলতান গিয়াস উদ্দিন বলবনের দুই ছেলে ছিলো মোহাম্মদ খান ও নাসির উদ্দিন বুগরা খান। সুলতান গিয়াস উদ্দিন বলবনের রাজত্বকালে মোহাম্মদ খান মুলতান ও সিন্ধুর গভর্নর আর নাসির উদ্দিন বুগরা খান প্রথমে সামান্য পরবর্তীকালে বাংলার গভর্নর এর দায়িত্ব পালন করেন (আবদুল করিম ২০০৭, ১৩৯)। মোহাম্মদ খানের ছেলের নাম কায়খসরু আর নাসির উদ্দিন বুগরা খানের ছেলের নাম কায়কোবাদ। গৌড়ের শাসনকর্তা তুগরিলা খান দিল্লির অধীনতা অস্বীকার করলে বলবন লখনৌতি আক্রমণ করেন। আমির খসরু দেহলভি এ সময় বলবনের সাথে গৌড়ে গমন করেছিলেন (রহিম ১৯৮২, ১৫৯)। তুঘরিলাকে পরাজিত করে বলবন পুত্র বুগরা খানকে বাংলার শাসনকর্তা নিযুক্ত করেন। তিনি বাংলার স্বাধীন সুলতান ছিলেন। আমির খসরু দেহলভি ১৩০১ খ্রিষ্টাব্দে বাংলার আবহাওয়া পছন্দ না হওয়ায় বলবনের সঙ্গে দিল্লিতে চলে আসেন। বলবনের জ্যেষ্ঠ পুত্র মোহাম্মদ খানের সাথে কবির পরিচয় ঘটে এবং বন্ধুত্ব হয়। তিনি কবি আমির খসরু দেহলভিকে তাঁর রাজ্য মুলতানে নিয়ে আসেন এবং কুরআন রক্ষকের বিরল সম্মানজনক পদে নিযুক্ত করেন (বেগ, তারিখবিহীন, ৪৮৮)। মুলতানে প্রায় চার বছর সুখে শান্তিতে থাকার পর তাঁর ভাগ্যাকাশে মেঘের ঘনঘটা দেখা দেয়। ১৩০৪ সালের শেষের দিকে দুর্ধর্ষ তাতারদের সাথে প্রচণ্ড যুদ্ধে শাহজাদা মোহাম্মদ খান নিহত হন (আবদুল করিম ২০০৭, ১৪৪)। কবি আমির খসরু দেহলভি তাদের হাতে বন্দি হয়ে সাধারণ সৈনিকের গোলামে পরিণত হন। পরবর্তীকালে আমির খসরু অযোদ্ধার শাসনকর্তা খানজাহান হাতিম খানের রাজ দরবারে উপস্থিত হন। হাতিম খান কবিকে সাদরে বরণ করে নেন। কবি সুলতান কায়কোবাদ ও বাংলার শাসনকর্তা পিতা বুগরা খানের আপোষ ও মিলনের চেষ্টা করেন। হাতেম খানের সাথে আমির খসরু দেহলভি এ ঐতিহাসিক মিলনে উপস্থিত ছিলেন। তিনি কায়কোবাদের অনুরোধে দিল্লির দরবারে আগমন করেন এবং কায়কোবাদ তাঁকে রাজকবি পদে ভূষিত করেন।

আমির খসরু কবি ও কাব্যমানস

আমির খসরু দেহলভি'র রচনাবলির সংখ্যা নিয়ে ঐতিহাসিকদের মধ্যে যথেষ্ট মতপার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। কারাগ, জার্মানি, মিশর, ইংল্যান্ড, ভারত, পাকিস্তানসহ পৃথিবীর বহু দেশে তাঁর রচনাবলি পাণ্ডুলিপি সংরক্ষিত থাকলেও অধিকাংশ জীবনীকারক, সাহিত্য সমালোচক ও বিশ্লেষকের ধারণা তাঁর সব পাণ্ডুলিপি সংগ্রহ করা যায়নি। তবে ধারণা করা হয় তিনি সর্বমোট ৯২টি গ্রন্থ রচনা করেছেন (Hardy P. 1960, 68)। পুরাতন ক্যাটালগগুলোতে আমির খসরু দেহলভি'র দিওয়ানের সংখ্যা চারটি উল্লেখ করা হয়। মিস্টার চার্লস রিও ১৮৮৩ খ্রিষ্টাব্দে যে গ্রন্থ তালিকা প্রস্তুত করেন তাতে সর্বপ্রথম আমির খসরু দেহলভি'র পাঁচটি দিওয়ানের পরিচয় পাওয়া যায় (ইসহাক খান ২০১২, ৩৯১)। আমির খসরু দেহলভি'র কাব্যগ্রন্থগুলো হলো:

تحفة الصغر (তুহফাতুস সিগার)

আমির খসরু দেহলভি'র তুহফাতুস সিগার প্রথম দিওয়ান গ্রন্থ। এটি তিনি কিশোরকালে তথা ১৬ বছর থেকে ১৯ বছর বয়সে রচনা করেছেন। তাঁর সংকলন হল তুহফাতুস সিগার। সুলতান গিয়াস উদ্দিন বলবনের শাসনামলে এ গ্রন্থটি রচনা করেন। এতে কাসিদা, গজল, মাসনভি, রুবাই ইত্যাদি আঙ্গিকের কবিতা অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। বেশিরভাগ গ্রন্থই সুলতান বলবন, শাহজাদা খান, শহীদ সুলতান মইজুদ্দিন কায়কোবাদ, সমকালীন আমির ও উজিরগণের প্রশংসায় রচিত। এই গ্রন্থে তিনি আধ্যাত্মিক গুরু খাজা নিজাম উদ্দিন আউলিয়ার গুণকীর্তন করেছেন (সবুর খান ২০২১, ১১৩)। নমুনা স্বরূপ নিম্নে এ কাব্যগ্রন্থের দু'টি পঙ্ক্তি তুলে ধরা হল যা আমীর খসরুর এই দিওয়ানের কাসিদা নিম্নোক্ত রুবায়ির মাধ্যমে শুরু করেন:

لوحى كه بر صحيفه گردون مصور است : توقيح آن بنام خداوند اكبر است
شد تحفت الصغر جو خطاب اين سواد را : از ذكر ذوالجلال سوادى منور است
(দেহলভি ১৯৮৯, ১৪)

মহাকাশের পাতায় অঙ্কিত যে ফলক
তা মহান খোদার নামের সেই স্বাক্ষর
হয় যদি ক্ষুদ্র উপহার খেতাব এই স্বাক্ষরতার
মহামহিয়ানের স্মরণে তা প্রোজ্জ্বল এক স্বাক্ষর
(সবুর খান ২০২১, ১১৪)

وسط الحيات (ওয়াসাতুল হায়াত)

আমির খসরু দেহলভি'র ওয়াসাতুল হায়াত দ্বিতীয় কাব্যসমগ্র। যা তাঁর ২৪ বছর থেকে ৩২ বছর সময়কালে রচিত। তিনি এই কাব্যগ্রন্থটি আধ্যাত্মিক গুরু খাজা নিজাম উদ্দিন আউলিয়া, গিয়াস উদ্দিন বলবনের জ্যেষ্ঠপুত্র শাহজাদা মোহাম্মদ খান, শহীদ সুলতান মইজুদ্দিন কায়কোবাদ এবং দরবারের অন্যান্য আমিরদের প্রশংসায় রচনা করেন (আলী ২০০৬, ১৭৩)। নিম্নে এ কাব্যগ্রন্থের একটি বেইত তুলে ধরা হলো:

ابتدا شد چون كتاب من بتوحيد خدا : هست اميدم كه بخشد ايزدم نور هدى
(দেহলভি ১৯৭৫, ১৭৩)

আমার গ্রন্থ যখন আরম্ভ করেছে আল্লাহর একত্ববাদের দ্বারা
আশা আমি করতেই পারি, আল্লাহ আমাকে দান করবেন পথের দিশা।

غرة الكمال (গুরাতুল কামাল)

আমির খসরু দেহলভি'র গুরাতুল কামাল তৃতীয় কাব্য গ্রন্থ। এই গ্রন্থটি তিনি তাঁর ২৪ বছর থেকে ৪৪ বছর সময়কালে রচনা করেন। এই গ্রন্থের শুরুতে তিনি একটি দীর্ঘ ভূমিকা সংযোজন করেছেন। যাতে তিনি স্বীয় জীবনের বহু ঘটনা উল্লেখ করেছেন। তিনি এই কাব্য গ্রন্থের ভূমিকায় ভারতীয় কবিদের প্রশংসা করেন। ভারতীয় কবিদের সাহিত্য, রচিবোধ ও কাব্যজগতের সুখ্যাতি তুলে ধরা হয়েছে (সবুর খান ২০২১, ১১৫)। তাঁর এই গ্রন্থে ৯০টি কাসিদা, নয়টি মাসনভি, বেশ কিছু গজল, রুবাই এবং কেতআ রয়েছে। কবিতাগুলো ১২৯৫ খ্রিষ্টাব্দে তাঁর বন্ধু তাজউদ্দিন জাহিদ, মাওলানা শিহাব উদ্দিন এবং আলাউদ্দিন সংগ্রহ করেন। এ কাব্যগ্রন্থটি তিনি আনওয়ারি, খাকানি, জহির ফারিয়াবির অনুকরণে রচনা করেন (রহমান, ১৯৯৭ : ৩১)।

আমির খসরু দেহলভি: কাব্য ও কবিমানস

নিম্নে এ কাব্যগ্রন্থের একটি শ্লোক দেয়া হলো:

اگر صواب یکی از کمال طبع ست این
وگر خطا ست یکی از دروغ شعر است آن
(দেহলভি ১৯৭৫, ১৯)

যদি শুদ্ধ হয় (এক শ্লোক) তাহলে এর সম্মান সম্পাদকের প্রাপ্য
আর যদি ভুল হয় তাতে তাহলে কবিতার মিথ্যার বৈশিষ্ট্য।

باقیه نقیہ (বাকিয়ে নাকিয়ে)

আমির খসরু দেহলভি'র *বাকিয়ে নাকিয়ে* তাঁর চতুর্থ দিওয়ান গ্রন্থ। এই গ্রন্থটিতে তাঁর ৫০ বছর থেকে ৬০ বছর বয়সকালে রচিত কবিতাসমূহ সংকলিত হয়েছে (ইসাহাক খান ২০১২, ৪২৩)। এই কাব্যগ্রন্থে ৬৩টি কাসিদা, ১৬৫টি মাসনভি, ২০০টি কেতআ, ৫৭০টি গজল, ৩৬০টি রুবাই রয়েছে। যা তিনি সুলতান আলাউদ্দিন খিলজির মৃত্যুর পর রচনা করেন। এ গ্রন্থের অধিকাংশ কাসিদা সুলতান আলাউদ্দিন খিলজির প্রশংসায় রচিত (সবুর খান ২০২১, ১১৭)।

নিম্নে এ কাব্যগ্রন্থের একটি বেইত দেয়া হলো:

خرد مجوی ز خسرو که اهل معنی را
نظر به عشق حقیقت، بود نه عقل مجاز

(<https://ganjoor.net/khosro/gozide/ghazalamkh/sh1127>)

খসরুর মত অধম থেকে তালাশ করো না জ্ঞান,
জ্ঞানীদের দৃষ্টি থাকে ষাঁটি প্রেমের প্রতি, নির্মোহ জ্ঞানের দিকে নয়।

نهایت الکمال (নেহায়াতুল কামাল)

আমির খসরু দেহলভি'র *নেহায়াতুল কামাল* কাব্যগ্রন্থটি ৫০ থেকে ৬৪ বছর বয়সকালে রচিত কবিতাগুলোর সংকলন। এ গ্রন্থের ভূমিকায় আল্লাহ, রাসুল (সা.) এবং আধ্যাত্মিক গুরু খাজা নিজাম উদ্দিন আউলিয়ার প্রশংসা করেছেন। এটি তাঁর পঞ্চম দিওয়ান গ্রন্থ। এ গ্রন্থের বেশ কিছু কবিতা শাহজাদা ইব্রাহিম, গিয়াস উদ্দিন তুঘলক, মোহাম্মদ বিন তুঘলক ও শাহজাদা বাহারামের উদ্দেশ্যে রচিত। অন্যগুলো শাহজাদা মোবারক শাহ প্রসঙ্গে রচিত। এগুলোর মধ্যে দু'টি কবিতা বেশ উপভোগ্য। একটির নাম *শিফাতুল আসহাব*। যা মোহাম্মদ বিন তুঘলকের উদ্দেশ্যে রচিত। অন্যটি তাজ উদ্দিন জাহিদের উদ্দেশ্যে রচিত (সবুর খান ২০২১, ১১৮)। আমির খসরু দেহলভি সম্পর্কে তাঁর বিপক্ষ দল যে অভিযোগ ও সমালোচনা করেছেন, তার জবাবে তিনি এ কাব্য রচনা করেন। এ কাব্যগ্রন্থে গজলের পূর্বে কয়েকটি কবিতা রয়েছে (রহমান ১৯৯৭ : ৩২)।

নিম্নে এ কাব্যগ্রন্থের একটি বেইত দেয়া হলো:

آمده بهار مشک دم، سنبل دمید و لاله هم
سبزه به صحرا زد قدم، سرو روان من کجا

(شماره ۱۵ « غزلیات » امیر خسرو دهلوی « سیمین ساق

বসন্তের সুঘ্রাণে বিমোহিত দিগন্ত
সম্মুল, লালাও ছড়িয়ে পড়েছে চতুর্দিক অথচ আমি কোথায়?

مطلع الانوار (মাতলাউল আনওয়ার)

আমির খসরু দেহলভি নিজামি গাঞ্জুবির মাখ্যানুল আসরার অনুকরণে ১১৭৫ খ্রিষ্টাব্দে মাতলাউল আনওয়ার গ্রন্থটি রচনা করেন। এই গ্রন্থে অধ্যাত্মবাদের বিভিন্ন স্তর সম্পর্কে বর্ণনা রয়েছে। সৃষ্টি ও গ্রন্থার মধ্যে সম্পর্ক স্থাপনের মাধ্যমসমূহ কাব্যাকারে উপস্থাপন করেছেন। তিনি এই গ্রন্থে আত্মকেই কেন্দ্রবিন্দুতে ঠাঁই দিয়েছেন। কবি আমির খসরু দেহলভি মাতলাউল আনওয়ার গ্রন্থটি ৬৯৮ হিজরি মোতাবেক ১২৯৮ খ্রিষ্টাব্দে রচনা সমাপ্ত করেন (সবুর খান ২০২১, ১৩৯)। এই গ্রন্থে তিনটি মোনাজাত এবং কিছু উপদেশ প্রদান করা হয়েছে। নিম্নে এ কাব্যগ্রন্থের দুটি পঙতি তুলে ধরা হলো:

گل من سبزه زاری کرد پیدا : زمانه نوبهاری کرد پیدا
در این موسم که از تأثیر نوروز : جهان نو روزگاری کرد پیدا
(<https://ganjoor.net/khosro/gozide/ghazalamkh/sh10>)
হরিদাভ বাগানে ফুটেছে আমার ফুল, নতুন বসন্ত খুজে পেয়েছে সে।

নওরোজের প্রভাবে প্রভাবিত এ মৌসুম, নতুন পৃথিবী খুজে পেয়েছে নতুন সময়।

شیرین و خسرو (শিরিন ওয়া খসরু)

নিজামি গাঞ্জুবির দ্বিতীয় মাসনভি কাব্যগ্রন্থ খসরু ওয়া শিরিন এর অনুসরণে আমির খসরু দেহলভি ১৩০০ খ্রিষ্টাব্দে তাঁর খামসার দ্বিতীয় মাসনভি শিরিন ওয়া খসরু রচনা করেন। নিজামি ১১৭৭ খ্রিষ্টাব্দে তাঁর খসরু ওয়া শিরিন রচনা শুরু করেন এবং ১১৮৪ খ্রিষ্টাব্দে রচনা শেষ করেন (আতাউল্যাহ ২০১১, ৮২)। আমির খসরু দেহলভি এই গ্রন্থটি আরসালান এর নামে উৎসর্গ করেন। এটি রাজনৈতিক ও রোমান্টিক প্রেম উপাখ্যান। শাহজাদা খসরু, শাহজাদি শিরিন ও সমাজের নিম্নশ্রেণীর ফরহাদ তিন জনের প্রেমকে কেন্দ্র করে এই মাসনভি গ্রন্থটি রচিত। নিম্নে এ কাব্যগ্রন্থের দুইটি বেইত উল্লেখ করা হলো:

شنیدم کز ره فرمانروایی : زنی دارد بر ارمن پادشاهی
امورش از رقمهای مسلسل : به توقیع مهین بانو مسجل
(দেহলভি, ১৩৬৩: ২৬৮)

শুনেছি তো আছে রাজ্য শাসনের পথে, আরমেনিয়ায় এক নারী বাদশাহীর রথে

তার শাসনের সুনাম নানা পরম্পরায়, মাহিন বানুর কীর্তি পর্যন্ত গড়ায়।

(সবুর খান ২০২১, ১৫০)।

আরো কয়েকটি বেইত দেয়া হলো,

خداوندا دلم را چشم بگشای
به معراج یقینم راه بنمای
به رحمت باز کن گنجینه جود
دروغم خوان بشادروان مقصود

(<https://ganjoor.net/khosro/gozide/khosro-shirin2/sh1>)

مجنون و لیلی (মজনুন ওয়া লাইলি)

আমির খসরু দেহলভি ১৩০১ খ্রিষ্টাব্দে নিজামি গাঞ্জুবির খামসার তৃতীয় মাসনভি কাব্যগ্রন্থ লাইলি ওয়া মজনুন এর অনুকরণে তাঁর খামসা কাব্যের মাসনভি গ্রন্থ মাজনুন ওয়া লাইলি রচনা করেন। এ মাসনভি গ্রন্থের বেইত সংখ্যা

আমির খসরু দেহলভি: কাব্য ও কবিমানস

২৬৬০টি (সাফা ১৩৭৩, ৭৮৪)। শিরওয়ানির বাদশা আবুল মোজাফ্ফারের অনুরোধে ১১৯৭ খ্রিষ্টাব্দে ৪৭০০টি বেইতে তাঁর এ কালজয়ী প্রেমোপাখ্যান রচনা সম্পন্ন করেন। এ কাব্যগ্রন্থটি লাইলি ওয়া মজনু এর অমর প্রেম কাহিনীকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠেছে। এই মাসনভির মূল চরিত্র মজনুনের প্রকৃত নাম ছিল কায়েস বিন মুলুহ বিন মুজাহেম। তিনি ছিলেন আরব বণিক আমল গোত্রের লোক আর লাইলি ছিলেন ভিন্ন গোত্রের সা'দ এর কন্যা। লাইলির প্রেমে কায়েস এতটাই উন্মাদ হয়েছিল যে, লোকেরা তাকে মজনুন বা উন্মাদ বলে ডাকত। কায়েসের এই অবস্থা দেখে তাঁর পরিবার লাইলির পরিবারের নিকট বিবাহের প্রস্তাব নিয়ে যায়। কিন্তু লাইলির বাবার অমতের কারণে তা নিষ্ফল হয়। ফলে উভয় গোত্রের মধ্যে এমন দ্বন্দ্ব শুরু হয় যা যুদ্ধের রূপ নেয়। এই গোত্রীয় যুদ্ধ যদিও উভয়পক্ষে বেশ কিছু হতাহতের ঘটনা ঘটে। আমির খসরু দেহলভি মূল গল্পের পাশাপাশি শাখা গল্প হিসেবে গোত্র যুদ্ধের বর্ণনা এখানেই শেষ করেন। কারণ যুদ্ধে লাইলি ও মজনুর প্রেমের কোনো রকম প্রভাব পড়েনি এবং এতে তাঁদের উভয়ের প্রেমাসক্তির কমতি ঘটেনি (সবুর খান ২০২১, ১৫৬)। নিম্নে এ কাব্যগ্রন্থের কয়েকটি বেইত তুলে ধরা হলো:

লিলী نامی که مه غلامش : خالشی نقطی از نقش نامش
مشعل کش آفتاب و انجم : دیوانه کن پری و مردم
تاراج گر متاع جانها : بنیاد شکاف خان و مانها
سلطان شکر لبان آفاق : لشکر شکن شکیب عشاق
گردن زن عاقبت فروشان : تشویش ده صلاح کوشان
سر تا به قدم کرشمه و ناز : هم سرکش حسن و هم سر انداز
(দেহলভি ১৩৬২, ১২৯)

লাইলি নাম তার, চাঁদ তার দাসী
কালো তিলখানি তার নামের উল্লাসী
মশালবাহী সে সূর্য ও নক্ষত্রাশির
পরী ও মানুষের সে পাগল-প্রয়াসী
জীবন-সামগ্রীর সে লুণ্ঠনকারী
পরিবার-পরিজনের ভিতে চিড়ধারী
মিষ্টভাষীদের দেশের সে সুলতান
প্রেমিকদের ধৈর্যের ফৌজ করে খান খান
পরিণাম-বিক্রেতাদের সে শিরচ্ছেদী
কল্যাণকামীদের সে দুশ্চিন্তাদারী
আপাদমস্তক তার কারিশমা-লাজুকতা
অবাধ্য সুন্দরী, তার অসীম সাহসিকতা!

هشت بهشت (হাশত বেহেশত)

নিজামি গাঞ্জবির চতুর্থ মাসনভি কাব্যগ্রন্থ হাফত পেইকার এর অনুকরণে আমির খসরু দেহলভি তাঁর হাশত বেহেশত রচনা করেন। এটি তাঁর পঞ্চম বা সর্বশেষ মাসনভি কাব্যগ্রন্থ। তিনি ৭০১ হিজরি মোতাবেক ১৩০৩

খ্রিষ্টাব্দে এই গ্রন্থটি রচনা সম্পন্ন করেন। তখন তাঁর বয়স ছিল ৫১ বছর (সবুর খান ২০২১, ১৬৯)। নমুনা স্বরূপ নিম্নে এ কাব্যগ্রন্থের একটি বেইত দেয়া হলো:

سال هجرش یکی و هفتصد بود : کین بنا برد سر به چرخ کبود
(দেহলভি ১৩৮৫, ২৭)

হিজরি সাল ছিল সাতশত এক

যখন এই রচনা পৌঁছলো নীলাভ চক্রে মাথায় (সবুর খান ২০২১, ১৬৯)।

আইনে সেকান্দারি (আইনে সেকান্দারি)

আমির খসরু দেহলভি আইনে সেকান্দারি নিজামি গাজুবি পঞ্চম মাসনভি কাব্যগ্রন্থ ইসকান্দার নামা এর অনুকরণে ১৩০০ খ্রিষ্টাব্দে রচনা করেন। বহুকাল থেকেই ফারসি সাহিত্যে গল্পের মাধ্যমে বিশেষ কোনো চিন্তা দর্শন বা আধ্যাত্মিক তত্ত্ব বর্ণনায় কবিগণ বিভিন্ন ঐতিহাসিক ঘটনার আশ্রয় নিয়েছেন। ইসকান্দার বা আলেকজান্ডার দ্যা গ্রেটের জীবনের ঘটনাবলি সেগুলোর অন্যতম। কবি নিজামি গাজুবি তাঁর সেকান্দার নামা কাব্যগ্রন্থে আলেকজান্ডার দ্যা গ্রেটের জীবন কাহিনী চমৎকারভাবে ফুটে তুলেছেন। আলেকজান্ডারের আধ্যাত্মিক জীবনকে তিনি তাঁর কাহিনীকাব্যে তুলে ধরেছেন। আমির খসরু দেহলভি তাঁর আইনে সেকান্দারি গ্রন্থে আলেকজান্ডারের জীবনী ও তাঁর মহানুভবতার বর্ণনা করেছেন (সবুর খান ২০২১, ১৬১)। বাদশা জুলকারনাইনের কাহিনীর বর্ণনার সাথে মিশে গিয়ে তা আরবদের থেকে ইরানিদের কাছে পৌঁছে (সাফা ১৩৬৩, ৯০)। নিম্নে এ কাব্যগ্রন্থের দু'টি বেইত তুলে ধরা হলো:

نخست آرم از رزم خالقان سخن : که دیدم به تاریخهای کهن
نظامی که کرد آن جریده نگاه : در آشتی زد میان دو شاه
(দেহলভি ১৩৬২, ৪৩৩)

প্রথমে নিয়ে এসেছি খাকানদের যুদ্ধের কথা
যে কাহিনীতে ভরে আছে পুরোনো ইতিহাসের পাতা
সেই পত্রে নিজামি করেছে দৃষ্টিপাত
দুই বাদশাহের মাঝে করেছে সমঝোতা।

ক্বেরানুস সাদাইন (ক্বেরানুস সাদাইন)

আমির খসরু দেহলভি'র প্রথম ঐতিহাসিক মাসনভি গ্রন্থ হল ক্বেরানুস সাদাইন। তিনি সুলতান কায়কোবাদের নির্দেশে ১২৮৯ খ্রিষ্টাব্দে গ্রন্থটি রচনা করেন। এতে ৬৯৪৪টি বেইত রয়েছে। এ কাব্যগ্রন্থটি তিনি মাত্র ছয় মাসে রচনা সম্পন্ন করেন (মোকাদ্দামে, ১৯১৮ : ৫৭)। এ মাসনভি গ্রন্থটির প্রধান আলোচ্য দুটি চরিত্র বাংলার সুলতান নাসির উদ্দিন মোহাম্মদ বুগরা খান অপরজন তাঁর পুত্র সুলতান মইজুদ্দিন কায়কোবাদ। ক্বেরানুস সাদাইন এর অর্থ হচ্ছে দু'টি তারকার মিলন। পিতা ও পুত্রের মিলনকাহিনীকে অতি চমৎকারভাবে বর্ণনা করেন (আব্দুল করিম, ২০০৭: ৫২)। নিম্নে এ কাব্যগ্রন্থের দুইটি বেইত দেয়া হলো:

این سخن چند که بیخواست ست : شاعری نیست کریم راست ست
گرچه چنین راست نباید نهفت : راست بی هست نتوانش گفت
(দেহলভি ১৯৫৪, ২৬)

আমির খসরু দেহলভি: কাব্য ও কবিমানস

এই ক'টি কথা অকারণ নয় তো
কবিত্ব নয় এতো মহানের মহা সত্য
যদিও এমন সত্য করা যায় না গোপন

অস্তিত্বহীন সত্য করা যায় না বর্ণন (সবুর খান ২০২১, ১৭৭)।

আরো কয়েকটি বেইত,

شکر گویم که به توفیق خداوند جهان بر سر نامه ز توحید نوشتم عنوان
نام این نامه والاست قران السعدين کز بلندیش به سعدین سپهر ست قران
(দেহলভি ১৯১৭, ১২)

শুকরিয়া করি পৃথিবীর স্রষ্টার,

যার তৌফিকে আমি তৌহিদের নামগুলো শিরোনামরূপে লিখতে সক্ষম হয়েছি।

এই কবিতার নাম দিয়েছি দুই সৌভাগ্যের মিলনমেলা।

আকাশগমে সৌভাগ্যের তারকা উদিত হওয়াতেই এই মিলন সম্ভব হয়েছে।

مفتاح الفتوح (মেফতাহুল ফুতুহ)

আমির খসরু দেহলভি'র দ্বিতীয় ঐতিহাসিক মাসনভি গ্রন্থ মেফতাহুল ফুতুহ। তিনি গ্রন্থটি ১২৯১ খ্রিষ্টাব্দে রচনা করেন। তিনি এই সময় জালাল উদ্দিন খিলজির সভাকবি ছিলেন। এই ঐতিহাসিক কাব্যগ্রন্থে সুলতান জালাল উদ্দিন ফিরোজ খিলজির চারটি বিজয়ের বর্ণনা রয়েছে। এই গ্রন্থটিকে আমির খসরু দেহলভি তৃতীয় দেওয়ান গুরাতুল কামাল এর অন্তর্ভুক্ত করেন। নিম্নে এ কাব্যগ্রন্থের বয়েত নমুনা হল:

گفتار در ثنای خداوند داد گر : کو باز می کند فیروزی و ظفر
(দেহলভি ১৯৫৪, ৮)।

আমার সকল কথা মহানদাতা স্রষ্টার প্রশংসায় নিবেদিত

যিনি উন্মোচন করেন বিজয় ও সফলতার দ্বার।

دولرانی خضر خان (দেভল রানি খিজির খান)

আমির খসরু দেহলভি'র তৃতীয় ঐতিহাসিক মাসনভি কাব্যগ্রন্থ হচ্ছে দেভল রানি খিজির খান। তিনি ৭১৫ হিজরিতে এ কাব্যগ্রন্থটি রচনা সম্পন্ন করেন। এ কাব্যগ্রন্থের বেইত সংখ্যা ৪২০০টি। এই ঐতিহাসিক গ্রন্থে শাহজাদা মোবারক খান কর্তৃক শাহজাদা খিজির খানের হত্যাকাণ্ড এবং খসরু খান কর্তৃক মোবারক খানের হত্যাকাণ্ডের বর্ণনা করা হয়েছে। খিজির খান ও দেভলাদেবির প্রেম ও বিয়ে পর্যন্ত প্রথমে রচিত হয়। আলাউদ্দিন খিলজির অসুস্থতা খিজির খানের গোয়ালিয়ার দুর্গে বন্দীজীবন, তাঁকে অন্ধকরণ, মালিক কাফুরের বিশ্বাসঘাতকতা, মালিক কাফুরের বন্দী জীবন, ফরিদ ও সাদিখানের পরিণতি অংশ পরে সংযোজন করা হয়েছে। ফলে এই গ্রন্থটি মহাকাব্যের আকার ধারণ করেছে (সবুর খান ২০২১, ১৮৯)। নিম্নে এ কাব্যগ্রন্থের কয়েকটি বেইত তুলে ধরা হলো:

چه خوش باشد در آغاز جوانی : دو بیدل را بهم سودای جانی
خضر خان و دول رانی درین کار : دو دل بودند یکدیگر گرفتار
کنون حرفی که من خواندم درین لوح : چنین بخشد به دلها راحت و روح

که چون آمد دولرانی به درگاه : بشارت یافت از بخت نکوخواه
(دهلوزی ۱۵۹۵, ۸۵)

(<https://rasekhoon.net/article/show/175412>)

কত আনন্দের বিষয় যে যুগ যৌবনের প্রারম্ভে, যে দুইটি মৃত হৃদয় জাগ্রত হয়েছে জান বা আত্মা
দেভল রানি এবং খিজির খান এই পৃথিবীতে, দুটি হৃদয় একটি দেহে গ্রেফতার হয়েছে।
আমি এখন যে কথাই বলবো তাদের সম্পর্কে, শুনে সকল শ্রোতার হৃদয় আনন্দে উজ্জ্বলিত হবে।
যখন দেভল রানি আসলো খিজির খানের দরবারে, তখন সুসংবাদ পেল সৌভাগ্যের।

تغلق نامه (তুঘলক নামা)

আমির খসরু দেহলভির ঐতিহাসিক মাসনভি কাব্যগ্রন্থ তুঘলক নামা পঞ্চম ও সর্বশেষ রচনা। তিনি সুলতান গিয়াস উদ্দিন তুঘলকের রাজত্বের ঘটনাকে কেন্দ্র করে এই মাসনভি গ্রন্থটি রচনা করেন। এতে সুলতান আলাউদ্দিন খিলজির বংশধরের প্রতি অত্যাচার, খসরু খানের পরাজয় ও তার হত্যার ঘটনা বর্ণনা করা হয়েছে (রহমান ১৯৯৭, ৩৮)।

উপসংহার

আমির খসরু দেহলভি ত্রয়োদশ ও চতুর্দশ শতকে ভারতবর্ষের প্রতিভাবান ও নির্ভরযোগ্য ঐতিহাসিকদের মধ্যে সবার শীর্ষে ছিলেন। তিনি দিল্লির বলবন খিলজিসহ মোট সাতজন নৃপতি যথা গিয়াস উদ্দিন বলবন, মুইজ উদ্দিন কায়কোবাদ, জালাল উদ্দিন খিলজি, আলাউদ্দিন খিলজি, কুতুব উদ্দিন মোবারক শাহ খিলজি, গিয়াস উদ্দিন তুঘলক এবং মোহাম্মদ বিন তুঘলকের শাসনকাল প্রত্যক্ষ করেন। তিনি তাঁদের প্রত্যেকের রাজদরবারের সভাসদ এবং সভাকবির মর্যাদায় সমাসীন ছিলেন। তাই সুলতানি শাসন আমলের ঐতিহাসিক ঘটনাবলি প্রত্যক্ষ করার যে অভিজ্ঞতা অর্জন হয়েছিল ভারতবর্ষে আর কোনো কবি, সাহিত্যিক, ঐতিহাসিকদের পক্ষে তা অর্জন করা সম্ভব হয়নি। বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী আমির খসরু দেহলভি যথার্থ একজন প্রতিভাবান কবি ছিলেন। তাঁর পরবর্তী সময়ে ভারতবর্ষে যে সকল কবি সাহিত্যিক জন্ম নিয়েছে তাঁদের প্রত্যেকের উপর আমির খসরু দেহলভির প্রভাব সুস্পষ্ট। তাই আমির খসরু দেহলভি সম্পর্কে বলা যায়, তিনি একজন কবি, সাহিত্যিক, দার্শনিক, ভাষাবিদ, সংগীতজ্ঞ, গায়ক ও সুফি-সাধক ছিলেন। ভারতবর্ষে তাঁর সমসাময়িক আর কাউকে এত গুণের অধিকারী খুঁজে পাওয়া যায় না। এমনকি তাঁর পরবর্তী শতাব্দীতেও এমন অসামান্য প্রতিভার অধিকারী পাওয়া দুষ্কর। আমির খসরু দেহলভি যে সাহিত্যকর্ম বা সৃষ্টিসম্ভার রেখে গেছেন, সময়ের বিবর্তনে সেগুলোর আবেদন বিন্দুমাত্রও কমেনি; বরং যত দিন যাচ্ছে উপমহাদেশের শিল্প-সাহিত্য ও সংস্কৃতিতে তিনি ততই প্রয়োজনীয়, গুরুত্বপূর্ণ ও প্রাসঙ্গিক হয়ে উঠেছেন।

তথ্যপঞ্জি

১. আব্দুস সাত্তার। ফারসি সাহিত্যের কালক্রম। ঢাকা: ইসলামী ফাউন্ডেশন, ১৯৮৭।
২. আবদুস সবুর খান। ভারতবর্ষের অসামান্য কাব্য ও সংগীত প্রতিভা আমির খসরু। ঢাকা: রোদেলা প্রকাশনী, ২০২১।
৩. আবদুল করিম। বাংলার ইতিহাস সুলতানি আমল। ঢাকা: জাতীয় সাহিত্য প্রকাশ, ২০০৭।

আমির খসরু দেহলভি: কাব্য ও কবিমানস

৪. মো: আতাউল্লাহ। *নিজামি গাঞ্জুবি: কাব্য-প্রতিভা ও প্রেমদর্শন* (অপ্রকাশিত পিএইচ.ডি অভিসন্দর্ভ)। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, ২০১১।
৫. এম এ রহিম (অনূদিত, মোহাম্মদ আনিসুজ্জামান)। *বাংলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস*, প্রথম খন্ড, ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৮২।
৬. মির্জা মকবুল বেগ। *আদব নাময়ে ইরান*। লাহোর: নিগারেশাত, [তারিখবিহীন]।
৭. ইসমাইল মিরাজি মোকাদ্দামে। *কিরানুস সাদাইন*। আলিগড়: আলিগড় মুসলিম ইউনিভার্সিটি, ১৯১৮।
৮. *ইসলামী বিশ্বকোষ*, দ্বিতীয় খন্ড। ঢাকা: ইসলামী ফাউন্ডেশন, ২০০৫।
৯. হামাদানী মোহাম্মদ সাদিক দেহলভি কাশ্মিরী। *কালিমাতুস সাবিকিন*। ইসলামাবাদ: এনতেশারাতে মারকাযে তাহকিকাতে ফারসি ইরান ওয়া পাকিস্তান, ১৯৮৮।
১০. আব্দুল মওদুদ। *মুসলিম মনীষা*, ৫ম মুদ্রণ। ঢাকা: ইসলামী ফাউন্ডেশন, ২০০৫।
১১. খন্দকার আব্দুর রহমান। *আমির খসরু*। ঢাকা: বাংলা একাডেমি, ১৯৯৭।
১২. আহমাদ তামীমদারী (ড.)। (অনূদিত, তারিক জিয়াউর রহমান সিরাজী, মুহাম্মদ ঈসা শাহেদী)। *ফার্সী সাহিত্যের ইতিহাস*। ঢাকা: আল হুদা আন্তর্জাতিক প্রকাশনা সংস্থা, ২০০৭।
১৩. আমির খসরু দেহলভি। *তুহফাতুস সিগার*। ভারত: গুলজারবাগ লাইব্রেরি, পোতনা, ১৯৮৯।
১৪. নবাব হাজি মোহাম্মদ ইসহাক খান। *কার রেওয়াইয়ে তারতিবে কুল্লিয়াতে হযরত আমির খসরু দেহলভি*। ভারত: মাতবায়ে ইনস্টিটিউট আলিগড়, ১৯১৪।
১৫. আমির খসরু দেহলভি। *ওয়াসাতুল হায়াত*। আলিগড়: মুসলিম ইউনিভার্সিটি প্রেস, ১৯৭৫।
১৬. এ কে এম ইয়াকুব আলী। *মুসলমানদের ইতিহাস চর্চা*। ঢাকা: অবসর প্রকাশনা সংস্থা, ২০০৬।
১৭. আমির খসরু দেহলভি। *গুররাতুল কামাল*। লাহোর: ন্যাশনাল কমিটি বারাইসাত সাউসালা তাকরিবাত আমির খসরু, ১৯৭৫।
১৮. আমির খসরু দেহলভি। *শিরিন ওয়া খসরু*। পোতনা, ভারত: গুলজারবাগ লাইব্রেরি, ১৯৬৩।
১৯. আমির খসরু দেহলভি। *মজনুন ওয়া লাইলি*। পোতনা, ভারত: গুলজারবাগ লাইব্রেরি, ১৩৬২।
২০. আমির খসরু দেহলভি। *হাশত বেহেশত*। পোতনা, ভারত: গুলজারবাগ লাইব্রেরি, ১৩৮৫।
২১. আমির খসরু দেহলভি। *আইনে সেকান্দারি*। ইতিহাস বিভাগ, মুসলিম ইউনিভার্সিটি, আলিগড়, ১৩৬২।
২২. আমির খসরু দেহলভি। *কেরানুস সাদাইন*। ইতিহাস বিভাগ, মুসলিম ইউনিভার্সিটি, আলিগড়, ১৯৫৪।
২৩. আমির খসরু দেহলভি। *কেরানুস সাদাইন*। ইতিহাস বিভাগ, মুসলিম ইউনিভার্সিটি, আলিগড়, ১৯১৭।
২৪. আমির খসরু দেহলভি। *মিফতাহুল ফুতুহ*। ইতিহাস বিভাগ, মুসলিম ইউনিভার্সিটি, আলিগড়, ১৯৫৪।
২৫. আমির খসরু দেহলভি। *দেভল রানি খিজির খান*। লাহোর: ন্যাশনাল কমিটি বারাইসাত সাউসালা তাকরিবাত আমির খসরু, ১৯৭৫।
২৬. আমির খসরু দেহলভি। *তুঘলক নামা*। ডেকান, ভারত: মাতবায়ে উর্দু আরঙ্গবাদ, ১৯৩৩।
২৭. যাবিউল্লাহ সাফা, (ড.)। *তারিখে আদাবিয়াতে দার ইরান*। তেহরান: ছাপাখানে রামিন, ১৩৭৩।
২৮. Hardy.P. *Historians of Medieval India*. London: 1960.

The Chittagong University Journal of Arts and Humanities

২৯. Tanwir Ahmed. *A Short history of persian literature*, 2nd Edition. Colcutta: Naaz Book Depot, 1991.
২৯. বাকিয়ে নাকিয়ে, <https://ganjoor.net/khosro/gozide/ghazalamkh/sh1127>
৩০. দেভল রাণী খিজির খান, <https://rasekhoon.net/article/show/175412>
৩১. মাতলাউল আনওয়ার, <https://ganjoor.net/khosro/gozide/ghazalamkh/sh10>
৩২. শিরিন ওয়া খসরু, <https://ganjoor.net/khosro/gozide/khosro-shirin2/sh1>
৩৩. নেহায়াতুল কামাল, «سیمین ساق» امیر خسرو دہلوی «غزلیات» شماره ۱۵

Islamic Education and Islamization of Education in Bangladesh: A Critical Study

Dr. Mohammad Nayamat Ullah*

Abstract

Bangladesh is a developing and predominantly Muslim country with 170 million populations in South Asia. About 90% of the large populations are Muslims who believe in Islam. Although they are religious in spirit they are unable to practice Islam in all spheres of life because of the dominating and influential secular system of education prevailing in the country ever since the British colonial period. Apart from this, like other part of the Muslim world, the country witnesses numerous crises such as corruption, oppression, depression, extremism, violation of human rights, unethical activities among the young generation and so on. Due to educational dualism of the country and several shortcomings, both Islamic education and general education do not effectively serve in respect to both individual and social needs. The responsible people of the society feel concern regarding increasing above-mentioned problems. As the majority people of the country are religious in spirit, Islamic education and Islamization of education would create awareness among the people particularly, young generation about spirituality and rationality of Islamic guidelines and ensure remedy for the above-mentioned crises to a large extent. Islamic education is a process of transmission and transformation of Islam as a complete way of life, the beliefs, values, knowledge, skills and ideologies of Islam from one generation to the next. On the other hand, Islamization refers to the inculcation of Islamic world views in the body of knowledge. This study aims to focus on how to implement Islamic education and Islamization of education to minimize or remove dichotomy and compartmentalization between two streams of education systems and the graduates in Bangladesh. Hopefully, this research would be guideline for other Muslims of the world. A combination approach of historical, philosophical and analytical research methods will be employed in this study.

Introduction

Human prosperity and progress since the beginning of human creation depends on education. Similarly, any problem or crisis of the human beings to a large extent can be solved through education. At the outset of human creation, the Creator established this reality by bestowing upon

*Professor, Department of Arabic, University of Chittagong

human beings a superior status over all other creations by equipping them with knowledge. “And He (Allah SWT) taught Adam the names of all things; then He placed them before the angels, and said: Tell Me the names of these if you are right” (Al-Baqarah: 31). Global history witnessed that no nation could gain significant ascendancy without commensurate superiority in education and intellectual performance. Likewise at the very beginning of revelation to Prophet Muhammad (PBUH), Allah sent the command to read, which forms the foundation of education. Allah (SWT) says, “Read in the name of your Lord and Cherisher, who created” (Al-‘Alaq: 1).

Bangladesh is a predominantly Muslim country in South Asia and the majority of its populations wholeheartedly believe in Islam. Although they are religious in spirit, they are unable to practise Islam in all spheres of life because of the dominating and influential secular system of education prevailing in the country ever since the British colonial period (1757 AD). Due to several shortcomings, traditional Islamic education as well as modern education does not effectively serve in respect to both individual and social needs. Like other parts of the Muslim world, in Bangladesh dualistic education that leads to dichotomy in terms of mind set, worldview, personality etc. has been regarded vital crisis. In order to remedy from this crisis Islamization of education through various process has been felt immense need and has become an intellectual issue.

This study aims to focus on history of dualistic education system of Bangladesh, and how educational dualism has created dichotomy. Moreover, a brief account on Islamization, how Islamization of education would create awareness among the people particularly, young generation about spirituality and rationality of Islamic guidelines and then ensure remedy from the dichotomy and dualism gradually.

An Introduction to Bangladesh and its Educational System

Bangladesh is a developing and democratic Muslim majority country in South Asia. It is located at the north-eastern part of the Indian sub-continent. It is flanked by India on three sides; west, east and north with a small common border with Myanmar in the south east. In the south its only outlet is provided by the Bay of Bengal. The total area of the country is about 147, 570 sq. km (56,977 sq. miles). It is one of the most densely populated rural areas in the world with an average population density of 1,400 persons per sq. mile, or 1,237.51 persons per sq. km. The capital city Dhaka was established in 1608 AD during the reign of Mughal emperor Jahangir (1605-1625) which known as the city of mosques (Statistical Pocket Book Bangladesh-2018).

The history of traditional Islamic education or Islamization of education in Bangladesh is naturally connected with the advent of Islam in Bangladesh as well as in the Indian Sub-continent. Islam came in different parts of India at different times through several means. Islamic education was introduced in the Indian sub-continent through Arab Muslim traders who were the first carriers of Islam in India. The second way of Islamic education can be linked to the Muslim conquests of India. The common soldiers and the commanders were not only fighters, but were also teachers and preachers of Islam and Islamic learning. Muslim rule was first founded in the Indian sub-continent with the conquest of Sindh (now in Pakistan) in 711 by Muhammad Bin Qasim (d.715). The administrative boundaries of the Sind extended subsequently in the eighth and the ninth centuries to include most of the present territories of the Indian sub-continent. Almost

Islamic Education and Islamization of Education in Bangladesh: A Critical Study

the whole sub-continent came under the Muslim rule by the beginning of the thirteenth century. Since then the glorious Muslim rule remained uninterrupted up to 1757 when the British came into power and ruled India including Bengal for about two hundred years. The British rule came to an end on 14 August 1947 with the establishment of two independent sovereign states in the sub-continent, namely Pakistan and India. Present day Bangladesh, then came to be known as East Bengal and later as East Pakistan as one of Pakistan's provinces. Afterwards, in the bloody war of liberation, Bangladesh emerged as an independent sovereign state on the 16 December 1971.

After independence of Bangladesh in 1971, a radical change was made by the then new government in the constitution. Among four principles of the constitution secularism and socialism were included and subsequently reflected almost all ideological, economic and social aspects. The Government of Bangladesh, on the 26th July, 1972 set up an Education Commission with Dr. Mohammad Qudrat-i-Khuda as its Chairman to prepare a comprehensive scheme for new educational pattern suitable for the changed economic and social conditions of the country. The Commission submitted its final comprehensive report on the 30th May, 1974. The report considered Madrasah education or Islamic education as one-sided system of education. The comment was to a great extent undue because the report itself was one-sided and was indifferent towards Islamic education (Mijy, 2001).

The Structure of the Education System in Bangladesh

Like most of the Muslim countries of the world, there exist today two parallel systems of education in Bangladesh; one is traditional Islamic education or *Madrasah* Education and the other is western or modern secular education. At present, both systems are operative in Bangladesh. In terms of stages or levels, the whole education system of Bangladesh is classified into six levels; pre-primary of one-year schooling, primary of five years, junior secondary of three years, secondary of two years, higher secondary of two years and higher or tertiary of four-year/three-year education.

Tertiary education comprises of three to four years of formal schooling. After completion of HSC (Higher Secondary Certificate), a student can take admission to higher education and get qualified to enrol in three-year degree pass courses or four-year Bachelor's degree honours course in degree level college or in universities. Degree pass or honours Bachelor's degree holders are qualified to enrol in the Master's degree course which is one year for honours Bachelor's degree holders and two years for Degree pass Bachelor holders (<http://banbeis.gov.bd/data/index.php>, Retrieved on 26/9/2019).

Traditional Madrasah/Islamic Education

There are many educational institutions called *madaris* (plural of *madrasah*) offering traditional education in Islamic subjects or Islamic Sciences and working under the control of a Madrasah Education Board. *Madrasah* education is the unique representative of Islamic education in Bangladesh. *Madaris* are divided into two different types named *Alia* and *Qawmi* streams.

Alia Stream of Madrasah Education

The *Alia* *madaris* are government-controlled and funded. Bangladesh Madrasah Education Board is the supervising authority of all *Madaris* from *ibtidai* (primary) to *Alim* (higher secondary) levels while Islamic Arabic University is an affiliating university that is for all *Fazil* (Bachelor's degree)

and *Kamil* (Master's degree) *madaris*. Madrasah education is classified into six levels; *ibtidai* (primary) of five-year schooling, junior *dakhil* (junior secondary) of three years, *dakhil* (secondary) of two years, *Alim* (higher secondary) of two-years and *Fazil* (bachelor) of four-year/three-year and finally *Kamil* of one/two-year.

Alia madaris offer almost all subjects of Islamic Studies and modern subjects. From time to time, reforms in this type of education have been made. Efforts are being made to integrate the reformed *madrasah* into the general system of education where subjects like Arithmetic, English, Bengali, Science, etc. are taught, although the main emphasis is on Islamic Studies and Arabic. After passing the examination of the *Alim*, *madrasah* students can enrol at higher modern educational institutions like the university, Medical College and so on.

Qawmi Madrasah Stream

The *Qawmi madaris* are run completely by private management and supported by religious endowments like *zakat*, *sadaqa* and private donations. *Qawmi madaris* follow the Deoband madrasah of India in terms of curriculum. There is no government control over this type of *madaris*. The *Qawmi* system of madrasah education is classified into five levels; *Ibtidai* (Primary) of a five-year period, *Thanuwiyyah* (Secondary) of a five-year period, *Alim* (Higher Secondary) of a two-year period and *Fazilat/Tafzil* (Tertiary) of a four-year period.

Islamic Education

Islamic education is the overall development of the human personality ranging from intellectual, physical, mental and behavioural to innate, spiritual and moral so that s/he can perform the responsibilities and duties of being servants and vicegerents of the Almighty Allah (SWT). In another language, Islamic education refers to a lifelong process of transmission and transformation of the beliefs, values and ideologies of a particular nation from one generation to the next.

After independence in 1971, the people of Bangladesh hoped to establish a country of righteous citizens to give the younger generation a golden future, despite the fact that the secular intelligentsia tended to misrepresent the aspiration of the majority of the people. Their expectation was to form a fair and sound society where everybody would have an equal right to live a happy life. But unfortunately, corruption, human rights violations and injustice have reached sickening heights (Akhter, 2019).

With the influence of materialistic philosophy and technological advancement, life has become complex and corrupt. Members of the young generation are threatened with secularism, modernity, globalization, and un-Islamic culture and values. Consequently, the country is losing many of the traditional values and manners which are largely based on Islam. In order to address these crises, the society demands an all-round and well-balanced development of its entire student community. However, the authorities have not yet been able to introduce any such system of education which may lead the country and its population towards the right direction. It was solely due to this reason of imbalance as stated above that the products of the *madrasah* system of education are not generally regarded as proper useful citizens. On the other hand, the products of the secular education system are mostly ignorant of their own religious values and moralities (Ibrahimy, 1990).

Islamic Education and Islamization of Education in Bangladesh: A Critical Study

Educational Dualism and Dichotomy in Bangladesh

Educational dualism was first introduced during the period of British rule (1757-1947) and then chiefly two systems of education developed:

1. Western education, the purpose of which was to create some clerks and assistants who could help the English rulers in their administrative duties.
2. Traditional *Madrasah* education, which would enable *Madrasah* educated students to learn some particular aspects of Islam and would not make them feel the necessity of learning its other important aspects (Ibrahimi, 1990).

The two types of education produced two types of individuals leading to two different ideas and conflicting mind-sets. Those who obtained Western education were in the good looks of English ruling class and got employment under the Government while those who acquired *Madrasah* education did not get any material benefit in the Government sector even they did not get opportunity to fulfil their basic needs; for their theological education brought no remarkable material gain.

Still now, the system of education in Bangladesh has been divided into secular modern or general education and religious or *madrasah* education. The society has been deprived of true Islamic education due to the educational dualism of the two different systems of education being operated side by side in Bangladesh today. This dualistic education system was developed during the British colonial period (1757-1947). This system has remained largely unchanged since independence (1947-1971, 1971-till present). As such, it cannot be considered suitable for an independent developing nation. It is clear, therefore, that neither of the two systems of education currently operating in Bangladesh is entirely satisfactory. The divided and contradictory systems of education divide the nation and beget the tremendous problems in the society, yet no substantial changes were made in the system of education in Pakistan period (1947-1971) and Bangladesh (1971- present) (Nayamat Ullah, 2016).

Before British colonization (712-1757), Muslim education or Islamic education in India generally, and in Bengal particularly was one and comprehensive which was able to fulfil the needs of society. Western and eastern scholars and educationists agree to this fact unanimously. From time to time, changes and modification of curriculum occurred as per necessity. Any dissatisfaction concerning curriculum or education system from any section or corner is not recorded. Among the scholars and great reformers, Shah Waliullah Muhaddith Dehlawi, and Nizamuddin Shahlawi contributed to great extent to curriculum while among rulers, the emperor Akbar and Awrangzeb also contributed significantly.

Degrading Values

There are two types of values such as supreme values or belief system in Islam another is interactive values like honesty, sincerity, responsibility, and so on. The both types of values have been regarded as inseparable characteristics of Muslim individuals and society. Nowadays parents, conscious people of Bangladesh are very much concerned about the degrading of values particularly among young generation of the society. Suffice to state that almost all stakeholders feel the importance of value education in all levels of education system. But anybody of them or

education leaders and concerned authority could not clarify how to execute this vital issue for safety of whole nation from upcoming dangers.

Compartmentalization of Knowledge

According to Islamic epistemology all kinds of knowledge are from the Almighty Allah (SWT) and subsequently unity of knowledge is a true fact in Islam. So there is no scope to differentiate between various types of knowledge (Ayatul Kursi)

Reform of Madrasah Curriculum or Modernization

In some occasions, the call for madrasah curriculum reform is raised randomly by concerned officials like minister, secretary or other officials and educationists and intellectuals (Barkat et al.2011; Manzur, 2008). But it is not defined and determined explicitly as to what type of reform and to what extent or how it ought to be done. Similarly, this type of reform question was raised in the past and accordingly from time to time some reforms occurred but it did not reach the satisfactory level till now. The main point of these demands, particularly at the contemporary situations is related to the issues of the graduates of higher Islamic learning being incapable to respond to the social, cultural, political and economic issues of the nation. This demerit is ascribed to the shallow understanding of their own disciplines, deficiency in modern knowledge and language as well as other religions and cultures. Nevertheless, this system of education and its graduates are playing a significant part in preserving and safeguarding of Islamic culture in the society of Bangladesh.

As discussed previously, there is a dualistic educational system prevailing in Bangladesh which leads to conflict among the graduates of confronting systems of education with the exclusive dominance of the modern or general stream. On the other hand, several streams of Islamic education also exist where unity in terms of curriculum, aims and objective is quite impossible. It seems the problem of educational dualism cannot be solved easily in Bangladesh without effective initiatives by the government, educationists and intellectuals. Gradually the effect of this crisis has spread to the whole society and made it worse. In order to remedy the crisis, at least initial steps should be taken by creating awareness among the graduates, educationists and thinkers on Islamization and integration. Al-Attas emphasizes the concepts by introducing a course on Islamization, particularly at the tertiary levels (Daud, 1998).

Outcomes of Madaris

There are around sixteen hundred *Fazil* and Kamil MadÉris throughout the country and about one million students are studying in different levels. About 150 thousand students graduated from madaris. Unemployment is regarded a far-reaching malaise which causes deep impact upon the educational system, graduates' psychology, parents' attitudes and mass people perception over Islamic education. According to a survey report conducted by the Bangladesh Bureau of Statistics (dhakatribunecom/opin, 26 September 2019) 46% of higher educated graduates in Bangladesh are unemployed or jobless. This high unemployment figure is undoubtedly alarming and worrying for a nation. This state of affairs causes frustration among young generation and unrest in society. The reasons, as the newspaper analysed, are lack of clear aims and objectives of higher education, and that curriculum has not been developed from time to time according to the job market's requirements in the domestic and global context. Although this report focuses in general, the

Islamic Education and Islamization of Education in Bangladesh: A Critical Study

unemployment and under-employment problem might be more in the case of higher Islamic education graduates. There does not seem to be any concentrated efforts from the authority to take steps in solving the problem of unemployment. The researcher observes that the responsibility, firstly, goes to the teachers' community who design the curriculum at the university level. Sometimes different education commissions and committees are recommended for introducing befitting vocational courses in *madaris*, but no measures have been taken in implementing such recommendations. Of course, recently the government took initiatives to establish some vocational *madaris*.

The Failure of the Traditional Islamic Education System

Ahmad (2005) observes that "the characteristics of the *Madrasah* Education System are Islamic in nature but it has failed to meet the requirements of the present day" (p. 316). Any sort of science education is neglected in the *Qawmi madrasah* system. One can find the negative effects of these half-baked systems of education. The prevailing Islamic education system does not fulfil the national aspiration as the graduates are not granted sufficient scope to equip themselves with the modern arts and sciences, and thus remain unaware of modern knowledge and techniques. At the same time, *madrasah* graduates do not have in-depth knowledge of Islamic disciplines; they are also not well aware of the philosophical thoughts that are influential all over the world such as socialism, capitalism, secularism, Marxism and Darwinism. No curriculum has yet been developed to familiarize the students with the ideological, political and social impacts caused by these 'isms' over the last century throughout the world (Azharul Islam & Habibur Rahman, 2003).

The Crisis of Modern Secular Education

The decline in morality is a major problem of Bangladeshi society. The society is now fully immersed in corruption, hypocrisy, bribery and other immoral acts. Unethical attitudes and immoral activities among the people have become a big barrier for sound development. In the perspective of Bangladesh, Islamic worldview has always been the driving force for a moral based education system. However, due to the onset of secularism, there has been a decline in Islamic values in the society. Along with a lack of good governance, this has contributed to further deterioration in social values. The annual reports of Transparency International Bangladesh (TIB) on corruption provide explicit evidence as Bangladesh is represented as the corrupt country of the world. The prevailing modern secular education system more possibly has failed to uphold morality in the society. The graduates of this system, to a great extent, are concerned merely with their individual material gain, but do not acknowledge their own Islamic culture and legacy or spiritual aspects. The system of education has been divided into the so called secular education and Islamic religious education but in fact Bangladeshi people are deprived of true Islamic education (Ibrahimi, 1990; Hasan, 2004).

Alienation of Madrasah Graduates

Since the British rule (1757-1947) and during the Pakistan period (1947-1971) madrasah graduates were alienated more or less everywhere and they were suffering from inferiority complex and discrimination unfortunately. After independence of Bangladesh in 1971 it emerged as a secular country. As a result their problems had not been solved rather increased at the first few years of independence. However, through various reforming steps development of madrasah

education were initiated but regarding secular education system nothing had been done to minimize dichotomy. Salema Begum (2002) conducted an interview and some respondents viewed that madrasah graduates do not have same opportunities what the graduates of secular institutions get. The former like mainstream and the later are marginalized. For example, public services, job opportunity and so on.

Educational Dualism in Bangladesh and its remedy through Islamization

In the present system of education in Bangladesh there is dualism and dichotomy prevailing too deep rooted and tough to remedy from this crisis. Though this type of educational dichotomy more or less is found everywhere in the Muslim world the situation of Bangladesh is seemed quite different as the worst. It affects almost all spheres of lives individuals and the society. Almost eighty percent of the graduates educated in secular/general educational institutions. A graduate could not know how to recite the Holy Qur'an after study primary. Secondary, higher secondary, undergraduate and post-graduation let alone required knowledge about Islam as a Muslim. To overcome the problem overnight is quite impossible. Multidimensional comprehensive measures in the name of Islamization or in another name should be taken sincerely and wisely by the concerned scholars, organizations or research centres.

Islamization of Knowledge/Education

Islamization of knowledge is an intellectual movement and scholarly notion in order to remedy the malaise of Muslim *Ummah* such as dichotomy and dualism in personality and society. The conception of Islamization of knowledge was introduced almost more than four decades ago. It is still a new perception as well as complex and difficult to understand clearly to many scholars and students in some parts of the Muslim world and Bangladesh is supposed to be one of them. Haneef (2009, p 2) "considers it one of the more important intellectual movements of the 20th century,... It can certainly be considered one of the more credible and long standing contemporary Muslim response to modernity". A considerable number of literature works on this concept have been produced through conferences, seminars, discussion groups, and workshop all over the world. Academic activities in this direction have continued to increase and newer works are being added daily. Many studies have been conducted to examine and clarify the existing conceptions of Islamization. A good number of scholars and institutions are playing an important role in the field of Islamization of knowledge all over the world.

An Introduction to Islamization of Knowledge/Education

Islamization is the process through which an entity is transformed by the ideology or the teaching of Islam to become a new entity with Islamic features and characteristics. However, Islamization of knowledge and Islamization of education both is often used for same meaning though Islamization of education refers to the wider sense and the term Islamization of knowledge (IOK) is more familiar and known to all. Several Muslim scholars define this term of IOK in different ways. Haneef (2009, p16, 17) mentions as follows;

- 1) Islamization of Social Sciences that means to Islamize one area or category of knowledge.
- 2) Islamization of specific discipline, such as Islamization of economics that one discipline of the social science.

Islamic Education and Islamization of Education in Bangladesh: A Critical Study

3) Islamization of curriculum i.e. the content of programme in universities aimed at enhancement of Islamic perspective of different subjects.

4) Islamization of education which leads to Islamize whole system of education and societies.

On the other hand, many scholars define the notion in different ways that are as follows;

- a) The inculcation of Islamic world views in the body of knowledge.
- b) The process by which the whole body of human knowledge is particularized, classified, organized and systemized in conformity with Islamic epistemological principles (Osman Bakar).
- c) To synthesize the ethics of Islam or Islamic world view with different fields of modern knowledge.
- d) It refers to synthesizing the Islamic world-view with the secular system of knowledge.
- e) According to Nasr, "Islamization of knowledge means integrating various subjects into the Islamic worldview".

Islamic Worldview

As the inculcation of Islamic worldview and Islamic values in the body of knowledge without Islamic worldview cannot be imagined Islamization movement. The Islamic worldview is concerning God, man, society, nature, history and cosmic order. Islamic concepts of God, man, nature, and cosmic order are Islamic worldview. So the Islamic worldview refers to ontological aspect firstly which pertain to the theory of existence or being. The second is the epistemological aspect that is philosophical and studies the nature of knowledge, its sources and methodologies. It also highlights the unity of knowledge and different kinds of enumerations. The third is the theological aspect that constructs the Islamic belief system based on the unity of Divinity and thus, it creates *tawhidic* paradigm. The fourth is the axiological aspect that emphasizes certain key values underlying Islamic values system and is vital to achieving overall excellence.

Background

For a long time almost all Muslim worlds had been subjugated by the colonial powers. Muslims depended on the West for science and technology. This state of affair accelerated the process of westernization and secularization of modern knowledge acquired and assimilated uncritically by Muslims through the Western secular system of education. The Western and secular system of education secularized their minds and exacerbated the malaise of the Muslim *Ummah*. When almost all Muslim countries got independence from the colonial powers after the Second World War, Muslims became aware and raised pressure on their governments to solve their all problems based on Islamic perspective. At the end of the 19th century and first half of 20th century some Muslim scholars like Al-Afghani, Abduhu, Rida, and Iqbal realized backwardness of Muslim *Ummah* and stated and criticised their worse situations regarding the both intellectual and material. Accordingly they called to reform the society. They pointed out that the vital fact of almost all problems and the solution to these problems is knowledge and education. The problem is not in terms of ignorance or want of knowledge, but the problem is making the Western worldview as epistemological foundation rather than Islamic worldview (Haneef, 2009).

Many of the early Muslim scholars had devoted their intellectual energy to Islamize, recast, assimilate, reconstruct and develop knowledge of their time in accordance with the Islamic

worldview. They did not blindly accept knowledge from other civilization. They critically examined and isolated the foreign elements and key concepts which were in contradiction to the Islamic worldview from the body of knowledge and then infused it with Islamic elements and key concepts. Haneef (2009) stated that according to al-Faruqi the main internal reason of backwardness of the Muslim Ummah is 'present state of education in the Muslim world' or educational dualism and the lack of vision' but he did not elaborate the latter.

The Malaise of the Muslim Ummah

Abu Sulaiman asserted that the current crisis of Islamic thought is more serious than it was in the past because our thinkers are not able to measure the range of educational radical change as well as cultural and civilization in this modern era. In order to solve this crisis, he opined to change our mentality towards knowledge profoundly. With IOK only we can solve our problem by reforming in three areas; "rectifying the revelation-reason; redefining the knowledge and clarifying the role of *ijtihad* and the *ifta* ; reorganizing and reorienting the methodology of Islamic education in order to end the existing dualism between secular and religious education" (Haneef, 2009, p 23).

History

Moten (2006) asserts the genesis of Islamization of knowledge is from the early Muslim period, Allama Muhammad Iqbal (1873-1938 CE), Sayyid Abul A'la Mawdudi (1903-1979 CE), and Syed Naqib al-'Attas (b1931 CE) were the pioneers of this scholarly movement. M. A. Kazi (1993) identifies that IOK movement is not a new matter because it had been done in our past particularly in Abbasid period (750-1258). During this period many branches of knowledge were obtained from Greek, Persian, Chinese and Hindu literature and had been synthesized and Islamized. Haneef (2009, p12) opined that "the IOK idea can possibly be traced back to the mid-sixties". In 1970, some Muslim social scientists who graduated in American and European universities, laid down the foundation of the Association of Muslim Social Scientists (AMSS) in Chicago. Ismail al-Faruqi, Anis Ahmad and Abdul Hamid Abu Sulaiman were among the founding executive. The prime aim of this association was to reconstruct and review critically the Western social science theory based on Islamic epistemology.

The First World Conference on Muslim Education in 1977 in Mecca was the turning point for the movement of Islamization. This issue was discussed among Muslim scholars in this conference and initially they diagnosed that the today's crisis of *Ummah* was the result of secularization brought about by the Western colonialism. They felt the necessity for reform education through IOK. Their diagnosis indicates that the root cause of *Ummatic* malaise is related to its education system. Thus the notion was introduced as solution to resolve the dilemma, especially the issue of educational dualism. The First and Second World Conference on Muslim education were momentous events for idea of Islamization (Haneef, 2009).

Purpose

According to Moten (2006), prime aim of Islamization of knowledge is to solve the vital problem of educational dualism by introducing an integrated system of education in the Muslim world. However, Alwani states the Islamization of knowledge aims at developing an Islamic paradigm of knowledge that will play role as an alternative to the dominating Western secular paradigm. This alternative unifies Islamic and universalistic perspectives; addresses the intellectual and

Islamic Education and Islamization of Education in Bangladesh: A Critical Study

conceptual problems of all humanity, not just of Muslims; and includes a *tawhid*-based reconstruction of the concepts of life, humankind and the universe.

Hussain (2006) views Islamization of knowledge aims at strengthening the future leaders with “Islamized knowledge”. In the words of al-Faruqi “Islamizing knowledge (is) in concrete terms, to Islamize the disciplines, or better, to produce university level textbooks recasting some twenty disciplines in accordance with the Islamic vision.”

The another purpose of Islamization of knowledge in regard of the Revealed discipline was to reopen the gate of *Ijtihad* and to interpret the revelation a new in order to find comprehensive and adequate solution for the contemporary complicated problems which the Muslim community is facing. The production of text books for teaching social sciences from the Islamic perspective was considered first priority.

Process

There are two levels of IOK process according to Khalil (1991). The first one is the theoretical and second one is practical. Theoretical level deals with the clarification of the ways, patterns, goals, stages. In this level the theory of IOK, definition, and justification should be presented. Practical level means Islamization of various disciplines by the specialists of those by applying the theories of first level. They would apply various processes to various body of knowledge. Those who involve in Islamizing movement should understand the fact of Islamic worldview properly (Haneef, 2009).

According to Faruqi (1982) the process of IOK is “recasting knowledge as Islam relates to it”. This way needs a cluster of works in order to solve the problem of dualism. On the other hand, IOK aims at ‘producing university level textbooks recasting some twenty disciplines in accordance to the Islamic vision’. After mastering modern knowledge Islamizers must integrate or infuse new knowledge into Islamic legacy. Further Faruqi (1981) mentioned some methodological ways of Islam entitled the unity of truth, unity of knowledge, unity of humanity, unity of life etc. (Haneef, 2009). Ragab (1995) stated the IOK initially an epistemological and methodological matter. In fact, this is a research oriented and theory building effort which leads to the synthesis or integration of revealed knowledge and watching the universe through scientific enterprise.

Brohi (1993) stated the process of IOK is to reform the components of modern knowledge and to make it consistent with the main aspects of the Holy Qur’an concerning ‘human life, mind and social behaviour’. According to Ragab (1999) without serious and organized plan with perfect methodologies production of university level text-books that is vital programme of IOK is not possible. Publishing some booklets and articles does not lead us to Islamize higher learning books rather than concentrated efforts can be carried out for the process of IOK and its procedure smoothly (Haneef, 2009).

The pioneer of Islamization of Knowledge al-Faruqi provided in his ‘Work plan’ twelve steps and five ontological principles of Islamic methodology which are: the unity of Allah, the unity of creation, the unity of truth, the unity of life and humanity. Hussain (2006) states the methodology of Louay Safi much easier and more effective where the revelation was considered primary source of knowledge and both text and action or behaviour analysis techniques as means for theory

construction. Islamization of personality is the inseparable part of Islamization of knowledge. Those who are involved in this movement, they should be God fearing, sincere and honest.

Al-Faruqi presented twelve steps of work plan to achieve the objectives and aims of Islamization of knowledge. Whoever wants to achieve the effective results of this movement must go through these steps. They are:

1. To master the modern disciplines;
2. Discipline survey;
3. To master the Islamic legacy; The Anthology;
4. Mastery of the Islamic legacy; The analysis;
5. Establishment of the specific relevance of Islam to each area of modern knowledge;
6. Critical assessment of the modern discipline: The state -of- the art;
7. Critical assessment of the Islamic legacy : The state -of- the art;
8. Survey of the *ummah*'s major problems;
9. Survey of the problems of humankind;
10. Creative analyses and syntheses between the Islamic legacy and modern knowledge;
11. Recasting the discipline under the framework of Islam: The university textbook;
12. Dissemination of Islamized knowledge

Challenges

It seems that Islamization movement activities are not sound compared to the Western new knowledge produced time to time in terms of quality and quantity. Naturally, due to slow motion, it lagged behind. Many university level text books have not been produced sufficiently. Further Hussain (2006) drew our attention to another challenge in this connection, that is internet or website basis huge amount of Western knowledge that gradually de-Islamize the minds of Muslim young generation.

There are different views prevail regarding Islamic revealed subjects whether it should be Islamized or not. Some scholars opine, in fact, in the context of Islamic Revealed Knowledge courses no need of Islamization but it should be contextualized by making Islamic issues relevant with contemporary issues (Othman, 2006). Integration the disciplines of Revealed knowledge and acquired knowledge in school, college and university curriculum is another important task to implement the programme "Islamization of knowledge".

Accommodation of the people from root level of the society is the must for popularizing Islamization movement in Bangladesh. BIIT the branch of IIIT has contributed a lot to this field. But failed to familiarize the concept of Islamization and its' importance among young generation as well as mass people. Almost all literatures on Islamization are in English language and content are seemed too complicated to understand the idea. Consequently, those publications could not draw attentions of general students. Apparently publications of IIIT are for elite class or for the people of high thought. That is why some original publication should be written in Bengali language easily.

Islamization Phobia

Whole education system of Bangladesh has been dominated by secular oriented educationists and secular politicians for long time. Sometimes they express concern about degrading of ethics and

Islamic Education and Islamization of Education in Bangladesh: A Critical Study

values among graduates. Accordingly, they emphasize value oriented education but never explain what type of values and how it should be taught. Similarly, they always also express deep concern and are afraid of Islamization of education. This is one kind of dilemma, dichotomy and dualistic characteristics that leads the whole nation to the vague. Moreover, they could not provide any guideline to uphold our traditional values and spiritual or inner development in the young graduates.

Solution

Islamization of Ourselves

Stakeholders of this great movement always must bear in their minds to Islamize themselves. Besides academic activities, Islamic values should be instilled in the inner minds of students through co-curriculum programme. In order to solve the malaise of *Ummah* perfectly, we have to emphasize to Islamize our behaviour also along with Islamization of knowledge.

Kalimah Sawah Theory

Almost all citizens of the country Muslims or non-Muslims are supposed to be unanimously admit that some interactive values should be developed in the students such as honesty, justice, equity and equality, law of order, patriotism, democracy, and so on. In this regard Islamic educationists/ academicians/ scholars should organize interfaith dialogue and exchange ideas based on the Holy Qur'an's verse: "Say: O people of the Book! Come to common terms as between us and you: that we worship none but Allah; that we associate no partners with Him; that we erect not, from among ourselves, Lords and patrons other than Allah..... They would negotiate and exchange views to inculcate/incorporate values in the curriculum of all stages of education. This may be initial stage of Islamization of education.

Role of 'Ulama/ Waiz to Islamization

'Ulama/Waizin who graduated from madaris frequently deliver sermon or public lectures on various issues based on Islamic ideology or Sharia'h. Similarly they have direct interaction with mass people and they could influence them easily. If they talk on the dualistic education and its effects providing the guideline for resolution of this crisis as Islamization of education, people from different corners can be convinced.

Integration and Islamization

To a great extent, without integration Islamization is not possible. Now a question arises about integration and its criteria. In fact, perfect integration seems very complicated. Already some formula or initiatives have been taken in different parts of the Muslim worlds. If necessary, some methods of integrations could be examined and introduced to some extent.

First Introduction of an Integrated Curriculum in Bangladesh

According to Mijy (2004), at the beginning of the twentieth century, some practical and serious efforts were made towards reforming the *madrasah* education and to promote it in line with the needs and demands of modern life. Ibrahimy (1990) commented that in the Earle conference of 1908, several members vigorously discussed on the question of modernization of the *madrasah* courses. During 1909-13, a series of conferences were held at Dhaka. A notable personality of Bengal, A. N. M. Waheed, had framed a new scheme in 1910 to promote the educational sector in

favour of Muslims. His scheme was accepted by the government in 1914 and came into practice in almost all *madaris* of Bengal in 1915, except Calcutta Aliya Madrasah.

In conformity with this new system introduced by A.N.M. Waheed, English was included in the syllabi as a compulsory subject while Persian was excluded. Consequently, the course of study approved by the government included Qur'an, Urdu, Bengali, Arithmetic, Geography, History, English, Arabic, Drawing, Handicrafts, and drill as subjects of studies.

Publications for Mass People and Students

In order to make mass students or mass people easy understand and access about Islamization and its relevant issues steps for publication have to be taken immediately. However, there are a lot of publications by IIIT and BIIT such as books, journals booklets and so on. This study observes that those publications could not draw attention of mass students to make understand the issue of Islamization and its significance as per expectation. However, a substantial number of literature works on the concept of Islamization or relevant must be produced in native language of Bangla in such articulated and flexible way that general students or mass educated people may understand the concept and importance of it. Subsequently, they could feel encouraged and materialize it in their practical life. This noble job has to be done by concerned individuals, research centre like BIIT and any other institutions.

Education Model of Malaysia or Other Muslim Countries

The government of Bangladesh and the people have always positive attitude towards Malaysia. More than one million people of Bangladesh live in Malaysia as students or professional of various sectors peacefully. Considering these circumstances, in order to develop or modify the education system of Bangladesh based on values or Islamization, Malaysian education system can be followed to some extent. In this regard the Bangladeshi faculties who are working in different Malaysian universities can take initiatives. In this way, to some extent Islamic world view or Islamization relevant courses or topics would introduced in all faculties of universities.

Islamization of Disciplines

Through past four decades different Muslim scholars attempted to write on Islamization of various disciplines applying the aspects of IOK like Abu Sulaiman in Political Science, Ibrahim Ragab and Awsaf Ali in Sociology, Muhammad Anwar, Muhammad Arif, Zubair Hasan and Ataul Haq in Economics (Haneef, 2009). Brohi (1993) argues that IOK is need "because modern knowledge is based on a framework that inconsistent with the Islamic worldview". Idris (1987) states modern knowledge is based on 'false assumption of materialistic atheistic philosophy'. As the contemporary knowledge or disciplines which are taught in universities all over the world in general, and the Muslim world in particular are representing the Western philosophy and based on western worldview, this is a need to Islamize this knowledge and evaluate and modify for being accepted in Muslim society. According to Al-Attas Islamization is applicable for humanities and social sciences not pure and natural sciences (Haneef, 2009).

There are some scholars who criticize the concept of Islamization in different angles. Haneef (2009) described that "Some works that are critical of the IOK project as a whole or approaches to IOK. In the former group there writers such as Fazlur Rahman (1988), Ziauddin Sardar (1988, 1989), Yasin Mohamed (1994), Seyyd Nasr (1991), and Hadi Sharifi (1984) who

Islamic Education and Islamization of Education in Bangladesh: A Critical Study

are critical of IOK". Hussain (2006) argues that it seems a new concept to many people and sometimes it is misinterpreted perception. On the other hand, Ali (2010) states that some are asking reasonable questions and arguing that they are still not satisfied "that the Islamization of knowledge is either relevant or urgent." Another scholar claimed that the term "Islamization of knowledge" itself is not perfect. It should be "Islamicization" or "contextualization" (Ali, 1). A number of scholars in different corners of the Muslim world think that it is not possible at all and they got annoyed when they hear this term.

According to Ragab (1995) the use of term of IOK in several ways creates confusion among the readers. The concept of IOK has not been clarified in clear way or better elaborately to those who are interested to contribute in this regard. Khalil (1991) criticized that theoretical level of IOK is still not realized clearly. Subsequently any real progress of practical is satisfactory (Haneef, 2009). Many criticise that those who involve in this movement, so far could not produce the university level textbooks in this regard which is main goal of it.

There is another matter of dispute among the scholars that which branch of knowledge should be Islamized. Some scholars do not perceive the necessity of Islamization of hard sciences, while some other think all branches of knowledge should be Islamized. However, IIUM has initiated to give priority in this regard the social sciences.

Question of Non-Muslims and Secularists/Communists

In terms of location of this country, a large number of non-Muslim populations (Hindu, Buddhists, Christians and various tribal groups) and major educated people's mind set the situation of Bangladesh much more different from other Muslim countries. Bangladesh is the Muslim country which is surrounded by India a big Hindu country in three sides and Myanmar in another side. There is no neighbouring Muslim country. Moreover, there are many conflicting religious sects and political groups among Muslims. Keeping these all factors in mind, Islamization and integration programme should be taken forward with wisdom, sincerity, missionary mind set, and unitedly.

An Integrated Common Course

In the Holy Qur'an, there are two types of great signs (Ayat) of the Almighty; Legislative Signs (آيات الأحكام) and Phenomenological Signs (آيات كونية). In order to create awareness, interest among the graduates towards the Holy Qur'an both of the signs should be taught in logical and scientific methods that it would be relevant to the contemporary circumstances and present situations. As the majority people of the country are religious in spirit, incorporation of the Qur'anic Signs in the curriculum of higher education and inculcation of Qur'anic world view in the body of higher learning or Islamization of education that would create awareness among the people particularly, young generation about spirituality and rationality of the Qur'anic guidelines and ensure remedy of the dichotomy crises to a large extent. Moreover, the curriculum of any education system has been regarded manifestation of the culture of any nation and influences the younger generation. This study recommends for introduction a Qur'anic course combined with both Signs of the Almighty and focuses on significance of incorporation of the course with the curriculum of higher education in all faculties of general /secular education.

Conclusion

Islamization of knowledge/education in general and particularly in Bangladesh is not a short cut programme rather it is a long time ongoing process. Absolutely for the sake of Allah, a group of Muslim scholars of all disciplines of knowledge, students, teachers and stake holders of the country who are dedicated and sincere must come forth and provide their efforts constantly in order to help reach this movement to its zenith. Then it is real success can be expected. In fact, holistic and integrated education can produce more competent graduates who contribute to the socio-economic development of the society. Social sciences and natural sciences from the Islamic perspective ought to be taught. Some stakeholders of the various Universities, to Islamize of social science should be immediately made to ensure an integrated curriculum. The Islamization movement has not been familiar still now in the country and certainly secular educationists and scholars do not accept it positively. In these circumstances, higher Islamic learning graduates have to gain in-depth awareness concerning this movement as so that they can motivate the secular intelligentsia.

References

- Abdul Karim. (1985). *Social History of the Muslims in Bengal (Down to A. D. 1538)*. (2nded.). Chittagong: Baitus Sharaf Islamic Research Institute.
- Abdus Sattar. (2004). *Madrasah-i-Aliar itihash (A History of Madrasah –i-Alia)* (2nd ed.). Dhaka: Islamic Foundation Bangladesh.
- Abu Sulayman, Abdul Hamid. (1989). *Islamization of Knowledge: General Principles and Work Plan*. Washington: The International Institute of Islamic Thought.
- Abu Sulayman, Abdul Hamid. (1993). *Crisis in the Muslim Mind*. Herndon, Virginia: The International Institute of Islamic Thought.
- Ahmed, Momtaj Uddin. (2004). *Madrasah-e-Aliar Itihash* (History of Madrasah-e-Alia). Dhaka: Islamic Foundation Bangladesh.
- Alam, A. Z. M. Shamsul. (2002). *Madrasah Shikka* (Madrasah Education). Dhaka: Bangladesh Co-operative Book Society Ltd.
- Al-Attas, Syed Muhamm Naqib. (1978). *Islam and Secularism*. Kuala Lumpur: Muslim Youth Movement Malaysia.
- Al-Attas, Syed Muhamm Naqib. (1979). *Aims and objectives of Islamic Education* (Edit.) Jeddah: Hodder & Stoughton and King Abdul Aziz University.
- Al-Attas, Syed Muhamm Naqib. (1995). *Prolegomena to the Metaphysics of Islam: An Exposition of the Fundamental Elements of the Worldview of Islam*. Kuala Lumpur: International Institute of Islamic Thought and Civilization (ISTAC).
- Al-Attas, Syed Muhamm Naqib. (1999). *The Concept of Education in Islam: A Framework for an Islamic Philosophy of Education*. Kuala Lumpur: International Institute of Islamic Thought and Civilization (ISTAC).
- Al-Faruqi, Ismail Raji. (1980). *Islam and Culture*. Kuala Lumpur: ABIM.
- Al-Faruqi, Ismail Raji. (1982). *Al-Tawhid: Its Implication for Thought and Life*. Herndon, Virginia: The International Institute of Islamic Thought.

Islamic Education and Islamization of Education in Bangladesh: A Critical Study

- Al-Faruqi, Ismail Raji. (1995). *Islamization of Knowledge: General Principles and Work Plan*. Herndon, Virginia: The International Institute of Islamic Thought.
- Ali, A. K. M. Ayyub. (1983). *History of Traditional Islamic Education in Bangladesh, (down to A. D. 1980)* Dhaka: Islamic Foundation Bangladesh.
- Amanullah, Muhammad. (2004). Evaluation of the Undergraduate Curriculum of Fiqh and UsŒl Al-Fiqh of the International Islamic University Malaysia, *Muslim Education Quarterly*, 21(3, 4) pp. 28-37.
- Ansari, M. Abdul Haq, (1979). Transformation of the Perspective. In Al-Attas (Ed.) *Aims and objectives of Islamic Education*. Jeddah: King Abdul Aziz University.
- Ashraf, Syed Ali. (1979). Planning for the Islamization of Education: Prerequisites for a Model. *Muslim Education Quarterly*. 6(1), pp.1-3.
- Ashraf, Syed Ali. (1980). *Islamic Curriculum for Muslim Education*. Second World Conference on Muslim Education. Islamabad: Qaid-i-Azam University.
- Ashraf, Syed Ali. (1985). *Islamization of Approach to Modernization of Traditional System*. *Muslim Education Quarterly*, 1(2), pp.1-5.
- Ashraf, Syed Ali. (1985). *New Horizons in Muslim Education*. Cambridge: Hodder and Stoughton.
- Ayoub, Mahmoud M. (2004). *Islam: Faith and History*. Oxford: Oneworld Publications.
- Azharul Islam, A.K.M. & Habibur Rahman, S. M. (2003). *Bangladeshe School o Madrasah Shikkaniti o Patthyakrom* (The Education Policy and Curricula of Schools and MadÉris in Bangladesh: An Evaluation in the light of the Makkah Declaration). Cambridge: The Islamic Academy.
- Azizul Huq, (1969). *History and Problem of Muslem Education in Bengal*. Dhaka: Bangla Academy.
- Badawi, M. A. Zaki. (1979). Traditional Islamic Education: Its Aims and Purposes in the Present day. In *Aims and Objectives of Islamic Education*, (Ed.). S. M. N. Al-Attas. Jeddah: Hodder and Stoughton.
- Bakar, Osman. (1987). *Al-Farabi Life, Works and Significance*. Kuala Lumpur: The Islamic Academy of Science.
- Baloch, N. A. (1997). Objectives of Education in the Pakistani Society before Colonial Rule, In *Encyclopaedia Survey of Islamic Culture* (Vol. 3. pp. 21-30). New Delhi: Anmol Publications.
- Barakat, Abul, Rowshan, Taheruddin, Zahid & Zaman (2011). *Political Economy of Madrassa Education in Bangladesh Genesis, Growth, and impact*. (1st Ed.) Dhaka: Ramon Publishers.
- Bilgram, Hameed Hassan and Ashraf, Syed Ali (1984). *Pre-requisite of an Islamic University, The Concept of an Islamic University*. *Muslim Education Quarterly*, 1(2). 6-22.
- Bilgram, Hameed Hassan and Ashraf, Syed Ali (1985). *The Concept of an Islamic University*. Cambridge: Hodder and Stoughton.
- Chaudhri, Abdul Ghafur and Saqib, Ghulam Nabi, (1980). Reconstruction of Curriculum for the Muslim Teacher. In E. M. Al-Afendi & N. A. Baloch, *Curriculum and Teacher Education*, Jeddah: Hodder and Stoughton.

The Chittagong University Journal of Arts and Humanities

- Clugston, H. A., & Davis R. A. (1930). Suggested Criteria for the Philosophical Method of Research in Education, *Educational Administration and Supervision*.
- Conference Book. (1977). First World Conference on Islamic Education, Jeddah: King Abdul Aziz University.
- Conference Report. (1983). Recommendations of the Four World Conferences on Islamic Education. *World Conferences on Muslim Education*, Makkah al-Mukarramah: Ministry of Higher Education, Kingdom of Saudi Arabia; Umm Al-Qura University; World Centre for Islamic Education.
- Daud, Wan Mohd Nor Wan. (1998). *The Educational Philosophy and Practice of Syed Muhammad Naquib Al-attas: An Exposition of the Original Concept of Islamization*. Kuala Lumpur: ISTAC.
- Ehsan, Mohammad. (2008). *Higher Education Governance in Bangladesh The Public Private Dilemma* (1st edn.). Dhaka: A H Development Publishing House, Centre for Development Governance.
- Fakhry, Majid. (2002). *Al-Farabi Founder of Islamic Neo-Platonism: His Life Works and Influence*. Oxford: One world.
- Faridi, Abdul Huq. (1985). *Madrasah Shikka: Bangladesh* (Madrasah Education in Bangladesh, (1st ed.). Dhaka: Bangla Academy.
- Fazlur Rahman. (1988). Islamization of Knowledge: A Response. *The American Journal of Islamic Social Science*, 3-11.
- Fazlur Rahman. (2000). *Revival and Reform in Islam*. Oxford: One world.
- Hales, S. (2002). *Analytic Philosophy: Classic Reading*. Canada: Wadsworth.
- Hamadi, Dhaou, (2005). *Analysis and Evaluation of the Islamabad Curriculum Design: Implication to Educational Theory and Practice in the Muslim World*. Unpublished Doctoral Thesis. Kuala Lumpur: International Islamic University Malaysia,
- Hamidullah, Muhammad. (1989). Educational System in the Time of the Prophet, Islamic Culture.
- Haneef, Mohamed Aslam. (2009). *A Critical Survey of Islamization of Knowledge*, (2nd ed.). Kuala Lumpur: IIUM Press.
- Hasan, Mohammad, (2004). *Bangladesher Madrasah Shikka Madrasah Education of Bangladesh* (1st ed.). Dhaka: Gronthomela.
- Hassan, Mohd Kamal (2013). Islamization of Human Knowledge In *Islamic Economics Education in Southeast Asian Universities*. (Ed.) Mohd Nizam Barom Mohd Mahyudi Mohd Yusop, Mohamed Aslam Haneef and Mustafa Omar Mohammed. pp. (13-50)
- Henzell-Thomas, Jermy, (2002). *The Challenges of Islamic Education in the 21st Century*, The Book Foundation.
- Hunter, W. W. (1945). *The Indian Musalmans*, Calcutta.
- Husain, Syed Sazzad. & Ashraf, Syed Ali (1979). *Crisis in Muslim Education*. Jeddah: King Abdul Aziz University.
- Hussain, Mohd Yusof. (2006). *Islamization of Human Sciences*. (Ed.). IIUM: Malaysia.
- Ibn Khaldun. (1958). *The Muqaddima: An Introduction to History* (Vol. 1) (F. Roshenthal.

Islamic Education and Islamization of Education in Bangladesh: A Critical Study

- Ibrahimi, M. Sekandar Ali, (1985). *Reports on Islamic Education and Madrasah Education in Bengal (1861-1977)*, (1st ed.) Vol. 1, Dhaka: Islamic Foundation Bangladesh.
- Ibrahimi, M. Sekandar Ali, (1987). *Reports on Islamic Education and Madrasah Education in Bengal (1861-1977)*, 1st Ed. Vol. 2, Dhaka: Islamic Foundation Bangladesh.
- Ibrahimi, M. Sekandar Ali, (1990). *Reports on Islamic Education and Madrasah Education in Bengal (1861-1977)*, (1st ed.) Vol. 3, 4, 5, Dhaka: Islamic Foundation Bangladesh.
- Ibrahimi, M. Sekandar Ali, (1998). *Education and Muslim Ummah: With Special Reference to Al-Hikmah System of Education*. Dhaka: Mawla Brothers.
- Ikram, Shaikh Muhammad, (2004). *History of Islamic Education and Culture in Sub-continent*, (2nd edn.). Dhaka; Islamic Foundation Bangladesh.
- Ishaq, Muhammad, (1976). *India's Contribution to the Study of Hadith Literature*, (2nd ed.). Dhaka: The University of Dhaka.
- Kamal Hassan, M. (1989). Values Education Framework Based on Islamic Concepts and Precepts *Jurnal Pendidikan Islam*. 2(3). Petaling Jaya: Muslim Youth Movement of Malaysia.
- Kamali, Mohammad Hashim. (2005). *Maqasid al-Shar'ah: The Objectives of Islamic Law*. Kuala Lumpur: Pelanduk Publications.
- Kamaruddin, Zaleha & Moten, Abdur Rashid. (2013). International Islamic University Malaysia: The University with a Soul. In *IIUM The Premier Global Islamic University*, (Ed.). Kuala Lumpur: IIUM.
- Karim, Muhammad Fazlul, (2009). *Kalkata Alia Madrasah o Darul Ulum Deobonder Pattokrom o Pattyoshucir Tulnamuluk Porjaluchona* (A Comparative Study between the Curriculum of Calcutta N'oliyah Madrasah and D'Er al-Ul'Em Deoband). Unpublished Doctoral Thesis, Chittagong: University of Chittagong.
- Kazmi, Yedullah. (1999). The Notion of Murabbi in Islam: An Islamic Critique of Trends in *Contemporary Education. Islamic Studies*, 38(2). pp. 209-233.
- Kelly, AV. (1989). *The Curriculum: Theory and Practice*, (3rd edn.). London: Paul Chapman Publishing Ltd.
- Khalil, Imam al-Din, (1991). *Islamization of knowledge: A methodology*, Herndon, Virginia: The International Islamic Thought.
- Khan, Israr Ahmad. (2008). Methodological Lacunae in the Qur'anic Studies A Reflection and Evaluation in *Proceedings of International Seminar of Religious Curricula in the Muslim World: Challenges and Prospectus* (pp. 17-25). Kuala Lumpur: International Institute of Muslim Unity, IIUM.
- Khan, Israr Ahmad. (2008). *Towards Understanding Islamic Paradigm of Education*.
- Khurshid Ahmad, (1978). *Principles of Islamic Education*, (6th ed.). Lahore: Islamic Publications LTD.
- Madkur, Ali Ahmad, (2002). *Manhaj al-Tarbiyyah fi al-Tasawwr al-Islami*, (1st ed.) Al-Qahirah: Dar al-Fikr al-Arbi.
- Makdisi, George. (1981). *The Rise of Colleges: Institutions of Learning in Islam and the West*. Edinburgh: Edinburgh University Press.

The Chittagong University Journal of Arts and Humanities

- Makdisi, George. (1985). Ethics in Islamic Traditionalist Doctrine. in *Ethics in Islam*, California: Undena Publications.
- Malek, Abdul, (2007). *Shikka Bigyan o Bangladeshe Shikka (Science of Education and Education system in Bangladesh)* in Bangla, Dhaka: UGC.
- Mallick, Azizur Rahman, (1977). *British Policy and the Muslims in Bengal 1757-1856*, (2nd ed.). Dhaka: Bangla Academy.
- Mamta Uddin Ahmad, (2004). *Madrasah-i-Aliar Itihash*. History of Madrasah –i-Alia, (2nd ed.) Dhaka: Islamic Foundation Bangladesh.
- Manzur, Abu Taher Muhammad. (2008). *Bangladeshe Uccah store Islami Shikkar Shikkakrom*. The Curriculum of Higher Islamic Education in Bangladesh: Plan and Development. Unpublished PhD. Thesis, Dhaka: University of Dhaka.
- Mawdudi, Seyyed Abul A'la. (1985). *The Education*. Delhi: Markaji Maktabah.
- Mizy, Md. Nasiruddin. (2001). *Development of Islamic Education in Bangladesh*, Unpublished PhD Thesis. New Delhi: Jamia Millia Islamia,
- Mustafizur Rahman, Muhammad, (1995). Development of Traditional Islamic Education in Bangladesh in *Islam in Bangladesh Through Ages*. (Ed.). Dhaka: Islamic Foundation Bangladesh.
- Nadvi, Abul Hasanat. (nd). *The ancient Islamic Education Centre of Indian Sub-continent*.
- Nasher Uddin, A. Y. M. (2005). *Evolution and Development of Islamic Education: Bangladesh Perspective* (1st ed.). Dhaka: Islamic Foundation Bangladesh.
- Nasr, Seyyed Hussein. (1968). *Science and Civilization in Islam*. Cambridge: Harvard University Press.
- Nasr, Seyyed Hussein. (1999). *A Young Muslim's Guide to the Modern World*. Cambridge: The Islamic Text Society.
- Nasr, Seyyed Hussein. (2002). *Islam, Religion, History and Civilization*. New York: Harper San Francisco.
- Nayamat Ullah, Mohammad. (2016). *An Evaluation of the Curriculum of Higher Islamic Education in Bangladesh: A Case Study*. Unpublished PhD Thesis, Kuala Lumpur: International Islamic University Malaysia.
- Nizam Uddin, Muhammad. (2001). *Bangladeshe Islami Shikkar Itihash (1971-1990)* The History of Islamic Education in Bangladesh (1971-1990). Unpublished M.Phil Thesis, Rajshahi: Rajshahi University.
- Nurullah, Syed, (1951). *A student's History of Education in India, 1800-1947*, Bombay.
- Parveen, Nusba. (2005). *Muslim Education Reforms in Nineteenth Century India: An Analysis of Shibli Nu'mani's Thought and Practice*. Unpublished Doctoral dissertation: International Islamic University Malaysia.
- Qadir, C. A. (1988). *Philosophy and Science in the Islamic World*, London: Routledge.
- Qasmi, H. M. Abd al-Quddus. (1980). Education According to Old Curriculum and its Impact on Modern Times. In M. H. al-Afendi, & N. A. Baloch, (Ed.) *Curriculum and Teacher Education*. (pp. 63-81). Jeddah: Hodder and Stoughton.
- Quraishi, Mansoor A. (1983). *Some Aspects of Muslim Education*. Lahore: Universal Books.

Islamic Education and Islamization of Education in Bangladesh: A Critical Study

- Qutub, Muhammad. (1979). The Role of Religion in Education. In S. M. al-Attas (Ed.), *Aims and Objectives of Islamic Education* (pp. 48-62). Jeddah: Hodder and Stoughton and King Abdul Aziz University.
- Rahim, Karim, Mohsin, Khan, Mustafiz & Afsaruddin, (1995). (ED.) *Islam in Bangladesh Through Ages*, Dhaka: Islamic Foundation Bangladesh.
- Rahimah, Embong. (2011). *The Concept of Islamic Integrated Curriculum (IIC): Implications for Islamic Schools*. Unpublished doctoral thesis, Kuala Lumpur: International Islamic University Malaysia.
- Recommendations of the Four World Conferences on Islamic Education*. (1983). Makka Al-Mukarrama: Umm Al-Qura University & World Centre for Islamic Education.
- Rizavi, Sayyid Sajjad, (1986). *Islamic Philosophy of Education*, (1st edn.). Institute of Islamic Culture, Lahore.
- Rosnani Hashim (1998). Islamization of the Curriculum *The American Journal of Islamic Social Sciences*, 16(2), 28-43.
- Rosnani Hashim and Imron Rossidy, (2000). *Islamization of Knowledge: A comparative Analysis of the Conception of Al-Attas and Al-Faruqi*. *Intellectual Discourse* 8(1) pp 19-44.
- Rosnani Hashim, (1997). The Construction of an Islamic-based Teacher Education Programme. *Muslim Education Quaterly*. 14(2): pp. 57-67. Cambridge.
- Rosnani Hashim, (2000). Research in Philosophy of Education. Paper presented at the *workshop on Research Methodology*. Kuala Lumpur: Institute of Education, IIUM,
- Rosnani Hashim, (2003). *The Teaching of Thinking Through Philosophy for Children Approach in Malaysia*, Unpublished Research Report. Kuala Lumpur: Research Centre, International Islamic University Malaysia.
- Rosnani Hashim, (2004). *Educational Dualism in Malaysia: Implications for theory and Practice*, (2nd edn). Kuala Lumpur: The Other Press.
- Rosnani Hashim, (2004). Islamization of the Curriculum. *The American Journal of Islamic Social Science*, 16(2).
- Rosnani Hashim, (2004). Rethinking Islamic Education in Facing the Challenges of the Twenty-first Century. *The American Journal of Islamic Social Sciences*, 22(4), pp. 133-147.
- Rosnani Hashim, (2007). Intellectualism in Higher Islamic Traditional Studies: Implication for the Curriculum. *American Journal of Islamic Social Sciences*, 24(3), pp. 92-115.
- Rosnani Hashim, (2008). Developing Capacities for Critical Thinking and Philosophical Reasoning in schools, paper presented at the Seminar Commemorating World Philosophy Day: *The Role of Universities in promoting dialogue Through Philosophy*, November 17, in Kuala Lumpur, Malaysia.
- Rosnani Hashim, (2008). Reviving the Pedagogy of Philosophical Inquiry among Muslim Teachers and Students. *Paper Presented at International Conference on Teacher Education in the Muslim World* at Crown Princess Hotel, July 16-18.
- Rosnani Hashim, (2013). Higher Education Curriculum Development for Islamization. In *Islamic Economics Education in Southeast Asian Universities*. (Ed.). pp. 51-73. Kuala Lumpur: IIUM Press.

- Rosnani Hashim, (2014). *The Curriculum of Islamic Studies and Islamic Studies Education Programmes in Meeting the Challenges of Globalization: A Case Study of Selected Malaysian Universities*. A lecture presented as guest professor at the Institute for Islamic Studies, University of Vienna, Austria, 27th May.
- Ross, D. (1990). An introduction to curriculum criticism. In Sherman & Webb, (Ed.). *Qualitative Research in Education: Focus and Methods*, London: The Falmer Press.
- Rounaq, Jahan. (1994). *Pakistan: Failure in National Integration*. Dhaka: The University Press Limited (UPL).
- Rufai, Saheed Ahmad. (2011). *Core Principles of An Islamic-Based Teacher Education Curriculum (IBTEC): Implications For Teaching Education Programmes In The Muslim World*. Unpublished doctoral thesis, Kuala Lumpur: International Islamic University Malaysia.
- Saqib, Ghulam Nabi. (1981). Modernization of Muslim Society and Education: Need for a Practical Approach. In Khan M. W. (Ed.). *Education and Society in the Muslim World*. (PP. 45-60). Jeddah: Hodder and Stoughton and King Abdul Aziz University.
- Sardar, Ziauddin. (1988). Rediscovering Islamic Epistemology, in *Islamic Futures: The Shape of Things to Come*. Kuala Lumpur: Pelanduk Publications.
- Sattar, Md. Abdus. (2004). *Bangladeshe Madrasah Shikka o Samaj Jibone Tar Probab* (Madrasah Education in Bangladesh and its Impact on Social life). Dhaka: Islamic Foundation Bangladesh.
- Scriven, M. (1967). The Methodology of Evaluation. *AERA Monograph Series on Curriculum Evaluation* 1: 39-83.
- Shafeeq Hussain, Vazhathodi. (2011). *A Proposed Framework for the Curriculum of Islamic Education: Implications on the Curricula of Islamic Religious Higher Institutions in Kerala, India*. Unpublished doctoral thesis, International Islamic University Malaysia, Kuala Lumpur.
- Shahed Ali. (1984). Conflict Between Religion and Secularism in the Modern World and the Role of Education in Preserving Transmitting and Promoting Islamic Culture in *Muslim Education Quarterly*, 2(1).
- Sherman, R. R. and Rodman, B. Webb. (1990). *Qualitative Research in Education: Focus and Method*. London: The Falmer Press.
- Siddiqui, Zillur Rahman. (1997). *Visions and Revisions of Higher Education in Bangladesh*. (1st ed.) Dhaka: The University Press Limited.
- Sikand, Yoginder. (2005). *Bastion of Believers: Madrasas and Islamic Education in India*. New Delhi: Penguin Books.
- Stanton, Charles Micheal. (1987). The Emergence of the Collegiate System in Classical System: 700-1200 AD. *The Annual Meeting of the Association for the Study of Higher Education*. Baltimore: Unpublished
- Stanton, Charles Micheal. (1990). *Higher Learning in Islam: The Classical Period A. A. 700-1300*. U.S.A: Rowman.

Islamic Education and Islamization of Education in Bangladesh: A Critical Study

- Stufflebeam, Daniel L. & Shikfield, Antony J. (2007). *Evaluation Theory, Models, & Applications*, San Francisco: John Wiley & Sons, Inc.
- Sultan, Talat, (1992). *Curriculum Guide for Islamic Studies*. Makkah: Centre for Research in Islamic Education.
- Syllabus of Fazil BA/BSC/BSS/Pass Course*. (2006). Kushtia: Islamic University Kushtia.
- Syllabus of First, Second and Third Year of Three-year Fazil (BA/BSC/BSS) Pass Course). (2006). (According to the Curriculum Approved by Islamic University). Dhaka: Islamia Kutubkhana.
- Taba, Hilda. (1962). *Curriculum Development: Theory and Practice*. New York: Harcourt, Brace & World, INC.
- Tanner, Daniel & Tanner, Laurel. (2007). *Curriculum Development: Theory into Practice*. (4th edn.). Ohio: Pearson.
- Tauhidi, Daud. (2001). *The Tarbiyah Project: An Overview*
- Thanawi, Ashraf Ali, (1984). *Kashshaf Istilahat al-Funun*, Istanbul: Kahraman Yayinlari.
- The Constitution of the People's Republic of Bangladesh, (2008). Dhaka: Government of The People's Republic of Bangladesh Ministry of Law, Justice and Parliamentary Affairs.
- The Daily Prothom Alo. Retrieved on March 27, 2014. Retrieved from, <http://www.prothom-alo.com/> Retrieved on
- The Daily Star. Retrieved on March 23, 2013. Retrieved from, <http://www.thedailystar.net/>
- The Islamic University Act. (1980). The Government of Bangladesh: The Bangladesh Parliament.
- Tyler, Ralph. W. (1949). *Basic Principles of Curriculum and Instruction*. Chicago: University of Chicago Press.
- Wahid, Abdul. C. M. (2004). *Amader itihash Oitijya* (Our History and Heritage). Dhaka: Tamanna Publication.
- Wan Daud, Wan Mohd Nor. (1989). *The Concept of Education in Islam and its Implication for Education in a Developing Country*. London and New York: Mansel.
- Wan Daud, Wan Mohd Nor. (1998). *The Educational Philosophy and Practice of Syed Muhammad Naqib al-Attas: An Exposition of the Original Concept of Islamization*. Kuala Lumpur: International Institute of Islamic Thought and Civilization.
- Wiles, J., & Bondi, J. (2007). *Curriculum Development: A Guide to Practice*. New Jersey: Pearson Education. Inc.
- Wiqaful Madaris Al-Arabiyyah Bangladesh. (2006). (Bangladesh Qawmi Madrasah Education Board) *Curriculum of Secondary, Higher Secondary, Undergraduate, and Postgraduate Levels of Qawmi Madrasah*. Dhaka.
- World Centre for Islamic Education. (1983). *Recommendations of the Five World Conferences on Islamic Education*. Makkah: Ummu al-Qura University.
- Yousuf Ali, Mohammed. (2005). Religious Studies in Institutions of Higher in Bangladesh: Challenges and Prospects, *Proceeding of International Conference in Religious Curriculum in the Muslim world*, Kuala Lumpur: International Institute for Muslim Unity and Institute of Education, IIUM.

The Chittagong University Journal of Arts and Humanities

- Yusof, Islam, “Teaching, Today and Tomorrow. Retrieved from, <http://w.w.w.iberr.org/bruneil.htm>
- Yusuf Ali, Abdullah. (2008). *The Holy Qur’En: Text and Translation*. Kuala Lumpur: Islamic Book Trust.
- Zahiri, Muhamad Awang Mat and Nayamat Ullah, Mohammad. (2012). Exploring the Notion of Curriculum (Minhaj) from the Quranic Perspective and its implementation Towards Curriculum Reform in the Muslim World *Proceeding of International Conference on Research in Islamic and Arabic Language Education*, (pp. 513-525), Makkah: Islamic Academy.
- Zahiri, Muhamad Awang Mat. (2005). *Values Underpinning Sex Education From An Islamic Perspective: Implication on the Sex Education in Malaysian Curriculum*. Unpublished PhD Dissertation, Kuala Lumpur: International Islamic University Malaysia.

English Acronymic Loans in Bangla

Dr. Sarwar Morshed*

Abstract

Acronyms, idiosyncratic part of natural languages, have become cross-lingually popular. The English language has experienced a resurgence of acronyms since the World Wars. This new wave of the non-morphematic words in English has left an indelible impression on Bangla. Like mainstream words, Bangla has also accepted many acronym loans from the English language. This is a small-scale research on the mechanisms and patterns of borrowing English acronyms and their functions in our language. In conducting this qualitative research, we have used diverse resources including dictionaries, lexicons, scholarly publications, newspapers and social media sites. Our data reveal that the English Acronymic loans in Bangla can be compartmentalized into two broad categories – direct and indirect loans. There are many direct loans from the English sources. We have named this type as ‘Global Acronyms’. The second broad category includes acronyms locally created using pure English materials (Local acronyms); acronyms created using pure Bangla materials (Indigenous acronyms); acronyms created with an admixture of bilingual elements (Hybrid acronyms) and acronyms formed from native materials but acronymized in the Roman script (Transliterated acronym). In our data, we see the presence of another type which we have called ‘Re-semanticized acronyms’. This refers to acronyms which are reinterpreted by Banglophones, for example, AIDS (Acute Ideological Deficiency Syndrome). Both direct and indirect loans in Bangla have shown considerable productivity. The loans can be prefixed and suffixed with Bangla affixes. They can be inflected for pluralization. They are also open to participate in non-concatenative processes like reduplication in Bangla.

Introduction

Life in the modern times is inundated with ‘acronyms’ and yet the term ‘acronym’ is one of those words that has remained maddeningly ill-defined for its entire existence (Zimmer). Ben Zimmer, after surveying the history of the term, offers the simplest definition of acronyms as pronounceable words created out of the initials or major parts of compounds like ‘NATO’, ‘radar’ or ‘TriBeCa’.

Mainstream word formation processes utilize morphemes to create new words (Zapata 24). In this respect, ‘acronyms’ are somewhat idiosyncratic by nature as they are formed out of initial letters

*Professor, Department of English, University of Chittagong

of a group of words. This means that acronyms are the products of a non-morphematic word formation process.

Etymologically speaking, the word ‘Acronym’ was coined in 1943 from Greek ‘akrosynoma’ meaning a name derived from the tips of some names. So, by origin, ‘acronym’ refers to a word formed by the juxtaposition of the initial letters of some other words. In other words, we can say that when the initial letters of a phrase form a new word, we call it ‘Acronym’. For example, the initial letters of ‘North Atlantic Treaty Organization’ form the single word ‘NATO’. When the initial letters of the phrase ‘National Aeronautics and Space Administration’ are put together to form a new word, we get the famed ‘NASA’.

Acronym is one of the three frequently used word formation processes involving abbreviation of words. The remaining two of the word shortening processes are Clipping and Initialism (Quirk et al. 182).

The linguistic analysis of the acronymization process by researchers has proved that acronymization as a word-formation process is common cross-linguistically (Altakhaineh 7). This cross-linguistic popularity of acronyms is connected with the observation of Yamina Beanne. She argues that as word shortening mechanisms are globally present across language families, acronyms should be treated as parts of language universals (Beanne 29).

Acronyms, which are idiosyncratic part of our lexical repertoire, are almost omnipresent in modern times. They can be traced in scientific and non-scientific journals i.e. NATO, CD-ROM, VAT, etc. Their presence is also visible in the social media sites (e.g. ASAP, LOL, etc.). The presence of acronyms is also tangible in the domains of text messaging and email correspondences. Technologization of the world has tremendously necessitated precision and economy in communication. Albeit the use of acronyms dates far back to the Roman times (INRI is an acronym found in use in ancient Rome), the tempo of word shortening techniques got accelerated with the 2nd World War. Military personnel and statesmen had to use acronyms for faster communication. Besides lending rapidity to communication, acronyms also helped people involved in the war in safely encrypting their messages.

The first edition of the *Acronyms, Initialisms and Abbreviations Dictionary* (AIAD) was published in 1960. The AIAD contained 12000 headwords. The 16th edition published in 1992 had an incredible number of entries –520000 (Izura and Playfoot 867)! This statistics speaks volumes in favour of the exponential growth and popularity of the word shortening techniques such as acronyms, initialisms and abbreviations.

Theoretical Background: Definition, Taxonomy, Orthography and Features of Acronyms **Definition**

According to Ben Zimmer, an acronym is “a pronounceable word created out of the initials or major parts of a compound term, like NATO, *radar* or *TriBeCa*”. When the abbreviation is pronounced by the names of initial letters, like *C.I.A.* (“see eye ay”), *U.C.L.A.* (“you see ell ay”) or the unwieldy *WWW* (“double-u double-u double-u”), then it’s best to call it an *initialism*. This is the nomenclature preferred by many abbreviation-watchers, including the creators of the *Acronyms, Initialisms and Abbreviations Dictionary*.

English Acronymic Loans in Bangla

The formation of acronyms or acronymization is conventionally considered as a word formation process and hence it is discussed in Morphology. A simplified definition of acronymization has been offered in the preceding section. In addition to that, a couple of definitions are furnished below extracted from the works of authorities on the field –

1. Acronyms are shortenings built from the initial letters in a phrase or name. Acronyms are marked as single words, for example, NASA, AIDS. (Finegan 48)
2. Acronymization is the process whereby a new word is formed from initial letters of the constituent words of a phrase or sentence. (Zapata 7-8)

If we have a look at the orthography of acronyms, we see that some acronyms are written in upper case letters while others are written using the combination of upper case and lower case letters in the English language. For example, NATO belongs to the first category while ‘Radar’ belongs to the second. There is yet another orthographic form of acronyms where the shortened terms are written using all lower case letters, for example, scuba.

From the above discussion and examples provided, we may infer that

- Acronyms are generally formed out of the initial letters of some other words or a phrase
- Non-initial letters can also participate in the formation of acronyms
- When acronyms are pronounced as words, they may be composed of initial letter, non-initial letters, or mixture of initial letters and non-initial letters.

Taxonomy of Acronyms

The following are the general types of acronyms –

Alphabetic acronym: Acronyms formed from the combination of initial letters of phrases or names are called Alphabetic acronyms. For example, NASA, WHO, etc.

Syllabic acronym: Acronyms formed by the syllables of the constituent words of a compound or phrase are called Syllabic acronyms. For example, SatNite (Saturday Night), BeNeLux (Belgium, Netherlands and Luxembourg), Forex (Foreign Exchange), Interpol (International Police; the official name of this organization is ‘International Criminal Police Organization’).

Mixed acronyms: These acronyms are formed by the combination of first letter and first or last syllable of constituent components of a name or phrase. For example, IMAX (Image Maximum).

Apart from these common categories, there are some other types of acronyms as well. One of these types is the acronyms where we see the combinations of words and numbers. For example, Covid-19. There are also word and letter combination in some acronyms. For example, CD-ROM.

The Acronym-Initialism Distinction

Though ‘initialism’ as a linguistic term is older and broader than ‘acronym’, and they have been in use interchangeably, some differences are there between the two. According to Paula Rua, initialisms have two forms – acronyms and alphabetisms. In the context of this article, we will consider strings of initial letters of names or phrases which are pronounceable as words as acronyms. Group of letters picked up from longer names or phrases which are not pronounceable as words can be called alphabetism.

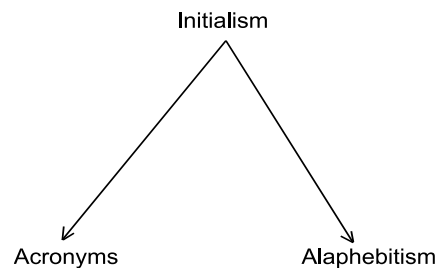


Figure1 Rua's Model of Initialism

So, from the above triangular model, we see that initialism is the broader term of which acronym is a mere part (Rua 33). In the remaining portion of this article we will consider letter words which are pronounced or read as words as acronyms.

Features of Acronyms

As acronyms are letter words (McArthur 28), they are composed of the initial letters of longer words or phrases. However, not all the initial letters of the longer words or phrases are used in the construction of acronyms. Normally, the function words are omitted in the process of acronym building. This is aimed at keeping the acronyms manageable.

According to Ingrid Fandryaz, the most distinctive feature of acronyms is that they are formed in the graphic mode. This pen and paper origin of acronyms sets them apart from other word formation processes.

Garland Cannon in his scholarly discussion on acronyms points out that the source of an acronym must have, at least, three constituents. Generally, not more than two initial letters or sounds of a constituent can be retained in the resultant form. The researcher, however, has acknowledged the exceptions to this general rule.

Pronounceability is an important factor in the construction of acronyms. Sometimes, the sequencing of the letters may be changed to make sure that the acronym is pronounceable. Ingrid Fandryaz quotes an example of this type from *Time* –

MISHAP – Missile High Speed Assembly Program. Here, in the acronymized form the positions of 'H' and 'S' have been interchanged to ensure the pronounceability and homonymy (Fandryaz 71).

Creativity plays a major role in the formation process of acronyms. In this regard, the observation of Garland Cannon is that "acronyms are among the most creative, freewheeling creations in vocabulary today. They differ from most other items in that they are never lapses and are seldom formed by analogy, but are consciously made. Organizations sometimes choose a proper-sounding name by assembling a sequence of words to effect the desired collocation" (102).

Some acronyms can be re-interpreted albeit in a jocular fashion. In such cases, irony is the driving force. For example, Fiat (Fix It Again, Tony instead of Fabbricaitaliana di Automobili Torino).

English Acronymic Loans in Bangla

Acronyms behave like normal words. They can participate in the morphological processes like other lexemes. Steven Pinker's observation is noteworthy in this regard. He rightly points out "acronyms, like phrases, can turn into bona fide words, as a language evolves as in TV, VCR, UFO, SOB, and PC. Once an acronym has become a word there is no reason not to treat it as a word, including adding a plural suffix to it. Would anyone really talk about *three JP* (Justice of Peace) *five POW* (Prisoners of War) or *nine SOB* (Sons of bitches) (Pinker 72)?"

The following are the salient features of acronyms that we get from the above discussion –

- Acronyms are letter words formed from the initial letters of longer words or phrases.
- Initially they come into existence graphemically.
- Pronounceability is an important factor in the construction of acronyms.
- The creation of acronyms is a laboriously creative process and some acronyms are re-interpreted creatively.
- Acronyms are like normal lexemes. They are inflectable. Like other words, they can participate in morphological processes.

Acronyms: A Brief History

It is a widely known fact that abbreviations and acronyms go back several millennia (Cannon 120). The strong intention to economize is seen in Hebrew and Roman examples like MILH (MiLolhLnvHshmilh – Who shall go up for us to heaven?) and INRI (Jesus Nazarenus Rex Judaerum – Jesus of Nazareth, King of the Jews).

Though acronymy seems to be a linguistic phenomenon of the modern times, it has ancient roots in Greek too. The first recorded use of acronymy is seen in the Greek word 'ichthys' meaning 'fish'. The expansion of this ecclesiastical acronym is 'Iesous Christos, TheousHuiois, Soter' (Jesus Christ, God's Son, Savior).

In Great Britain, we see the popular presence of an acronym in the 17th century. This political acronym, CABAL, was constructed from the names of five cabinet ministers. The 'penta' was comprised of Clifford, Arlington, Buckingham, Ashley and Lauderdale (Algeo 220).

In American English, the first known acronyms were recorded in 1879. Walter P. Phillips developed it for The United Press Association. The acronyms intended to be used as telegraphic codes were 'SCOTUS' (Supreme Court of the United States) and 'POT' (President of the ...). 'POT', in 1895, ended up in 'POTUS' (President of the United States). 'POTUS' was later joined by 'FLOTUS' (First Lady of the United States). The growth of this type of acronyms kept an upward curve because of their succinctness. These acronyms because of their shorthandedness received importance in the lingos of journalism, diplomacy and later on they sealed their place in the academic circle.

The German equivalent of acronyms is 'akronym' and it had been in use since the early 1920s. Though initialisms date back 1844, Ben Zimmer points out "It took another century for *acronym* to make the scene in English, taking off during World War II ... Stephen Goranson, a researcher at Duke University, recently discovered a use of *acronym* from 1940, ...". There is consensus among the linguistic historians that despite the presence of acronyms from antiquity, they started to get widespread acceptance since the 2nd World War. The wartime emergency situation warranted extreme precision in language use. Messages needed to be encoded succinctly and safely in the least

possible time. These parameters were aptly met by acronyms and hence they proliferated during the wartime. Now the internet revolution and the resultant unprecedented growth of electronic communication have caused the perennial bloom of this flower from the linguistic garden.

Acronymization: Its uses and functions in Bangla

Despite the presence of word shortening mechanisms in Bangla for a long period of time pre-dating the British colonization of the Indian sub-continent, the popularity of the twin processes of abbreviation and acronymization got momentum after the prolonged linguistic contact between Bangla and English got started. The processes have been vigorously incorporated into the fabric of Bangla with the IT revolution and increased global connectivity between the Banglophones and other communities through the internet. Increased national and international communication, exponential growth in the number of highly educated individuals, rapid industrialization and urbanization and above all, democratization of technology like availability of mobile phones with internet connections, wifi etc. have tremendously contributed to the popularity of word-shortening mechanisms like acronymization and abbreviations in Bangla. Higher educational and scientific institutions have also played a remarkable role in the dissemination of this process. Apart from the laudable role of academia in the dispersal of acronymization, the role of mobile phone operators also deserves mention in accelerating the popularity of word shortening techniques in Bangla. To say all in a few words, we can say that the Banglophones have adopted word shortening mechanisms to save time, space, and money. Economy of language here entails time, energy, space, and money.

Pragmatic factors apart, acronymization like the English language, serves the purpose of getting rid of repetitions in Bangla. Besides serving utilitarian purposes of saving time, space and energy, acronymization adds to the beauty of the language, both in its written and oral forms. No more is acronymization the territory solely to be visited by the writers of scientific papers - the land can these days be explored by anyone, Every Tom, Dick and Harry. The domain of acronymized forms are no more terra incognita for the common language users. Even the illiterate people these days have their fair share in this whom you will frequently hear using the shortened forms 'ILU' or 'OMG' over the phone!

Materials and Method

In conducting this qualitative study, the researcher has collected data chiefly from lexicographic sources. To diversify the data and to make them representative, other sources have also been used. Among these are government websites, social media sites and newspapers.

As there is a paucity of materials on acronyms in Bangla, the researcher has utilized his native-speaking status in collecting and generating required data. Researcher-observation as a reliable source of data was introduced by Uriel Weinreich. Authentic data, according to him, can be collected by a trained researcher (Weinreich 112).

Data

Data for this study have been collected from diverse sources including the following dictionaries. Government websites, newspapers and social media sites have also supplied us with data which have been recorded under 'Researcher's Collection'.

Chalti Shobder Abhidhan

The following data have been collected from Mamunur Rasheed's *Chalti Shobder Abhidhan*:

English Acronymic Loans in Bangla

Photo Credit = Fokrey (ফক্রে)
Tax Identification Number = TIN (টিন)
Laugh Out Loud = Lool/Lools (লুল/লুলজ)
Personal Identification Number = PIN (পিন)
Chattogram Biswabiddiyala (Chittagong University) = Chobi (চবি)
Dhaka Biswabiddiyalaya (Dhaka University) = Dhabi (ঢাবি)
Shahjalal University of Science and Technology = Shabiprobi (শাবিপ্রবি)
Bangladesh Institute of Research and Rehabilitation on Diabetes, Endocrine and Metabolic Disorders = BIRDEM (বারডেম)
National Academy for Educational Management = NAEM (ন্যামে)
Haste Haste Morey Gelam = HaHaMoGe (হাহামগে)

Banglai Procholino Engreji Shobder Abhidhan

Bangladesh Agricultural Research Institute = BARI (বারি)
Bangladesh Academy for Rural Development = BARD (বার্ড)
Dhaka University Central Students' Union = DUCSU (ডাকসু)
Bangladesh Small and Cottage Industries Corporation = BSIC (বিসিক)
Water Supply and Sewage Authorities = WASA (ওয়াসা)
International Rice Research Institute = IRRI (ইরি)
Water and Power Development Authority = WAPDA (ওয়াপদা)

Bangla Slang Abhidhan

Avra Basu has recorded, among others, the following examples of acronyms in Bangla:
Acute Ideological Deficiency Syndrome = AIDS (এইডস)
I Love You = ILU (ইলু)

Researcher's collection

The following examples have been collected by the researcher from different sources:
Bangladesh Institute of Academic Management = BIAM (বিয়াম)
Durniti Daman Commission = Dudak (দুদক)
Chattogram City Corporation = Chosik (চসিক)
Chattogram Unnoyan Kartripakkha = Chouk (চউক)
Rajdhani Unnoyan Kartripakkha = Rajuk (রাজউক)
JaS = Jati Songo (UN) (জাতিসংঘ)
SaS = Sahajjo Songstha (সাহায্য সংস্থা)
VAT = Value Added Tax (ভ্যাট)
Muillo Songjojon Kar = Musak (মুসক)
Self-Contained Under Water Breathing Apparatus = SCUBA (Scuba) (স্কুবা)
RAT = Rapid Action Team (র্যাট)

Official Acronyms used in Bangladesh

The following are examples of some acronyms officially coined and used in Bangladesh.

Acronyms enjoying high-frequency use have been transliterated into Bangla –

- Association of Development Agencies in Bangladesh = ADAB
- Bangladesh Association of International Recruiting Agencies = BAIRA (বায়রা)
- Bangladesh Petroleum Exploration Company = BAPEX (বাপেক্স)
- Bangladesh Academy for Rural Development = BARD (বার্ড)
- Bangladesh Agricultural Research Institute = BARI (বারি)
- Bangladesh Agricultural Research Council = BARC
- Bangladesh Textile Exposition = BATEXPO (বাটেক্সপো)
- Bangladesh Export Processing Zone Authority = BEPZA (বেপজা)
- Bangladesh Institute of Research on Diabetes and Endocrine Metabolism = BIRDEM (বারডেম)
- Bangladesh Oxygen Company = BOC
- Bangladesh Rural Advancement Committee = BRAC (ব্র্যাক)
- Bangladesh University of Engineering and Technology = BUET (বুয়েট)
- Dhaka Electric Supply Company = DESCO (ডেস্কো)
- Eastern News Agency = ENA
- Fair Election Monitoring Alliance = FEMA (ফেমা)
- International NGO = INGO
- Memorandum of Understanding = MoU
- National Institute of Public Administration = NIPA
- National Institute of Preventive and Social Medicine = NIPSOM
- Overseas Correspondents' Association of Bangladesh = OCAB (ওকাব)
- Rapid Action Battalion = RAB (র‍্যাব)
- Sramik Karmachari Oikya Parishad = SKOP (স্কপ)

Acronyms in sentences

Afghanistan a-NATO (অ-ন্যাটো) deshgulir Bhumika Kemon chhilo?
Dudaker obhijan choloman thakuk.
Jolaboddota niroshoney Chosiker ghum kokhon bhanbey?
NATOheen Afghanistan Kemon hobey?
AIDSakranto lokjoner upojukto chikithsar beboস্থা kora houk.
Tar MUNpriti dekhar moto. Kintu eto MUNtun diye ki hobey?
Amader Radargulo thik moto kaj korey ki?
Al-Nassr-e swagatam, Priyo GOAT CR7.
Covidakranta lokjonke sahajjo koro.
Tar BUETioohonkar BCS porikkhai bhupatito holo.
WASA-twasa lagbena, ekta deep tubewell bosiey nao.
Hall-e keno, faokhete holey FAO-e jao.

English Acronymic Loans in Bangla

Shilpomontrir SKOPpriti dekhar motho.
IRRItey sonali diner sonali swapno krishoker.
Nijer ghorer chaley tin nai, amar abar TIN!
EsobPINTin baad den, ami analogue manush.
Lukieyelukieye koi jao sobi jani, amar radar fanki deya eto sohojna!
Etoeto phonalap fansh hochchhey, konta asol konta nokol buja dai.
Kothata bolatey tar BUETio abhijathey gha legechhey.
(Researcher generated sample sentences)

Discussion

The collected data reveal the patterns, morphological behavior, status and productivity of English acronyms in Bangla.

Let us begin our discussion with the types of English or English-induced acronyms in Bangla. Like lexical items, acronym-borrowing in Bangla has two broad patterns – Direct and Indirect borrowings. The members of the first category are those borrowed directly from English. Some examples of these unaltered acronyms from our data are – NATO, NASA, AIDS etc. Here we would like to dub these direct acronym loans as ‘Global Acronyms’.

The other class the members of which have been indirectly borrowed can be called ‘Local Acronyms’. Local acronyms are constructed in a number of ways. They can be formed using materials from the English language but these are ‘home made’ products. Some examples of this class are – NAEM, BIAM, WAPDA etc. Some acronyms of this class are also constructed using Bangla materials. For example, MuSaK (Muillo Songjojan Kar) etc. There are some acronyms in Bangla formed using Bangla materials but they are transliterated in the Roman script. For example, SKOP (Sramik Karmachari Oikya Parishad). There is yet the presence of another acronym which is composed of both Bangla and English elements. For example, DuDaC (Durniti Daman Commission).

We have seen the presence of acronyms like ‘MuSaK’, ‘ChaUK’, ‘RajUK’ etc. The raw materials used in the molding of these acronyms are purely indigenous. They are pure Bangla acronyms processed by the utilization of Bangla words. These acronyms can be labelled as ‘Indigenous Acronyms’.

The acronym ‘SKOP’ is built from Bangla lexical materials but is written and pronounced in the Romanized form and hence it can be christened as ‘Transliterated acronym’.

The acronym ‘DuDaC’ (Durniti Daman Commission) is composed of bilingual elements. We can dub it as ‘Hybrid acronym’.

Another interesting type of acronym is also in use in Bangla. Let us have a look at ‘AIDS’ from *Bangla Slang Abhidhan*. The global acronym has been purged of 25% of its old carnal elements and re-fleshed by the speakers of Bangla maintaining the original skeleton. In its ‘old bones and some new flesh’ form, AIDS stands for ‘Acute Ideological Deficiency Syndrome’. Here all the materials are of English stock but the acronym has been recharged with new semantic significance. This acronymic ‘old wine in new bottle’ may be called as ‘Re-semanticized Acronyms’ or ‘Reinterpreted Acronyms’. Twists of this type are generally added to the acronyms by young users of the social media.

Morphological Processing of Acronymic Loans in Bangla

The English loan acronyms in Bangla show remarkable performance in getting combined with other morphological processes. For example, some of them can be inflected to form plurals. The acronym 'Radar' can be pluralized by adding the Bangla plural marker suffix 'gulo' to it which results in the hybrid form 'Radargulo (রাডারগুলো)'. Some of the acronyms are open to affixation – 'A-NATO (অ-ন্যাটো)' (Non-NATO), NATOheen (ন্যাটোহীন) (Without the presence of NATO). The acronyms can form Euphonic combination with Bangla words, i.e. AIDSakranto (এইডসাক্রান্ত). The acronyms can also take different case endings in Bangla. For instance, 'Sey Bracey (সেই ব্র্যাক-এ) kormoroto'. Here we see the acronym taking the locative case ending. Some of the acronyms can also take genitive case ending in Bangla. For example, 'UNICEF programgulo onek doridro deshey bhalo fol diechhey'. In this sentence, 'UNICEF' has taken the genitive case-ending in Bangla. Some of the acronyms can also be reduplicated in Bangla. For example, 'Esob MUNtun nakorey poralekha koro'.

Phonological and Semantic Shifts

A few of the borrowed acronyms in Bangla can also undergo some changes in form and meaning. One such example attested by our data (*Chalti Shobder Abhidhan*) is 'Lool' or 'Lools'. It is based on LOL (Laughing Out Loud). But it has undergone phonological change in Bangla by the insertion of an extra vowel sound /o/ between the two consonants. Both the two variants of the acronym are in use in Bangla. With the insertion of the extra vowel sound, it has undergone semantic change in Bangla. By Lool or Lools, the younger speakers of Bangla refer to someone with philandering mentality who is senior to them in term of age. Here we see that through the twin processes of phonological and semantic changes, the acronym in the Bangla language has adopted a new and curious look, in terms of both form and meaning.

'YABA-compatibility' in Nomenclature

Garland Cannon suggests that in choosing acronyms, we should remember that the letter word should be 'YABA-compatible' (103). The acronym 'YABA' here stands for 'Yet Another Bloody Acronym'. By 'YABA-compatible', the scholar means that in the construction process of acronyms, pronounceability and inoffensiveness of the chosen form should be ensured (103). In conformity with the basic principles at work in the construction process of acronyms, meticulous care is taken in Bangladesh. For example, the name of the elite force 'RAB' (Rapid Action Battalion) was 'RAT' (Rapid Action Troops) at the inception. But as 'RAT' is not a bravery-emitting name, it was changed to a more appealing form, 'RAB'. This reminds us of an American acronym 'BOMB' which was discarded by the Nixon administration for its negative semantic connotation.

Lexicalization of acronyms

Some acronyms in Bangladesh have become household words. They are so frequently used that people are oblivious of their status. This widespread dispersal and the subsequent promotion of acronyms to words is called lexicalization. In other words, the process through which an acronym passes from being a sequence of letters into a word is called lexicalization (Beanne

English Acronymic Loans in Bangla

27). ‘IRRI’ and ‘BIRDEM’ are two examples of this class in Bangladesh. Leonhard Lipka in his discussion points to the temporal factor behind the lexicalization of acronyms (5). He thinks that lexicalization is a process of diachronic change through which a string of initial letters formed out of an expression is reduced to a single word. How time contributes to the lexicalization of acronyms has also been commented upon by Brinton and Traugott – “the change whereby in certain linguistic contexts speakers use a syntactic construction or word formation as a new contentful form with formal and semantic properties that are not completely derivable or predictable from the constituents of the constructions or the word formation pattern. Over time, there may be further loss of internal constituency and the item may become more lexical” (144).

Yamina Beanne has indicated another operational factor that leads an acronym to being treated as a word. According to her, “lexicalization is achieved when the relation between the word’s meaning and the acronym becomes stronger than the relation between the acronym and its expanded form (Beanne 27).” From the English language ‘radar’, and ‘scuba’ are good examples that prove the point of Beanne.

In the light of the discussion on lexicalization of acronyms by Yamina Beanne, Leonhard Lipka, Laurel J. Brinton and Elizabeth C. Traugott, we see that two factors are at work behind the lexicalization of acronyms. Beanne (32) terms these factors as ‘frequency’ and ‘constancy’. When acronyms are bestowed with these factors, they got stabilized in a language. Stabilization leads to the lexicalization of acronyms.

Now let us evaluate some English acronymic loans in Bangla in the light of the preceding theoretical discussion. Some acronyms in Bangla because of their high-frequency use have gained pan-Bangladesh dispersal. They have also been being used for decades. For example, ‘IRRI’, ‘BUET’ and ‘BIRDEM’. These acronyms are often treated as independent, one-word unit. People from all walks of life come across these acronyms both in the print and electronic media. This repeated exposure to the acronyms has made them conversant with the letter words. Many of them use these acronyms like native Bangla words. For example, let us think of the sentence ‘BCS porikkhai fail Korey tar BUETio ohonkar bhupatito holo’. Here the local English acronym ‘BUET’ has been affixed with Bangla suffix ‘-io’. ‘BUETio’ in this context means ‘connected with BUET’. Let us have a look at another sentence ‘BIRDEM, BIRDEM Korey sey local haspataley chikithsha nanie bipodey porlo.’ BIRDEM, the famous specialized hospital situated in Dhaka, is a household name in Bangladesh. Even semi-literate people in our country can frame sentences like the above one by employing the word formation technique of reduplication on the acronym ‘BIRDEM’. Again, in a sentence like ‘Montrir SKOPpreiti dekhari moto’, we see that the transliterated acronym ‘SKOP’ has been compounded with the Bangla word ‘Preeti’ yielding the hybrid form ‘SKOPpreiti’ meaning ‘love for SKOP’. So, it is noticeable that some acronyms in Bangla because of their high-frequency use and familiarity have achieved almost lexicalized status. Another factor is at work behind this integration of English acronyms into the fabric of Bangla. This is the temporal length of the acronym. The

older the acronym, the better chances for its assimilation with the borrowing language. Acronyms like 'BUET', 'SKOP' and 'DuDaC' enjoy high frequency use in Bangla – 'BUET' for its academic excellence and prestige; 'SKOP' for its role in the industrial sector of the country and 'DuDaC' for its countrywide anti-corruption drives.

Final Taxonomy of Acronyms in Bangla

At the beginning of the 'Discussion' section, we have traced four types of acronyms in Bangla. Based on our data and the subsequent discussion, we can further categorize the English loan acronyms in Bangla into the following types –

Lexicalized Acronyms –These are kinds of democratic acronyms with almost all Banglophones having access and command over them. For example, IRRI (dhan). Some other examples of this group attested by our data are WASA, BUET, CUCSU, DUCSU etc.

Transliterated Acronyms –The building blocks of these acronyms are pure native materials but for the convenience of pronunciation their acronymized forms are written in the Roman script. One example of this type present in our data is SKOP (Sramaik Karmachari Oikiya Parishad).

Hybrid Acronyms –There are some acronyms which are composed of bilingual elements. For example, DuDaC (Durniti Daman Commission). As this acronym is formed through the fusion of Bangla and English elements, we dub this as a 'Hybrid acronym'.

Janus Acronyms –There are some curious acronyms which when written in Bangla script are pronounced as words but when these are written in Roman script, they are pronounced as individual letters. Examples are ChaSiK (Chattogram City Corporation. In English the shortened form is CCC). The case with ChaMeK (Chattogram Medical College – CMC) is identical. Other examples are RaSiK, KhuSiK, Dhamek etc.

Our data have attested the presence of these sub-classes of acronyms – Global, Local, Indigenous (Calqued and Transliterated), Resemanticized, Lexicalized, Transliterated, Hybridized and Janus acronyms.

English Acronymic Loans in Bangla

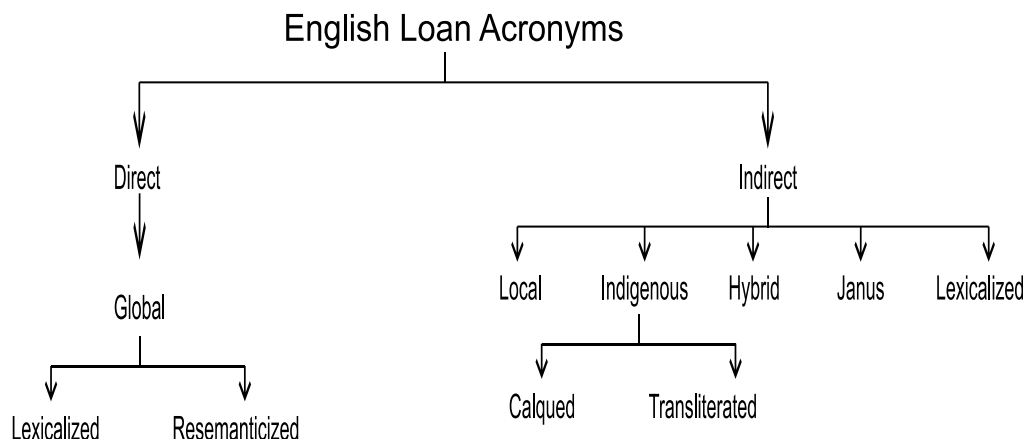


Figure 02: Proposed Taxonomy Model of English Acronyms in Bangla

Findings

Based on our observations in the above discussion, the following are our findings –

1. Bangla has widespread use of borrowed acronymized words from English.
2. The analysis of the collected data have revealed that we have the following types of English or English-induced acronyms in Bangla – Global Acronyms, Local acronyms, Indigenous Acronyms (Calqued and Transliterated Acronyms), Resemanticized or Reinterpreted Acronyms, Lexicalized Acronyms, Janus Acronyms and Hybridized Acronyms.
3. Despite the significant presence of Global Acronyms, Local Acronyms have started to assume a preponderant status in Bangla.
4. Like their English counterparts, acronyms in Bangla can be written with dots and without dots between letters. But these days, Bangla shows a clear preference to write acronyms without dots between the letters.
5. Bangla, in the construction of acronyms, follows the English rule of omitting non-lexical items.
6. English or English-induced acronyms in Bangla can participate in both Non-concatenative and Concatenative morphological processes. They can be inflected, can be affixed and can be reduplicated, among other morphological processes.
7. A few English acronyms can undergo partial phonological change and full semantic change in Bangla.

8. In complete harmony with the English language, negative-sounding acronyms are avoided in Bangladesh
9. Some acronyms in Bangla, because of their frequent use in the media, have achieved almost lexicalized status.

Acronyms: Boons or Banes?

As the issue of the cross-lingual popularity of acronyms crops up in any discussion on them, we need to answer the query what makes acronyms so popular? This can be attributed to the catchiness of their forms. Apart from catchiness, there are other attributes of acronyms. The most important one is the mnemonic quality of the initials. They can aid the memory and makes it possible for people to remember complex names or things. The mnemonic side of acronyms is intensified by the time-saving capacity of the initials. In addition to these, there are some other advantages of acronyms as well. Let us think of the re-creations or re-interpretations of acronyms. They can serve some literary purposes side by side performing pragmatic functions. Last but not the least, the utilitarian value of acronyms is of significant importance in modern times. Encoding of messages through acronyms is a global phenomenon, both in the military and civil domains. The internet revolution and electronic communication, to be precise, have taken acronyms to insurmountable heights.

Acronyms by the way of their distinctive manner of encoding messages, can contribute to the preservation of historical facts. Let us think of the case of the most used acronym in the contemporary world, Covid-19. The year of the outbreak of the pandemic has been succinctly packed into the alpha-numeric acronym. Another example that confirms that acronyms are not only of linguistic value, they have other values too, is the word GOLF. Zerkina et al point out that ‘Gentlemen Only Ladies Forbidden’, the expansion of GOLF, reflect that there was prohibition on the participation of women in the game (138). In this way acronyms are linguistic capsules containing vital information of historical importance. They embody archaic societal features conveying the realities of past epochs.

Acronyms, however, are not unmixed blessings for us. They pose some problems for the users of languages. The major difficulty of acronyms is in the semantic field. Meanings of words created through the use of mainstream word formation techniques can be easily deduced from the meanings of the constituent parts. But there is a significant hurdle in this case in acronyms. Unless one is fully aware of the components that contribute to the creation of the acronym, it is impossible to decode the meaning.

This semantic difficulty apart, the advantages of acronyms far outweigh the disadvantages. The catchy form, the memory-aiding quality, the time-savvy form and the freewheeling creativity of acronyms have placed them at a great height of cross-lingual popularity.

Conclusion

Acronyms have been found to be cross-linguistically present and operational. With their origin traced in the antiquity, weathering millennial waves, they have emerged even stronger. The

world wars ended their infancy and the internet revolution and electronic communication have taken the letter words to an insurmountable height. As they have reached a robust prime, acronyms have become highly productive yielding innumerable offspring. Their productivity and global popularity have contributed to the erasure of their status as products of non-morphematic process. Despite the recognition of the fact that acronymization is a somewhat low-profile word-formation technique, it shows remarkable performance in Bangla. Morphologically speaking, some acronyms can be inflected to form plurals. Some others can be prefixed and suffixed. Some acronyms can also take different case endings in Bangla. Some are also open to non-concatenative processes such as reduplication.

Bangla has readily embraced many unaltered acronyms from English. The users of Bangla, however, have not left the lexical transaction at the mere stage of blind borrowing. They have shown great creativity in utilizing the technique by moulding, remoulding and adapting it to the linguistic milieu of Bangla. This adaptability and creativity is manifest in the creation of new types of shortening like ‘Local Acronyms’, ‘Re-semanticized Acronyms’, ‘Janus Acronyms’, ‘Hybridized Acronyms’ and ‘Indigenous Acronyms’. The versatility of acronymic loan acceptance and new acronymic class creations can contribute significantly to the future studies of acronyms and their global typologization.

References

- Algeo, John. “The Acronym and Its Congeners”. *The First LACUS Forum 1974*, edited by Adam Makkai and Valerie Makkai, Hornbeam Press, 1975, pp. 217-234.
- Altakhaineh, Abdel Rahman M. “The Linguistic Features of Acronyms in Arabic”. *SAGE Open*, 7(4), 2017, pp. 1 – 14. <https://doi.org/10.1177/2158244017746710>.
- Basu, Avra. *Bangla Slang*. Papyrus, 2009.
- Bennane, Yamina. “The Lexicalization of Acronyms in English: The Case of Third Year E.F.L Students, Mentouri University – Constantine”. *Expressions* (3), 2017, pp.24-35.
- Brinton, Laurel J. and Elizabeth C. Traugott. *Lexicalization and Language Change*. Cambridge University Press, 2005.
- Cannon, Garland. “Abbreviations and Acronyms in English Word-formation”. *American Speech*. 64.2, 1989, pp. 99 – 127.
- Fandryaz, Ingrid. “Submorphemic elements in the formation of acronyms, blends and clippings”. *LEXIS* (2), 2008, pp.68 -79.
- Finegan, Edward. *Language: Its Structure and Use*. Thomson Wadsworth, 2007.
- Izura, Cristina. & David Playfoot. “A Normative Study of Acronyms and Acronym Naming”. *Behav Res* 8, 2012, pp. 862-889.
- Lipka, Leonhard. “Lexicalization and Institutionalization in English and German”. *Linguistica Pregensia* (1), 1992, pp. 1 – 13.
- McArthur, Tom (Ed.). *The Oxford Companion to the English Language*. Oxford University Press, 1992.
- Musa, Mansur and Monowara Iliyas. *Banglai Procholito Engreji Shobder Abhidhan*. Mouli, 2002.

The Chittagong University Journal of Arts and Humanities

- Pinker, Steven. *Words and Rules. The Ingredients of Language*. Weidenfeld & Nicholson, 1999.
- Quirk, Randolph, et al. *A Comprehensive Grammar of the English Language*. Longman, 1985.
- Rasheed, Mamunur. *Chalti Shobder Abhidhan*. Ittiyadi, 2017.
- Rua, Paula. "On the structure of acronyms and neighbouring Categories: A prototype-based account". *English Language & Linguistics* 6, 2002, pp. 31-60.
- Weinreich, Uriel. *Languages in contact: findings and problems*. Mouton, 1963.
- Zapata, Argenis. *Types of Words and Word-Formation Processes in English*. Escuela de Idiomas Modernos, 2007.
- Zerkina, Natalya, et al. "Abbreviation Semantics". *Procedia* 199, 2015, pp. 137-142.
- Zimmer, Ben. "Covid: The New Coinage That Defined 2020". *Wall Street Journal*, December 24, 2020. www.wsj.com/articles/covid-the-new-coinage-that-defined-2020-11608830903. Accessed on 11.06.22.

A critical analysis of deriving moral statement from factual statement

Muhammed Amir Uddin*

Abstract

The problem of deriving moral statement from factual statement(s) is a controversial issue of moral philosophy. British philosopher David Hume raised the issue at first. Moral philosophers have contributed each other interpreting Hume's 'is-ought' passage in many ways. Some moral philosophers believe that a value term or moral term in particular can be defined by a factual term, or moral statement can be derived from absolutely factual premises. On the other hand some others oppose that view and argue that there is no relation between factual term and moral term. They claim that it is not possible to define moral terms by factual terms or to derive a moral statement from s factual statement. In this article I shall critically examine the above two opposing views. I believe that both these views are partially true. Those who believe that value statement cannot be defined by or derived from factual statement are right in the sense that value statement cannot be derived from factual statement formally or deductively and a definition of value terms by natural terms commits *naturalistic fallacy*. But they are wrong to say that value statement cannot be derived from factual statement in any way, or that there is no relation between them. Similarly those who claim that moral statement can be derived from factual statement(s) are partially right in the sense that there is a way to draw moral statement from factual statement(s). They are partially right because I believe and will try to establish the fact that moral statement can only be drawn from factual statement informally.

1. Introduction

In the history of meta-ethics we see that naturalism find a very close connection between fact and value. They attempt to define value terms, such as, good by different natural properties. On the

*Associate Professor, Institute of Education & Research, University of Chittagong

other hand, some emotivists, like A. J. Ayer, believe that factual statement and moral statement contain different properties and hence there is no relation between them. Similarly, Searle and some others believe that there is a logical connection between factual statement and moral statement(s). They try to show how moral statement or *ought statement* can be derived from factual statement(s) or *is statement(s)*. But R.M. Hare and some others disagree with them. They find no logical connection between *is* and *ought*.

We believe, naturalist's view that *good* is definable and Ayer's view that moral statements are devoid of all factual contents are too extreme. We will argue that there are some sort of connection between fact and value, but that connection is varying different from that of naturalist's claim. Like non-naturalists, for example G. E. Moore, we believe that a moral term, such as *good* is indefinable. But at the same time we believe that there is some sort of connection between fact and value, that values are rooted in facts in the sense that we explain value with the help of fact.

Again, Searle and Hare's view that "moral statement can be derived from factual statement" and "moral statement cannot be derived from factual statement" are respectively also too extreme. We are in agreement with Hare that formal deduction from *is* to *ought* is not possible, but we believe that there is a logical connection between *is* and *ought*. For we can arrive at *ought* from *is* informally.

2. Ethical naturalism: Moral term can be defined by factual term.

Ethical naturalism is a theory of meta-ethics according to which, moral terms can be defined by non-ethical terms, and moral statements can be replaced by non-ethical statements without changing their meaning. According to naturalism, William Frankenna says, "Ought can be defined in terms of *is*, and value in terms of *fact*" (1970, 97).

Some moral philosophers, G. E. Moore, for example, characterize naturalism as a theory which holds that moral statements are a sub-class of empirical statements because like factual statements moral statements are also empirically verifiable:

According to the naturalistic ethics, ethics is an empirical or positive science; its conclusion could be all established by means of empirical observation... Those theories of ethics, then are naturalistic, which declare the sole good to consist in some one property of things, which exists in time; and which do so because they suppose that 'good' itself can be defined by reference to such a property (1903, 39).

The naturalists believe that there are no special moral facts or properties to be known other than by empirical observation. Instead, they think that moral terms, such as, *good* or *right* can be identified with, or reduced to natural properties. Therefore, ethical naturalism is the view, in short, which

A critical analysis of deriving moral statement from factual statement

denies the gap between fact and value. According to this theory, like factual statements, moral statements can also be rendered either true or false by empirical verification and all these are possible because a value term can be defined by a factual one without changing its meaning. The most discussed definition of *good* is the hedonistic definition. According to which, *good* means pleasure. The sentence 'X is *good*' is equivalent to the sentence 'X is pleasant'. This kind of definition of good is popularly known as utilitarian definition.

2.1. The indefinability of *good* : G. E. Moore

In his book *Principia Ethica*, G. E. Moore has offered the most powerful argument against naturalism. We see that the utilitarian as well ethical naturalists Bentham, Mill and Spencer try to define ethical term (good) by non-ethical property or natural property (pleasure). Moore strongly opposes such kind of attempt because it commits *naturalistic fallacy*. He says, many moral philosophers are guilty of this fallacy. Now we will consider his grounds against the definability of good.

2.2. Good is a simple notion.

Moore proposes a special kind of definition which expresses the real character of the object or notion denoted by a word, and do not simply inform us what the word is used to mean. He says:

You can give a definition of a horse, because a horse has many different properties and qualities, all of which you can enumerate. But when you have enumerated them all and when you have reduced a horse to his simplest terms. They are simply something, which you think of or perceive them; you can never, by any definition make their nature known (1903, 7).

Moore argues that good is a simple notion as like as color yellow is a simple notion. Nobody can able to explain yellow to a blind or an ignorant person who does not already have the knowledge of yellow. For the same logic we cannot explain what good is. We cannot equalize the word yellow as some naturalists do it with the words produce of a certain kind of vibration in the light; similarly, good is not equalized with the words produce of pleasure.

2.3. The open question argument

According to open question argument, whatever definition is offered for good, it may always be asked with importance whether it is good. Suppose, good is defined as pleasure. Someone may ask, "Is pleasure good?" If this definition is correct then the question will be insignificant. And if the definition is not correct then the question is significant.

2.4. The naturalistic fallacy

Finally, Moore concludes that good cannot be defined by pleasure. And any attempt to define good by any natural property must commit *naturalistic fallacy*. The naturalistic fallacy is committed when anyone tries to identify or define value properties with natural properties. So

Moore claims that ethical naturalists, such as, Bentham, Mill, Spencer and Green commit naturalistic fallacy by defining moral terms with natural terms.

3. Values are devoid of factual content: Intuitionism

Ethics, according to intuitionism, does not depend logically on facts about man and the world, empirical or non-empirical, scientific or theological. (Frankenna, 1963, 84) Rather than, intuitionists hold, ethical statements are intuitively known to be certain. According to C.A. Patterson, ethical intuitionism is:

The doctrine that what is right or wrong is something that can be known immediately without stopping to reflect on the matter or taking into account the consequences which belong to the action in question (1949, 77).

Ethical intuitionists are in agreement that moral knowledge is immediate, self-evident, clear and distinct- that moral truths are known by intuition without appealing to fact or reason. In other word, they hold that there is no relation between fact and value.

3.1. G. E. Moore: Factual terms and moral terms are different

We have seen that according to Moore, moral terms such as good cannot be defined in terms of natural properties. Indeed he believes that goodness is a non-natural property. He holds that we know by our intuition that there is a gap between fact and value. Value concept-such as, *good*, according to him, is a unique object which is very different from natural properties, e.g., producing pleasure. The truthfulness or falsehoods of moral statements do not depend on sense experience or reason. We can know their truth-value immediately, i.e., by intuition. We know that men without moral eyesight do know what yellowness is and a man who is not suffering from physical and mental disorder directly can experience the taste of food. Similarly, a man with average intellect can experience what goodness is. But although the knowledge of yellowness and the knowledge of goodness are immediate and direct, yet they differ in respect of the way we know them. While the knowledge of yellowness is perceptible, i.e., depends on sense experience, the knowledge of goodness is intuitive. In other words, the sensory knowledge of yellow is empirical and the knowledge of good is non-empirical. Thus Moore comes to the conclusion that there is a logical gap between factual statement and moral statement.

3.2. Limitation of intuitionism

We have seen Moore's reason for thinking that there is a difference between moral good and natural fact. We all know it by intuition that there is such a gap. And good is a unique object. But do all men have before their minds this unique object when they think about good? If someone's answer is negative, then we cannot refute him. Hudson says, "...the logical gap between 'good' and any 'naturalistic description cannot be established by Moore's appeal to intuition.'"(1970:85). We believe that Hospers is right to say that Intuitionism is not an acceptable view. It seems an

A critical analysis of deriving moral statement from factual statement

extreme view. Now we will discuss another extreme view regarding fact-value relation, called radical subjectivism, which also claims, like intuitionism, that ethical statements are devoid of factual contents.

3.3. Radical subjectivism: Moral statements are purely expressive

Regarding the nature of moral statement British empiricist as well as logical positivist A. J. Ayer also rejects intuitionism advocated by G. E. Moore, H. A. Prichard and W. D. Ross. According to them goodness and badness, or rightness and wrongness of an action can be known by intuition. Ayer agrees with Moore and others that moral statements are not empirically verifiable, but he does not recognize as a scientific mode of verification. "Intuition", he says, "is worthless as a test of proposition's validity because it cannot serve as a criterion to resolve conflicts" (1936, 141).

According to radical subjectivism, an ethical statement does not express real feelings of the speaker. It does not necessarily involve any assertions; or does not ever report the mental state of the speaker. Thus if the speaker says that x is good but I do not approve of x, he does not contradict because he is not expressing his real feeling. Why? Ayer answers,

If I say x is good I should not be making any statement about feeling or about anything else. I should simply be evincing my feeling which is not at all the same thing as saying that I have them (1936, 144).

Ayer claims that ethical statements are purely expressive, since they say nothing; they are like a cry of pain or a word of command. Ethical statements do not express actual propositions; they are pseudo propositions. Therefore they are neither true nor false.

For in saying that certain type of action is right or wrong. I am not making any factual statement, not even a statement about my own state of man. I am merely expressing certain moral sentiments. And the man who is ostensibly contradicting me is merely expressing his moral sentiments. So there is plainly no sense in asking which of us is in the right. For neither of us is asserting a genuine proposition (1936, 142-143).

So, in brief, we can say, Ayer's radical subjectivism claims that ethical statements are devoid of all factual contents; they do not even report speaker's mental state. We will show that this claim is unacceptable.

4. Arguments for factual-evaluative transition

We saw that naturalists argue that there is a very close relation between fact and value. But we said that Moore is right to claim that moral statement(s) cannot be defined by factual statement(s). Even though we disagree with the naturalists that moral statement(s) can be defined by factual statement(s), we agree with them, on different ground that facts and values are related. Similarly, even though we agree with Moore that moral statements cannot be defined by factual statements,

but we disagree with him and others like intuitionists and radical subjectivist that values are devoid of all factual contents.

The reason why we believe that fact and value are related is that the justification of moral statement depends on factual statement(s), in the sense that if someone asks me what is *good* then I cannot make him understand or explain to him what *good* is without reference to or taking help of factual statements. Let us remember that there are some statements of morality. If someone says that 'x is good' and if we ask him why does he believe that 'x is good' then he will mention a standard on the basis of which he called 'x' good. For example, some use 'approval of self' as a standard some use God's approval, some use majority's approval and some others use 'survival of the fittest as the standard of morality. If we look at these standards carefully, we can see that these standards are factual. Indeed, religion, society, law, culture etc. are frequently used as the standards and origin of morality. As we have noted earlier that whenever someone says that 'x is good' and if asked why does he believe so, he gives reference of the standards mentioned above; and these standards are factual. In order to justify moral statements people frequently uses factual statements. Thus morality is related with fact.

Let us grasp the issue in a different way. Supposing we are asked-what is yellow? Or what is wave? Usually, we answer that such and such kind of vibration (causes) is yellow. Similarly, we say that wave is such and such kind of particle. We have already said with reference to G. E. Moore that it is true that vibration and yellow is not the same thing. But at the same time it is also true that without vibration the color yellow is impossible. This means that even though vibration and color are different; still in order to explain what yellow is, we need the reference of vibration. In this way yellow and vibration are related, though they are different in nature- one is natural (vibration) and the other is non-natural (yellow).

What we have acknowledged so far is that two different properties can have relation. If so, fact and value can also be related. We generally explain value with an appeal to fact. In other words, the justification of value mostly depends on fact. So we conclude that fact and value are related each other. The reason on which we base our claim that fact and value are related is very different from those of naturalists offer. Naturalists believe that ethical terms are definable by factual terms and they are synonymous. But we do not agree with them. Like Moore, we think that moral terms cannot be defined by factual terms. At the same time we disagree with Moore that goodness can be determined by intuition. For we have argued that intuition cannot be a reliable source of knowledge. In the next we will consider the logical relation between fact and value.

5. The logical derivation of moral statement from factual statement(s)

Here we will consider the logical connection between factual statement and moral statement. Some moral philosophers believe that there is a relation between fact and value, that is, there is a logical connection between Factual statement or *is statement* and moral statement or *ought statement*. On the other hand, some philosophers say that there is no logical connection between

A critical analysis of deriving moral statement from factual statement

is-statement and *ought-statement*. Let us see how some moral philosophers try to deduce *ought* from *is* and others deny it.

5.1. Searle's attempt to derive evaluative statement from factual statement(s)

Searle depicts and defends with a case of an evaluative conclusion derived exclusively from descriptive premises. He begins his five steps of derivation with a purely descriptive statement such as, Jones uttered the words, I hereby promise to pay... and to continue by a series of reasoning moves to the purely evaluative conclusion 'Jones ought to pay...' The proof discloses the relation between the utterance of certain words and the speech act of promising, and then in turn discloses promising into commitment that moves from obligation to 'ought'. Searle designs his argument as follows:

- 1) Jones uttered the words, "I hereby promise to pay you, Smith, five dollars".
- 2) Jones promised to pay Smith five dollars.
- 3) Jones placed himself under an obligation to pay Smith five dollars.
- 4) Jones is under an obligation to pay Smith five dollars.
- 5) Jones ought to pay Smith five dollars.

Searle explains, (1a) under certain condition C anyone who utters the words "I hereby promise to pay you, Smith, five dollars", promises to pay Smith five dollars. For the act of promising the conditions must be empirical, such as, the speakers and hearer are both conscious, speak of English, speaking seriously; the speakers and hearer are both conscious and the speaker knows what he is doing, not under the influence of drugs, not hypnotized, or not acting in a play, not telling a joke or reporting an event etc.

(1b) Conditions C obtain.

From 1. (1a) and (1b), 2 is derived.

Between (2) and (3) Searle takes 'promise' by its definition, such as, an act of placing one's under an obligation. So, (2) entails (3) directly.

The tautological premise is:

(2a) All promises are acts of placing oneself under an obligation to do what are promised.

(3a) other things are equal.

(3b) All those who place themselves under an obligation are, other things being equal, under an obligation.

From (3), (3a) and (3b), (4) is derived.

The relation between (4) and (5), the additional statement is also tautological.

(4a) Other things being equal.

(4b) All those who are under an obligation to do an action 'ought', other things being equal, to do that action.

Searle believes that there is nothing evaluative about the *ceteris paribus* clause. The phrase other things being equal contains the sense "unless we have some reasons or we are actually preparing to give some reasons, for supposing the obligation is void, or the agent ought not to keep the promise then the obligation holds and promise ought to be kept" (1964. Vol. LXX). He argues that the conclusion of the derivation is not a hypothetical but categorical. Thus, Searle derives evaluative statement from factual premises.

5.2. R. M. Hare: Denial of *is-ought* derivation

Hare denies Searle's derivation in his article *promising game* (1964:144). He mainly attacks the status of the extra premise, which Searle introduces between (1) to (2) and (2) to (3) as an entailment. Hare analyzes Searle's extra premise (1a) and argues that it contains a synthetic evaluation or prescription. He combines Searle's (1a) and (1b) into a single constitutive rule: (1a*) under certain condition C anyone who utters the words, "I hereby promise to pay Smith five dollars" place himself under an obligation to pay Smith five dollars.

Hare concludes that (1a*) is neither a synthetic nor a tautological statement. Uttering the word *promise*, we should not think that this makes (1a*) a tautology, or a mere statement about word usage. It is an essence of a word like *promise* has a meaning only when certain synthetic proposition about how we should act is assented. (1a*) is such kind of proposition. The word *promise* depends for its meaning upon the proposition but the proposition is not true solely in virtue of the meaning of the promise. He believes that (1a*) is a synthetic constitutive rule of institution of promising and the constitutive rules of promising are moral principle, so (1a*) is a synthetic moral principle. If (2a) is tautological statement then (1a) is either explicitly or implicitly contained a synthetic moral principle. Therefore Hare concludes that Searle does not reach evaluative conclusion from exclusively factual premises. He just draws an evaluative statement from concealed evaluative premise(s).

6. Informal way of deriving ought from is

Now we are going to explain how moral statement can be derived from factual statement(s) informally. For this we discuss conduction and legal reasoning as the examples of informal logic. Through these discussions it would be clear that there is a way to derive *ought* from *is*.

6.1. Informal logic

There are some kinds of arguments, which are neither deductive nor inductive. These arguments are named informal reasoning. Informal logic helps in those fields where formal logic is unable to help. Informal logic like, conduction and legal reasoning will help us to understand how value statements can be derived from factual statement(s).

6.2. Conduction

Karl Wellman advocates conduction. He defines conduction "as a kind of reasoning in which the conclusion about some individual case is drawn non-conclusively from one or more premises about the same case without any appeal to other cases" (1970, 52).

There are three patterns of conduction. The first pattern consists of one premise and the conclusion. In this pattern other premises are not added because the reason given by the single premise is so clear and powerful that it alone is enough to draw the conclusion. For example,

You promised to return my book.
Therefore you ought to return my book.

The second pattern consists of more than one premises to draw the conclusion. Here each premise provides independently positive reason for the conclusion, for example,

You are rich.

A critical analysis of deriving moral statement from factual statement

You are kind hearted.
Your neighbor is poor.
Therefore you ought to help your neighbor.

In the third pattern of conduction the conclusion is drawn from both positive and negative premise(s). The positive premises provide favorable reasons for the conclusion and the negative premises provide reasons against the conclusion. For example,

He is rude.
He is eccentric.
He is honest.
He is benevolent.
Therefore He is good.

Here two premises are positive. They provide reasons for the conclusion. And two other premises are negative. They give reasons against the conclusion. But the reasons for are stronger than the reasons against. Thus the argument presents convincing evidence to tell the person good.

All the three patterns of argument mentioned above, consist of factual premise(s) and evaluative conclusion. We may conclude that conduction which provides us value statement on the basis of factual statement(s).

6.3. Legal Reasoning

Legal reasoning is another branch of informal logic which allows us to draw value conclusion from factual premise(s). In his book *An Introduction to Legal Reasoning* Edward, Levi characterizes legal reasoning (1970:1-2). Following him Let us construct arguments:

Suppose that Karim has stolen a necklace from a shop. Suppose also that Rahim stole from a shop. In Rahim's case the court has declared him guilty. So in Karim's case the judge probably call him guilty, because the present case has the similarity with the previous case.

X steals money.
Y steals money and he was declared guilty.
Therefore X is guilty.

It shows us how moral statement can be drawn from factual statement informally. In legal reasoning, the premise (e.g. Rahim stole money) is factual; but the conclusion (e.g. Rahim is guilty) is evaluative. And the conclusion does not derive from the premise formally. As a result legal reasoning again helps us to understand that there is a logical connection between fact and value.

7. Conclusion

We have explored whether there is any valid relationship between fact and value. We have critically examined all the views regarding fact-value relation. We elaborately discuss naturalism and see that naturalistic definition is not justified. Therefore their entire attempt to define moral

terms by factual terms is futile. We explore the two other extreme views, namely, intuitionism and radical subjectivism where we find that value statements or moral statements in particular, are devoid of all factual contents hence there is no relation between them. Here we have argued that their claim is also extreme and unacceptable.

But we believe and argue that there is a relation between descriptive element and evaluative element of a moral term. For this we consider the logical derivation of moral conclusion from absolutely factual premise(s). Here we critically examine Searle's derivation and Hare's criticism. We convince with Hare that moral conclusion cannot be drawn from pure factual premises deductively or formally. Finally we use informal logic as a tool to show how moral statement can be drawn from factual premise(s).

References

- Ayer, A.J. 1936 *Language truth and Logic*, London, Victor Gallancz, ed.
- Frankena, William. *Ethics*, New jersey: Prentice-Hall., Englewood Cliffs, 1963.
- "The naturalistic Fallacy", in *Reading in Ethical Theory*, Edited by Wilfred Seller and John Hospers, New Jersey: Prentice-Hall, 1970.
- Hare, R.M. 'The Promising Game'. in *The Is-Ought Question*, Edited by W.D. Hudson, London: The Macmillan press Ltd, 1969.
- Hudson. W.D. *Modern moral philosophy*. London: The Macmillan press, 1970.
- Levi, H. Edward. *An Introduction to Legal Reasoning*. London: The university of Chicago press, 1970.
- Moore, G.E. *Principia Ethica*. London: Cambridge University Press, 1903.
- Patterson, C.A. *Moral Standard: An Introduction to Ethics*. New York: The Ronald Press Company, 1949.
- Wellman, Carl. *Challenge and Response: A Justification of Ethical Reasoning*, USA: Southern Illinois Press, 1970.

The nature of world according to Advaita Vedānta

Rajpati Das*

Abstract

Advaita Vedānta is a branch of Indian philosophy that strongly and logically refutes all theories of Reality other than the Absolute Brahman, the only eternal entity. Shankara is considered to be the best exponent of this philosophy. In such preaching, he has demonstrated his innate supernatural erudition, unparalleled divine power, heartfelt logic and extraordinary diligence. The main goal of Advaita Vedānta is to achieve mokṣa (liberation) through the sense of oneness and identity between the soul of the inquiring seeker and the omnipresent transcendental Brahman. Advaita Vedānta firmly assumes that Brahman alone is true, that this world is transcendently false, and that Jivātmā (individual soul) and Brahman are one and the same. Brahman is one and unique in all states Who exists in all the worlds and all beings as an all-pervaded single entity. Since this doctrine envisages Brahman, beings and the universe as one and indivisible, it is called Advaitaism. This article attempts to explain the nature of Jagat (world) described in Advaitaism and how the existence of the world is completely dependent on Brahman.

Introduction:

The basic tone of Advaita Vedānta philosophy is expressed in a verse of Shankara:

brahma satyaṃ jaganmithyā jīvo brahmaiva nāparaḥ |
anena vedyam sacchāstramiti vedāntaḥ |

(Shankaracharya, 1981, v. 20. 198).

which means- this world is false and Jivātmā and Brahman are one and the unique. This Jivātmā or Ātman is Paramātmā or Brahman. Brahman is Ekmebādvitīyam i.e. Brahman is One and Unique in all states. He is truth, everything else is false. In any case, He is not many. And this doctrine of Shankara is called Advaitaism because he imagines this supreme truth Brahman, all lives and this universe as one and indivisible. According to Advaita, the perceptible world is not separate from the unrevealed Brahman; It is based on Brahman, hence Brahman. We

* Associate Professor, Department of Sanskrit, University of Chittagong

mistakenly see Him in many forms. This visible world, which is constantly changing in the combination of name and form, is only an illusion.

The essence of Shankara's Advaitic teaching is the union of soul and Brahman. This soul does not mean body, senses, mind and intellect. Rather, it the very conscious entity that lies behind all these things known as I or self who is the constant witness of this universe. This soul is the Supreme Brahman who exists in all beings and in everything in the world as one entity. This self-knowledge cannot be proved, because it is the basis at the root of all proofs. Shruti thus says, "vijñātāram are kena vijānīyāt" (Swami Krishnananda, 1983, v. 2.4.14. 216.) means 'Through what should one know the Knower?' All the proofs are verified by this Knower. So, this self-consciousness is eternal knowledge without a doubt. Although self-consciousness is present in everyone, it is covered by ignorance or Avidyā or Māyā. This ignorance can be destroyed by penance and justice. The nature of the soul will be revealed to the judicious saint only when he completely rejects all inanimate objects in front of him by judging like- I (Self) am not really this gross body, not bodily senses, not mind, not intelligence, not happiness and sorrow, not even anything in the visible world. In this context, the following verse from Shankar's Vivekacūḍamaṇi is relevant:

pañcānāmapī kośānāṃ niṣedhe yuktitaḥ śruteḥ
tanniṣedhāvadhi sākṣī bodharūpo'vaśiṣyate||

(Swami Madhavananda, 1921, v. 210. 94.)

which means- when all the five sheaths have been removed by the logic of the Śruti passages, what remains as the final point of the process is the Witness, the Knowledge Absolute – the Ātman. It will then be understood that only the Brahman is the Self-manifest, by whom this world and all the things of this world are manifested, He is the one in waking, dreaming, and slumbering; and exists in present, past and future as true witnesses in all situations.

Brahman according to Advaita Vedānta:

Although the main topic of this article is world, in Advaita Vedānta there is no existence of Jīva and world without Brahman. Therefore, the discussion about the form of Brahman becomes relevant even before the Jīva and the world. According to Shankara, Brahman is One without a second, eternal, Nirguṇa (without attributes) and the Supreme Being. According to him, just as the same sun is reflected in every waterfall and manifests itself in many forms, so there is only Brahman who is present everywhere. In the third chapter of Brahmasutra Commentary, he says:

Just as this lustrous sun (Vivasvan) even though one only, yet, having entered different waters, appears to be many, due to (being reflected in) the limiting adjunct viz. water, even so is this Self (Atma), which is not subject to birth, made to appear as if it is different because of the limiting adjuncts of many bodies. Similarly, this Self (Atma) of all beings, one as it is, is, by residing in different beings, seen as if it is one and many, at one and the same time, like the reflections of the moon in water. (V. M. Apte (trans.) 1960, 588).

The nature of world according to Advaita Vedānta

There is no existence of anything other than Brahman. Brahman is eternally pure, eternally conscious and eternally liberated. Brahman is beyond the categories of space, time, causation, words, mind and intellect. Brahman is an indefinable reality beyond the reach of all intellectual proofs.

According to Shankara, Brahman is Nirguṇa from the Paramārthika (transcendental) point of view. But from a Vyabāhārika (practical) point of view, Brahman is Saguṇa i.e., possessing qualities. According to Shankara, the Paramārthika view is true, where Nirguṇa Brahman is the only real entity. Brahman is Nirguṇa when we think of Brahman as having no power or above all attributes. In Advaita, Nirguṇa Brahman is the Svarūpa-lakṣaṇa (eternal or eternal nature) of Brahman. On the other hand, Saguṇa Brahman or Ishvara is the Tatastha-lakṣaṇa (marginal or incidental nature) of Brahman. Nirguṇa Brahman and Saguṇa Brahman are not two different concepts. According to Shankara, there is only Nirguṇa Brahman. In actual fact, there is no Saguṇa Brahman. Nirguṇa Brahman assumed the title of Māyā and appeared as Saguṇa. If Brahman had any quality or attribute, then that Brahman could not be infinite. If it is assumed that Brahman has a certain quality - then it must be admitted that Brahman does not have the quality opposite to that quality. Then Brahman will become a limited entity. That is why Shankara called Nirguṇa Brahman the formless transcendental reality. This Brahman is formless, infinite, non-dual, non-different, self-manifest, the soul of all beings and Satchidānanda (Truth-knowledge-bliss). According to Shankara, the personal God or Saguṇa Brahman created the world through Māyā Śakti. This Māyā Śakti has the power to cover the true form of the real thing and reveal its distorted form. Therefore in the Bhagavad-gītā Kṛṣṇa says, “I never appear to stupid and unintelligent people. To them, I am veiled by my intimate potency Yogamāyā. Therefore, they cannot know my birthless and imperishable form” (*Srimad Bhagavad Gita*, v. 7/25).

From a practical point of view, this Saguṇa Brahman is thought of as the creator, sustainer and destroyer of the world and from this point of view, He is considered the lord of the universe, the companion of the poor, the ocean of mercy, the shelter of orphans and the worshipped god of devotees. Brahman’s Saguṇa Bhāva is only His pastimes or sports. This aspect of Brahman is presented more extensively in Ram Shankar Mishra's discussion-

Brahman is full of all perfections. And to say that Brahman has some purpose in creating the world will mean that it wants to attain through the process of creation something which it has not. And that is impossible. Hence, there can be no purpose of Brahman in creating the world. The world is a mere spontaneous creation of Brahman. It is a Lila, or sport, of Brahman. It is created out of Bliss, by Bliss and for Bliss. Lila indicates a spontaneous sportive activity of Brahman as distinguished from a self-conscious volitional effort. The concept of Lila signifies freedom as distinguished from necessity. (Ram S. Misra 1998, 181).

According to Shankaracharya, ignorance in the form of Māyā is the producer of all dualities. It is from this duality of the living being that all actions take place. Only when duality

is destroyed is the passive soul established in Brahman and the renunciation of the result of action vanishes forever. He then rightly realizes that whatever reality exists, by which all else subsists, is Brahman. Behind all impermanence, He is the one eternal Being, the One Truth of things, Who is hidden in all appearances. That's when such non-dual minded people get the knowledge of Brahman.

World according to Advaita Vedānta:

There is a popular saying in Sanskrit about the world- “Jayate gacchati tisthati iva iti jagat”, the essence of which is that what arises, perishes, comes and goes and seems to exist in it is the world. This means that everything in this world is ever-changing, transitory, and subject to destruction and decay. Pointing to the impermanence of all things in the world, Shankara says, the existence of this strange and tricky world is false. The sole cause of its origin, status and destruction is the infinite, omniscient and omnipotent Brahman. The supremacy of the universe over Brahman is due to Māyā. In Advaita, Māyā is the mysterious force of Brahman that misleads us to accept the experiential world as real. Thibaut's translation of Shankara's commentary on Brahmasutra gives a beautiful explanation of the matter-

It is in fact a principle of illusion; the undefinable cause owing to which there seems to exist a material world comprehending distinct individual existences. Being associated with this principle of illusion, Brahman is enabled to project the appearance of the world, in the same way as a magician is enabled by his incomprehensible magical power to produce illusory appearances of animate and inanimate beings. Māyā thus constitutes the upadana, the material cause of the world; or —if we wish to call attention to the circumstance that Māyā belongs to Brahman as a sakti—we may say that the material cause of the world is Brahman in so far as it is associated with Māyā (George Thibaut (Trans.) 1904, Introduction, xxv).

Thus, Māyā has the ability to hide reality which misrepresents or distorts reality. For Shankara, therefore, the phenomenal world is nothing but Māyā, the real shaper of this world. However, calling this world a lie does not mean the non-existence of the world. The world is false means that this world is relative, changing and consequential. In Advaita, the word ‘world is false’ does not mean completely false like flowers in the sky or like the horns of a hare. It has a relative existence. It is temporarily true for now but disappears when the true knowledge of Brahman arises. In other words, it exists momentarily but is not real from an absolute point of view.

In order to understand the true nature of the world, Advaita Vedānta postulates three types of sattva (existence), which it calls- Pāramārthika (real or transcendental), Vyāvahārika (pragmatic) and Prātibhāsika (apparent or illusory). From this viewpoint of Advaita, Brahman is Pāramārthika Sattvā (absolute reality), Jagat is Vyāvahārika Sattvā (relative reality) and dream object is Prātibhāsika Sattvā (apparent reality). The Nirviśeṣa (undifferentiated or indeterminate) aspect of Brahman is Pāramārthika Sattva, as His true nature. The other aspect of Brahman is His Vyāvahārika Sattvā which is imposed on Him by Avidyā as the phenomenal

The nature of world according to Advaita Vedānta

world and is therefore not real. In Advaita, only the Pāramārthika Brahman is the ultimate reality. He is the cause of all beings and matter and the only representative of the universe. As the other two are His phenomenal manifestations, Advaita negates all the existence of objects of the world. For Shankar, the practical or empirical world is sufficiently real for all practical purposes, however, to him, it is not ultimately real. It appears unreal (false) only when compared with Brahman. The world and all its objects are conditioned by space and time and regulated by cause-effect relationships. On the contrary, Brahman is not caused by anything and transcends time, space, and causality. In his commentary on Brahmasutra, he argues thus-

That omniscient omnipotent cause from which proceed the origin, subsistence, and dissolution of this world-which world is differentiated by names and forms, contains many agents and enjoyers, is the abode of the fruits of actions, these fruits having their definite places, times, and causes, and the nature of whose arrangement cannot even be conceived by the mind,-that cause, we say, is Brahman (George Thibaut (Trans.) 1904, Introduction, xxv).

Thus, Shankara denies the existence of world in order to highlight its dependent nature, and not to deny its practical existence. If we think deeply about his view, we can easily understand that anything that has a beginning has a dependent nature, because it owes its existence to its cause. Moreover, anything that has a beginning must have an end, and therefore must be finite and temporary. So, anything in this world has a dependent existence as a cause and cannot exist forever because eventually, it becomes one with the source from which it originates. From this point of view, Shankara falsifies everything in this world and accepts only Pāramārthika as the Ever-Existing Reality That has no beginning or end.

According to Shankara, Brahman is not only the efficient cause of the world but also the material cause. All the quantities of clay can be known by a lump of clay because all the modification is a verbal distinction. The modification of clay like pot, plate, or jar is nothing more than some names derived from sentences, while the truth is that it is clay merely. Similarly, only Brahman is true and this world is false. Just as there is no separate entity such as pot etc. without the basic material clay- they are not separate objects, they are only different states, again just as the childhood, youth etc. of the same Devdatta are only different states of Devdatta but none of them is true, only Devdatta is true, just like this the production, existence, maintenance, expansion, decay and destruction of the world are from Brahman. This world was unmanifested before the creation, but in the state of creation that unmanifest has been manifested or useable by the dual designations of name and form. Shankara in the Brahmasutra commentary says-If it is argued that the effect did not exist before creation, since it is declared (in the Upanishads) as "non-existent", then we say, no, because from the complementary portion it is known that the word is used from the point of view of distinguishing characteristics (*Brahma-Sutra Shankara-Bhashya*, v. 2.1.17.).

As we always live in this world, everything we experience here is only at the Vyavahārika level. At this level, anything we experience directly through the senses is real, but

only as long as our experience lasts. In Bhagavad Gita, we see ‘nāsatō vidyatē bhāvō nābhāvō vidyatē sataḥ’ (*Srimad Bhagavad Gita*, 2.16.) where the word ‘Āsatō’ means unreal, which does not actually exist. Again, ‘Sataḥ’ refers to the transcendental reality, which is the only truly existing and can never go out of existence. In fact, Brahman appears as the earth under the influence of his mysterious power, known as Māyā or Ajanana. This truth is revealed in Shankara’s Upadahasahasri - Brahman is omnipresent like ether, possessing infinite energy, free from all souls, hunger etc. and free from appearance and disappearance. This Supreme Brahman being possessed of inconceivable power is the originator of the imperishable Nama-form by existence alone. This immutable name-form is different in essence from Brahman who is the seed of the world, indescribable as this or that, upon which the world has taken its form (*Upadahasahasri*, v. 2.1.18.).

Māyā: the foundation of the pragmatic world:

The doctrine of Māyā holds a pivotal position in the foundation of Advaita-Vedānta philosophy. Although the concept of Māyāvad is observed in the Vedas and Upaniṣhads, Shankara and his followers tried to establish this Māyā firmly with the help of logic. The power which is capable of causing the impossible, which envelops Brahman and imposes world phenomena on it, is called ignorance, Avidyā or Māyā in Shankara’s Advaita Vedānta. It is essentially because of this Māyā that Nirguṇa Brahma becomes Saguṇa Ishwar, the source of goodness and becomes the cause of the world. Māyā is called an epithet of Brahman because it imposes its own actions on Brahman.

In Advaita, this Māyā-Śakti of Brahman originates from falsehood or Avidyā. Brahman as described in the Upaniṣhads is the only truth and everything in the strange world is false - these are only apparent entities. It is the one true Brahman who manifests himself in the form of the body, the senses, the mind, the soul, and every external object that exists. Therefore, all things and organisms, regardless of the seemingly small and large, appearing in this world, are identical, one and unique to Brahman. Aitareya Upaniṣhad declares that:

sarvaṃ tatprajñānetraṃ prajñāne pratiṣṭhitam
prajñānetro lokāḥ prajñā pratiṣṭhā prajñānam brahma

(*Aitareya Upanishad*, v. 3.1.3).

which means-all this is produced by Consciousness, is supported by Consciousness and rests in Consciousness. That Consciousness is Brahman. While the only true Brahman exists everywhere, explaining the apparent conflict between the various sensations and experiences of our senses in our daily life, Shankar says, this diversity of the world is Māyā. Whenever we have knowledge of Brahman in its proper form, these varieties do not exist, and therefore there is no real basis for the existence of this multi-coloured world. It is an illusion like seeing a snake on a string in the dark. This error is for illusion. This primordial Māyā is the cause of all manifold visions and it is because of this Māyā that Brahman is mistaken for the world. It is because of this Māyā that the living beings consider themselves to be attached to the body, the

The nature of world according to Advaita Vedānta

senses etc. Gambhirananda, translating verse 1.iii.12 of Shankara's Kāṭha Upanisad commentary, writes that:

Alas, how unfathomable, inscrutable, and variegated is this Māyā, that every creature, though in reality identical with the supreme Entity, and is instructed as such, does not grasp the fact, "I am the supreme Self", while even without being told, he accepts as his Self the non-selves, viz the aggregate of body and senses, under the idea, "I am the son of such a one", though these (latter) are objects of perception (and are hence not his selves) like pots etc. ! Verily, it is through the Māyā of the supreme Being, that every man moves, again and again (through birth and death)- (Swami Gambhirananda (Trans.). 1937,162-163).

Māyā is the Upadhi (limiting adjunct) of Brahman that hides His essence and appears as the highest manifestation of the Absolute. The limiting adjunct is imposed on the living being and because of association with the limiting adjunct the living being thinks of himself as a doer, consumer etc. Although the limiting adjunct has nothing to do with the soul itself, the living beings are still bound by Māyā and consider themselves subject to birth, death, happiness and sorrow.

According to Shankar the subject of illusion produced by Māyā is neither 'Sat' (real) nor 'Asat' (unreal), nor is it a compound of 'Sat-asat', but different from 'Sat-asat' which is indefinable. This illusion is sometimes variable, sometimes erosive and sometimes magical. It surpasses human understanding, it stands above all proportion, and it even controls the reasoning power of man. If this illusory visible world were 'Sat', it would have existed forever. By 'Sat' we mean 'time-absolute existence' irrespective of past, present or future. The world created by Māyā does not transcend time i.e. it did not exist millions of years ago, it exists now and it will cease to exist at some point in the future. We know that during 'Suṣupti' or dreamless sleep our five senses are absorbed in the mind and the mind in the soul. At this time we do not perceive the world. If this illusory world was really true then we could perceive this world even during 'Suṣupti'. Again, when the world appears before us under the influence of direct evidence, it cannot be called completely 'Asat', because if it were 'Asat', it would not appear before us; As the son of the barren never appears. Again 'Sat' and 'Asat' are opposite to each other, so that too is impossible. Hence Māyā is to be distinguished from 'Sat-asat' and by reason of coherence, we are compelled to conclude that this visible world is 'Anirvachanīya' (indescribable). Shankara in his Vivekachūḍāmonī explains the matter succinctly:

sannāpyasannāpyubhayātmikā no
bhinnāpyabhinnāpyubhayātmikā no |
sāṅgāpyanaṅgā hyubhayātmikā no
mahādbhutānirvacanīyarūpā (Swami Madhavananda, 192, v. 109. 45).

This Māyā is neither existent nor non-existent nor partaking of both characters; neither the same as Brahman nor different from Brahman nor both; neither composed of parts nor an indivisible whole nor both. She is most wonderful and cannot be described in words.

According to Advaita Vedānta, Māyā is the cause of this world and the world is the result of Māyā. In reality, this illusory world is completely real as long as we are under the influence of Māyā. When the dominion of Māyā passes from us by judgment, the One Brahman reveals Himself to us with His eternal existence. To a sage enlightened by Brahman, the external world is like mirage water which cannot quench his thirst. He ignores this illusory appearance of the world to enjoy Brahman, the abode of supreme truth, peace and bliss. When man's dualistic mind is gone and established in self-knowledge, he sees nothing but Brahman in this world. In the Brihadāraṇyaka Upaniṣhad sage Yājñavalkya told Maitreyī this truth - When duality is realized through ignorance one sees one another, one smells one another, but when everything is identified as self, how can one see another or smell another (*Brihadaranyaka Upanishad*, v. 4.5.15)? Shankara opines that the way in which Brahman may appear to be changeable or divisible or transformable is similar to the way in which a rope may appear to be a snake in light darkness. The multiplicity of appearances in the empirical world may be mistaken for Brahman, just as a rope may mistakenly appear to us as a snake (*Brahma-Sutra Shankara-Bhashya*, v. 2,1,14). The rope does not transform into a snake, but it appears to us as a snake due to our ignorance (Avidyā). A closer look at the rope reveals that the snake disappears without a trace. Another example can be given - just as the sun is reflected in the water and appears to be many, similarly Brahman is reflected and becomes the universe along with the living beings.

Conclusion:

The basic tenet of Advaita Vedānta is the ultimate elimination of the duality existing in the world between cause and matter. It is an abstract concept that attempts to explain how the impersonal Supreme Brahman has transformed into His phenomenal world creation and multifaceted personality. In this sense, Brahman is the one and only Absolute Reality, who exists in infinite consciousness free from all attributes. He is a breathless entity imperceptible to the human senses, who lies behind the name-form of everything in the world around us. Therefore, the external world that arises in the presence or absence of our mind and senses is the manifestation of that Brahman - mere appearance, form or illusion. Shankara's attempt is to generalize the entire external world into one entity - the one true Brahman who manifests himself in this world in various forms - body, senses, mind, soul and every external object that exists. He is the true and only reality upon whose existence the universe is born, grows and dies. He is the source and foundation of all things upon which all things arise. The world that appears to be real will eventually become unreal when the judicious sage knows that the Reality of eternal Brahman remains at the higher level of the infinite consciousness of his intellect. Only at this higher level of consciousness, this world seems illusory. The supersensible experience of the Absolute Reality is known as immediate and indirect. As long as we are in the dream state, we see all the infinite variety of creatures! When the fleeting dream vanishes in the dawn of awakening, the dreamy object becomes illusory like the Flower of the sky. Similarly, if the dream of this worldly awakening is broken once or if one attains greater

The nature of world according to Advaita Vedānta

awakening in the ocean of Brahman considering this world as illusory, then the awakening of this present world will appear as a dream.

References

- Sastri, Alladi Mahadeva, Trans. *The Bhagavad Gita with Commentary of Sri Shankaracharya*. Madras: The Personal Bookshop, 1977.
- Thibaut, George, Trans. *The Vedanta Sutras of Badarayana with the Commentary by Shankaracharya*, Part I. Oxford: The Clarendon Press, 1904.
- Thibaut, George, Trans. *The Vedanta Sutras of Badarayana with the Commentary by Shankaracharya*, Part II. Oxford: The Clarendon Press, 1896.
- Bhattacharyya, Haridas. *The Cultural Heritage of India*. Vol. I - Vol. IV. Calcutta: The Ramakrishna Mission Institute of Culture, 1953.
- Misra, Ram S. *Integral Advaitism of Sri Aurobindo*, Delhi: Motilal Banarsidass Publishers Pvt Ltd, 1998.
- Chinmayānanda, Swami. *Shankara the missionary*. Kolkata: Central Chinmayā Mission Trust, 1998.
- Dasgupta, Surendranath. *A History of Indian Philosophy* Volume I-IV. London: The Syndics of The Cambridge University Press, 1957.
- Gambhirananda, Swami, Trans. *Bhagavad Gita with the commentary of Shankaracharya*. Calcutta: Advaita Ashrama, India. 1984.
- Gambhirananda, Swami, Trans. *Eight Upanishads with the commentary of Shankaracharya*. Calcutta: Advaita Ashrama, India. 1937.
- Jagadananda, S., Trans. *Upadeshasahasri (Thousand teachings) of Sri Shankaracharya*. Madras: Sri Ramakrishna Math, 1949.
- Krishnananda, Swami. *Bṛhadāraṇyaka Upaniṣad*, Rishikesh: The Divine Life Society Sivananda Ashram, 1983.
- Madhavananda, Swami, Trans. *Vivekachudamani of Sri Shankaracharya*. Himalayas: The Advaita Ashrama, 1921.
- Swami Madhavananda. Trans., *The Bṛhadaranyaka Upanisad with the commentary of Shankaracharya*. Māyāvati: Advaita Ashrama, 1950.
- Swami Nikhilananda. Trans., *The Upanishads* Vol. I with the Commentary by Shankaracharya. New York: Harper & Brothers Publishers, 1949.
- Shankaracharya. “Brahmajñānāvalīmālā”, *Complete Works of Sri Shankaracharya*, Vol. II, Samata Books, Madras, 1981.
- Sri Swami Sivananda. *Vedanta for Beginners*. Uttarakhand: The Divine Life Society, 1996.
- Swami Tapasyananda. Trans., *Shankara-Dig-Vijaya: The Traditional Life of SriShankaracharya by Madhava Vidyaranya*. Chennai: Sri Ramakrishna Math.
- Swami Vireswarananda. Trans., *Brahma Sutras according to the interpretations of Shankara*. Himalayas: The Advaita Ashrama, 1936.
- Swami Vivekananda. *The Complete works of Swami Vivekananda*. Vol. I - IX. Māyābati: Advaita Ashrama, 1995.

The Chittagong University Journal of Arts and Humanities

T. S. Narayana Sastry. *The Age of Shankara*. Madras: B. G. Paul & Co., 1971.

মহানামব্রত ব্রহ্মচারী, (ড.)। *বেদ-বেদান্ত, পূর্বখণ্ড-ব্রহ্মসূত্র*। কলিকাতা: শ্রী মহানামব্রত কালাচারাল এণ্ড ওয়েলফেয়ার ট্রাস্ট
শ্রী শ্রী মহানাম অঙ্গন, রঘুনাথপুর, ১৩০৪ বাংলা।

মহানামব্রত ব্রহ্মচারী, (ড.)। *বেদ-বেদান্ত, উত্তরখণ্ড-বেদ বিচিস্তন*। কলিকাতা: শ্রী মহানামব্রত কালাচারাল এণ্ড ওয়েলফেয়ার
ট্রাস্ট, শ্রী শ্রী মহানাম অঙ্গন, রঘুনাথপুর, ১৯৯৯।

মহানামব্রত ব্রহ্মচারী, (ড.)। *উপনিষদ ভাবনা*। কলিকাতা: শ্রী মহানামব্রত কালাচারাল এণ্ড ওয়েলফেয়ার ট্রাস্ট, শ্রী শ্রী
মহানাম অঙ্গন, রঘুনাথপুর, ১৯৯৪।

স্বামী অপূর্বানন্দ। *আচার্য শংকর*। কলিকাতা: উদ্বোধন কার্যালয়, বাগবাজার, ২০১৪।

স্বামী গম্ভীরানন্দ। *উপনিষদ গ্রন্থাবলী*। কলিকাতা: উদ্বোধন কার্যালয়, বাগবাজার, ১৯৬২।

The Enigma Called Translation: An Exposition

Golam Hossain Habib*

Abstract

Translation is the vehicle that takes us across territories formerly unknown to us. Despite the sheer importance of the journey and the beneficial role of the vehicle itself, the latter, that is the vehicle, has suffered much neglect, with its identity continually debated and misunderstood. The present essay tries to weigh this variegated and contentious phenomenon, by putting up different opinions of literary luminaries about it.

Few would argue that without translation it would have been impossible for people to be initiated into the creations of the great minds of humanity, because of the very simple fact that it is next to impossible for us to learn all the languages for studying the various texts in the tongues they are originally written in. Translation encircles us in such a way that it can be compared to our being surrounded by air without being constantly aware of it. Despite this, paradoxically, this omnipresent precious entity that we call translation has suffered a good deal of negligence not only from the commoners, but also in the academia for a long time. Even now, it is plagued by the same scourge, though to a lesser degree as can be seen in the following comment: “Translation was never considered a serious intellectual activity until the seventeenth century although there were some insightful observations on the business of translation from time to time” (Ray ed. 2008, ix).

The concept of translation is a project that is fraught with problems and disputes—all of it starting right from its definition down to its ways of execution. The title of the essay can be vindicated by one single utterance made by I. A. Richards who said that translation ‘may probably be the most complex type of event yet produced in the evolution of the cosmos’ (Richards 1953, 250). Whether it is really so can be debated *ad infinitum*; but, that it has retained its status as a

*Assistant Professor, Department of English, University of Chittagong

serious intellectual activity of great interest for quite long, with its ways and scopes remaining yet unsettled, cannot be debated.

According to Mallikarjun Patil, “The word ‘translation’ is derived from the Latin term ‘translatum’. The prefix ‘trans’ means passing something, while the stem ‘latum’ means cover. The generic term translation has several implications such as alteration, change, conversion, interpretation, paraphrase, rendering, rephrasing, rewording, transcription, transformation and transliteration, while the specific meanings of the word are translating, rephrasing, interpretation, rendering, decoding, etc.” (Ray 2008, 9-18).

We are aware of the account of the Tower of Babel (Genesis 11:19) that is said to mark the beginning of the multilingualism which called for the birth of translation, while we can trace the pulse of ‘common’ people’s negative attitude towards translation in the Shakespearean play *A Midsummer Night’s Dream* in which Quince utters: “Bless thee, Bottom, bless thee, thou art translated” and Bottom retorts, “I see the knavery, this is to make the ass of me.”

So far, a great number of people, both luminaries and common ones, have tried to define translation in various ways in accordance with their experience and discernment, the one in the first paragraph of the essay being a unique example. It needs to be pointed out here that we are mostly concerned about literary translations.

Theodore Savory, in his *The Art of Translation* defines translation as an ‘art’, while, according to Eric Jacobson and Eugene A. Nida, it is, respectively, a ‘craft’ and a ‘science which consists in reproducing in the receptor language the closest natural equivalent of the source language message, first in terms of meaning and secondly in terms of style.’ According to Dostert it belongs to ‘... that branch of the applied science of language which is specifically concerned with the problem or the fact of transference of meaning from one set of patterned symbols into another set of patterned symbols’ (Dostert, cited in J. C. Catford’s *A Linguistic Theory of Translation*, p. 35). According to J. C. Catford, one of the major contributors to the theory of translation, translation is the replacement of source language text material by equivalent target language material.

The definitions cited above are all from the Occident; as regards the Oriental attitude towards translation, ‘Classical Indian translation is characterized by loose adaptation, rather than the closer translation more commonly found in Europe; and Chinese translation theory identifies various criteria and limitations in translation’ (Wikipedia). The popular attitude to translation and translators is also evident in the Italian saying—*traduttore, traditore* : translator, traitor.

But, perhaps, the most radical definition of translation was given by Octavio Paz, the famous Mexican Nobel Laureate in literature, who said:

Every text is unique and at the same time, it is the translation of another text. No text is entirely original because language itself, in its essence, is already a translation: firstly, of the non-verbal world, and secondly, since every sign and every phrase is the translation of another sign and another phrase. However, this argument can be turned around without losing its validity: all texts are original, because every translation is distinctive. Every translation, up to a certain point, is an invention, and

The Enigma Called Translation: An Exposition

as such it constitutes a unique text (Paz, Octavio, 'Translation: literature and letters', 152-162).

In fact, in a way the history of translation is broadly the history of rivalry and heated debate between two warring groups: the proponents of fidelity to the original or source text, and those of freedom of the translator in general. Here we are reminded of the theory of translation provided by the English poet and translator John Dryden in his 'Preface to Ovid's Epistles' (1680):

First, that of Metaphrase, or turning an author word by word, and Line by Line, from one Language into another. ...The second way is that of Paraphrase, or Translation with Latitude, where the Author is kept in view by the Translator, so as never to be lost, but his words are not so strictly followed as his sense, and that too is admitted to be amplified, but not altered. The Third way is that of Imitation, where the Translator ...assumes the liberty not only to vary from the words and sense, but to forsake them both as he sees occasion: and taking only some general hints from the Original, to run division on the ground-work, as he pleases.

With an aim to illustrate his points, John Dryden gives examples of three types of translations—Ben Jonson's translation of Horace's *Art of Poetry* (metaphrase), Waller's Translation of Virgil's *Aeneid* (paraphrase), and Cowley's rendering into English of two odes of Pindar, and one of Horace (imitation).

The point to be noted here is that it is the ancient Greeks who recognized the difference between metaphrase and paraphrase, and Dryden adopted it. Even more interesting is the fact that the Russian novelist, poet, and translator Vladimir Nabokov, who was of the opinion that even the sweetest paraphrase of a text is inferior to and less desirable than a peculiar literal translation, adopted almost the same concepts of Dryden, or those of the ancient Greeks, though with his own nomenclature: lexical, literal, and paraphrastic. He termed his favourite way 'the servile path', that is, strict adherence to the original text, especially while translating poetry. Ketaki Kushari Dyson, the eminent Bangla essayist, poet, and novelist, described this attitude as 'fundamentalism of translation', thus suggesting instead that it is not servility to the text that is required while translating, rather friendliness with it.

Long before Nabokov, Horace (65-8 B.C.) uttered a few words of caution against the too much faithfulness in translation and rather advised translators to shun the path that the Russian novelist advocated for:

A theme that is familiar can be made your own property so long you do not waste your time on a hackneyed treatment; nor should you try to render your original word for word like a slavish translator... (*Art of Poetry*).

It seems that the champions of literal translation are perfectionists who are scrupulous and concerned about the phrase that has come to the verge of becoming a cliché: lost in

translation. They are totally forgetful about the fact that in hair splitting terms translation is impossible, and hence a compromise, a practice that we are won't to in many of our daily activities. They cannot accept the fact that loss is inevitable in the process of translation, and translation, as Derrida says, is not transcription. So, translators and translation theorists better accept the fact of loss, thus, abiding by the dictum of Rabindranath Tagore: “যা হারিয়ে যায় তা আগলে বসে রইবো কত আর?” (Something which is lost eventually, can how long be kept?).

The advocates of the ‘loss in translation’ or those of strict adherence to the source text, whom Ketaki Kushari Dyson calls ‘the fundamentalists of translation’, seem to forget that there are certain limits of translation. There is no language in the world that, in terms of equivalence of its words, has accurate equivalent to all of them in any other language. So, in most of the cases the length of the Target Language text is not the same to that of the Source Language text. Good translations often getting lengthier than the texts of the source languages (SL). The length apart, there are other things that defy translation, namely jargons, critical terms like ‘romanticism’, ‘structuralism’, ‘deconstruction’ ‘objective correlative’, etc. ..., cultural words, rhyme and rhythm in poetry, jokes and puns and humour, slangs, advertisements, etc.

More deserving of study, it seems, is what is gained in translation, because translation is, after all, as has been said before, a compromise. However, before we delve deep into the prospect of ‘gain’ in translation, let’s take a look into the idea of translation prevalent during the Middle Ages since it cared little about the so-called ‘loss’ in translation:

Medieval translation was a very different undertaking from modern academic translation. It is more akin to what we might call ‘adaptation’, a free rendering of an earlier text that concentrate more on what it says than how it says it: more on *matiere* or *san* (to use Chretien’s terms) than on form. When Chretien set out to translate a story from Ovid’s *Metamorphoses*, as he apparently did in the case of Philomela, he sought to convey not so much the words or the Latin poetic form as the meaning, or import, or—as he would put it—the *san* of the original. He did not hesitate to add anachronistic touches to make the text more comprehensible and enjoyable to his courtly patrons, or even to include entire developments that were not in Ovid. Yet I venture to say he still considered his work a ‘translation’ of the Latin original. Similarly modern ‘literary’ translators such as Ezra Pound, Stuart Merrill, or Kenneth Rexroth seek not so much to reproduce the exact words or images or the poetic patterns of the originals they translate as to convey the mood or feeling or tone of the original (Beer 1997, 256).

And, this particular characteristic of translation in the West during the Middle Ages has bearings on the tendency of looking down upon translation as well as translators and the practice of translation into Bangla in the medieval period and later.

Dr. Sudhakar Chattapadhyaya, in his *Amor anubadak Satyendranath* (The Immortal Translator Satyendranath)—a unique book published in the early sixties of the last century and devoted mostly to the critical appreciation of Satyendranath Datta’s prolific translations from English, Sanskrit, Hindi, French, Persian, and Oriya languages into Bangla—has aptly pointed out that despite the common tendency to consider translation as a secondary activity, we must not forget that the great authors of pre-Modern Bangla literature—Krittibas, Kashiram, and Alaol—are, in effect, translators. The list of names does not end here, Dr. Sudhakar Chattapadhyaya reminds

The Enigma Called Translation: An Exposition

us, and goes on to say that it includes Ishwarchandra Vidyasagar, the eminent scholar and writer of Bangla and Sanskrit languages and literatures in the early stage of modern period of Bangla literature as well as un-daunting social reformer, whose *Shakuntala*, *Betalpanchabingshati*, *Bhrantibilas* are imitations of different significant works from Sanskrit, Hindi, and English literatures. Munier Choudhury, the prominent playwright, literary critic, educationist, teacher, and martyred intellectual of Bangladesh, in his *Tulanamulak Samalochana* (Comparative Criticism), a volume of comparative criticism or treatise published in 1969 mentions that Jyotiridranath Thakur wrote thirty-three plays of which twenty-two are translations. Munier Choudhury further comments that *Purubikram* and *Sarojini* are not original plays, rather translations of some special kind. Thus, he refutes the prevalent notion that Jyotiridranath's original plays are only four, namely *Purubikram* (1874), *Sarojini* (1875), *Ashrumati* (1879) and *Swapnamayee* (1882).

Now, let's think further about the issues related to the loss and gain in translation. As has been mentioned earlier, today we are almost submerged in translation in our daily life. Even while we communicate with people using the same language, meaning and interpretation of what is being said vary from person to person. Secondly, without translation it would have been impossible for most of us to be acquainted with the realm of great thoughts of most of the great minds. This, certainly, is a gain that none can venture to put aside.

Moreover, if we are to take note of the particular observation made by J. C. Catford that texts of the source language are not completely translatable or completely untranslatable, rather they are partially translatable, then the loss, since inevitable, cannot remain a matter of continuous lament, since we—the human beings—are quite aware of our mortality, braving which we live our life as much as we can.

As regards people's harping on what is lost in translation, their attention now can be drawn to a different kind of loss that, so far, many have seemed to ignore. We can term it as 'lost in creation'. The writer, while preparing a piece of writing, draws on from her/his experience, feelings, insights, intellect, and so on. Still s/he cannot possibly claim to have penned or 'key-boarded' everything that is intended to be delineated. Something, though not so significant, is always lost in the process of creation of the so-called original piece of writing. Often, many of them would confess that the intended 'thing' could not be fully captured. While this may seem to be a modest gesture on their part, there, we have reasons to believe, are some 'taints' of truth in it, for the simple reason that—as pen pushers would bear us out—words, elusive and ambiguous in their nature, tend to go out of control, and sometimes in hiding in the process of writing, thus leaving the writer or author somewhat helpless, and causing the piece to lose something. To say it in a lighter vein, the writer works with impunity here as no record regarding the intended piece of writing lies anywhere (if not in the realm of 'Ideas' championed by Plato) to detect what is lost in the process of creation. But, alas, the unfortunate translator is caught red-handed even for a simple deviation from the so-called original by a reader who knows both the source language and the target languages well.

In the last five or six decades, academics and literary critics in the West have started to look at translation with feelings of respect and awe. The study of translation has gained ground; and, the focus is now rather on what is 'gained' in translation, not so much on what is 'lost' in the

process. This championing of translation is a daunting venture that has defied and dismantled the age old tradition of considering the task as being hackneyed and not original.

References

- Beer, Jeanette (ed.). *Translation Theory and Practice in the Middle Ages*. Michigan: Western Michigan University, 1997. Print.
- Catford, J. C. *A Linguistic Theory of Translation*. Oxford: Oxford University Press, 1965. Print.
- Eugene, A. Nida and Charles, Taber. *The Theory and Practice of Translation*. Leiden: E. J. Brill. 1969. Print.
- Paz, Octavio. 'Traduccion: literatura y literalidad'. ed. translated by Irene del Corral, *Theories of Translation: An Anthology of Essays from Dryden to Derrida*. Ed. Rainer Schulte and John Biguenet. Chicago: University of Chicago Press, 1992. 152-162. Print.
- Ray, Mohit K. (ed.). *Studies in Translation*. Atlanta: Atlantic, 2008. Print.
- Richards, I. A. 'Towards a Theory of Translating'. *Studies in Chinese Thought*. Ed. Arthur F Wright, (Chicago: Chicago University Press. 1953. pp. 247-262. Print.
- Wright, Arthur F. (ed.). *Studies in Chinese Thought*. Chicago: Chicago: Chicago University Press. 1953. Print.
- চট্টোপাধ্যায়, সুধাকর। *অমর অনুবাদক সত্যেন্দ্রনাথ*। কলকাতা: এ. মুখার্জী, ১৯৯১। মুদ্রিত।
(Chattapadhyaya, Sudhakar. *The Immortal Translator Satyendranath*. Kolkata: A. Mukherjee. 1991). Print.

Femininity and Silence: Reading *Tree Without Roots*

Sarjana Akter*

Abstract

Tree Without Roots, a novel by Syed Waliullah, sketches two main female characters — Rahima and Jamila. These two characters define the idea of femininity differently — Jamila becomes vocal or sometimes adopts silence of disapproval to protest anything unjust, while Rahima predominantly uses the weapon of silence for her survival. Focusing on these characters, the study argues that the concept of femininity here in Bengal incorporates silence as an essential element which, at times, symbolizes submission, while, at other times, turns out to be an instrument of protest. Certain methodological means — the instances of females in Bengali literature, theories about the construction of femininity, and the historical formation of womanhood in Bengal — have been applied here to reach the intended goal.

In response to the traditional understanding of silence as a symbol of non-existence or powerlessness, Maureen A. Mahoney reconceptualizes silence as a manifestation of power in her article “The problem of silence in feminist psychology” (1996). What Mahoney illustrates regarding the West’s imagination of femininity, becomes predominantly manifest in the East’s conception of being female as well. Being caught in the same traditional and revolutionized conceptions of voice and silence, that mainly revolves around a female’s life, the novel *Tree Without Roots* by Syed Waliullah demonstrates how the two female protagonists of it – namely Rahima and Jamila – instrument silence differently as a form of their existence that further facilitates to interpret and evaluate femininity from opposite perspectives existent in the same land. In order to reach the intended objective, the study, first and foremost, illustrates the traditional picture of femininity — in terms of voice and silence — in existing Bengali literature, then paves the way for a brief theoretical grounding, and finally, discusses the select novel in light of theory and commonplace understanding of female voice.

*Assistant Professor of English, Faculty of Arts & Humanities, University of Chittagong

At the outset of the present paper, certain selected stories and life events from the writings of eminent Bengali writers need to be cited to set the scene for a discussion of two of Waliullah's major female characters. It is always incomplete without the inclusion of Rabindranath Tagore's contributions of which one short story titled, "Haimanti", narrates the story of a young girl who confronts harsh realities of a women's life in her in-law's house. She is accustomed to telling the truth, but eventually experiencing the bitter consequences of telling the truth, she adopts the way of silence. Through the words of her husband, we get a reflection of the dying inner world that Haimanti constantly tries to hide from the world outside (Tagore 439-446).

On the other hand, Rokeya Sakhawat Hossain describes certain incidents from the lives of a few women belonging to her contemporary space-time, who in order to maintain the status of femaleness give little attention to their life and comfort. For instance, one incident she tells of a girl from 10 to 11 years earlier of her time who belonged to Bihar and in accordance with the rituals of the locality got confined to a "maiakhana". In the abovementioned locality, a girl, soon to be married off, needed to remain in an imprisonment where she was not allowed to set her foot outside her confinement. It was her relatives who assisted in doing everyday activities. The girl in reference, therefore, stayed in such darkness for six months and on her release, it was found that her eyes were damaged for being closed for a prolonged period of time (Hossain 399, translation & paraphrase mine). In another instance, delineated by the same author, it happened that a daughter of a zamindar failed to accept her father's wish to get her married to one of her cousins as the cousin was reportedly drunk most of the time. It is to be mentioned here that it was seen as outrageous on the part of a girl to voice her decision. However, the adamant father almost by force, made her agree to go to the wedding stage, but couldn't make her utter the word of acceptance of the marriage. Right then one of the relatives pinched the girl which made her say "uhh", that got translated into "hu", that means, "yes". Only because of a voiceless existence of a female, her life decisions got controlled by others (Hossain 401-402, translation & paraphrase mine).

Mala, the wife of Kuber and one of the female protagonists in *Padma Nadir Majhi*, by Manik Bandopadhyaya, accepts everything that her husband commands due to her disability as well as helplessness. Even an illicit relationship between her husband and sister is often ignored as her voice will worsen the situation (86).

In all of these instances, drawn above, one thing that emerges as a common factor is the silence of the females in Bengal community. In Tagore, it is the failure of Haimanti to survive with dignity which makes her silent. In Hussain, on the other hand, it is the submission to patriarchal society that gets manifested in the form of silence. In Bandopadhyaya, silence comes as an instrument of survival. Therefore, it is this very silence that helps the aforementioned females preserve their femaleness or femininity in their contemporary society. Based on such literary

Femininity and Silence: Reading *Tree Without Roots*

observations, the study has aimed to investigate the female characters of *Tree Without Roots* by Syed Waliullah to look at how silence is a key formative factor in the construction of femininity. In the aforementioned novel, the silence of Rahima defines her as a female who the society appreciates while the voice of Jamila frightens her people that they fail to associate with the traditional definition of femininity.

It has been mentioned in “Negotiating Discourses of Femininity” by Sara Mills that the “male culture” perceives “femininity as a *condition* of being female” and female considers it “as an *addition* to one’s femaleness and a status to be achieved” (271). Hence, it becomes clear that femininity is the expression of one’s becoming female and a quality to long for. The society formulates certain standards based on which one’s female identity gets established and at the same time, it makes females internalize the established feminine codes of conduct in order to belong to the society. Therefore, the question arises: What qualities ensure for a female of the attainment of femininity? In the words of Sara Mills, the qualities that are ascribed to femininity include:

...politeness, concern with conversation going well, deference, not pushing yourself forward as a person; not wanting to succeed, being vulnerable, emotional, intuitive, incompetent, not being strong, being fragile, not swearing, self-denigrating, not posing yourself as serious; working on your beauty without wearing too much make up, being attractive, having neat and tidy hair, wearing clothes which are soft, flowing and delicate, being small, not taking up much space, caring for others, avoiding taboo subjects, sitting with your knees together, being modest, not aiming for scientific, factful statements, hedging your statements, displaying conformity (272).

The long list of rules for female behavior, disposition, and interest comprehensively suggests what femininity in a female looks like. However, together all these qualities indicate a sort of existence that is bereft of any kind of strong, intelligent, and active articulations. Therefore, in a word, making a female feminine is a campaign that stands firmly against voicing the likings, needs, and explorations.

Irrespective of time and place, the discourse of femininity emphasizes a kind of submission that gets upheld through the soft and emotional aspect of female character. In this context, it can be instanced how John Money describes “Nine Sex-Shared Threshold Dimorphisms” in “Propaedeutics of Diecious G-I/R: Theoretical Foundations for Understanding Dimorphic Gender-Identity/Role” of which “sixth” and “seventh” provisions respectively investigate “a provision of a nest or safe place for the delivery, care, suckling, and retrieving of the young” and “parentalism, exclusive of delivery and suckling” (21). Both provisions represent the female essentially according to the study that eventually discloses the affiliation of women with emotion and care. In other words, this observation relates to the attributes of femininity mentioned in the earlier quote that canonically define it. The quietness of female character eventually makes her succumb to the patriarchal domination and gives birth to the idea of femininity. Femininity, however, is discussed in an

interdisciplinary manner ranging from Psychobiology, Neuroscience, Evolutionary perspectives to Developmental, Psychosocial and Cultural perspectives. Despite such multidisciplinary presence of femininity, discussion of it in light of particular context can reveal a lot about the position of women and perception of femininity in a society. In particular, in the context of Bengali society, Margaret M. Urquhart elaborately discusses on the different aspects of women's life in Bengal in her book *Women of Bengal* – particularly the upbringing, the social and religious state of women, and the construction of womanhood through social and cultural constraints – that eventually reflects on how the concept of womanhood underwent a transformation from the emphasis on “passivity” and “submission” to a demand for “freedom” (144). The observations of Urquhart implicate how the women in Bengal had to spend a long period of time to realize their confinement and ask for an unrestrained mood of life. R. C. Majumdar, in *The History of Bengal* (Vol.1), documents the ancient constitution of femininity, depicted in Vatsyayana's *Kamasutra* — periodically during the Gauda era — as “soft and timid, sweet-speaking and graceful” (609). In another instance, in the context of an intersection of Hinduism and Islam in Bengali society in order to develop a unified character of womanhood, it has been brought to light how women are mostly constrained by patriarchal structure of the society regarding which, at one point, while discussing the situation of Bengali Muslim women, Santi Rozario mentions Smock comments: “Bengali Muslim women, besides being constrained by *parda*, are further affected by Hindu patriarchal culture, Bengali women are thus trapped in two patriarchal cultures...” (103).

This historical characterization of womanhood gives us an idea about the root of female inferiority compared to the male counterparts of the society. Because the women of Bengal are constrained by certain social restrictions that eventually compel them to internalize certain characteristics specific to the place. In *Tree Without Roots*, therefore, we come across two central female characters: Rahima and Jamila. These two characters stand on two opposite poles as for Rahima Majeed's words draw the limit while Jamila cannot withstand the lifestyle of Majeed. It is important to mention here that Majeed comes to Mahabbatpur for survival and a fake graveyard of a falsified pir Saint Shah Sadeque becomes the cornerstone of his survival. The common people of the village accept his words and help him construct a *mazar* in the village. Majeed, therefore, starts solidifying his existence there adopting a wife and entering family life. Rahima, a widow-young-childless woman, becomes his mistress. Majeed describes Rahima as “a gentle, yielding, understanding personality” who never shows anger (Waliullah 21). Although Majeed believes that Rahima has developed “a deep respect” for him which is “mingled with fear”, he can realize that the overwhelming presence of the *mazar* empowers him more (21). Whether it is Majeed or the *mazar* or the correlating relationship between them, Rahima surrenders herself intimidating her voice. In the course of the story, in one instance, during harvesting time, Rahima is busy working throughout the night when Majeed calls Rahima: “His voice was not loud, but it had a note of

Femininity and Silence: Reading *Tree Without Roots*

finality. It was not to be disobeyed; as though there were no one greater or mightier than the man from whom it came” (46). It is relevant to see how the course of action proceeds in the novel where Majeed asks Rahima to massage his legs; almost everyday, she does serve her husband this way irrespective of her willingness or exhaustion after day-long works. However, on that particular day, Rahima is pre-occupied with so many things to accomplish within a time-frame that she tries to refuse the demand of her husband. Despite Rahima’s passivity and lack of immediate positive response, Majeed’s stubbornness just strips Rahima of her voice:

Spoken gently, these words were nonetheless a command, a command from the man who owned the paddy that was boiling and owned the woman who boiled it. It was also the command of a man strangely charged with happiness, yet imprisoned by the intensity of the present instant when time had ceased to flow (46).

The entire conversation between Rahima and Majeed, and Majeed’s subsequent monologue manifest the powerfulness of his existence. He owns everything from the land to his wife. On the contrary, Rahima’s life depends entirely on the will of Majeed. Therefore, she cannot disobey Majeed’s command, although here she tries to convince Majeed much softly, but in vain. It is the voice of Majeed that silences Rahima and it is the silence of Rahima that gives him an inexplicable pleasure. The submissiveness, fragility, and voicelessness define Rahima as a female. This is what makes Majeed and other like-minded people happy and satisfied. Eventually the silence that erupts from her voicelessness becomes an inseparable part of her femininity.

In another instance, Majeed informs Rahima of his desire to marry again so that he can have a child. During night, when Rahima massages Majeed’s feet, she can understand something unusual in him, but remains silent “as it was not for her to speak first” (89). The story, therefore, proceeds in a non-linear way, for instance, in reply to Majeed’s desire to have a child in the house, Rahima remains silent for few months, but later she suggests, “I would like very much to adopt Hasuni. He’s such a fat and healthy little child” (89). However, Majeed finds her willingness to adopt a child completely unreasonable and strives for a child of his “own flesh and blood” (89). Rahima, due to her simple-mindedness and naivety, cannot decipher the implications of Majeed’s words; Majeed, on the other hand, initially feels quite uncomfortable to utter his mind. After lots of dramatizations, Majeed finally becomes capable of voicing the words he has so wholeheartedly intended to convey, “Bibi, our home is a home without happiness. It is a house filled with sadness. We are like two strangers on a boat which drifts along and reaches nowhere” (89-90). Majeed, therefore, goes on providing with a number of reasons to justify his demand; Rahima, on the other hand, remains silent throughout the entire conversation. Her silence, however, does not remain confined to a mere silence; instead, “a strange and powerful fear took hold of her” resulting in her silence (90). Next morning, Majeed’s direct proposal to remarry raises a non-affective emotion in her that in the writer’s description appears to be a “no anger, no fear, no apprehension” feeling

(90). The strange fear that overwhelms her the night before gets transformed into a senseless, affectless numbness that holds onto her forever.

The way Majeed makes Rahima feel unable to give him happiness and joy is disgraceful. However, such disrespectful behavior and Majeed's decision to marry again cannot make her speak her mind. She accepts her husband as the ultimate authority of her life. His decision means the command to her. And her silence is the triumph of Majeed. Majeed expects the silence of Rahima to lead his life the way he wants. Therefore, it is Rahima's silence that makes her female in the eye of Majeed.

Contrary to Rahima, Jamila is vocal and spontaneous. From the very beginning, Majeed notices Jamila's voice and tries relentlessly to control her unrestricted behavior: "Before long Jamila became a source of ever-increasing worry for Majeed. The girl was strange. He could not grasp how her mind worked. Sometimes it seemed covered by dark clouds; at other times it was radiant like a clear bright sky. Her character was strangely erratic" (96).

Majeed for the first time can understand the absence of an obedient silence in Jamila when he hears a loud laughter coming from the inner house (93). The moment he hears it, he realizes the untamable difference that exists between Rahima and Jamila, because Majeed remembers that he has never heard Rahima laughing so loudly, nor any visitors to the mazar dares do it (93).

Jamila's laughter symbolizes her robust existence which is far distanced from the kind of femininity Rahima has. As a female Jamila has certain biological and psychological characteristics, but silence or accepting everything is not included in it which Rahima predominantly inheres.

At times, Jamila also remains silent, but this silence is an example of disobedience which she makes everyone understand through her activities. During one incident, when Majeed angrily asks Jamila about her prayer, she remains silent: "Finally she realized that there was no danger, no earthquake, no armed robbers, nothing but Majeed standing before her, looking down at her angrily. Next to him stood Rahima, quiet as a shadow, Jamila slowly lowered her face but did not move. Majeed asked her about her prayers, but she said not a word. She remained there frozen, silent" (101).

This silence that expresses Jamila's disagreement does not match Majeed's conception of femininity. Majeed always conceives of femininity as a way to act according to the man's orders. There should not be any refusal of or protest against his orders and desires. However, Jamila cannot match Majeed's expectations regarding femininity. She is more engaged in her world where her likes and dislikes matter more than Majeed's. Majeed is scared of Jamila's version of femininity which he is not much acquainted with.

Rahima and Jamila belong to the same sociocultural time, but they are different in their thoughts. Through their differences what gets manifested is the expectation of the males from their

Femininity and Silence: Reading *Tree Without Roots*

female counterparts. Jamila's strangeness scares Majeed; he cannot understand how to make her obey his command. He gets more fearful as he can sense that such strangeness can destroy his castle of falsifications and lies. Rahima, on the other hand, means stability to Majeed as he knows that she does not have the courage to go beyond his words. He gets assured of this fact because Rahima does not have a voice of her own. She abides by everything her husband recommends or demands. Rahima, therefore, embodies silence that is integral to the concept of traditional femininity. A female who has a voice has to undergo a lot of troubles the way Jamila encounters. On the other hand, silence ensures a female's acceptability in her society. Therefore, it is the silence that is one of the core elements in the concept of Bengal femininity.

Until a female gets silent, the society cannot rest in peace. Some females develop an unbreakable silence in them for the sake of survival, while others are silenced to belong to the society. The attributes such as weakness, softness, emotionality that a female essentially possesses, silence also becomes a part of them to adjust to a male-dominated society. The examples given at the beginning of the study show how women take hold of silence for surviving in the society. Rahima, in *Tree Without Roots*, portrays one of such characters whose silence makes Majeed happy. In her silent world, there is no place for voicing her wishes and likes. Jamila, on the contrary, is not confined to a silent world. She voices her likings and uses silence as an instrument only to inform the society of her disagreement. Therefore, it can be summarized that in the construction of femininity in this part of the world, silence is an unavoidable particle.

Note

Mazar is a sacred place in the context of Bangladesh where a graveyard of a religious person is worshipped and treasured.

References

- Bandapaddhaya, Manik. *Padma Nadir Majhi*. Dhaka: M.B. Printing and Publications, 2010.
- Hossain, Rokeya Sakhawat. *Aborodhbasini. Rokeya Rachanabali*, edited by Abdul Quadir, Dhaka: Bangla Academy, 2018, pp. 379-414.
- Majumdar, R.C., editor. *The History of Bengal*. vol.1, Dacca: The University of Dacca, 1943.
- Mills, Sara. "Negotiating Discourses of Femininity." *Journal of Gender Studies*, vol. 1, no. 3, 1992, pp. 271-285, doi: 10.1080/09589236.1992.9960499.
- Mohoney, Maureen A. "The Problem of silence in Feminist Psychology." *Feminist Studies*, vol. 22, no. 3, 1996, pp. 603-625, URL: <http://www.jstor.org/stable/3178132>.
- Money, John. "Propaedeutics of Diecious G-I/R: Theoretical Foundations for Understanding Dimorphic Gender-Identity/Role." *Masculinity/Femininity*, edited by June Machover Reinisch, Leonardo A. Rosenblum, Stephanie A. Sanders, New York, Oxford University Press, 1987, pp. 13-28.

The Chittagong University Journal of Arts and Humanities

Rozario, Santi. "Women and Development." *Purity and Communal Boundaries*. Dhaka: The University Press Limited, 2001, pp. 103-130.

Tagore, Rabindranath. "Haimanti." *Galpaguchchha*, Dhaka, Shuchoyoni Publishers, 2012, pp. 439-446.

Urquhart, Margaret M. "Changes and the Future." *Women of Bengal*. Calcutta: Association Press, 1925, pp. 130-156.

Waliullah, Syed. *Tree Without Roots*, edited by Niaz Zaman, Dhaka: writers.ink, 2005.

A Foucauldian Analysis of Power, Culture and Politics

Md. Najemul Alam*

Abstract

Michel Foucault, in his philosophical discourse, examined the changes in history and the ways in which power is used in society from a unique perspective. He clarifies the powers used in the traditional social order and how these powers subject people to the bio-power and bio-politics of the state and government. In the manner of idealistic thought, he explains how power functions in society and how its structure impacts many facets of society. The purpose of this article, in light of Michel Foucault's philosophy, is to analyze how power functions in culture, space, and history as well as how, from the interdependence of truth and power, a power system evolves over time to create a culture.

Introduction

Michel Foucault (1926-1984) places the greatest emphasis on experience in postmodern philosophy. Through the linguistic emergence of change he overemphasizes the meaning of the concept rather than the global impact of the concept. It is this historical foresight or archeology that Foucault is most interested in. His most important literary works are *Madness and Civilization* (1961), *The Birth of the Clinic* (1963), *Discipline and Punish* (1975), *The History of Sexuality* (1976). The childhood of the boys and girls of any generation is formed in the light of the various historical events of the time. The horror of war formed the background of Michel Foucault's existence. Perhaps this is why, according to Foucault himself, he was more enthusiastic about history and the relationship between experience and events. In 1971 he and some of his friends formed a group called the Group d'information sur les Prisons. Since then he has been involved in politics for the rest of his life working on prison conditions refugee issues and gay rights. The fundamental goal of Foucault's work is to show to us what we believe to be knowledge and the consistent, changing, and historical concepts—such as "intelligence," "normality," and "sexuality"—that we believe to be our own. According to him, these concepts do not merely evolve 'in progress' or represent a sustainable development, but at the same time are regulated and

*Lecturer, Department of Philosophy, University of Chittagong

modified by the needs of the behavior and management of those in power (Stokes 2005: 187). Underlying all of Foucault's work is the exploration of the relationship between power and knowledge and how this power is used to control and define knowledge. For Foucault, what the ruling class claimed to be 'scientific knowledge' was really nothing more than a means of social control (Stokes 2005a: 187). Foucault, for example, shows how in the eighteenth century the concept of madness was applied not only to the mentally ill but also to the poor, sick, homeless and indeed was also used by the ruling class to categorize and stigmatize disliked individuals (Foucault and Gordon, 1980: 243). It was not because of medical ignorance that the concept of 'madness' became opposed to reason but because of its function as a means of social control (Stokes 2005b: 187). Foucault in his, 'History of Sexuality', argues that this new emphasis on controlling the mind rather than the body as an effective strategy of domination continues in Freud's psychoanalytic approach. In the middle ages, where sexuality was purely a physical matter, Freud redefined it as a psychological feature of the mind. There is now an equal emphasis not only on people's sexual behavior, but also on their sexual motives (Foucault 1990: 95). Sexual behavior is regulated by focusing on people's attitudes towards sexuality which represents a fundamental aspect of their identity. Although individuals are encouraged to talk about their sexual orientation more freely than ever before, the freedom to talk freely about sex is tempered by the fear that something fundamental about their personality is being revealed through their passion for sex. Its effectiveness as a means of control is unparalleled (Foucault and Gordon 1980a, 243).

Research Questionnaires

The goal of the study is to find answers to the following questions:

- What does power mean?
- How power works in society?
- How the structure of power affects culture and politics?
- How power system becomes a culture?

Research Objectives

The following are the study's objectives:

- To analyze the concept of power in Foucault's philosophy;
- To study how power and knowledge are associated in society and culture through the lens of Foucault's philosophy;
- To investigate how the use of power makes people subject to the bio-politics and bio-power of the state;
- To discuss how power works in society and how society's allocation of power affects a variety of societal aspects;
- To understand how a power structure emerges in a society that eventually becomes a culture, in light of the Foucauldian philosophy.

Methodology and Materials

The author first started analyzing several studies on the Foucauldian concept of power, knowledge, subject, punishment, history, politics, and culture that he had gathered from a number of reliable data sources, including Google, Google Scholar, Research Gate, Academia, and

A Foucauldian Analysis of Power, Culture and Politics

Newspapers, in order to identify the research gap. The investigation was carried out using a theoretical research methodology. The available literature has been critically analyzed in the context of Foucauldian discourses on power, knowledge, culture, and politics. To understand the issue, relevant theories have been clarified and understood. Additionally, the effectiveness of the qualitative approach in this study is largely due to the successful use of secondary data in general. Secondary data is acquired from reliable media, books, journals, websites, and journal publications. To sum up, this is a qualitative study that heavily relies on secondary data.

Power

The ability to direct or control the present or future actions of an individual or a group of individuals is called power (Naím 2013: 25). In the sixteenth century, Niccolò Machiavelli in *The Prince* referred to power as synonymous with control. According to him, territorial occupation and political control are so common and natural that people do these when they get the chance.ⁱ According to Hobbes, the desire for power is a restless and eternal desire of all mankind, which ceases only after death.ⁱⁱ Friedrich Nietzsche, in 1883-85, in *Thus Spoke Zarathustra* said – Wherever I have seen a living being, I have noticed within it the will to power, and even in the slave I have found the will to be master.ⁱⁱⁱ

Michel Foucault, in his thought, explains power from different points of view. He saw power as multifaceted, combining history, archaeology, anthropology, and philosophy. He did not see power as 'force' but showed how power works in history, society, and political practice. In a state where power is exercised through institutionalized organizations, Foucault thought that thinking of power as such would not end the work. "Power is everywhere; not because it encompasses everything, but because it originates from everything," It is a relational activity involving effort and maneuver, a continuous flow of realignment of people, and practical calculation (Allen 2009: 227). All the governmental organizations that the state has, such as the police, army, and other military forces, are controlled by the state, and through them the state shows its power. In a capitalist society, educational institutions, the media, and family and religious institutions mainly belong to the ideological state apparatus. In an ideological state apparatus, ideology acts as the core and power as a secondary function, but in a repressive state apparatus, power acts as the primary function and ideology as a secondary function (Sharma and Gupta 2006, 8). But this interpretation of power alone does not satisfy Foucault. He does not want to confine power to the state, but rather he was interested in how power works outside the state apparatus. Foucault's analysis of society explains power as relational, not individual. Society is dominated by power. As much as individuals are constituted by power, they become the subject of power, i.e., the individual embodies power. Analysis of power can be done in different ways and at different levels, even interpersonal. Power is not only repressive but also manifests a multifaceted productive side (Foucault and Gordon 1980b, 245). In the life of the state, the people face power, the common people have a relationship with state institutions, and these state institutions did not come into their present form overnight. Foucault prefaces the book 'Discipline and Punishment' by explaining how people were publicly executed in ancient times but not now. Punishment as an exercise of power and the treatment of death-row convicts in prison as 'humane' today, such as the opportunity to pray, to ask for the last wishes of the accused, did not exist in

ancient times (Foucault 1977, 73-131). Either way, Foucault was interested in how it evolved. So it turns out that power doesn't just work in large cases. Power is exercised in every small area, where the state is a monster and this state-monster consists of many small organizations. We also find the concept of the state-monster in Hobbes's philosophy. But Foucault differs from Hobbes. Where Hobbes speaks of the ultimate sovereign, Foucault speaks of the subject under that sovereign. Foucault is also talking about micro power here, which he discusses through discourse or discursive methods. Foucault argues that many systems of power interact simultaneously but not always in consistent ways. He therefore avoids developing a single overarching approach to social and conceptual mobility himself, instead calling his project a "microphysics of power," or micropower (Sen 2019).

Subject and Power

In Foucault's view, power is not something that belongs to the state, the ruling class, or a sovereign; rather, it is a tool for achieving goals. Michel Foucault investigated the various master-making practices in Western culture from a philosophical standpoint. In doing so, he gives the problem of power a completely new perspective. Foucault asserts that the state emerged as a completely new form of political power in the sixteenth century. The majority of people view the system of government as an example of authoritarianism that puts the interests of one group above those of one set of citizens to the exclusion of personal concerns. However, Foucault underlines a distinct problem rather than calls this view incorrect. The state's authority, then, both personalizes and totalizes. Subjectivity was something Michel Foucault was really passionate about. On the basis of the connections between three questions, he classifies his thought-provoking books. First, how do people perceive themselves as knowledge-holders? Second, how does the individual become embedded in power relations? Thirdly, how can individuals establish themselves as moral agents? (Foucault 1982, 777-782). As opposed to Marxists, Foucault did not examine the effects of power at the level of ideology (Raaper and Olssen 2017). Since those who prioritize ideology in the analysis of power assume a person with an advanced master in line with the model of classical philosophy, who rides on him with consciousness and power, it is most logical, in his opinion, to ask the question about the body of the person and the question about how power works in the body (Mazhar 2017). From the 16th century, the main concern of the state became the supervision, nurturing, and improvement of the people. Foucault coined the term "bio-power" to describe a new system of state governance based on this idea. This bio-power recognizes the state's close observation of people's daily lives and activities as well as its use of knowledge and power (Foucault uses the terms synonymously) as agents of social change (Gutting 2005, 100). As a result, society becomes a political target. Parallel to this, disciplinary methods are used to subjugate, change, and develop the human body.

Power and Knowledge

Michel Foucault was fascinated by the way that power and knowledge affect an individual's existence and development throughout his entire career. Towards the end of his life, he became particularly interested not only in how the subject of knowledge is formed by this power, but also in how the individual constitutes himself morally. According to Foucault, our ideas about the world or ourselves do not always remain the same over time. However, a lot of people believe that

A Foucauldian Analysis of Power, Culture and Politics

certain universal truths, like the existence of matter, cannot be altered. In opposition to this view, Michel Foucault holds that there is nothing immutable between man and his body that can play a sufficient role as a basis for understanding oneself and other people (Windschuttle 1998, 5-35). Central to Foucault's thought is the analysis of the institutional form and source of everything from a historical and epistemological level. The rejection of self-evident truth and objectivity marks the beginning of postmodern philosophy's epistemology. According to the philosophers of that time, what we know is largely the result of individual action and communal consent. They also believe that all forms of knowing—knowing an entity, a society, etc.—are founded on the same equation. In his philosophy, Michel Foucault aims to link politics and epistemology. Instead of using different varieties of consciousness, perception, and ideologies to explain the development of a certain story or his genealogy of knowledge, he chose to do it using different power methods and strategies (Mazhar 2017a). Knowledge derived from science is usually seen as humanistic. As a result, the doctor has omnipotent power over the patient's body. Due to the doctor's specialized knowledge, this power exists. Foucault therefore refers to this knowledge as "power/knowledge," where power and knowledge are synonymous. In his analysis, Foucault places a strong emphasis on theory and practice, both of which shape the knowledge that is produced and exert influence on certain state organs and functions, including medical, mental and social welfare, charity, law, and gender formation (Weeks 2017, 6).

Power and Punishment

According to Foucault, the relatively low level of corporal punishment in torturing the criminal is a manifestation of the discretion of the state or ruling class, which is seen as a practical effect of profound change. Subtle but less painful pains that apparently have no material existence are considered by him as a special case. Foucault refers to knowledge as something used in the service of the ruling class. He believed that French prisons reflected the regime's thinking that controlling the mind was a more effective means of social control than punishing the body (Foucault 1977a, 104-107). Prolonged and inhumane punishment is a more terrifying act than a quick and brutal death by execution. Foucault considers the panopticon, from which prisoners can be monitored, as another practical example of the exercise of power. The main function of panopticons is to keep the prisoners alert and aware that they are constantly being watched. Although surveillance is not continuous, the arrangements are designed to ensure that the power is always maintained. The power becomes so perfect that it does not need to be realised. The very architecture of the prison becomes an instrument for the production and maintenance of power independent of the exerciser of power. That is, prison inmates are involved in a kind of power situation where they themselves become the bearers of power (Foucault 1977b, 201). Foucault challenges us to ask how we live in panopticons of our own making. He draws our attention to how credit cards, government and company records, phone logs, computers, security cameras, and various managerial techniques put us in fear of self-surveillance or constant surveillance and how this affects our thoughts, actions, and feelings.

History and Politics

From ancient Greek and Roman culture through sixteenth- to twentieth-century European civilization, Foucault studied a variety of historical eras. He was very concerned about how

events, which man himself is a part, relate to history and the subjective experiences of individuals, and he saw this as being at the center of his theoretical work (Foucault 1998). Michel Foucault questioned the linear flow of history in order to develop his philosophy. For him, the strong target a particular group of the ordinary people and use them as a conduit for their power rather than directly controlling the majority. This selection process employs the leveling method, whereby those who are hated are separated out by being labeled as lazy, insane, criminals, dissidents, destitute, deviants, etc. (Stokes 2005d).

Such leveling results in what Michel Foucault called divisive narrowing. Because, in his opinion, it is an effort to centralize control. The powerful select a small number of individuals from the whole population and use them for themselves, if necessary, to further their own goals. The strong attempt to legitimate their authority by fabricating their own narrative of truth, justice, or freedom by exploiting history to serve their own purposes. In the last chapter of "The History of Sexuality," Foucault makes the case that the fundamental tenets governing the state's exercise of power have changed significantly since the seventeenth century. He asserts that whereas earlier the sovereign power exercised power by taking the lives of its subjects, in the modern age this principle has been reversed and the exercise of power begins by managing the lives of the subjects. The integration of life into the 'Mechanism of Power' and the interrelationship of political strategies in the survival of mankind, according to Foucault, constitute the boundaries of modernity. Different historical periods have different ways of understanding and ordering their experiences. That is, an early twenty-first century reader cannot enter into the mindset and sense-making style of a person living in a different historical period. These historical periods and individuals are, in a sense, the invention of our own time, and we gradually reconstruct the past for the sake of the present (Danaher, Schirato and Webb 2000, 82). Foucault's philosophy is not directed at understanding the conscious thoughts and feelings of individuals in different eras or at recreating the "truth" or essence of different historical periods. Rather than thinking of history as a single and fixed entity, Foucault encourages us to think of multiple, mixed, and contested histories (Danaher et al. 2000, 98). Foucault originally used the term "governmentality" in the context of the emergence of the concept of the state in modern European history to describe a particular way of governing the population. He later expanded its definition to include techniques and methods that are devised to regulate the behavior of both individuals and populations at every level of the state, not just at the administrative or political level. This includes the concept of self-control (Kritzman 1988, XXIV). Analyzing history, he sees the development of a new type of oral practice, namely self-confession. Through this confession, one's inner thoughts, wishes, dislikes, goals, objectives, etc. would be revealed. Later, these confessions became the data of social science and were used by the state to formulate strategies for exercising power in the social structure. According to Foucault, governmentality is as much a matter of 'body politics' as it is a matter of conventional politics-such as political parties, elections, etc. It structures society and determines the individual's way of functioning and the individual's relationship to his own and others' bodies (Danaher et al., 2000: 83). Foucault never tries to analyze anything from a political point of view, but instead asks what it (politics) has to say about the problems that politics always faces. He is neither for nor against Marxism, but asks what Marxism has to say about these

A Foucauldian Analysis of Power, Culture and Politics

emerging problems. Foucault was more enthusiastic about the principles of politics than about politics itself. He raised these questions in the political field in the same way he raised questions in the historical and philosophical fields. But his inquiries are in no way predetermined by political views or driven by any specific political project. If one raises political questions from an ethical-epistemological point of view, one will never become a chess piece, he thinks. In a 1971 debate with Noam Chomsky, he said: "It seems to me that the current function of politics in our society is to criticize the actions of the most apparently impartial and independent institutions, and to criticize and attack these institutions in such a way as to expose the political violence that is secretly carried out through these institutions and to fight against them (Tuite 1971). Foucault's contribution to the theory of governance is that he attempts to establish a connection between the level of state and world politics on the one hand and the individual and his (the individual's) behavior in every sphere of life on the other. Foucault aims to explore the possibilities of understanding and discussing the ideas and practices of governance.

Culture and Space

Foucault attempts to demonstrate how knowledge and culture affect discourses in the majority of his writings. He opposes the idea that a guy has control over his ideas (Burrell 1988, 221-235). "It is not the aim of my work to analyze the context of power or to lay the foundation for such an analysis," writes Michel Foucault in his essay "The Subject and Power (1982)" "Rather, it has been the aim of my work for the last thirty years to write a history of the ways in which human beings have been mastered in our culture." Because of this, every civilization has cultural similarities and differences. While discussing culture in various writings, Foucault first defined culture as a hierarchical association of values that is readily intelligible to everyone. However, Foucault (2001, 173) notes that this process is both excluded and contained. If we want to highlight the planet called Earth, then we have to start from a certain time and the discussion of history on various topics such as traditions, religion, science, cultural norms, etc., created with time will become relevant in various ways. At the time when Michel Foucault's philosophical thought was being developed, various philosophical discussions were taking place in continental philosophy, including existentialism, Marxism, phenomenology, and obscurantism. Foucault never wants to confine himself to a particular theory or argument. He is interested in the discourses. In his "Archeology of Knowledge," Foucault rejects the concept of traditional history. He claims that historians have long debated how to construct a stable or unchanging state that lasts for centuries and occasionally undergoes abrupt transition as well as how political events develop through time. As a result, conventional historical conceptions are still hidden (Foucault 2002). Western scholars hold the view that space itself is history, containing elements of social, cultural, and institutional development across time. Ancient history is concentrated on historical civilizations, as opposed to the Medieval Era, which are marked by a hierarchical flow of urban and rural life. Once more, the modern era is characterized by industrial concentration. The way Michel Foucault perceived space or place implies a shift in how we think about how the environment and people, as well as objects, interact. To illustrate how the heliocentric theory challenges pre-modern ideas of space, he cites Galileo's notion as an illustration. The earth was considered to be the center of the universe during the medieval period. But Galileo discovered that the sun is at the center of our solar system using a

telescope. This idea of place was referred to as "emplacement" by Foucault. According to Foucault, this "emplacement" is just a decision rather than the result of an endless or supreme force (Foucault 1967).

Heterotopia

In the discussion of culture, Michel Foucault uses a term called "heterotopia," by which Foucault refers to a place that exists outside of our everyday social and institutional space (Key Concepts 2018). In general, we know that "Utopia" means an unreal world. In contrast to "Utopia," Michel Foucault uses the term "heterotopia" to describe how a space or place can have a different meaning depending on its relationship to another place (Smart 2004). According to Foucault, these things can only be understood in the context of relationships. In contrast to utopia, Foucault's heterotopia is real and exists. Prisons and hospitals are two examples of places where it is real. As these prisons and hospitals refer to certain things. Using the mirror as an example, Foucault explains utopia and heterotopia. According to Foucault, when we look at ourselves in the mirror, the real image of us reflected in the mirror is Utopia. Because what the mirror, in this case, is reflecting inside is a placeless place. But again, this mirror itself is a heterotopia. Because the mirror is a real object. The heterotopia of the mirror is very real, but the space in relation to the real space that surrounds it creates a very unreal virtual image. Foucault explains the concept of heterotopia with a few principles. The first principle is that all cultures produce heterotopias (Foucault 2004a). In every human community, it is obvious. But rather than being of a single type everywhere, heterotopias come in a variety of shapes and sizes. There are two different sorts of heterotopia, according to Foucault. The Heterotopia of Crisis is the name he gave to the kind of heterotopia present in the so-called ancient society. For instance, different holy sites or locations reserved for particular groups or people might be noted. In ancient cultures, it was forbidden for impure persons, pregnant women, or women who were menstrual to access certain places. These are a form of the "state of crisis," in Foucault's opinion. These circumstances have significantly changed in modern times, giving rise to a new variety of heterotopia. Heterotopia of Deviation is what he called it. In this case, the issue of emplacement is important. Those whose behavior or activities deviate from the norms or ideals set by society are transferred to these places. For example, mental hospitals, prisons, insane asylums, etc. The second principle, heterotopia is changing over time. It is possible for heterotopias to function in a space in a variety of different ways over time (Foucault 2004b). For instance, there are variances between cemeteries in cities and villages. The third principle is that several heterotopias can coexist in the same location (Foucault 2004c). Theatres or flower gardens, for instance. We are simultaneously in two places while watching a movie. There are two places: the movie theater and the locations where the scenes were shot. The fourth principle of heterotopia is that it frequently exists in various periods of time, or "heterochronics," as Foucault put it. We need to get out of the conventional notion of time if we want to understand how it operates (Foucault 2004d). For instance, in the cemetery, we are familiar with both human death and the burial and subsequent disappearance of a body. The library and museum are similar instances. All the objects kept in the museum were once there, but now they are lost or obsolete. In other words, it might be argued that different places, such as cemeteries, libraries, and museums, collect time. The fifth principle of heterotopia is that

A Foucauldian Analysis of Power, Culture and Politics

heterotopia is not easily accessible. According to Foucault (2004e), heterotopia requires a system of open and closed spaces that both divide one another while still allowing access. Examples of such spaces include barracks and prisons. The sixth and final heterotopian principle is that there is an action mode in relation to the remaining spaces. This phenomenon, which Foucault refers to as a "heterotopia of compensation" (Foucault 2004f), produces either an illusionary space that reveals real space or a perfect real space that is entirely distinct from an imperfect real space. For instance, a costly city has higher levels of saturation than a cheaper city.

Truth and power transform into a culture

The order of power, according to Foucault, seeks to narrow the range of human possibilities by elevating particular beliefs and practices as "normal" in a variety of contexts. Therefore, through a variety of oppressive strategies where judges of normality are present everywhere, sexual practices, family structures, religions, and various speaking and working styles are dismissed as "deviant" from "normal." (Gutting 2005a: 84). Foucault asserts that since power is elusive, "power games" may be concealed here as well (Basumatary 2020, 5). In comparison to the historical or metaphysical definitions of truth, Foucault was more interested in the politics of truth. The way a statement is made in society as a truth, the manner in which it is disseminated in society, the ways in which society and politics control that fact, as well as what occurs and how it occurs in response to that truth in various parts of society, all of which Foucault interprets as a cyclical process as a whole (Mazhar 2017b). Truth and power are interrelated, creating a system of power that actually becomes culture over a period of time. The whole system is, therefore, for Foucault, nothing more than a regime of truth or a system of power, which in turn takes shape in culture.

Conclusion

It's critical to make an effort to comprehend Foucault's work as a philosophy of history because doing so will help us as philosophy readers evaluate the true significance of his contributions to both history and philosophy as well as address persistent and misguided criticisms of his philosophy. Despite the initial impression that Foucault's philosophy is pessimistic, there is still some room for hope. He reaffirms the value of philosophy as a tool for challenging the ruling class's hold over the individual by outlining the hierarchical power structures that they employ. What we need to do, in Foucault's opinion, is work to create social structures that lessen the possibility of hegemony. At the same time, it is one of our duties to reevaluate our beliefs in light of the implications of knowledge.

Reference

- Allen, A. (2009). *The Foucauldian Peacekeeper: On the Dispersion of Power and the Futility of Change*. Power and Education, 1(2), 226–237. <https://doi.org/10.2304/power.2009.1.2.226>
- Basumatary, J. (2020). *Michel Foucault on Regenerative Relatedness of Power/Knowledge and Truth*. Journal of Indian Council of Philosophical Research, 37(3), 323–341. <https://doi.org/10.1007/s40961-020-00224-4>
- Burrell (1988) *Modernism, post modernism and organizational analysis 2: The contribution of Michel Foucault*. Organization studies, 9(2), 221-235.
- Danaher, G., Schirato, T., & Webb, J. (2000). *Understanding Foucault*. Allen & Unwin. <https://www.taylorfrancis.com/books/9781003118343>

The Chittagong University Journal of Arts and Humanities

- Foucault, M. (1967). *Of Other Spaces/Heterotopias*. Michel Foucault, Info. Retrieved March 18, 2022, from <https://foucault.info/documents/heterotopia/foucault.heteroTopia.en/>
- Foucault, M. (1977.). *Discipline and Punish: The Birth of the Prison*, Translated by Alan Sheridan (2nd Ed.). Vintage Books, 73-131.
- Foucault, M. The Subject and Power. *Critical Inquiry*, 8(4), 777–795, 1982.
- Foucault, M. *The history of sexuality: An introduction*, volume I. Trans. Robert Hurley. New York: Vintage, 95, 1990.
- Foucault, M. *Aesthetics, Method, and Epistemology: Essential Works of Foucault 1954–1984*, Vol. 2, ed. New York: James Faubion, New Press, 1998.
- Foucault, M. (2001). *L'hermeneutique du sujet. Cours au Collège de France, 1981-1982*. Paris: Gallimard Seuil.
- Foucault, M. (2002). *Archaeology of Knowledge* (2nd ed.). Routledge.
<https://doi.org/10.4324/9780203604168>
- Foucault, M. (2004) *Die Heterotopien/Les Hétérotopies, Der utopische Körper/Le Corps utopique. Zwei Radiovorträge*, trans. Michael Bischoff and with an afterword by Daniel Defert, Frankfurt: Suhrkamp (with audio CD). Available online: www.foucault.info/documents/heteroTopia/
- Foucault, M., & Gordon, C. (1980). *Power/knowledge: Selected interviews and other writings*, Gutting, G. (2005.). *Foucault: A Very Short Introduction (Very Short Introductions)*. 141.
Key concepts. (2018, March 19). Foucault News. <https://michel-foucault.com/key-concepts/>
- Kritzman, L. D. (1988). *Politics, philosophy, culture: Interviews and other writings, 1977-1984*. Routledge.
- Mamun, A. (May 6, 2014). *Argument: Chomsky and Foucault* [Blog]. Bacbichar. (Trans.)
<https://www.bacbichar.net/2014/05/art.1535.bb/>
- Mazhar, F. (2017). *Political Spirituality and Michel Foucault* [Chintaa]. Blog. (Trans.)
<https://chintaa.com/index.php/chinta/showArticle/423/>
- Naím, M. (2013). *The end of power: From boardrooms to battlefields and churches to states, why being in charge isn't what it used to be*. Basic Books, A Member of the Perseus Books Group.
- Raaper, R., & Olssen, M. (2017). In conversation with Mark Olssen: On Foucault with Marx and Hegel. *Open Review of Educational Research*, 4(1), 96–117.
<https://doi.org/10.1080/23265507.2017.1334575>
- Sen Binayak (2019). *Michel Foucault on Power: The Concept of Micropower* [E-paper]. SAMAKAL. (Trans.) <https://samakal.com/tp-kaler-kheya/article/19073692/>
- Sharma, A., & Gupta, A. (Eds.). (2006). *The anthropology of the state: A reader*. Blackwell Pub.
- Smart, B. (2004). *Michel Foucault* (Rev. ed., repr). Routledge.
- Stokes, P. (2005). *Philosophy, 100 essential thinkers* (1st American ed). Enchanted Lion.
- Tuite, K. (1971, November). *Human Nature: Justice versus Power, Noam Chomsky debates with Michel Foucault* [Interview]. <https://michel-foucault.com/2013/02/28/the-chomsky-foucault-debate/>
- Weeks, J. (2017). *Sex, Politics and Society: The Regulation of Sexuality Since 1800* (4th ed.). Taylor & Francis Group. <https://doi.org/10.4324/9781315161525>
- Windschuttle, K. (1998). *Foucault as historian. Critical Review of International Social and Political Philosophy*, 1(2), 5-35.

End note

- Machiavelli, *The Prince*, ch. 3, <http://www.constitution.org/mac/prince03.htm>.
- Hobbes, *Leviathan*, ch. 11, <http://www.bartleby.com/34/5/11.html>.
- Nietzsche, *Thus Spake Zarathustra*, ch. 34, <http://nietzsche.thefreelibrary.com/Thus-Spake-Zarathustra/36-1>; see also- Meacham, “The Story of Power,” *Newsweek*, December 20, 2008.

الموازنة بين الشعاعين أبي تمام والبُحْثُري في الأشعار العربية

(কবি আবু তাম্মাম ও কবি আল-বুহতুরী'র মধ্যে তুলনামূলক আলোচনা)

ড. মুহাম্মদ জুনাইদুল ইসলাম*

প্রতিপাদ্যসার

কবি আবু তাম্মাম ও কবি আল-বুহতুরী আব্বাসীয় যুগের প্রধান কবিদের অন্যতম। আরবি কবিতার সমৃদ্ধি ও উৎকর্ষ সাধনে তাঁদের অবদান অপরিসীম। আরবি কাব্যজগতে তাঁদের স্থান এক অনন্য উচ্চতায় অধিষ্ঠিত। কবি আবু তাম্মাম ১৯০ হি. সনে জন্ম গ্রহণ করেন এবং ২৩১ হি. সনে মৃত্যু বরণ করেন। কবি আল-বুহতুরী ২০৬ হি. সনে জন্ম গ্রহণ করেন এবং ২৮৪ হি. সনে মৃত্যু বরণ করেন। উভয় কবি সিরিয়ার 'মানবিজ' নামক স্থানে জন্ম গ্রহণ করেন এবং উভয় ছিলেন সমকালীন কবি। উভয়ের মধ্যে শিক্ষক-শিষ্যের সম্পর্ক ছিলো। কবি আল-বুহতুরী কবি আবু তাম্মামের নিকট থেকে কাব্যরীতি আত্মস্থ করেন এবং আবু তাম্মাম আল-বুহতুরীর তীক্ষ্ণ বুদ্ধি, প্রখর মেধা ও কাব্যপ্রতিভার প্রতি মুগ্ধ ছিলেন। কবি আল-বুহতুরী আবু তাম্মামের নিকট থেকে কাব্য রচনার কলা-কৌশল, রীতিনীতি ও শিল্পপদ্ধতি রপ্ত করলেও তিনি স্বীয় প্রতিভা ও যোগ্যতা বলে নিজের জন্য স্বতন্ত্র পথ আবিষ্কার করতে সক্ষম হন। কাব্য সংশ্লিষ্ট অনেক বিষয়ে তিনি আবু তাম্মাম থেকে পৃথক ছিলেন। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি হলো- আবু তাম্মাম কবিতায় একই সাথে একাধিক উপমা (تشبيهات) ও উৎপ্রেক্ষা (استعارات) ব্যবহারে অভ্যস্ত ছিলেন। ফলে পাঠকমহলের নিকট তাঁর কাব্যের ভাবার্থ উদঘাটন করা অনেক দুরূহ হতো। দুর্বোধ্য ভাষা ব্যবহারের ক্ষেত্রে তিনি সকল যুগের প্রসিদ্ধ কবিদেরকে ছাড়িয়ে গেছেন। অন্যদিকে আল-বুহতুরী'র ভাষা প্রাঞ্জল ও সহজবোধ্য। এমনভাবে আবু তাম্মাম নগরজীবনে বেড়ে উঠার কারণে দেশ-বিদেশের জ্ঞান-বিজ্ঞান, সংস্কৃতি ও সভ্যতার সাথে পরিচিত ছিলেন। ফলে তাঁর কবিতায় যুক্তি-দর্শনের প্রয়োগ অধিকহারে লক্ষণীয়। অন্য দিকে আল-বুহতুরী গ্রামীণজীবনে বেড়ে

* সহযোগী অধ্যাপক, আরবি বিভাগ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়

উঠার কারণে তিনি সর্বদা সাদাসিধে বর্ণনায় অভ্যস্ত ছিলেন। ফলে যুক্তি-দর্শনের উপস্থাপনা তাঁর কবিতায় তুলনামূলক কম পরিলক্ষিত হয়। আবু-তাম্মামের কবিতায় শাদিক ও আলঙ্কারিক সৌন্দর্য বৃদ্ধির ক্ষেত্রে কৃত্রিমতা ও আধিক্য পরিলক্ষিত হয়। অন্যদিকে আল-বুহতুরীর কবিতায় তা ছিলো স্বভাবজাত ও অকৃত্রিম। শাদিক দ্যোতনার ক্ষেত্রে আবু তাম্মামের কবিতায় ‘জিনাস (جناس) বা অনুপ্রাস এর অধিক প্রয়োগ দেখা যায়। অন্যদিকে আল-বুহতুরীর কবিতায় ‘তিবাক’ (طباق) অর্থাৎ বিপরীত অর্থবোধক দুটি শব্দ যেমন-দিন-রাত এর প্রয়োগ ব্যাপকভাবে লক্ষণীয়। আল-বুহতুরীর কবিতার সংখ্যা ও ব্যবহৃত ছন্দের সংখ্যা আবু তাম্মামের তুলনায় অধিক। সমালোচকগণ উভয়কে এভাবে মূল্যায়ন করেছেন যে, আবু তাম্মাম সংকলন কর্মে আল-বুহতুরীর চেয়ে শ্রেষ্ঠ এবং আল-বুহতুরী কাব্যালঙ্কারে আবু তাম্মামের চেয়ে শ্রেষ্ঠ। বক্ষ্যমাণ প্রবন্ধে উভয়ের কবিতার নানা দিক নিয়ে তুলনামূলক আলোচনার প্রয়াস পাব।

المقدمة

الشاعر أبو تمام والشاعر البحتري هما من أعلام الشعر العربي عبر العصور، خصوصاً في العصر العباسي، بينهما تشابهات في كثير الأمور مثلاً أنهما من عصر واحد، وهما من أشهر الشعراء عبر العصور، وهما من شعراء البلاط، كان بينهما التأثير والتأثير، وكان بينهما تعلق التلمذ والأستاذية، والنقاد فاضلوا بينهما لغزارة شعريهما وكثرة جيدهما وبدائعهما، أما أنهم لم يتفوقوا على أيهما أشعر، كما لم يتفوقوا عند المفاضلة في الشعراء الآخرين من الجاهليين والإسلاميين والمتأخرين، وأيضاً لا غرابة في عدم اتفاقهم هذا؛ لأن الحكم بالأفضلية يعتمد على الذوق، والأذواق الفنية مختلفة من قديم، فيُفضّل البعض بعضها والبعض الآخر بعضاً آخر، فبعض النقاد يُفضّل أبا تمام على البحتري والبعض على عكسه، والسُرُّ في ذلك أن أصحاب النقاد والشعراء في الجملة على طائفتين: طائفة أصحاب المعاني هم يُرجح استخدام العقل والفكر والفلسفة في الشعر، فهم يميلون إلى تفضيل أبي تمام على البحتري كشوقي وأمثاله، وطائفة أصحاب اللفظ والصناعة هم يُرجّحون السهولة والصوت العذب، فهم يميلون إلى تفضيل البحتري على أبي تمام كالأمدي وأمثاله، ففي هذه المقالة نسعى إن شاء الله بالموازنة بينهما في الأمور المتعلقة بحياتهما من الصفات والأخلاق والثقافة وكذا في الأمور المتعلقة بشعرهما من الغرض والبحر والفن والصناعة وما سوى ذلك، والله هو الموفق ومتمم الأمور.

الموازنة بين الشعراء أبي تمام والبُحْري في الأشعار العربية
(কবি আবু তাম্মাম ও কবি আল-বুহরী'র মধ্যে তুলনামূলক আলোচনা)

التعريف بأبي تَمَّام (١٩٠ - ٢٣١ هـ = ٨٠٦ - ٨٤٦ م)

هو حبيب بن أوس بن الحارث بن قيس بن الأشج بن يحيى بن مروان بن مر بن سعد بن كاهل بن عمرو بن عدي بن عمرو بن الغوث بن طيء - واسمه جلهمه - بن أدد بن زيد بن يشجب بن عريب بن زيد بن كهلان بن يشجب ابن يعرب بن قحطان (ابن خلكان، ١٩٠ م، ج ٢، ص ١١)، وُلد الشاعر بقرية "منبج" في شمال سوريا و قيل بقرية "جاسم" قرب دمشق، والروايات مختلفة في سنة ولادته، فقيل سنة ١٧٢ هـ وقيل سنة ١٨٢ هـ وقيل سنة ١٨٨ هـ وقيل سنة ١٩٢ هـ، (ضيف، تاريخ الأدب العربي، ج ٣، ص ٢٦٨)، وقال الأُمدي: إن أثبت القول في سن ولادته أنه وُلد سنة ١٩٠ هـ، يعتقد الأصفهاني أنه ولد من نسل عربي وهي قبيلة "طيء" والبعض يعتقدون أنه من أب رومي، واسمه تدوس أو بدوس أو تيودوس، وما يُرى من اسم أبيه "أوس" هو من قلب الشاعر نفسه بعد إسلام أبيه (عبد عون، ص ٣٣) كان الشاعر في بداية حياته حائكا في دمشق، ثم انتقل إلى فسطاط مصر ولبث هناك خمس سنوات يعمل ساقيا في جامعها الكبير، ثم جالس الأدباء، فأخذ عنهم، وتعلم منهم، وكان فطنا فهما، وكان يُحب الشعر، فلم يزل يُعانيه حتى قال الشعر فأجاد، وشاع ذكره وسار شعره ثم ضاقت به الفسطاط ومصر فشَدَّ الرحال إلى وطنه الشام ويقول الشعر هناك متكسبا (عبد عون، ص ٣٣) وبلغ المعتصم خبره فحملة إليه وهو بسر من رأى، فعَمِلَ أبُو تمام فيه قصائد عدة، وأجازه المعتصم، وقَدَّمه على شعراء وقته. وقدم إلى بَغْدَاد فجالس بها الأدباء، وعاشر العلماء. (الخطيب البغدادي، ٢٠٠٢ م، ج ٩، ص ١٥٧). وكذا أنه اتصل بالخليفة الواثق وبأحمد بن المعتصم وكذا اتصل بالوزراء أحمد بن أبي دؤاد القاضي ومحمد بن عبد الملك الزيات مثلما اتصل بكبار الكتاب كالحسن بن وهب والحسن بن رجاء فغادر بغداد مطوفا في أقطار الدولة الإسلامية، ففي أرمينية مدح خالد بن يزيد وفي الجزيرة مدح محمد بن يوسف الطائي وفي خراسان مدح عبد الله بن طاهر (موسوعة الشعراء، عبد عون، ص ٣٣) وكذا يتهاداه كبار القواد والعُمَال أمثال أبي سعيد محمد بن يوسف الثغري، وأبي دلف العجلي، وجعفر الخياط ومالك بن طوق، والحسن بن رجاء، والحسن بن وهب. (ضيف، الفن ومذاهبه، ص ٢٢٠). وأقام في العراق، ثم ولَّى بريد الموصل، فلم يتم سنتين حتى توفي فيها سنة ٢٣١ هـ

(مقدمة شرح ديوان أبي تمام، ج ١، ص ٥). وبني عليه أحد بني حميد الطوسي قبة خارج الميدان، وقبره الآن في حديقة البلدية بالموصل. (الأمدي، ص ١)

التعريف بالبُحْثري (٢٠٦ - ٢٨٤ هـ = ٨٢١ - ٨٩٨ م)

هو الوليد بن عبيد الله بن يحيى بن عبيد بن شمال بن جابر بن سلمة بن مسهر بن الحارث بن خيثم بن أبي حارثة بن جدي بن تدول بن بحتري بن عتود بن عثمة بن سلامان بن ثعل بن عمرو بن الغوث بن جلهمة وهو طيء بن أدد بن زيد بن كهلان بن سبأ بن يشجب بن يعرب بن قحطان. (الأصفهاني، ج ١٠، ص ٤٢) وكنيته أبو عبادة وقيل أبو الحسن، وقيل أبو عبادة قبل الدخول في العراق وأبو الحسن بعد الدخول فيها، يقول الخطيب البغدادي: "كَانَ يَكْنَى: أَبَا الْحَسَنِ، وَأَبَا عَبَادَةَ، فَأَشِيرَ عَلَيْهِ فِي أَيَّامِ الْمُتَوَكَّلِ أَنْ يَقْتَصِرَ عَلَى أَبِي عَبَادَةَ فَإِنَّهُ أَشْهَرُ" (الخطيب البغدادي، ج ١٥، ص ٦٢٠) أما أنه في عالم الأدب كان مشهورا بالبُحْثري منسوباً إلى "بُحْثَر" جده الثاني عشر، وُلِدَ سنة ٢٠٦ هـ وقيل سنة ٢٠٥ هـ وقيل سنة ٢٠٤ هـ، والمشهور أنه وُلِدَ سنة ٢٠٦ هـ (الخطيب البغدادي، ج ١٥، ص ٦٢٠)، وهو وُلِدَ ونشأ بمنبج وهي بلدة في الشام بين حلب والفرات، فنشأ في البادية الشامية في قبائل طيء، فتعلم منها الفصاحة العربية والبراعة الأسلوبية، وحفظ القرآن، كما حفظ كثيراً من الأشعار والخطب، وحين شبَّ اختلف إلى مجلس العلماء والأدباء (ضيف، تاريخ الأدب العربي، ج ٤، ص ٢٧١)، وحين سمع بشهرة أبي تمام في حمص قصده، وعرض عليه شعره، فأعجب أبو تمام بشاعريته وقال له: "أنت أشعر من أنشدني" فلزمه قليلاً وأفاد منه كثيراً (ضيف، تاريخ الأدب العربي، ج ٤، ص ٢٧٢) وهو اتصل بالخلفاء العباسيين، فمدح منهم ستة تعاقبوا في أيامه، وهكذا مدح كبار رجال الخلافة من الوزراء والأمراء والكتاب ونال الجوائز منهم إلا أنه نال الحظ الأوفى لدى الخليفة المتوكل، ولدى الفتح بن خاقان الذي هو وزير المتوكل (ضيف، تاريخ الأدب العربي، ج ٤، ص ٢٨٩)، كان البُحْثري صاحب مخيلة قوية، كان إذا صور الأشياء أبرز لها صورا دقيقة الفن، ويقال في شعره أنه "سلاسل الذهب" ولقبه ابن رشيق القيرواني بـ"شيخ الصناعة الشعرية" حيث يقول: أحسن الناس طريقاً في عتاب الأشراف شيخ الصناعة وسيد الجماعة أبو عبادة البُحْثري (ابن رشيق، ١٩٨١ م، ج ١، ص ١٦٤)

الموازنة بين الشعاعرين أبي تمام والبُحْري في الأشعار العربية
(کবি আবু তাম্মام ও কবি আল-بُهْزُرِّيٰ'র মধ্যে তুলনামূলক আলোচনা)

الموازنة بينهما في الصفات

وُلد أبو تمام سنة ١٩٠ هـ ووُلد البحتري سنة ٢٠٦ هـ، فأبو تمام أكبرُ من البحتري بستة عشر سنة، وأبو تمام مات سنة ٢٣١ هـ والبحتري مات سنة ٢٨٤ هـ، فمجموعة عُمر أبي تمام واحد وأربعون سنة ومجموعة عُمر البُحْري ثمانية وسبعون سنة، فالبحتري بقي في الحياة أكثر من أبي تمام سبعة وثلاثين سنة، كلاهما من بني طيء وهي قبيلة عربية معروفة بالأدب، أما البحتري وُلد بمنبج ورحل إلى العراق ثم عاد إلى الشام وتوفي بمنبج، وأبو تمام وإن كان شامي الأصل إلا أنه في حداثة عمره كان بمصر وقضى فيها وقتا طويلا من أول حياته، ولم يروى عن البحتري أنه ارتحل إلى مصر في أي وقت، ومن ناحية أخرى أن البحتري توفي بمنبج في الشام وأبو تمام توفي في العراق، ولم يُروى عن البحتري أنه عمل في أي منصب من مناصب الدولة أما أبو تمام تولى منصب بريد الدولة في العراق في آخر عمره نحو سنتين. هما من كبار الشعراء المتكسبين، ومن شعراء البلاط، أبو تمام شاعر بلاط الخليفة المعتصم والبحتري شاعر بلاط الخلفاء الخمسة: المتوكل، المستعين، المعتز، المعتمد، المعتضد، ويروى أن البحتري كان ممتلكا لضياح وسيع، ولم يكن أبو تمام كذلك، (ضيف، الفن ومذاهبه، ص ١٨٩) وكان البحتري من أوسخ خلق الله ثوبا وآلة وأبخلهم على كل شيء، يروى: أنه كان له أخ وغلّام معه في داره فكان يقتلها جوعا، ولم يكن أبو تمام كذلك، بل كان كريما وغيورا وكان خبيرا بعزته ووقاره، يقال إن أميرا نثر ألف دينار بعد إنشاده قصيدة مدحية، فالتقطها الغلمان ولكن أبو تمام لم يمس منها شيئا (مصطفى شكعة، ١٩٨٦م، ص ٦٤١)، وكان البحتري من أبغض الناس إنشادا يتشادق ويتزاور في مشيته وكذا كان مُعجبا بنفسه ومفتخرا بشعره، يُروى أنه إذا أنشد شعراً في مجلسٍ يقول للمستمعين: لم لا تقولون أحسنت؟ هذا والله مالا يقدر أحد أن يقول مثله! (الأمدي، ١٩٩٤م، ص ١) وكذا أنه كان أقل وفاء إلى المحسنين، حتى هجا نحواً من أربعين رئيساً بعد أن مدحهم وأخذ جوائزهم: ولا يُروى عن أبي تمام كذلك، أبو تمام كان في لسانه بعض الجبسة والتمتمة ولم يكن كذلك في البحتري، كان البحتري بدوياً أعرابياً وكان أبو تمام حضرياً ومدنياً، كان البحتري معتزلياً قبل اتصاله بالمتوكل، وبعد اتصاله به أصبح سُنياً ثم أنه اتهم بالزندقة في آخر أيامه بالعراق، حتى ترك العراق

وعاد إلى منبع خوفًا من إغالة الناس، (المرزباني، ص ٢٦٤) وأبو تمام كان رجل الدين ورجل القومية، أما ديانتَه لم يمنعه عن متع الحياة والإغراق في اللهو والتلذذ (عبد العزيز م.، ص ٨٣)، وأنه أيضًا رُمي بالكفر لقول قاله في جواب سؤال، وهو أنه كان يحمل ديوان أبي نواس في جانبٍ وديوان مسلم بن الوليد في جانبٍ، فلما سُئل عنهما فأجاب: أما اللقي عن يميني فاللالت، وأما التي عن شمالي فالعزى، وأنا أعبدُهما منذ عشرين سنة، لكن الحقيقة أنه كان مزاحًا لا أصلًا. (ابن المعتز، ص ٢٨٤)

الموازنة بينهما في التأثير والتأثير

كان أبو تمام يحتل مكان الأستاذ للبحثري عُمرًا وفنا، وكان البحثري متأثرًا به ويعترف بأستاذيته له، فإن أبا تمام كان إمام الأدب في عصره، والشعراء كانوا يحتفلون إليه دائمًا، فقصده البحثري يوما ولقيه في حمص، يقول البحثري: "كان أول أمري في الشعر ونباهتي أنني صرت إلى أبي تمام وهو بحمص فعرضت عليه شعري ... فقال لي أنتَ أشعرُ من أنشدني ثم كتب إلى أهل معرة النعمان وأمرهم بإكرامي، فصرت إليهم وأكرموني بأربعة آلاف درهم" (الأصفهاني، ج ١٠، ص ٤٦) وكذا يعترف البحثري بأستاذية أبي تمام وإحسانه، يُروى أنه قيل للبحثري: الناس يزعمون أنك أشعر من أبي تمام فقال: فقال والله ما ينفعني هذا القول ولا يضر أبا تمام والله ما أكلت الخبز إلا به ثم يقول: والله أنا تابع له أخذ منه لائد به، نسيبي يركد عند هوائه وأرضي تنخفض عند سمائه (الأصفهاني، ج ١٠، ص ٤٥) وذكر ابن رشيق وصيةً قيَّمةً من أبي تمام للبحثري في تنظيم الشعر: "فقال: يا أبا عبادة، تخير الأوقات وأنت قليل الهموم، صفر من الغموم، واعلم أن العادة في الأوقات أن يقصد الإنسان لتأليف شيء أو حفظه في وقت السحر، ... فإن أردت النسيب فاجعل اللفظ رقيقًا، والمعنى رشيقًا، ... وإذا أخذت في مدح سيد ذي أياذ فأشهر مناقبه، وأظهر مناسبه، وأبين معاملته، ... وكن كأنك خياط يقطع الثياب على مقادير الأجسام.. (ابن رشيق، ج ٢، ص ١١٤). وكذا لما قال المبرد له في شعر: أنت في هذا أشعر من أبي تمام. فقال البحثري: لا والله ذلك الرئيس الأستاذ. أما أبو تمام يحب البحثري لذكائه وفرط قوته في الشعر، كما نرى أنه فضَّل البحثريَّ من بين الشعراء التلاميذ عنده: وقال له أنك أشعر من أنشدني، وأيضًا يروى أن بني حميد أعطوا البحثري مالا جليلا في قصيدة مدحية لهم، لكن لما سمع به أبو تمام فقال للبحثري: فقد ظلموك، ما وقَّوك حقك والله لبيتٌ منها خيرٌ مما أخذت، ثم قال: وأنت والله يا بُني

الموازنة بين الشاعرين أبي تمام والبُحْثري في الأشعار العربية
(কবি আবু তাম্মাম ও কবি আল-বুহতুরী'র মধ্যে তুলনামূলক আলোচনা)

أمير الشعراء غدا بعدي. (شيخو، ١٩١٣م، ج٦، ص٣٠٤)، وكذا لما سمع أبو تمام بيتا للبحثري فقال: إن عمري لن يطول وقد نشأ في طيء مثلك (الأمدي، ص١) ومع رغم تأثر البحثري بأبي تمام إنه وقف في الصف المقابل لأبي تمام، يقف صف الصانعين مثل بشار وأبي نواس بينما يقف أبو تمام صف المصنعين مثل مسلم بن الوليد، ولعل لكونه أعرابيا لم يستطع أن يؤدي بما أداه أبو تمام فوقف تأثره بأبي تمام في بعض الجوانب الظاهرة، ولم يستطع أن يتغلغل في أعماق شعر أبي تمام (ضيف، الفن ومذاهبه، ص١٩١)

الموازنة بينهما في التاليفات الشعرية

بعد التفحيص نرى أن أصحاب التراجم ذكروا لأبي تمام ثمانية تأليفات وهي "ديوان أبي تمام" و "ديوان الحماسة" و "الوحشيات أو الحماسة الصغرى" و "فحول الشعراء" و "نقائض جرير والأخطل" و "مختار أشعار القبائل" و "اختيارات المقطعات" و "مختارات من شعر المحدثين"، الخمسة الأولى توجد مطبوعا، ولكن الثلاثة الأخيرة لاتوجد. وبجانب ذلك نرى للبحثري ثلاث كتب تأليفا وجمعا، وهي "ديوان البحثري" و "الحماسة أو حماسة البحثري"، و "معاني الشعر"، يوجد الأولان ولايوجد الثالث، وأيضا إذا نُقِبل حماسة أبي تمام بحماسة البحثري فنرى أن الشرف في هذا لأبي تمام وهو أول مبدع لهذا النهج والإسم، والبحثري ألف على منواله وكذا أن اسم "الاختيار" للجمع من اختراع أبي تمام، حتى أصبح مصطلحا فيما بعد، وأبو تمام بَوَّبَ حماسته نظراً إلى أغراض الشعر، فجعله في عشرة أبواب، وأهمها: الحماسة، المراثي، الأدب، النسيب، الهجاء، الصفات، الملح، مذمة النساء، أما البحثري في هذا متفرّد فهو بَوَّبَ حماسته نظرا إلى معاني الشعر ومفهومه، فقسّمه إلى أربعة وسبعين ومائة باب ترجع كلها إلى ثلاثة أبواب هي الأدب والحماسة والثناء، وبعد التفحيص والنقد نرى أن أبا تمام برع في اختيار الحماسة من البحثري، ولذا قال الخطيب: "إن أبا تمام في اختياره الحماسة أشعرُ من شعره"، والبحثري برع في قول الشعر من أبي تمام.

الموازنة بينهما في أيهما أشعر

القولُ بالقطعِ أيُّهما أشعر؟ مشكلٌ جداً، لأنَّ المفاضلةَ تعتمد على الذوق الفني وهذا يختلف باختلاف النقاد، فمن يميل إلى حلاوة اللفظ وصحة العبارة يُفَضِّلُ البُحْثِي؛ لكونه كذلك، ومن يميل إلى التدقيق وفلسفي الكلام يُفَضِّلُ أبا تمام لغموص المعاني ودقتها عنده ومع ذلك نجد كثير النقاد مالوا إلى تفضيل البحتري، سئل أبو العلاء المعري: أي الثلاثة أشعر؟ أبو تمام أم البحتري أم المتنبي؟ فأجاب: المتنبي وأبو تمام حكيمان، والشاعر البحتري. وكذا سئل البحتري: أيكما أشعر؟ أنت أم أبو تمام؟ فأجاب: جيدٌ أبي تمام خيرٌ من جيدي، ورديني خيرٌ من رديئه. وهو قصد به أنه معتدل في الشعر وأبو تمام قد يعلو وقد يسقط سقطاً، والاعتدال أفضل وأهم في الأمور كلها. (الآمدي، ص ١)، وكذا سئل أبو على الحسن عن أيما أشعر أبو تمام أم البحتري؟ فأجاب بما سمع من العلماء فقال: كيف يقاس البحتري بأبي تمام؛ وهو به، وكلامه منه؛ وليس أبو تمام بالبحتري، ولا يلتفت إليه (المرزباني، ص ٤١١). قال المبرد: شعر البحتري أحسن استواء من شعر أبي تمام. لأن البحتري يقول القصيدة كلها فتكون سليمة من طعن طاعن. وأبو تمام يقول البيت النادر والبارد. (شيخو، ج ٦، ص ٣٠٤) وكان أبو تمام يقول الشعر متكلفاً والبحتري طبعاً، وما يأتي طبعاً أحسن وأجود مما يأتي تكلفاً، يقول المرزباني: فسبحان الذي حوّل تكلف أبي تمام إلى البحتري، وطبع البحتري إلى أبي تمام! (الموشح، ص ٤١١) و يُروى أن دعبلاً يقول: لم يكن أبو تمام شاعراً، إنما كان خطيباً، وشعره بالكلام أشبه منه بالشعر (الصولي، ص ٣٦)، وقال النوبختي، قال لي البحتري: والله يا أبا الحسن لو رأيت أبا تمام الطائي، لرأيت أكمل الناس عقلاً وأدباً، وعلمت أن أقل شيء فيه شعره!. (الصولي، ص ٢١)، وقال الشايب عند المفاضلة بين أبي تمام والبحتري والمتنبي: ولعل البحتري أرق الثلاثة وأرضاهم، والمتنبي أجفاهم وأسخطهم، وأبو تمام أوسطهم وأشدّهم حذرًا واحتياطاً. وقد سئل الشريف الرضي عنهم فقال: "أما أبو تمام فخطيب منبر، وأما البحتري فواصف جوذر، وأما المتنبي فقائد عسكر". (الشايب، ص ١٤١) ومال الآمدي إلى تفضيل البحتري، لأن أبا تمام قد يعلو ويسقط والبحتري معتدل.

وقد أشرنا سابقاً إلى أصل الأمر في أمر المفاضلة أن الحكم فيه قطعاً مشكل جداً، فمن يُحب الخفة والسهولة فاضل البحتري ومن يحب المعاني السامية فاضل أبا تمام وفي العصر الحديث رأيتُ

الموازنة بين الشاعرين أبي تمام والبُحْثري في الأشعار العربية
(কবি আবু তাম্মাম ও কবি আল-বুহতুরী'র মধ্যে তুলনামূলক আলোচনা)

شوقي ضيف من أكثر المولعين بأبي تمام. وهو في كتابه "الفن ومذاهبه في الشعر العربي" أثبت بكل جهوده فضل أبي تمام على البحتري.

الموازنة بينهما في عدد الأبيات والقصائد

عدّد الأبيات عند البحتري يقرب من ١٦٠٠٠ بيتا ويقرب عند أبي تمام نحو ٨٢٠٤ بيتا، فتزيد أبيات البحتري من أبي تمام بنحو نصف العدد ومجموع القصائد والمقطوعات عند البحتري يبلغ نحو ٨٩٣ عدداً وفيهن القصائد نحو ٥٥٣ والمقطوعات نحو ٣٤٠، ومجموع القصائد والمقطوعات عند أبي تمام نحو ٤٩٢، وفيهن القصائد نحو ٢٥٩ والمقطوعات نحو ٢٣٣ بيتا. وأطول القصائد عند البحتري يبلغ ٨٩ بيتا وعند أبي تمام ٨٨ بيتا، وإذا عددنا القصائد التي تطول فوق خمسين بيتا، فوجدناها عند أبي تمام نحو ٣١ قصيدة وعند البحتري نحو ٢٠ قصيدة.

الموازنة بينهما في البحور والقافية

البحور المستخدمة في أشعار أبي تمام نحو ١٢ بحراً، وهي: الكامل، والبسيط، والمنسرح، والخفيف، والطويل، والوافر، والسريع، والرمل، والهزج، والمديد، والمجتث، والرجز، وهي عند البحتري نحو ٢٠ بحراً، وهي الخفيف ومجزوء الخفيف والوافر ومجزوء الوافر والكامل ومجزوء الكامل والطويل ومجزوء الطويل والسريع والبسيط ومجزوء البسيط والمنسرح والرجز ومجزوء الرجز والرمل ومجزوء الرمل والمجتث ومخلع البسيط والمديد والهزج، فأبو تمام لم ينظم أيّ شعر في المجزوءات، في حين نرى البحتري أنه نظم الشعر في كثير من المجزوءات، ونظم أبو تمام في الرجز نحو ١٣٨ بيتا في حين نظم البحتري فيه ٦٨ بيتا وهو أكثر من أبي تمام بنصف العدد. أما أنهما يشتركان في أنهما لم ينظما الشعر في بعض الحروف الصعبة أصلاً، فهي عند البحتري الذال والشين والطاء وعند أبي تمام الخاء والذال والطاء والغين، وكذا ما نظمناه في بعض الحروف الصعبة فهي أقل قليل بالنسبة إلى مجموع العدد، فنظم البحتري في الثاء ٨ بيتا وأبو تمام ٦٥ بيتا وفي الزاء نظم البحتري ١٥ بيتا وأبو تمام ٤ بيتا، وفي الصاد نظم البحتري ٣٥ بيتا وأبو تمام ٨ بيتا، وفي الطاء نظم البحتري ٥٧ بيتا ولم ينظم فيه أبو تمام أي شعر، وفي الغين نظم أبو تمام ٣ بيتا ولم ينظم البحتري فيه أي شعر، وفي الواو نظم

البحثري ٤ بيتا وأبو تمام ٥ بيتا، ونظم أبو تمام في الظاء ١١ بيتا ولم ينظم البحثري فيه أي شعر، ونظم البحثري في الضاد ٤ بيتا وأبو تمام ٣٨ بيتا. ونظم أبو تمام في الشين ٢٢ بيتا ولم ينظم البحثري فيه أي شعر.

الموازنة بينهما في الموضوعات الشعرية

كلا الشاعرين قد طرقا كل الأغراض الشعرية التقليدية من المدح والفخر والهجاء والشكوى والوصف والغزل والرثاء وما عدا ذلك ، أما أهم الموضوع وأغلبه في شعر أبي تمام المدح، وأكثر خصائصه وروائعه قد تجلت في هذا الموضوع، يقول الأُمدي: "وقد أحصيتُ عدة من مدحهم فألفيتهم ثمانية وأربعين ما بين خليفة وابن خليفة ووزير وكاتب وقاض وسري... وكان أكثر إنسان مدحه أبو تمام هو أبو سعيد محمد بن يوسف الثغري؛ فقد أحصينا له فيه سبعا وعشرين كلمة" (الأُمدي، ص ١) أما أنه لم يجد خطوة عظيمة إلا عند المعتصم، حتى أصبح شاعر بلاطه ورفيقه في الغزوات ثم يقارب المدح في الأهمية والفن موضوع الرثاء ولقد صدق البحثري فيما قاله في تقدير أبي تمام: " أنه مداحة نواحة " أي أنه قد بلغ ذروة الكمال في صنع شعر المدح والرثاء، وكان الرثاء عنده نوعين: رثاء تفجع وألم يقوله في ذويه وأصدقائه الموفين، ورثاء مجاملة يقوله في غيرهم من الناس (عبد العزيز ب.م، ص ٨٦) ثم يقاربه الغزل، أما أنه لم يكن يحمل حقيقة الحب والغرامة، ثم يقاربه الوصف والفخر، أما البحثري أهم أغراضه الوصف، وهو أجاد كثيرا في وصف القصور والبرك والحيوان من أسد وغير أسد، وقصيدته في وصف إيوان كسرى من دُرره وكذلك قصيدته في وصف أسطول ابن دينار (ضيف، الفن ومذاهبه، ص ١٩١). ثم يُقارب الوصف المدح، هواتصل بكثير من رجالات الدولة، ومدح الكثيرين، وأكثر مدائحه في أمير المؤمنين المتوكل على الله، ووزيره الفتح بن خاقان، ثم يضاف إلى ذلك العتاب والاعتذار ثم رثاء الممالك الزائلة، وكان البحثري قد وقع في حب حقيقي لإمراة اسمها علوة، ولم يكن كذلك لأبي تمام أما أنهما في موضوع الهجاء لم يُوفقا كثيرا، أما رواية تدل على أن للبحثري كان شعرا كثيرا في الهجاء لكنه أمر بإحراقه قبيل الموت لحصول مقصده منه، (عبد المنعم، ص ١٩٩) البحثري لم يجعل الحكمة من أغراض شعره ولا أن ينحو نحو الفلسفة كما فعل أبو تمام لأنه يؤثر السهولة والوضوح.

الموازنة بين الشاعرين أبي تمام والبُحْري في الأشعار العربية
(کবি আবু তাম্মাম ও কবি আল-বুহরী'র মধ্যে তুলনামূলক আলোচনা)

الموازنة بينهما في وضوح المعنى والتعقيد

من أهمّ الجوانب في شعر أبي تمام والبحري جانب وضوح المعاني وغموضها، شعر البحري عند الدلالة على المعنى في أشد الوضوح وشعر أبي تمام في أشد الغموض والتعقيد، مسألة الغموض والتعقيد في شعر أبي تمام من المسائل المهمة الشهيرة في النقد الأدبي قديماً وحديثاً، ولا يكون من المبالغة إن قلنا إن شعره من أصعب الأشعار عبر العصور، حتى الشعراء الجياد والعلماء الخيار يحتاجون إلى تجشم بالغ وكلفة شديدة عند استخراج معانيها واستنباطها، فالعلماء والنقاد قد أثاروا ضجة واسعة حول هذا الجانب في شعره، وباحثوا وتفكروا في أن هذا الغموض من العيب أم من المدح؟ ومن أين جاء هذا الغموض في شعره؟ وما ذا قدره الفني والأدبي؟ وكثير من النقاد جاهدوا في أمر المفاضلة بينهما، فأصبحوا فيه طائفتين: فأصحاب المعاني الذين يميلون إلى التدقيق وفلسفي الكلام، ذهبوا إلى تفضيل أبي تمام، وعندهم ما يُري من التعقيد والغموض في شعره فهي مسألة اتجاه جديد في الشعر، لا أمر الصعوبة والعسر في التعبير، وطائفة أصحاب اللفظ والصوت الذين يميلون إلى حلاوة اللفظ أكثر بالنسبة إلى المعنى، فهم ينحرفون من أبي تمام ويزعمون أنه لا يضيف شيئاً إلى الفن إلا صعوبة وعسراً في التعبير، ويفضلون البحري عليه ويرون أنه لائق به لحلاوة اللفظ، وحسن التخلص، ووضع الكلام في مواضعه،، ومن أبرز من ذهب إليه المبرد وابن الأعرابي والأمدي والنوبختي والمرزباني وأمثالهم، وأكثرهم من أهل اللغة، أما الذين فضلوا أبا تمام وجعلوا هذه الصعوبة والغموض من التجديدات، من أبرزهم في العصر الحديث شوقي ضيف، هو جعلها من تجديدات أبي تمام ويقول أن العلوم والفنون قد تطورت كثيراً في العصر العباسي، والعقل والفلسفة قد نضجا بقدر ملحوظ في هذا العصر فلا بد من ظهور أثره في كل مجال الحياة والفنون، فإدخال العقل والفلسفة عند التصوير في الشعر ليس من عيب، بل جدير بالمدح والاحترام، وأما الذين أحصروا من فهمه، فهي من عجزهم لا من عجز الشاعر، فالشاعر ليس من واجبه أن ينزل لهذا السبب إلى الجمهور بل يجب على الجمهور أن يصعد إليه. (ضيف، الفن ومذاهبه، ص ٢٤٠)

بعض الأمثلة من التعقيدات في شعره

كأن يقول أبو تمام في وصف روض:

- ومعرّسٍ للغيبِ تخفّق فوقه
- راياتُ كلّ دُجْنَةٍ وطُفَاءٍ
- نشرتْ حدائقه فصِرْنَ مألّفًا
- لطرائفُ الأنواءِ والأنداءِ
- فسقاه مسكَ الطلِّ كافورُ الندى
- وانحلَّ فيه خيطُ كلِّ سماءٍ

(التبريزي، شرح ديوان أبي تمام، ج ١، ص ٢٤-٢٥)

فقد عبّر عن السحب التي يتلألأ البرق في أطرافها بالرايات المطرزة التي تخفق بالريح؛ ولكن ليس هذا ما يلفتنا في الأبيات إنما يلفتنا الشطر الأول من البيت الثالث؛ فقد أبعد على نفسه فيه؛ إذ ذهب يقول: إن مسك الطل يسقي الروض كافور الندى، وهي صورة معقّدة، فماذا يريد أبو تمام بمسك الطل؟ وماذا يريد بكافور الندى؟ أما مسك الطل فإنه يريد به الرائحة العطرية التي تعبق من الروض إثر الطل والمطر الخفيف، وأما كافور الندى فإنه ذلك الرشاش الذي تعقد قطراته بيضاء على أوراق الروض كالكافور، وليس من شك في أن هذه صورة مركبة؛ ولكنها تعبق بالمسك والطيب، وهل هناك أجمل من تصويره لسقوط المطر بتلك الخيوط التي تنحل في الروض؟! إنه تصوير طريف قلما يقع في ذهن شاعر إلا هذا الذي يستوعب الثقافة والفلسفة. (ضيف، الفن ومذاهبه، ص ٢٤٥)

ومن أبياته الغامضة التي تحتل لتفسيرات متعددة قوله

وَلَهَتْ فَأَظْلَمَ كُلُّ شَيْءٍ دُونَهَا - وَأَنَارَ مِنْهَا كُلُّ شَيْءٍ مُظْلَمٍ

(التبريزي، شرح ديوان أبي تمام، ج ٢، ص ١٢٤)

يقول المرزوقي: "لما جزعت لفراق اشتد جزعها على، فأظلم كل شيء في عيني سواها ومن دونها، وبان لي ووضح من مكتوم أمرها ومكنون ودها لي ما كان مغيباً عني ومظلماً علي. ويجوز أن يكون المعنى: ارتفعت لما أحسّت بالفراق وتولّته فألقت قناعها فأظلم كل شيء دونها لسواد شعرها، فأنار كل شيء مظلم من بياض وجهها، والأول أوضح وأجود.

وهذه الوفرة من الاحتمالات كما تأتي من دقة المعنى وبعده تأتي أيضاً من ثقافته، ولعل ما

يوضح ذلك من بعض الوجوه قوله:

الموازنة بين الشعاعين أبي تمام والبُحْري في الأشعار العربية
(کবি আবু তাম্মাম ও কবি আল-বুহরী'র মধ্যে তুলনামূলক আলোচনা)

طال إنكارِي البياضَ ولو عُجِرَ - رُتُ حينًا أنكرتُ لونَ السوادِ

(التبريزي، شرح ديوان أبي تمام، ج ٢، ص ١٩١)

يقول المرزوقي: "يحتمل هذا البيت وجوهًا: أحدها: ما قاله الأعرابي لما استُوصف حاله؛ فقال كنت أنكر الشعرة البيضاء فقد صرت الآن أنكر الشعرة السوداء، والثاني: إن عَمِرْتُ شيئًا أسودَّ من لوني وجلدي ما كان مبيضًا فأنكرته، والثالث: إن عَمِرْتُ شيئًا أنست بالبياض وسكنت إليه حتى أكون منكراً للسواد إنكاري الساعة للبياض، والحق أن شعر أبي تمام شعر شخص مثقف ثقافة واسعة ما يزال يتسرب منها ظلال من الغموض ولكنها ظلال زاهية. (ضيف، الفن ومذاهبه، ص ٢٤٦)

الشاعر نفسه يستدل على كون الأشعار ممزوجة بالمعاني البديعية والألوان الزاهرة بقوله-

- | | | |
|----------------------------------|---|------------------------------------|
| خذها مثقفةً القوافي، رُبُّها | - | لسوايغ النعماء غيرَ كنودِ |
| حداءً تملأُ كلَّ أذنٍ حكمةً | - | وبلاغةً وتُدرُّ كلَّ وريد |
| كالدِرِّ والمرجانِ أَلْفَ نظمُهُ | - | بالشَّذرِ في عنقِ الكعابِ الرُّودِ |
| كشقيقة البردِ المُنَمَّمِ وشيْهُ | - | في أرض مهرةٍ أو بلاد تيزيد |

(التبريزي، شرح ديوان أبي تمام، ج ١، ص ٢١٣)

فالشعر عنده كالقلائد يصوغها الصانغ الحاذق؛ ففي كل شق منها درٌّ ومرجان وشذور من الذهب، بل هي كبرود أرض مهرة وتيزيد، التي ننمها الوشي ونَمَقها النقش.

الموازنة بينهما في البديع أو الصناعة اللفظية:

أبو تمام في أحيان كثيرة يحاول أن يواجه المستمعين إليه بالصناعة اللفظية، فيستخدم الألوان المتنوعة من البديع من الطباق والجناس والتقسيم والمشكلة ونوافر الأضداد أما يُكثِّرُ الجناسَ إكثاراً شديداً، ويُعجب به أكثر مما سواها، كما نراه في المثال التالي

إذ يقول في مديح خالد بن يزيد بن مزيد الشيباني وقد عزم المعتصم أن يوليّه الحرمين ثم

رجع عن عزمه:

- | | | |
|---------------------------|---|-----------------------|
| سيلٌ طما لو لم يذُده ذائد | - | لتبطحت أولاه بالبطحاء |
|---------------------------|---|-----------------------|

- وغدت بطونٌ مئىً مئىً من سيبه - وغدت حرىً منه طهور جِراء
- وتعرّفتُ عرفاتٌ زاخرة ولم - يُخصّص كداءً منه بالإكداء
- ولطاب مرتبّع بطيبةً واكتست - بُردين: بُرد ثرىً وبُردُ ثراء
- لا يُخرّم الحرمان خيراً إنهم - حُرّموا به نوءاً من الأنواء

(التبريزي، شرح ديوان أبي تمام، ج ١، ص ١٧-١٨)

استمر الشاعر يجانس بين يذود وذائد، وبطحاء وتبطحت، ومئىً ومئىً، وحرا وحراء، وتعرّفت وعرفات، وكداء وإكداء. وطيبة وطابت، والحرمان ويحرم. وأبو تمام عند استخدام ألوان البديع يستخدمها مختلطة ممتزجة مع التصوير والتشبيهات، فتمتزج فيها هذه الألوان، ويمر بعضها في بعض، وهذه هي الطريقة الممتزجة المعقدة، وطريقة البحري فيها طريقة بسيطة سهلة.

فبعض الأمثلة من هذا الامتزاج والتعقيد كما في شعره-

- ألبست فوق بياض مجدك نعمةً - بيضاءً تُسرّع في سواد الحاسد
- فإن فيه طباقاً بين البياض والسواد؛ ولكنه ليس طباقاً خالصاً، بل انغمس في لون آخر هو لون التصوير، إذا عبر عن غيظ الحاسد بالسواد وعبر عن نعمة صاحبه بالبياض. ولم يكتف بذلك، بل جعل هذا البياض يسرع في السواد وينتشر فيه.

وكذا منه قوله في مدح محمد بن عبد الملك الزيات.

- متى أنت عن ذُهلٍ العيِّ ذاهلٌ - وقلبكُ منه مدّة الدهر آهلٌ
- تُطلُّ الطلولُ الدمع في كل موقفٍ - وتمثلُ بالصبر الديارُ الموائلُ
- دوارسٌ لم يجفُ الربيعُ رُبوعُها - ولا مرٌّ في أغفالها وهو غافلٌ
- فقد سحبتُ فيه السحائبُ ذيلها - وقد أخملتُ بالنور فيها الخمائِلُ
- تعقّين من زاد العُفاة إذا انتحى - على الحي صرفُ الأزيمة المتحاملُ
- لهم سلفٌ سُمِرُ العوالي وسامرٌ - وفيهم جمالٌ لا يغيضُ وجمالُ

(التبريزي، شرح ديوان أبي تمام، ج ٢، ص ٥٣-٥٤)

الموازنة بين الشاعرين أبي تمام والبُحْثري في الأشعار العربية
(কবি আবু তাম্মাম ও কবি আল-বুহতুরী'র মধ্যে তুলনামূলক আলোচনা)

فإن في هذه الأبيات جمال الجناس واضح كما نرى بين دُهِليَّة وذاهلٌ و تُطلُ والطلولُ وتمثلُ والموائلُ، والربيعُ ورُبوعُها وأغفالها و غافلٌ وسحبتُ و السحائبُ وأُخملتُ و الخمائِلُ و سُمرٌ وسامرٌ وجمالٌ وجاملٌ، أما أنه أودعها في أوعية "التصوير" التي ترى فيها الطلول تطل الدمع والربيع لا يجفو الربوع ولا يمر بها غافلاً، ثم تلك السحائب التي تجرر أذيالها وتلك الخمائِل التي أخملت النور. وكذا أنه يهتم بالجناس بنوعيه من التام وغير التام، وقد يجمع الطباق مع الجناس في بيت واحد. كما في شعره -

من مات من حدث الزمان فإنه - يحيا لدى يحيى بن عبد الله

فإن بين كلمة "مات" و "يحيا" طباق، وبين كلمة "يحيا" و "يحيى" جناس

وكذا يفرض من جناس مصطنع وطباق مقصود وتشطير مستهدف يبدو فيه، وكأنه جعلها هدفاً دون الشعر.

أما البحتري لم يكن كلفاً بالبديع على النحو الذي كان عليه أبو تمام وربما حاول أن ينهج نهج أستاذه، ولكنه أخفق في ذلك، ولم يُساعده طبعه في ذلك. (حسن درويش، ١٩٨٩م، ص ١٧١) مع ذلك أنه كان مولعاً بها ويأتيها بقدر ملحوظ، فمن الألوان المستخمة في شعره الجناس، الطباق، رد العجز على الصدر، التكرار، التوشيح، التقسيم، الأنسجام والمماثلة، أما أنه يُعجب بالطباق أكثر مما يعجب بسواها وهو في الاصطلاح الجمع بين الضدين في كلام أو بيت، وهذه تسعى التضاد أيضاً، فهي في شعر البحتري كما في قوله

والدهرُ لوان، فهل مُخلِق	-	أبيضَه باللبس أم أسودَه
يا هل تُرى مُدنيةً للهوى	-	بمنبج أيامه المُبَعَدَه
نشدت هذا الدهرَ لما نثى	-	يُصلِح من شأنى الذي أفسدَه
مذمَّةٌ منه تغمَّدُها	-	بالصبرِ حتى خَلَّلت محمَدَه
فرَّق بين الناس في نجرهم	-	ما يُعظِم العبدُ له سيِّدَه
وأنجمُ الافق نظامٌ خلا	-	ما خالفتُ أنحُسُه أسعدَه

(حسن كامل الصيرفي، ديوان البحري، ص ٦٦٢-٦٦٣)

فها هنا الأبيات كلها من قصيدة واحدة، توالى فيه المطابقة بين الكلمات: أبيضه وأسوده، ومُدنيةً والمُبعدة، ويُصلح وأفسده، ومذمةً ومحمّده، والعبد وسيده، وأنحسه وأسعده. وكذا في شعره-

- | | | |
|----------------------|---|----------------------|
| منى وصلّ ومنك هجرٌ | - | وفى ذلّ وفيك كبرٌ |
| وما سواء إذا التقينا | - | سهلٌ على خلةٍ ووعرٌ |
| كنتُ حراً وأنت عبدٌ | - | فصرتُ عبداً وأنت حرٌ |
| أنت نعيمى وأنت بؤسى | - | وقد يسوء الذي يسر |

(حسن كامل الصيرفي، ديوان البحري، ص ١٠٥٠)

فهذه الأبيات كلها من قصيد واحدة، مدح بها البحري الفتاح بن خاقان، توالى فيها الطباق بين الكلمات: وصل وهجر، وذل وكبر، وسهل وعر، حر وعبد، ونعيم وبؤس، ويسوء ويسر.

الموازنة بينهما في الموسيقى الداخلية

الشعر يشتمل على أمور كثيرة من الجمال، وأسرعها إلى النفوس جرس الألفاظ، والانسجام في توالي مقاطعه، فالموسيقى من أبرز صفات الشعر يميزه من النثر، وينقسم هذا إلى قسمين: الموسيقى الخارجية والموسيقى الداخلية، والخارجية تتمثل في البحور والقوافي، والداخلية تتمثل في نغمات خفية تحدث من تلاؤم الحروف والكلمات، وسميت داخلية؛ لأنه ليست هناك قواعد ثابتة لإحساسه أو للحكم به، بل يعتمد على الذوق السليم والإحساس من داخل النفس، وهذا يزيد الحسن والجمال في الكلام، فالبحري قد برع فيه أكثر من أبي تمام فإن شعره موفور بالموسيقى الداخلى، يأتي الكلمات ذات نغم خفي، ذات خفة ورشاقة، كأن القارئ فيه ينحدر من الأعلى إلى الأسفل، ويقول ابن الأثير في شأن كلماته "كأنها نساء حسان علمهن غلاثل مصبغات وقد تحلين بأصناف الحلي" ويُفضل يوسف بكار البحريّ فيه على جميع الشعراء ، ويقول: "وبهذه الموسيقى الداخلية يتفاضل الشعراء، ولعل شاعرا عربيا لم يستوفي منها ما استوفاه البحري" (يوسف بكار، ١٩٨٢ م ، ص ١٩٥) وذلك كما نرى في شعره:

الموازنة بين الشاعرين أبي تمام والبُحْثري في الأشعار العربية
(কবি আবু তাম্মাম ও কবি আল-বুহতুরী'র মধ্যে তুলনামূলক আলোচনা)

- ذاك وادي الأراك فاحبس قليلا - مُقَصِّرًا من صَبَابَةٍ أو مُطِيلًا
قِفْ مشوقًا أو مُسَعِّدًا أو حَزِينًا - أو معِينًا أو عاذِرًا أو عذولا
(حسن كامل الصيرفي، ديوان البحتري، ص ١٧٦٦)

فإننا نجد العبارات فيه متدفقة متواصلة، والصوت فيه عذبة سهلة، تمر كالنسيم العليل، لا توقف فيها ولا تكلف.

أما إذا نرى إلى شعر أبي تمام فنراه عسير التلفظ مثل غموض معانيه، وذلك كما نراه في الشعر التالي:

- لو حازَ مرتادُ المنية لم يجد - إلا الفراقَ على النفوسِ دليلا
قالوا: الرحيلُ، فما شككتُ بأنَّها - نفسي عن الدنيا تُريدُ رحيلًا
الصبرُ أجملُ غير أن تلدُّدًا - في الحبِّ أخرى أن يكونَ جميلًا
أتظنُّني أجدُ السبيلَ إلى العزا؟ - وجد الجِمامُ إذاً إليَّ سبيلًا
(التبريزي، شرح ديوان أبي تمام، ج ٢، ص ٣٣)

فالموسيقى في هذه الأبيات مقسمة متئدة، أو نقول إنها كالماء الجاري بين الصخور، يتمهل ليظفر بالمنافذ والمسارب.

الخاتمة:

بعد الدراسة والتنقيد نستطيع أن نصل إلى نتائج تالية

- ١- أبو تمام والبحتري هما من قبيلة طيء ومن المولودين في سوريا ومن شعراء البلاط أما أبو تمام شاعر المعتصم والبحتري شاعر المتوكل، توفي البحتري في سوريا وأبو تمام في بغداد.
- ٢- كان أبو تمام يحتل مكان الأستاذ والبحتري مكان التلميذ، البحتري عند بناء الشعر يستفيد القواعد والضوابط من أبي تمام، وكان أبو تمام مولعا ومشغوبا بذكاء البحتري ومهارته في الشعر.
- ٣- نشأ أبو تمام نشأة حضريا مثقفا، والبحتري نشأ نشأة بادية أعرابيا.

- ٤- كان الشعر عند البحري على شدة الانكشاف والوضوح، وعند أبي تمام على شدة الغموض والتعقيد.
- ٥- معظم النقاد يُفضل البحريّ على أبي تمام في قول الشعر، ويفضل أبا تمام على البحري في أمر الجمع والاختيار من شعر القدامى
- ٦- كان أبو تمام يُبالغ في توظيف المحسنات اللفظية والمعنوية، والبحري يختار التوسط الرائع في استخدامها.
- ٧- كان أبو تمام يستخدم الصناعة اللفظية جبراً وقهراً وتصنعاً وتكلفاً، والبحري لا يستخدمها إلا ما يأتيه طبعاً وسمحاً.
- ٨- يُكثر أبو تمام استخدام الجنس مع جميع أنواعه، والبحري يُكثر استخدام الطباق بحساب ملحوظ.
- ٩- كان أبو تمام يأتي بالأقوال الفلسفية والدلائل المنطقية، والبحري كان يتجنب ويتبعد منها.
- ١٠- هما طرقاً كل الأغراض الشعرية التقليدية إلا أبا تمام قد تقدم في غرض المدح والبحري في غرض الوصف.
- ١١- أبو تمام يقوم بجانبه أهل المعاني والشعراء ومن يميل إلى التدقيق وفلسفي الكلام، والبحري يقوم بجانبه الشعراء المطبوعون وأهل البلاغة واللغويون
- ١٢- عدد الأبيات عند أبي تمام نحو ٨٢٠٤ وعند البحري نحو ١٦٠٠٠ ومجموع القصائد والمقطوعات عند البحري نحو ٨٩٣ وعند أبي تمام نحو ٤٩٢، والبحور المستخدمة عند أبي تمام نحو ١٢ بحراً وعند البحري نحو ٢٠، وأبو تمام لم ينظم أي شعر في المجزوءات ونراها كثيراً عند البحري، كلاهما لم ينظم في بعض الحروف الصعبة، فهي عند البحري الذال والشين والطاء وعند أبي تمام الخاء والذال والطاء والغين.

الموازنة بين الشعاعين أبي تمام والبُحْري في الأشعار العربية
(কবি আবু তাম্মাম ও কবি আল-বুহরী'র মধ্যে তুলনামূলক আলোচনা)

المصادر والمراجع:

- ١- ابن خلكان، أبو العباس شمس الدين أحمد بن محمد، *وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان*، (المحقق: إحسان عباس)، بيروت: دار صادر، ١٩٠٠ م.
- ٢- ابن رشيقي القيرواني، أبو علي الحسن، *العمدة في محاسن الشعر وآدابه*، (المحقق: محمد محيي الدين عبد الحميد)، بيروت: دار الجيل، ط ٥، ١٤٠١ هـ/ ١٩٨١ م.
- ٣- ابن المعتز، عبد الله بن محمد ابن المعتز العباسي، *طبقات الشعراء*، (المحقق: عبد الستار أحمد فراج)، القاهرة: دار المعارف، د-ت.
- ٤- الأصفهاني، أبو الفرج علي بن الحسين بن محمد بن أحمد، *الأغاني*، (تحقيق: سمير جابر) بيروت: دار الفكر، ط ٢، د-ت.
- ٥- الآمدي، أبو القاسم الحسن بن بشر الآمدي، *الموازنة بين أبي تمام والبُحْري*، مكتبة الخانجي - الطبعة الأولى، ١٩٩٤ م.
- ٦- التبريزي، أبو زكريا يحيى بن علي بن محمد الشيباني، *مقدمة شرح ديوان أبي تمام*، بيروت: دار الكتاب العربي، ط ٢، ١٩٩٤ م.
- ٧- الخفاجي، د. محمد عبد المنعم، *الحياة الأدبية في العصر العباسي*، الإسكندرية: دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر، ط ١، ٢٠٠٤ م.
- ٨- الخطيب البغدادي، أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت، *تاريخ بغداد*، (المحقق: الدكتور بشار عواد معروف)، بيروت: دار الغرب الإسلامي، ط ١، ١٤٢٢ هـ/ ٢٠٠٢ م.
- ٩- الخطيب التبريزي، *شرح ديوان أبي تمام*، بيروت: دار الكتاب العربي، ١٩٩٤ م.
- ١٠- الدكتور مصطفى الشكعة، *الشعر والشعراء في العصر العباسي*، بيروت: دار العلم للملايين، ١٩٨٦ م.
- ١١- الروضان، عبد عون، *موسوعة شعراء العصر العباسي*، عمان: دار أسامة، ط ١، ٢٠٠١ م.
- ١٢- الشايب، أحمد، *الأسلوب*، مصر: مكتبة النهضة المصرية، ط ١٢، ٢٠٠٣ م.

- ١٣- العباسي، أبو الفتح عبد الرحيم بن عبد الرحمن، *معاهد التنصيص على شواهد التلخيص*، (المحقق: محمد محيي الدين عبد الحميد)، بيروت، عالم الكتب، د-ت.
- ١٤- الصولي، أبو بكر محمد بن يحيى بن عبد الله، *أخبار أبي تمام*.
- ١٥- المرزباني، أبو عبيد الله محمد بن عمران، *الموشح في مأخذ العلماء على الشعراء*، د-ت
- ١٦- بروفيسر عبد العزيز ب. م، *تاريخ الأدب العربي*، كريل، د-ت.
- ١٧- بكّار، د. يوسف حسين، *بناء القصيدة في النقد العربي القديم*، بيروت: دار الأندلس للطباعة والنشر والتوزيع، ١٩٨٢م.
- ١٨- حسين كامل الصيرفي، *ديوان البحري*، القاهرة: دار المعارف، د-ت.
- ١٩- درويش، د. العربي حسن، *الشعراء المحدثون في العصر العباسي*، مصر: الهيئة المصرية العامة، ١٩٨٩م.
- ٢٠- شيخو، رزق الله بن يوسف بن عبد المسيح، *مجاني الأدب في حقائق العرب*، بيروت: مطبعة الآباء اليسوعيين، ١٩١٣م.
- ٢١- ضيف، د. أحمد شوقي عبد السلام، *الفن ومذاهبه في الشعر العربي*، مصر: دار المعارف، ط ١٢، د-ت.
- ٢٢- ضيف، د. أحمد شوقي عبد السلام، *تاريخ الأدب العربي العصر العباسي الثاني*، القاهرة: دار المعارف، ط ٢، د-ت.



কলা ও মানববিদ্যা অনুষদ
চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়